ফিওদর দস্তয়েভস্কি



বঞ্চিত লাঞ্ছিত

ফিওদর দস্তয়েভস্কি · বঞ্চিত লাঞ্ছিত

কয়েদখাটুনি থেকে ফিরে (১৮৬১ সাল) ফিওদর দস্তয়েভস্কি লিখেন 'বঞ্চিত লাঞ্ছিত' উপন্যাস, এতে তাঁর 'অপরাধ ও শাস্তি', 'ইডিঅট', 'কারামাজোভ ভাইয়েরা' উপন্যাসের মতোই একটা বড়ো রকমের দার্শনিক-মনস্তাত্ত্বিক চিত্রণ পূর্বাভাসিত হয়েছে। রুশ সমাজ ও রুশ প্রগতিশীল সাহিত্যের ওপর তার প্রভাব প্রভূত।

'বঞ্চিত লাঞ্ছিত' দস্তয়েভস্কির সর্বাধিক লোকপ্রিয় ও প্রসাদগুণে পাঠ্য উপন্যাস। এ প্রসঙ্গে লেভ তলস্তোয়ের উক্তি স্মরণীয়: '...দিন কয়েক আগে "বঞ্চিত লাঞ্ছিত" পড়লাম, অভিভূত হয়েছি।'

ফিওদর
দস্তয়েভস্কি

বঞ্চিত লাঞ্ছিত

ফিওদর দস্তয়েভস্কি

বঞ্চিত লাঞ্ছিত

উপন্যাস
চার খণ্ডে
সমাপ্ত



প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: ননী ভৌমিক
অঙ্গসজ্জা: ইউ. ফমেঙ্কো

Ф. Достоевский
УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ
На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Д $\frac{70301-284}{014(01)-78}$ 643—78

সূচী

ভূমিকা

রুশ সাহিত্যিক... আমরা যখন কথাটা বলি পুশ্‌কিন আর গোগল, দস্তয়েভস্কি আর তলস্তোয় প্রসঙ্গে, তখন আমরা তাতে একটা বিশেষ অর্থ আরোপ করি যাতে দেশের সাহিত্যকৃতি বড়ো হয়ে ওঠে। আমরা অনুভব করি যে রুশ সাহিত্যিক শুধু সাহিত্যিক নন, শুধু রুশী নন, তার চেয়েও বেশিকিছু।

গত শতকে আমাদের স্বদেশীয় সংস্কৃতি বিশ্বাঙ্গনে আবির্ভূত হয় তার নিজস্ব বার্তা, মানুষ আর মানবজাতির কাছে তার সুগভীর দায়িত্ববোধ, সামাজিক ও নৈতিক সমস্যার সমাধানে তার অকুতোভয় জিজ্ঞাসা নিয়ে।

সেই কারণে রুশ সাহিত্যিক হয়ে ওঠেন একাধারে সমাজকর্মী ও দার্শনিক, নিজ জনগণের আত্মজ হওয়ায় তিনি হয়ে দাঁড়ান বিশ্ব সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ, আর স্বযুগের সন্তান হওয়ায় তিনি হন ভবিষ্যতের সমকালীন।

সমুন্নত ও দর্পিত এই উপাধিটি ফিওদর মিখাইলভিচ দস্তয়েভস্কির ক্ষেত্রে পূর্ণ মাত্রায় প্রযোজ্য, প্রাণের ও প্রতিভার সমস্ত শক্তি নিয়ে মননের প্রয়াস আর বিবেকের আর্তি নিয়ে তিনি সাড়া দিয়েছেন সেই শোকাবহ কালটার জটিল ও মর্মান্তিক প্রশ্নে যখন টাকাকড়ি, জোরজুলুম, আর চক্ষুলজ্জাহীনতা লোককে পরিণত করেছে এক হৃদয়হীন অর্থহীন লক্ষ্যসিদ্ধির যন্ত্রে: ক্ষমতার জন্যে মুনাফা, মুনাফার জন্যে ক্ষমতা।

দস্তয়েভস্কির রচনা তখনো বলেছে এবং আজও বলছে যে মানুষের অন্তর বিদ্রোহ করছে, পরিত্রাণ সন্ধানে তা আকুল, একটা পণ্যে পরিণত হওয়ার চাইতে বরং আত্মনাশ সে মেনে নেবে।

দস্তয়েভস্কির রচনায় শুধু আবেগাধীর শিল্পীর নিরন্তর অস্থিরতা, গ্রহণের অযোগ্য এক জগতের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ আর দ্বন্দ্বাহ্বান নেই, আছে

সন্ধানীর যন্ত্রণাকর উদ্‌ভ্রান্তি, একার শক্তিতে যার সমাধান অসাধ্য সেই স্ববিরোধের কথাও।

দস্তয়েভস্কির সমকালীন নেক্রাসভ তখনকার একমাত্র চালিকা শক্তি দেখেছিলেন ক্রমসন্নিকট বিপ্লবে। দস্তয়েভস্কি চেয়েছিলেন সমকালকে ডিঙিয়ে যেতে, খুঁজেছিলেন কালবহির্ভূত অন্তিম একটা নৈতিক আদর্শ। বলাই বাহুল্য, প্রশ্নটার এমন সর্বাত্মক উত্থাপনে তার সত্যকারের বাস্তব সমাধান অসম্ভব, কিন্তু প্রতিভাধর কবি যে মর্মন্তুদ আবেগে প্রশ্নটা তুলেছিলেন, তা আজও তীব্র যখন রয়ে গেছে জুলুম আর টাকার দুনিয়া, লোকের প্রাণ যেখানে ধর্ষিত, রুধিরাক্ত।

না, নীতির শিক্ষা দেন নি দস্তয়েভস্কি। তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকর্মে তিনি বলেছেন: এভাবে বাঁচা আর চলে না। সেটা মনে রেখেছিল রুশ বিপ্লবীদের যুগটা, এখনো সেকথা শুনছেন বিশ্বের অগ্রণী লোকেরা, বিশ শতকের তীক্ষ্ণ বিরোধগুলোর কাছে মাথা নোয়ান নি তাঁরা।

ফিওদর মিখাইলভিচ দস্তয়েভস্কির মানবিক কীর্তি, সাহিত্যিক কীর্তি আমাদের কাছে চিরবরণীয়, তিনি আমাদের অগ্রদূত, আমাদের বিবেকের স্মৃতি।

কন্‌স্তান্‌তিন ফেদিন*

---

* ফ. ম. দস্তয়েভস্কির ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের বলশয় থিয়েটারে ১৯৭১ সালের ১১ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত সমারোহসভায় উদ্বোধনী ভাষণ থেকে।

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারি একটা অদ্ভুত ঘটনা হয়েছিল আমার গত বছর বাইশে মার্চের সন্ধ্যায়। সারাটা দিন শহর চষে বেড়িয়েছি একটা বাসাবাড়ির খোঁজে। পুরনো বাসাটা ছিল ভারি স্যাঁতসেঁতে, বিচ্ছিরি একটা কাশিই শুরু হয়েছিল আমার। শরৎকাল থেকেই ভেবে আসছি অন্য কোথাও উঠে যাব, কিন্তু বসন্ত পর্যন্ত গড়াল। সারাটা দিন ঘুরেও সেদিন যুতসই কিছুর সন্ধান হল না। প্রথমত, আমি চাইছিলাম একটা আলাদা বাসা, অন্যের সংসারে একটা ঘর মাত্র নয়। দ্বিতীয়ত, নয় একটি ঘরই হোক, কিন্তু সেটি হওয়া চাই অবশ্যই বড়োসড়ো, এবং বলাই বাহুল্য যথাসম্ভব শস্তা। দেখেছি, ঘুপচি ঘরে ভাবনাও হয় জড়োসড়ো। ভবিষ্যৎ উপন্যাসের কথা ভাবতে ভাবতে আগুপিছু পায়চারি করে বেড়ানো আমার অভ্যেস। প্রসঙ্গত, আসলে লেখার চাইতে আমার বেশি ভালো লাগে লেখাটা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে, শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে তারই জল্পনাকল্পনা। সত্যি বলতে সেটা আলস্য নয়, কিন্তু কী?

সকাল থেকেই শরীরটা ভালো ঠেকছিল না। বিকেলের দিকে খুবই অসুস্থ মনে হল: শুরু হল কেমন একটা জ্বরের মতো। তাছাড়া সারা দিন গেছে দুটো পায়ের ওপর, ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সন্ধ্যের দিকে, অন্ধকার ঘনিয়ে আসার ঠিক আগে আমি আসছিলাম ভজ্‌নেসেন্‌স্কি স্ট্রিট দিয়ে। পিটার্সবুর্গে মার্চের সূর্যটা আমার বেশ লাগে, বিশেষ করে সূর্যাস্তের সময়, অবশ্যই পরিষ্কার ঠান্ডা সন্ধ্যেটা। উজ্জ্বল আলোয় নেয়ে আচমকা ঝকমকিয়ে ওঠে গোটা রাস্তাখানা। হঠাৎ যেন ঝিলিক দিতে থাকে সমস্ত বাড়িগুলো। ধূসর, হলুদ আর ময়লা-সবুজ রঙ থেকে যেন মুহূর্তেই সব অপ্রসন্নতা মুছে যায়। মন যেন আলো হয়ে ওঠে, যেন চমক লাগে, কেউ যেন-বা ঠেলা দিল তার কনুই দিয়ে। একটা নতুন দৃষ্টি, নতুন ভাবনা... এক ঝলক রোদ দিয়ে লোকের প্রাণটাকে যে কী করে তোলা যায় আশ্চর্য!

কিন্তু রোদের ঝলকটা মরে গেল; তীব্র হয়ে উঠতে লাগল ঠান্ডা; নাক কনকন করতে লাগল; অন্ধকার হয়ে এল গোধূলি। দোকানপত্তরে গ্যাস জবলল। মিলারের মিষ্টিখানার উল্টো দিক পর্যন্ত পেণছিয়ে হঠাৎ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি, রাস্তার ওদিকটায় তাকিয়ে রইলাম, যেন এক্ষুনি অদ্ভুত কিছু যে একটা আমার ঘটবে তা বুঝি টের পেয়েছি। এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই রাস্তার অপর পারে চোখে পড়ল, সেই বুড়ো মানুষটা আর তার কুকুর। বেশ মনে আছে, একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি যেন হৃৎপিন্ডটা চেপে ধরেছিল, নিজেও ধরতে পারি নি, সে অনুভূতিটা ঠিক কী।

আমি রহস্যবাদী নই। দৈবাভাস বা ভবিষ্যৎদর্শনে বিশেষ বিশ্বাস নেই আমার, কিন্তু সম্ভবত সবার মতো আমার জীবনেও এমন কিছু অভিজ্ঞতা আছে যা ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না। যেমন, এই বুড়ো লোকটাই। ওকে দেখা মাত্রই কেন আমার মনে হল যে সেই সন্ধ্যেতেই আমার জীবনে এমন একটা কিছু ঘটবে যা ঠিক দৈনন্দিন ব্যাপার নয়? তবে, আমি অসুস্থ ছিলাম তা ঠিক, আর এ অবস্থায় অনুভূতিগুলো প্রায়ই হয় বিভ্রম।

ফুটপাথের ওপর ছড়ি মৃদু ঠক ঠক করে বুড়ো ধীরে দুর্বল পা ফেলে ফেলে এগিয়ে এল মিষ্টিখানার কাছে; পা ফেলছিল প্রায় না বেঁকিয়ে, যেন পা নয় কাঠ। এমন অদ্ভুত ভজকট মূর্তি আমি কখনো দেখি নি। আগেও মিলারের দোকানে যখনই ওকে দেখেছি, তখনই একটা পীড়িত অনুভূতি হয়েছে আমার। ঢেঙা চেহারা, কুঁজো হয়ে ওঠা পিঠ, মড়ার মতো আশী বছুরী মুখ, পুরনো ওভারকোট, সেলাই ছিঁড়ে গেছে, অন্তত কুড়ি বছরের পুরনো দলামোচড়া একটা গোল টুপিতে টেকো মাথা ঢাকা, চাঁদিতে যে এক গোছা চুল টিকে আছে, তা আর পাকা নয়, শাদাটে হলদে। তার যা কিছু অঙ্গভঙ্গি তা যেন হয়ে চলেছে ইচ্ছাবশে নয়, দম-দেওয়া, স্প্রীঙে। এই সব কিছুর ফলে ওকে প্রথম দেখে লোকে আপনা থেকেই থমকে যেত। আয়ু ফুরিয়ে গিয়েও যে বেঁচে আছে একা একা, দেখাশোনার মতো যার কেউ নেই, তেমন একটা বুড়োকে দেখলে কেমন অদ্ভুত লাগে, তার উপর আবার একে মনে হত একটা পাগলা, প্রহরীদের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে এসেছে। আর একটা জিনিসেও অবাক লেগেছিল — লোকটা ভয়ঙ্কর শীর্ণ। গায়ে মাংস নেই, হাড় ক'খানি কেবল চামড়ায় ঢাকা। বড়ো বড়ো কিন্তু নিষ্প্রভ চোখদুটো কেমন যেন নীল কোটর থেকে সোজা তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে, কখনো অন্য দিকে নয়।

কিছু যে সে দেখছেও না তাতে আমি নিশ্চিত। কারো দিকে তাকিয়ে থাকলেও সোজাসুজি হেঁটে যায় এমনভাবে যেন সামনে কেউ নেই। কয়েকবার এটা আমার নজরে পড়েছে। কে জানে কোত্থেকে মিলারের দোকানে লোকটা দেখা দিতে শুরু করেছে নিতান্ত সম্প্রতি, আর সঙ্গে সব সময়েই ওই কুকুরটা। মিলারের খদ্দেরদের কেউ তার সঙ্গে সাহস করে কথা কয় নি, সেও কথা বলত না কারো সঙ্গে।

রাস্তার অপর পারে আমি দাঁড়িয়ে; চোখ ফেরাতে পারছিলাম না ওর ওপর থেকে। ভাবছিলাম, "মিলারের দোকানে নিজেকে ও টেনে নিয়ে যায় কেন, ওখানে তার করবার কী আছে?" কেমন একটা বিরক্তি বেড়ে উঠতে লাগল আমার মনে, অসুখ আর হয়রানির ফল আর কি। "কী ভাবছে লোকটা?" আমি ভেবেই চললাম, "কী আছে ওর মাথায়? আদৌ কিছু সে এখনো ভাবতে পারে নাকি? মুখটা ওর এমন মরা যে তাতে কিছুই ফুটে ওঠে না। আর কোথা থেকেই বা জোগাড় করেছে ওই জঘন্য কুকুরটাকে? কদাচ ওকে ছেড়ে যায় না কুকুরটা, বুড়োর সঙ্গে যেন অচ্ছেদ্য, অখন্ড। দেখতেও হুবহু ওরই মতো।"

হতভাগা কুকুরটার বয়সও নিশ্চয় আশী হবে। সত্যি, নির্ঘাৎ তাই। প্রথমত, ওকে যা দেখাত, তেমন বুড়ো কোনো কুকুরই হয় না, আর দ্বিতীয়ত, ওকে প্রথম দেখা মাত্র একথাই বা কেন আমার মনে হল যে ওটা কিছুতেই আর পাঁচটা কুকুরের মতো নয়, অস্বাভাবিক কোনো কুকুর ওটা, ওর মধ্যে নিশ্চয় এমন কিছু আছে যা অপ্রাকৃত, তুকতাক করা, সম্ভবত কুকুরের রূপে কোনো মেফিস্টোফেলিস, এবং অদৃশ্য রহস্যময় কোনো একটা সূত্রে ওর ভাগ্য জড়িয়ে আছে ওর প্রভুর ভাগ্যের সঙ্গে। ওকে দেখলে মানতেই হবে ওর শেষ খাওয়াটা খাওয়ার পর অন্তত কেটেছে কুড়ি বছর। চেহারাটা কঙ্কালসার, কিংবা (বলা ভালো) ঠিক তার মালিকের মতোই। সব রোঁয়া প্রায় উঠে গেছে, কাঠির মতো ন্যাড়া লেজটা সর্বদাই দুই ঠ্যাঙের মাঝখানে গুটানো। লম্বা কানওয়ালা মাথাটা গোমড়ার মতো নিচে নামানো। জীবনে এমন কদাকার কুকুর আমি দেখি নি। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় মালিকটি যেত আগে আগে, ঠিক পেছু পেছু কুকুরটা, নাকটা ঠেকত সোজা ওভারকোটটায়, যেন আটা দিয়ে আঁটা। ওদের চলন, ওদের গোটা চেহারা যেন তখন প্রতিপদক্ষেপে প্রায় বলে উঠত:

'বুড়ো, বুড়িয়ে গেছি আমরা, ঈশ্বর,
কী বুড়োই না আমরা হয়েছি!'

ওদের দেখে একবার মনে হয়েছিল ওরা বুঝি গাভার্নি চিত্রিত হফম্যানের বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসেছে, সংস্করণটার সজীব বিজ্ঞাপনের মতো হেঁটে বেড়াতে শুরু করেছে দুনিয়ায়। রাস্তাটা পার হয়ে মিষ্টিখানায় ঢুকলাম বুড়োর পিছন পিছন।

দোকানে বুড়োটার আচরণ হত অতি অদ্ভুত রকমের। অনাহূত এই অতিথিটিকে দেখলেই ইদানীং কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে মিলার মুখ ব্যাজার করতে শুরু করেছিল। প্রথমত, এই বিচিত্র আগন্তুকটি কখনো কিছু চাইত না। সোজা কোণের দিকে গিয়ে চুল্লির পাশে বসত একটা চেয়ার নিয়ে। চুল্লির পাশে তার জায়গাটা যদি আগেই কারো দখলে গিয়ে থাকত, তাহলে ভদ্রলোকটির সামনে হতভম্ব শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বুড়োটা বিব্রতভাবে উঠে যেত জানলার পাশের অন্য কোণটিতে। সেখানে একটা চেয়ার বেছে বুড়ো ধীরে-সুস্থে বসত, টুপিটা খুলে রাখত কাছেই মেঝের ওপর, ছড়িটি রাখত টুপির পাশে, তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে নিশ্চল হয়ে বসে থাকত তিন-চার ঘণ্টা। কখনো একটা খবরের কাগজও সে তুলে দেখত না, একটা কথাও বলত না, একটা শব্দ পর্যন্ত করত না। শুধুই বসে থাকত, সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকত বড়ো বড়ো চোখ মেলে, কিন্তু তাতে এমন ভোঁতা নিষ্প্রাণ দৃষ্টি যে বাজি রাখতে পারি, চারপাশে যা হত কিছুই সে না দেখত, না শুনত। বার দুই-তিন একই জায়গায় পাক খেয়ে কুকুরটাও গোমড়া মুখে বসে পড়ত তার পায়ের কাছে বুটদুটোর মধ্যে নাকটা গুঁজে, তারপর মস্ত একটা শ্বাস ফেলে শুয়ে পড়ত সটান হয়ে; সারা সন্ধে কুকুরটাও এতটুকু নড়ত না, যেন মরে থাকত ওই সময়টুকু। মনে হত যেন এই দুটি প্রাণী সারা দিন কোথাও বুঝি মরে পড়ে ছিল, সূর্য ডুবতেই হঠাৎ যেন প্রাণ পেত শুধু মিলারের দোকান পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে সেখানে কী একটা রহস্যময় কর্তব্য সাধনের জন্যে যা কেউ জানে না। এইভাবে তিন-চার ঘণ্টা বসে থাকার পর বুড়ো অবশেষে উঠে দাঁড়াত, টুপিটি তুলে নিয়ে রওনা দিত বাড়ির দিকে, কে জানে কোথায় সে বাড়ি! কুকুরটাও উঠত, ঠিক আগের মতোই ঝোলা লেজ আর নোয়ানো মাথায় যন্ত্রের মতো পিছু পিছু চলত যথারীতি ধীর পদক্ষেপে। শেষের দিকে দোকানের খরিদ্দাররা সর্বোপায়ে এড়াতে চাইত বুড়োটাকে। তার পাশেও বসতে চাইত না, বুঝি কেমন একটা ঘেন্না লাগত তাকে দেখে। এসব কিছুই কিন্তু নজর করত না বুড়োটা।

দোকানটার খরিদ্দাররা বেশির ভাগই জার্মান। গোটা ভজ্‌নেসেন্‌স্কি

শিল্ট থেকে তারা এসে জুটত, সকলেই নানা ধরনের কারিগরির মালিক — গিটার, রুটিওয়ালা, রংমিস্ত্রি, টুপি-বানিয়ে, জিন বানাবার কারিগর — জার্মান অর্থে পিতৃতান্ত্রিক লোক সব। মিলারের দোকানটা মোটের ওপর চলত পিতৃতান্ত্রিক চালে। দোকানের মালিক প্রায়ই তার চেনা খদ্দেরের সঙ্গে এসে বসত টেবিলে, একটু মদ খেত। বাড়ির কুকুর আর বাচ্চারাও মাঝে মাঝে এসে জুটত খদ্দেরদের কাছে, খদ্দেররাও আদর করত বাচ্চা আর কুকুরদের। সকলেই সকলের চেনা, সবাই মান্য করত সবাইকে। খদ্দেররা যখন জার্মান খবরের কাগজে মগ্ন হয়ে থাকত, তখন দরজার ওপাশে দোকানদারের বাড়িতে উঠত 'মাইন লিবর আউগুস্টিন' সুরের ঘ্যাঙানি, — খনখনে পিয়ানোয় গানটা বাজাত বাড়ির বড়ো খুকিটি, শণের মতো চুল তার কুণ্ডলীতে লম্বমান, দেখতে হুবহু একটি শাদা ইঁদুরের মতো। ওয়াল্জ্টা গৃহীত হত সাদরে। মিলারের দোকানে রুশ পত্রিকা রাখা হত, তা পড়বার জন্যে প্রতি মাসের গোড়ার দিকে আমি যেতাম সেখানে।

ভেতরে ঢুকে দেখলাম, ইতিমধ্যেই বুড়ো জানলার পাশে জায়গা নিয়েছে, পায়ের কাছে যথারীতি টান হয়ে আছে কুকুরটা। নীরবে একটি কোণে গিয়ে আমি বসলাম, নিজেকেই প্রশ্ন করেছিলাম, "সত্যি কেনই বা এলাম এখানে, যখন করার আমার এখানে কিছুই নেই, যখন আমি অসুস্থ, তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে কিছু চা খেয়ে শুয়ে পড়াই যখন দরকার। নেহাৎ এই বুড়োর দিকে তাকিয়ে থাকার জন্যেই কি আমি এসেছি?" বিরক্ত লাগছিল। বিচিত্র, অসুস্থ যে অনুভূতি নিয়ে লোকটার দিকে চেয়েছিলাম রাস্তায়, তার কথা মনে হওয়ায় ভাবলাম, "কী দায় পড়েছে আমার ওকে নিয়ে? একঘেয়ে এই সব জার্মানদের নিয়েই বা আমার কী গরজ? বিদঘুটে এই মেজাজটাই বা কেন? আজেবাজে জিনিস নিয়ে কী লাভ এই শস্তা উত্তেজনায়? ইদানীং নিজের মধ্যে এটা লক্ষ্য করছি। জীবন ধারণে, জীবনটাকে স্পষ্ট করে দেখতে তাতে বাধা হচ্ছে। আমার গত উপন্যাসটার সরোষ সমালোচনা করে গভীর চিন্তাশীল জনৈক সমালোচকও সে কথা বলেছেন।" কিন্তু এ নিয়ে যতই ভাবি আর আফসোস করি না কেন, ওখানেই বসে রইলাম, ওদিকে ক্রমেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম জ্বরটায়, শেষে গরম ঘরখানা ছেড়ে আর যেতে ইচ্ছে করল না। ফ্রাঙ্কফুর্ট সংবাদপত্র একখানা তুলে নিয়ে দু'এক লাইন পড়তে পড়তে ঢুলতে লাগলাম। জার্মানরা থাকায় আমার কিছু এসে যাচ্ছিল না। ওরা পড়ছিল আর ধোঁয়া ছাড়ছিল, আর মাঝে-মধ্যে, মিনিট তিরিশেক পর পর নিচু গলায় ফ্রাঙ্কফুর্ট'এর

কোনো একটা সংবাদের জানানি দিচ্ছিল পরস্পরকে, নয়ত সেই বিখ্যাত জার্মান রসিক সাফির'এর কোনো চুটকি বা রসিকতা ছেড়ে দ্বিগুণ জাতি-গর্বে ফের ডুবে যাচ্ছিল তাদের পড়ায়।

আধ ঘণ্টা খানেক ঢুলেছি, হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর কাঁপুনিতে জেগে উঠলাম। তখন নিশ্চয় বাড়ি যাওয়াই উচিত। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের মধ্যে যে একটি নির্বাক নাটক হচ্ছিল তাতে ফের আমায় আটকাল। আগেই বলেছি, চেয়ারে বসেই বুড়ো কোনো একটা দিকে তাকাত এবং সারা সন্ধ্যে সেখান থেকে দৃষ্টি ফেরাত না। অর্থহীন রকমের একাগ্র, অথচ কিছুই না-দেখা সে চাউনির কবলে আমিও কয়েকবার পড়েছি। সে অনুভূতি ভারি অপ্রীতিকর, প্রায় অসহ্য, যথাসম্ভব জায়গা বদলে নিতাম আমি। সেদিন বুড়োর শিকার হয়েছিল একটি ছোটোখাটো গোলগাল, অসাধারণ পরিপাটী জার্মান, প্রচণ্ড মাড়-দেওয়া খাড়াই কলার, মুখটা অস্বাভাবিক রকমের লাল; রিগার এক ব্যবসায়ী সে, নাম আদাম ইভানিচ শুল্‌ৎস — এ দোকানে নতুন আগন্তুক। পরে শুনেছি, মিলারের সে অন্তরঙ্গ বন্ধু, কিন্তু বুড়োটাকে বা খদ্দেরদের অনেককে সে তখনো চিনত না। তৃপ্তিতে 'Dorfbarbier' পড়ে, মদে চুমুক দিতে দিতে হঠাৎ চোখ তুলে সে দেখে, বুড়োর স্থির দৃষ্টি তারই ওপরে। ব্যাপারটা খারাপ লাগে তার। 'বনেদী' জার্মানদের সবার মতোই আদাম ইভানিচ স্পর্শকাতর, শোভনতাপ্রিয় মানুষ। অমন অভদ্রের মতো একদৃষ্টে কেউ তার দিকে চেয়ে থাকবে এটা তার কাছে বিদঘুটে আর অপমানকর ঠেকল। এই অশালীন অতিথির দিক থেকে সে চোখ ফিরিয়ে রাগ চেপে নিজের মনে কী গজরাতে গজরাতে নীরবে আড়াল নিল খবরের কাগজের পেছনে। কিন্তু মিনিট দু'এক পরে কাগজের পেছন থেকে সন্দিগ্ধভাবে উঁকি না দিয়ে সে পারল না। কিন্তু তখনো সেই অবিচল দৃষ্টি, অর্থহীন অবলোকন। এবারেও আদাম ইভানিচ কিছু বলে নি। কিন্তু তৃতীয় বার ঐ একই ব্যাপার ঘটতে দেখে ও জ্বলে উঠল। ভাবল স্বীয় মর্যাদা রক্ষা করা এবং তার ধারণায় সে যার প্রতিনিধি সেই সুন্দরী রিগা শহরের মানহানি ভদ্রজনের এমন একটা আসরে হতে না দেওয়া তার কর্তব্য। অধৈর্যের মতো সে কাগজখানা ছুঁড়ে ফেললে টেবিলে, কাগজ-আঁটা কাঠটা ঠুকল সজোরে এবং মর্যাদায় জ্বলজ্বল করে মদে ও আত্মাভিমানে লাল হয়ে ক্ষুদে ক্ষুদে রক্তচক্ষু মেলে সে পাল্টা তাকিয়ে রইল বিরক্তিকর বুড়োটার দিকে। মনে হল, জার্মানটি এবং তার প্রতিপক্ষ দুজনেই যেন দৃষ্টির চুম্বক শক্তি দিয়ে অভিভূত করতে চাইছে

পরস্পরকে, দেখতে চাইছে কে প্রথম ঘাবড়ে গিয়ে চোখ নামাবে। কাঠ ঠোকার শব্দে এবং আদাম ইভানিচের খ্যাপাটে ভঙ্গিতে খদ্দেরদের সকলেরই দৃষ্টি পড়েছিল তাদের ওপর। অমনি সবাই সব ছেড়ে গুরুগম্ভীর নির্বাক কৌতূহলে লক্ষ্য করতে লাগল দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে। অতি হাস্যকর হয়ে উঠছিল দৃশ্যটা। তবে রক্তিমানন আদাম ইভানিচের স্পর্ধিত চোখের চৌম্বকত্ব একেবারে বৃথা গেল। কোনো কিছু না ভেবে বুড়ো সোজা তাকিয়েই রইল ক্ষেপে-ওঠা হের শুলৎসের দিকে; সকলের কৌতূহল যে ওকে নিয়েই, যেন তার মাথাটা রয়েছে মাটিতে নয়, চাঁদে, বুড়োর তা আদৌ খেয়াল নেই। অবশেষে ধৈর্যচ্যুত হয়ে আদাম ইভানিচ ফেটে পড়ল।

'কেন আমার দিকে তাকিয়ে আছেন অমন একদৃষ্টে?' তীক্ষ্ম খনখনে গলায় মারমুখো ভঙ্গিতে ও চেঁচিয়ে উঠল জার্মান ভাষায়।

প্রতিপক্ষ কিন্তু চুপ করেই থাকল, যেন কিছুই বোঝে নি, যেন প্রশ্নটা পর্যন্ত ওর কানে যায় নি। আদাম ইভানিচ স্থির করলে রুশ ভাষাতেই বলবে। দ্বিগুণ আক্রোশে সে চেঁচাল:

'আপকে পুছ করি, কেনো আপনি অমন তাকাও!' এবং চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে যোগ করলে, 'দরবার আমাকে জানিতেছে, আপকে না জানে!'

তবু একটুও নড়ল না বুড়ো। অসন্তোষের গুঞ্জন উঠল জার্মানদের মধ্যে। গোলমাল শুনে মিলার নিজেই এসে ঢুকল ঘরে। কী ব্যাপার সব শুনে সে ভাবলে বুড়োটা হয়ত কালা। একেবারে তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে বললে:

'শুলৎস মশায় আপকে পলছেন, মন তিয়ে তাঁর তিকে তাকান না।' দুর্বোধ্য আগন্তুকের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে যথাসম্ভব চেঁচিয়ে কথা কয়টা বললে মিলার।

যন্ত্রের মতো বুড়ো তাকাল মিলারের দিকে। এতক্ষণ পর্যন্ত তার যে মুখটা ছিল অচঞ্চল, হঠাৎ যেন তাতে কী একটা দুর্ভাবনা, কী একটা শঙ্কিত চাঞ্চল্যের লক্ষণ ফুটে উঠল। শশব্যস্তে কুঁথে কুঁথে সে নুয়ে পড়ল টুপিটা তোলার জন্যে, তারপর তাড়াতাড়ি করে লাঠি-টুপি নিয়ে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। করুণ একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে — ভুল করে বসা আসন থেকে বিতাড়িত হবার সময় ভিখিরি যেমন করে হাসে তেমনি দীন হেসে ও ঘর ছেড়ে চলে যেতে গেল। থুথুড়ে বেচারা বৃদ্ধের এই নিরীহ বিনীত ব্যস্ততার মধ্যে করুণা জাগানোর মতো, মর্মে বেঁধার মতো এমন অনেক কিছু ছিল যে আদাম ইভানিচ থেকে শুরু করে সকলেই এখন অন্যভাবে

দেখতে লাগল ঘটনাটাকে। পরিষ্কার বোঝা গেল, কাউকে অপমান করা তো দূরের কথা, বুড়ো মানুষটা নিজেই সব সময় তটস্থ, ভিখিরির মতো তাকে বুঝি সবখান থেকেই বের করে দেওয়া হবে।

সদয় সহানুভূতিশীল মানুষ ছিল মিলার।

উৎসাহ দিয়ে কাঁধ চাপড়ে সে বললে, 'না, না, পসুন, পসুন। মানে, হের শুল্ৎস আপকে পলছেন কি অমন তাকান না। দরবারের লোকে উনিকে জানছেন।'

কিন্তু এ কথাটাও বেচারা বুড়োর ঠিক হৃদয়ঙ্গম হল না। আরো বেশি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। টুপি থেকে তার রুমালটা পড়ে গিয়েছিল। নিচু হয়ে ছেঁড়া পুরনো নীল রুমালটা কুড়িয়ে নিতে গেল সে, তারপর কুকুরটাকে ডাকলে। নিশ্চল হয়ে কুকুরটা পড়ে ছিল মেঝের ওপর, দুই থাবায় মুখটি ঢেকে সম্ভবত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

কাঁপা কাঁপা বুড়োটে জড়িত গলায় লোকটা ডাকলে:

'আজর্কা, আজর্কা।'

আজর্কা নড়ল না।

'আজর্কা, আজর্কা,' বুড়ো করুণস্বরে ডাকলে আবার, ছড়িটা দিয়ে নাড়া দিলে। কিন্তু কুকুরটা যেমন ছিল তেমনি পড়েই রইল।

ছড়িটা পড়ে গেল বুড়োর হাত থেকে। নিচু হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে বুড়ো আজর্কার মাথাটা তুলে নিলে দুই হাতের মধ্যে। বেচারা আজর্কা। মারা গেছে কুকুরটা। মনিবের পায়ের কাছে মারা গেছে নিঃশব্দে — হয়ত বার্ধক্যে, অথবা না খেতে পেয়ে হয়ত। বজ্রাহতের মতো বুড়ো তাকিয়ে রইল এক মিনিট, যেন আজর্কা যে সত্যিই মারা গেছে সেটা মাথায় ঢুকছে না। তারপর আস্তে করে সে তার পুরনো সেবক আর বন্ধুর ওপর ঝুঁকে পড়ে নিজের বিবর্ণ গালখানা ঠেকালে কুকুরের মরা মুখের ওপর। নীরবে কাটল এক মিনিট। আমরা সকলেই ভারি বিচলিত হয়ে উঠেছিলাম... অবশেষে উঠে দাঁড়াল বেচারা বুড়ো। ভারি বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল সে। কাঁপছিল জ্বরগ্রস্তের মতো।

সদয় মিলার খানিকটা সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললে, 'এতাকে আপনি শুষেল* বানহিয়ে লিতে পারেন!' মাটি থেকে লাঠিটা বুড়োর হাতে তুলে দিয়ে ফের বললে, 'বালো একতা শুষেল বানহিয়ে লিতে পারবেন। ফিওদর

---

* শুষেল — স্টাফ করা মৃত পশুপাখি (জার্মান উচ্চারণে)। — সম্পাঃ

কার্লভিচ ক্রিগার খাসা শুষেল বানহান জানছেন। ফিওদর কার্লভিচ ক্রিগার হইলেন ওস্তাৎ।'

হের ক্রিগার সামনে এসে নিজেই সবিনয়ে সমর্থন করলে, 'হাঁ, হাঁ, আমি বালো শুষেল বানাহিয়ে পারি।'

লোকটা ঢ্যাঙা রোগা ধর্মপ্রাণ জার্মান। মাথায় এলোমেলো পাটকিলে চুল, বাঁকা নাকের ওপর চশমা।

নিজের আইডিয়াতে নিজেই উৎসাহিত হতে হতে মিলার বললে, 'চতো প্রকার খাসা শুষেল বানহান ফিওদর কার্লভিচ ক্রিগার, বৃহৎ গুণ আছে।'

'হাঁ, হাঁ, চতো প্রকার খাসা শুষেল বানহাবার বৃহৎ গুণ আছে আমার!' ফের সায় দিলে হের ক্রিগার এবং উদার স্বার্থত্যাগের ঝোঁকে যোগ দিলে, 'আপনার কুকুরকে শুষেল বানাহিয়ে তিব, কিছু না লইব।'

'না, না, শুষেল বানহানের খরচা আপকে আমি তিব!' ক্ষ্যাপার মতো চেঁচিয়ে বললে শুল্ৎস, দ্বিগুণ লাল হয়ে উঠেছে সে, মহানুভবতায় জ্বলজ্বল করে ওঠার পালা এবার তার। সরল মনেই সে ভাবলে, সব দুর্ভাগ্যের কারণ সেই-ই।

এ সবকিছুই বুড়োটা শুনলে বটে, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল একবর্ণও তার মাথায় ঢোকে নি। আগের মতোই সর্বাঙ্গ কাঁপছিল তার।

দুর্বোধ্য অতিথিটি চলে যেতে চায় দেখে মিলার চিৎকার করে বললে, 'তাঁড়ান, এক গ্লাস বালো কনিয়াক পান করিয়া যান!'

নিয়ে আসা হল কনিয়াক। যন্ত্রের মতো বুড়ো পাত্রটা নিলে, কিন্তু হাত কাঁপছিল, ঠোঁটে তোলার আগেই অর্ধেকটা পড়ে গেল, এক ফোঁটাও না খেয়ে সে পাত্রটা নামিয়ে রাখল ট্রের ওপর। তারপর অদ্ভুত, একেবারে বেখাপ্পা একটা হাসি হেসে মিষ্টিখানা থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুত অসমান পা ফেলে। আজর্কা পড়ে রইল মেঝের ওপর। থ' মেরে দাঁড়িয়ে থাকল সকলে। শোনা গেল অস্ফুটোক্তি।

এ-ওর দিকে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে জার্মানরা বলছিল, 'স্ভেরনৎ! ভাস্ ফুর আইনে গেসিহ্তে?'*

আমি কিন্তু বুড়ো মানুষটার পেছনে ধাওয়া করলাম। মিষ্টিখানা থেকে কয়েক পা দূরে ডান দিকে একটা সরু অন্ধকার কানাগলি আছে বড়ো বড়ো

---

* আচ্ছা মুশকিল, কী যে কাণ্ড! (জার্মান ভাষায়)

বাড়িতে চাপা। কেমন যেন মনে হল বুড়োটা নিশ্চয়ই সেখানেই গেছে। এখানে ডান দিকের দ্বিতীয় বাড়িটা তৈরি হচ্ছিল, কাঠ দিয়ে চারিদিক বাঁধা-ছাঁদা। বাড়িটার চারপাশের বেড়া প্রায় গলির মাঝখান পর্যন্ত এসে পৌঁছিয়েছে। তার পাশ দিয়ে পথচারীদের যাতায়াতের জন্যে কাঠের পাটাতন পাতা। বাড়িটা আর বেড়াটার অন্ধকার একটা কোণে বুড়োটাকে পেলাম। কাঠের ফুটপাথের ধারে সে বসে আছে, হাঁটুর ওপর কনুই ভর দিয়ে দুই হাতের মধ্যে মাথাটা ধরা। আমি গিয়ে বসলাম পাশে।

কী থেকে শুরু করব বুঝে পাচ্ছিলাম না। বললাম, 'শুনুন, আজকার জন্যে শোক করবেন না। চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই। শান্ত হোন, এক্ষুনি একটা গাড়ি ডেকে আনছি। কোথায় থাকেন?'

বুড়ো কোনো জবাব দিলে না। ভেবে পাচ্ছিলাম না কী করব। পথচারীও কেউ নেই। হঠাৎ বুড়োটা আমার হাত আঁকড়ে ধরতে লাগল।

'দম!' প্রায় শোনা যায় না এমন একটা ঘড়ঘড়ে গলায় সে বললে, 'দম পাচ্ছি না!'

'চলুন, আপনাকে বাড়ি নিয়ে যাই!' চিৎকার করে উঠে দাঁড়ালাম আমি। বুড়োকে জোর করে তুলতে চেষ্টা করলাম। 'একটু চা খেয়ে শুয়ে পড়বেন... এক্ষুনি গাড়ি ডেকে আনছি। ডাক্তারও ডাকব... আমার একজন চেনা ডাক্তার আছে...'

আর কী কী বলেছিলাম মনে নেই। ওঠার চেষ্টা করছিল ও, কিন্তু খানিকটা উঠেই মাটির ওপর ফের পড়ে গিয়ে ঐ ভাঙা ভাঙা দম আটকানো গলায় কী বিড়বিড় করতে লাগল। আরো নিচু হয়ে শোনার চেষ্টা করলাম আমি।

ঘড়ঘড়ে গলায় বুড়ো বললে, 'ভাসিলিয়েভস্কি দ্বীপে... ছয় নম্বর লাইন... ছয় ন-ম্ব-র...'

তারপর চুপ করে গেল।

'ভাসিলিয়েভস্কি দ্বীপে আপনি থাকেন? কিন্তু ভুল পথে এসেছেন। ওটা হবে বাঁ দিকে, ডান দিকে নয়। এক্ষুনি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি...'

বুড়ো নড়াচড়া করছিল না। আমি ওর হাতটা নিলাম। হাতটা ঝুলে পড়ল মরার মতো। মুখের দিকে তাকালাম ওর, ছুঁয়ে দেখলাম — মরে গেছে লোকটা। মনে হল সব কিছুই যেন ঘটছে স্বপ্নে।

ঘটনাটায় অনেক ঝামেলা পোয়াতে হয়েছিল আমাকে, তার মধ্যে জ্বরটা

কখন নিজে থেকেই চলে যায়। বুড়োর আস্তানাটা খুঁজে পাওয়া গেল। ও অবিশ্যি ভাসিলিয়েভস্কি দ্বীপে থাকত না, যেখানে মরেছে থাকত সেখান থেকে দু' পা দূরে, ক্লুগেনের বাড়িতে, পাঁচতলায়, ঠিক ছাতের নিচেই। ছোটো একটা ঢোকার ঘর আর নিচু ছাদওয়ালা বড়ো একটা ঘর নিয়ে আলাদা ফ্ল্যাট — জানলা বলতে তিনটি ফোকর। অসহ্য দারিদ্র্যের মধ্যে থাকত লোকটা। আসবাব বলতে একটা টেবিল, দুটি চেয়ার আর অতি পুরনো একটি সোফা — পাথরের মতো শক্ত, ভেতরকার গদি সব ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়েছে চারিদিকে। কিন্তু এই আসবাবগুলোও ওর নয়, বাড়িওয়ালার। চুল্লিটায় স্পষ্টতই দীর্ঘ দিনআঁচ পড়ে নি কোনো। ঘরের কোথাও মোমবাতি পাওয়া গেল না। এখন আমার সত্যি করেই মনে হয়, মিলারের মিষ্টিখানায় বুড়ো যেত নেহাৎ মোমবাতির আলোয় কিছুক্ষণ বসে থেকে গরম হবার জন্যে। টেবিলের ওপর মাটির একটা খালি মগ, এক টুকরো বাসি ছাতাপড়া রুটি। টাকা পয়সা কিছুই পাওয়া গেল না, একটা কোপেক পর্যন্ত নয়। নেই কবর দেবার মতো একটা বদলী সুতী পোশাক। একজন তার শার্টটা দিলে। বুঝতে পারছিলাম, ও ভাবে অমন একা বাস করা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়, নিশ্চয় কেউ অন্তত মাঝে মাঝে এসে তার দেখাশোনা করে যেত। টেবিলের দেরাজে ওর পাসপোর্ট পাওয়া গেল। মৃত ব্যক্তি আসলে বিদেশী, যদিও রাশিয়ার নাগরিক। নাম তার ইয়েরেমিয়া স্মিথ্, ইঞ্জিনিয়র ছিল সে; আটাত্তর বছর বয়স। টেবিলের ওপর পড়ে ছিল দুটি বই — একটি সংক্ষিপ্ত-পাঠ ভূগোল, এবং অন্যটি নিউ টেস্টামেন্টের রুশ অনুবাদ, মার্জিন ভরে পেনসিলের লেখা আর নখে দাগা। বইগুলি আমি নিজে নিলাম। বাড়িওয়ালা এবং অন্যান্য ভাড়াটেদের জিজ্ঞাসাবাদ করা গেল। লোকটার সম্পর্কে এরা কেউই প্রায় কিছুই জানে না। বাড়িখানায় ভাড়াটে অসংখ্য, সকলেই প্রায় কারিগর কিংবা জার্মান মেয়ে — এরা খাওয়া সমেত লজিং ভাড়া দিত। বাড়ির সরকার ভদ্রবংশজাত, এই ভূতপূর্ব ভাড়াটে সম্পর্কে সেও বিশেষ কিছু বলতে পারলে না। শুধু এইটুকু জানালে যে ঘরখানার ভাড়া ছিল মাসে ছয় রুবল। মৃত ব্যক্তি সেখানে থেকেছে মাস চারেক; গত দু' মাসের ভাড়া এক কোপেকও দেয় নি। তাই ঘর ছেড়ে দেবার জন্যে তাড়া দিতে হয়। জিজ্ঞেস করা হল, কেউ তার দেখাশোনা করার জন্যে আসত কিনা। কিন্তু এর কোনো সন্তোষজনক উত্তর কেউ দিতে পারল না। বাড়িখানা প্রকাণ্ড, কত লোকই তো আসা-যাওয়া করে এই নোয়ার জাহাজে। সকলকে তো আর মনে করে রাখা সম্ভব নয়। দারোয়ান

এ বাড়িতে কাজ করছে পাঁচ বছর, সে হয়ত কিছু বলতে পারত। কিন্তু একপক্ষ আগে সে দেশে চলে গেছে ছুটিতে। তার জায়গায় বদলী দিয়ে গেছে তার ভাইপোকে, ছোকরা গোছের, ভাড়াটেদের অর্ধেককেই সে এখনো সরাসরি চিনে উঠতে পারে নি। এই সব জিজ্ঞাসাবাদের ফলাফল কী দাঁড়িয়েছিল তা সঠিক বলতে পারি না। তবে শেষ পর্যন্ত কবরস্থ করা গেল বুড়োকে। ওই অন্যান্য নানা ঝামেলার মধ্যে একদিন গিয়েছিলাম ভাসিলিয়েভস্কি দ্বীপে, ছয় নম্বর লাইনে। কিন্তু গিয়ে নিজের মনেই হাসি পেল: এক সার সাধারণ বাড়ি ছাড়া সেখানে কী দেখবার আছে? ভেবে পেলাম না মরার সময় তাহলে বুড়ো ছয় নম্বর লাইন আর ভাসিলিয়েভস্কি দ্বীপের কথাই বা বলল কেন? ভুল বকছিল কি?

স্মিথের পরিত্যক্ত ঘরখানা নজর করে দেখে আমার ভালোই লাগল। নিজের জন্যে সেটা ভাড়া নিলাম। আসল কথা ঘরখানা বেশ বড়ো — যদিও ছাতটা ভারি নিচু, এত নিচু যে প্রথম প্রথম মনে হত সিলিং-এর সঙ্গে মাথা ঠুকে যাবে বুঝি। তবে অচিরেই অভ্যাস হয়ে গেল। মাসে ছয় রুবলে এর চেয়ে ভালো কিছু পাওয়া যাবে না। জায়গাটা আলাদা মতো, তাই লোভ হল। বাকি রইল কেবল চাকরের একটা ব্যবস্থা — একেবারে চাকর ছাড়া থাকা অসম্ভব। দারোয়ান কথা দিলে, প্রথম দিকটায় অন্তত দিনে একবার করে এসে জরুরী কাজকর্ম করে দিয়ে যাবে। তাছাড়া, মনে মনে ভেবেছিলাম, বুড়ো লোকটার খোঁজ করতে কেউ হয়ত কখনো এসেও পড়তে পারে। কিন্তু ওর মৃত্যুর পর পাঁচ দিন কেটে গেল, কেউ এল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সে সময়টা, ঠিক এক বছর আগে, আমি পত্রিকাদিতে কাজ করতাম; প্রবন্ধ লিখতাম এবং নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতাম, বড়ো কিছু, ভালো কিছু এক দিন লিখে ফেলতে পারব নিশ্চয়। বড়ো একটা উপন্যাস নিয়ে খাটছিলাম তখন; কিন্তু এ সবের শেষ তো হল এই যে এসে ঠেকলাম হাসপাতালে, বোঝাই যাচ্ছে শিগ্গিরই মরব। আর মরতেই যখন চলেছি তখন মনে হতে পারে স্মৃতিকথা লিখে লাভ কী।

কিন্তু আমার জীবনের এই দুঃসহ শেষ বছরটার কথা যে আপনা থেকেই ক্রমাগত মনে পড়ছে আমার। ইচ্ছে হয় সবটা লিখে ফেলি। আর এই

কাজটা না থাকলে হয়ত বিষাদের চাপেই মরে যেতাম বলে আমার বিশ্বাস। অতীতের এই সব ছবি আমায় মাঝে মাঝে আকুল করে তোলে, বেদনায়, যন্ত্রণায়। কলম ধরলে তা হয়ে উঠবে অনেক অনেক শান্ত, অনেক সুস্থির। অতটা প্রলাপ, অতটা দুঃস্বপ্নের মতো লাগবে না। তাই আমার ধারণা। লিখে যাওয়ার কাজটাই কত হিতকর: তাতে সান্ত্বনা পাব আমি, মন জুড়াবে, পুরনো সাহিত্যিক অভ্যাসগুলো নড়েচড়ে উঠবে, আমার স্মৃতি আর ব্যথিত স্বপ্নগুলো পরিণত হবে কর্মে... সত্যি, এটা মন্দ নয়। তাছাড়া, সহকারী ডাক্তার হবেন এটির উত্তরাধিকারী; শীতকালে ডবল ফ্রেম লাগাবার সময়, আমার পাণ্ডুলিপি দিয়ে জানলা সাঁটার কাজ হবে তাঁর।

কিন্তু কেন জানি না, আমার কাহিনী আমি শুরু করেছি মাঝখান থেকে। সবটাই যদি লিখতে হয় তবে গোড়া থেকে শুরু করা দরকার। তাহলে গোড়া থেকেই শুরু করি। তবে আত্মকাহিনী আমার বিশেষ দীর্ঘ নয়।

আমার জন্ম এখানে নয়, অনেক দূরে 'ক' প্রদেশে। আমার মা-বাপ ভালো লোক ছিলেন বলেই ধরতে হয়, কিন্তু শৈশবেই আমায় অনাথ করে চলে যান তাঁরা, বেড়ে উঠি নিকোলাই সের্গেয়িচ ইখমেনেভ-এর সংসারে। তিনি ছিলেন ওখানকার এক ছোটোখাটো জমিদার, আমাকে নেন করুণাবশে। তাঁর সন্তান বলতে ছিল একটি মেয়ে নাতাশা, আমার চেয়ে তিন বছরের ছোটো। ভাইবোনের মতো আমরা একসঙ্গে বেড়ে উঠি। হায় আমার মধুর শৈশব! পঁচিশ বছর বয়সে তাই নিয়ে হাহুতাশ করা, মরার সময় কেবল সেই কথাটাই আনন্দে আর কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করা কী বোকামি! আকাশে সূর্য তখন কী উজ্জ্বলই না দেখাত, পিটার্সবুর্গের মতো একেবারেই নয়। কী উদ্দাম, কী খুশিতেই না স্পন্দিত হত আমাদের ছোটো ছোটো বুক। আমাদের চারপাশে তখন মাঠ আর বন — এখনকার মতো এমন মরা পাথরের স্তূপ নয়। নিকোলাই সের্গেয়িচ নায়েবি করতেন ভাসিলিয়েভ্স্কয়ে-তে। কী অপরূপই না ছিল সেখানকার পার্ক আর বাগান। সে বাগানে বেরিয়ে বেড়াতাম আমি আর নাতাশা। বাগানের পরে ছিল একটা মস্ত সোঁদা বন। ছোটোতে দুজনেই আমরা একবার হারিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে... অপূর্ব, সোনালী সে সব দিন! জীবন মনে হত রহস্যময়, ছলনাময়ী, কী মধুর তার সঙ্গে সেই পরিচয়। তখন মনে হত প্রতিটি ঝোপ, প্রতিটি গাছের পেছনে কেউ যেন থাকত, রহস্যময়, অজানা। বাস্তবের সঙ্গে মিশে ছিল রূপকথার রাজ্য।

আর সন্ধ্যায় যখন কুয়াসা জমত গভীর উপত্যকার কোলে, আমাদের মস্ত খাদটার পাথুরে পাঁজরা আঁকড়ে ধরা ঝোপঝাড়গুলোর চারপাশে সে কুয়াসা জড়িয়ে যেত শাদা কুণ্ডলীতে, তখন হাত ধরাধরি করে আমি আর নাতাশা খাদের পাড় থেকে সভয় কৌতূহলে উঁকি দিতাম নিচের গভীরে, ভাবতাম, এই বুঝি কেউ খাদের তলার কুয়াসা থেকে বেরিয়ে আসবে নয়ত ডাকবে আমাদের; আয়ার কাছে শোনা রূপকথাগুলো যেন হয়ে উঠবে খাঁটি সত্যি। অনেক পরে একবার নাতাশাকে বলেছিলাম, 'মনে পড়ে, সেই যে একখান বই পেয়েছিলাম — "শিশু কাহিনী"। পেয়েই আমরা ছুটে যাই বাগানে, পুকুরপারে, সেখানে ঝাঁকড়া বুড়ো মেপ্‌ল্‌ গাছটার নিচে আমাদের পেয়ারের সেই সবুজ বেঞ্চে বসে পড়তে শুরু করেছিলাম "আলফোন্‌স আর দালিন্দা'র" রূপকথা।' আজো পর্যন্ত সে রূপকথার গল্পটা মনে পড়লেই একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ লাগে বুকের মধ্যে। একবছর আগে নাতাশার কাছে যখন গল্পের প্রথম লাইনগুলো ফের বলি: 'আমার গল্পের নায়ক আলফোনসের জন্ম হয় পর্তুগালে; পিতা দন রামির —' ইত্যাদি, তখন প্রায় কান্না পেয়ে গিয়েছিল আমার। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ভয়ানক বোকামির মতো হয়ে থাকবে, হয়ত সেই জন্যেই আমার উৎসাহ দেখে অমন অদ্ভুত করে হেসেছিল নাতাশা। তবে তক্ষুনি সামলে নেয় সে (এটা আমার মনে আছে), আমায় সান্ত্বনা দেবার জন্যে নিজেই বলতে শুরু করেছিল পুরনো দিনের কথা। একটার পর একটা কথা, নিজেও ব্যাকুল হয়ে উঠছিল নাতাশা। ভারি সুন্দর ছিল সন্ধ্যেটা; সবই বলাবলি করতে লাগলাম আমরা, কেমন করে জেলা শহরে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল বোর্ডিং স্কুলে, ঈস্‌, কী কান্নাই না তখন নাতাশা কেঁদেছিল! — তারপর আমাদের সেই শেষ বিচ্ছেদ, ভাসিলিয়েভ্‌স্কয়ে ছেড়ে যখন আমি চলে যাই চিরকালের মতো। বোর্ডিং স্কুলে পড়া তখন আমার শেষ হয়ে গিয়েছিল, যাচ্ছিলাম পিটার্সবুর্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্যে। আমি তখন সতেরো, ও পনেরোয় পড়েছে। নাতাশা বলে, তখন আমায় এমন ঢ্যাঙা বেখাপ্পা দেখাত যে হাসি চাপা দায় হত। বিদায়ের সময় আমি তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে ভারি জরুরি কিছু একটা বলতে গিয়েছিলাম, কিন্তু জিভ আমার হঠাৎ অবশ হয়ে আটকে গেল। ওর মনে আছে, আমি নাকি ভয়ানক উত্তেজিত ছিলাম। বলাই বাহুল্য, আমাদের কথাবার্তা জমল না। কী বলব আমিও ভেবে পাচ্ছিলাম না, আর সেও হয়ত বুঝতেও পারত না আমায়। কেবল অঝোরে কেঁদে ফেলেই চলে গিয়েছিলাম, একটা কথাও বলি নি। আমাদের ফের

দেখা হয় শুধু অনেকদিন পরে পিটার্সবুর্গে, দু'বছর আগে। বৃদ্ধ নিকোলাই সের্গেয়িচ তখন পিটার্সবুর্গে এসেছিলেন তাঁর মোকদ্দমার তদ্বিরে; আর আমি তখন সবে পা দিয়েছি সাহিত্যজগতে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিকোলাই সের্গেয়িচ ইখমেনেভ সদ্বংশের লোক, কিন্তু সম্পদ তাঁদের শেষ হয়ে গিয়েছিল বহু দিন। তাহলেও, পিতামাতার মৃত্যুর পর বেশ বড়ো একটা সম্পত্তি তিনি পান, দেড়শ ভূমিদাস খাটত তাতে। কুড়ি বছর বয়সে তিনি ঘোড়সওয়ার বাহিনীতে যোগ দেন। ভালোই চলছিল। কিন্তু সৈন্য বাহিনীতে পাঁচ বছর কাটাবার পর এক অভাগা সন্ধ্যায় তিনি তাসের বাজিতে সব সম্পত্তিটুকুই খুইয়ে বসেন। সারা রাত তিনি ঘুমোতে পারেন নি। পরের দিন সন্ধ্যায় জুয়ার আড্ডায় এসে বাজি ধরেন তাঁর একমাত্র অবশিষ্ট সামগ্রী — ঘোড়াটি। তাঁর তাসটা জেতে, দ্বিতীয় বাজি এবং তৃতীয় বাজিও তিনি জেতেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর একটি গ্রাম ফেরত পান তিনি — গ্রামটির নাম ইখমেনেভকা, গত জনগণনায় তাতে ছিল পঞ্চাশটি লোক। এর পর তিনি আর খেলেন নি। সৈন্য বাহিনী থেকে ইস্তফার দরখাস্ত দেন পরের দিনই। একশ ভূমিদাস তিনি চিরকালের জন্যে হারালেন। দু'মাস পরে, লেফ্‌টেন্যান্ট পদ সহ তাঁর ইস্তফা মঞ্জুর হয়। গাঁয়ে ফিরে আসেন। জীবনে তার পর তিনি কখনো তাঁর জুয়ায় হারার গল্প করেন নি, সে কথা যদি কেউ তুলত, তাহলে তাঁর সুবিদিত সদাশয় স্বভাব সত্ত্বেও নিশ্চয় তার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসতেন। গাঁয়ে তিনি মন দিয়ে জমি দেখাশোনার কাজে লাগেন এবং পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বিয়ে করেন অভিজাত বংশের একটি গরিব মেয়ে, আন্না আন্দ্রেয়েভনা শুমিলভাকে। মেয়েটি আদৌ কোনো যৌতুক আনে নি, কিন্তু পড়াশুনা করেছিল গুবের্নিয়ায় অভিজাত বোর্ডিং স্কুলে মঁ রেভেশ নামে এক প্রবাসী ফরাসীর কাছে। এই নিয়ে আন্না আন্দ্রেয়েভনার সারা জীবন বেশ একটা গর্ব ছিল যদিও বোঝা যেত না, ঠিক কী তিনি শিখেছেন। নিকোলাই সের্গেয়িচ ছিলেন চমৎকার, একজন ব্যবস্থাপক। আশেপাশের জমিদাররা শিখতেন তাঁর কাছ থেকে। কয়েক বছর গেল। হঠাৎ প্রিন্স পিয়তর আলেক্সান্দ্রভিচ ভালকোভস্কি নামে একজন মস্ত জমিদার পিটার্সবুর্গ থেকে আসেন পাশের মহাল, ভাসিলিয়েভ্‌স্কয়ে-তে। মহালটায়

তাঁর ছিল নয়শত ভূমিদাস। এ আগমনে গোটা এলাকায় বেশ সাড়া পড়ে যায়। রাজাবাহাদুর তখন যুবক, যদিও প্রথম যৌবন তাঁর পেরিয়ে গিয়েছিল। পদমর্যাদা তাঁর কম ছিল না, বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে তাঁর নানা সম্পর্ক, ধনসম্পত্তি ছিল, দেখতে সুপুরুষ এবং শেষ কথা, বিপত্নীক — এলাকার কুমারী ও মহিলাদের সকলের কাছে এই ব্যাপারটাই ছিল বিশেষ আগ্রহের। সদর শহরে প্রদেশপাল তাঁকে যে চমৎকার অভ্যর্থনা জানিয়েছেন তার গল্প করত লোকে। এই প্রদেশপালের সঙ্গে তাঁর কেমন একটা আত্মীয়তাও ছিল; গল্প করত তাঁর সৌজন্যে শহরের সমস্ত মহিলাদের মাথা ঘুরে গিয়েছিল, ইত্যাদি নানা কথা। মোটের ওপর, ইনি ছিলেন পিটার্সবুর্গ উচ্চ সমাজের তেমন একজন ঝলমলে ব্যক্তি যাঁরা গ্রামাঞ্চলে কদাচিৎ দর্শন দেন, কিন্তু দর্শন দিয়েই অস্বাভাবিক তাক লাগান। রাজাবাহাদুরের মধ্যে কিন্তু অমায়িকতা কিছু ছিল না, বিশেষ করে যে লোকদের তাঁর প্রয়োজন নেই, যাদের তিনি নিজের চেয়ে অন্তত কিছুটা ছোটো ভাবতেন তাদের প্রতি আচরণে। প্রতিবেশী মহালদারদের কারো সঙ্গে পরিচয় স্থাপন তিনি প্রয়োজন জ্ঞান করেন নি, ফলে অবিলম্বেই তাঁর নানা শত্রু জুটে যায়। তাই সকলে ভারি তাজ্জব বনে গেল যখন হঠাৎ নিকোলাই সের্গেয়িচের বাড়িতে পদধূলি দেবার বাসনা হল তাঁর। তবে এও সত্যি যে নিকোলাই সের্গেয়িচ ছিলেন তাঁর নিকটতম প্রতিবেশীদের একজন। ইখমেনেভ পরিবারে রাজাবাহাদুর খুব একটা ছাপ ফেললেন। মুহূর্তে তিনি ওঁদের মুগ্ধ করলেন দুজনকেই। বিশেষ করে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠল, উনি প্রত্যেক দিন যেতেন, বাড়িতে নেমন্তন্ন করে আনতেন। চুটকি গল্প শোনাতেন, রসিকতা করতেন, বাজিয়ে গান গাইতেন জীর্ণ পিয়ানোটায়। ইখমেনেভরা অবাক না হয়ে পারতেন না: এমন একটি সজ্জন সুন্দর লোককে প্রতিবেশীরা একবাক্যে যা ঘোষণা করেছে তেমন অহংকারী, দাম্ভিক, নিষ্প্রাণ স্বার্থপর বলে ভাবা যায় কী করে? ধরতে হয় যে নিকোলাই সের্গেয়িচকে সত্যিই পছন্দ হয়েছে রাজাবাহাদুরের, — নিকোলাই সের্গেয়িচ ছিলেন একজন সাদাসিধা লোক, প্যাঁচ নেই, স্বার্থপর নন, মনটা উঁচু। কিন্তু ব্যাপারটা কিছুদিনের মধ্যে সব বোঝা গেল। ভাসিলিয়েভ্‌স্কয়ে-তে রাজাবাহাদুর এসেছিলেন শুধু এই অভিপ্রায় নিয়েই যে নায়েবটিকে তিনি ছাড়িয়ে দেবেন — লোকটা ছিল এক ছিঁচকে জার্মান, দাম্ভিক, কৃষি-বিশেষজ্ঞ, শ্রদ্ধাজাগানো পাকা চুল, চশমা এবং বক্র নাসিকায়

ছিল; কিন্তু এই সব গুণ সত্ত্বেও চৌর্যবৃত্তিতে তার লজ্জা-সরম ছিল না। এবং তদুপরি জনকয়েক চাষীকে সে নির্যাতন করেছে। ইভান কার্লভিচ অবশেষে হাতে-নাতে ধরা পড়ে, দারুণ আহতভাবে ভদ্রলোক জার্মান সততা সম্পর্কে বহু কথা শোনায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে বরখাস্ত হতে হয়, এবং কিছুটা কলংক নিয়েই। নতুন নায়েবের দরকার হল রাজাবাহাদুরের, এবং তাঁর নজর পড়ল নিকোলাই সের্গেয়িচের ওপর। ম্যানেজার হিশেবে নিকোলাই সের্গেয়িচ ছিলেন চমৎকার, সততাও তাঁর সন্দেহাতীত। রাজাবাহাদুর বোধ হয় খুব চাইছিলেন, নিকোলাই সের্গেয়িচ নিজে থেকেই চাকরিটা নিতে চাইবেন। কিন্তু তা না ঘটায় একদিন সুপ্রভাতে নিজেই প্রস্তাবটা হাজির করলেন ভারি বন্ধুর মতো বিনীত একটি অনুরোধ হিশেবে। নিকোলাই সের্গেয়িচ প্রথমটা নিতে চান নি, কিন্তু মোটা বেতনের পরিমাণটা আন্না আন্দ্রেয়েভনাকে প্রলুব্ধ করে তুলল এবং বাকি সমস্ত দ্বিধা দূর হয়ে গেল যাচকের দ্বিগুণ অমায়িকতায়। প্রিন্স যা চাইছিলেন পেলেন। এই কথাই মানতে হয় যে মনুষ্যচরিত্র তিনি ভালো বুঝতেন। ইখমেনেভের সঙ্গে পরিচয়ের স্বল্পকাল মধ্যেই তিনি নিখুঁতভাবে জেনে নিয়েছিলেন, কী ধরনের লোকের সঙ্গে তাঁকে চলতে হবে; বুঝতে পেরেছিলেন, এ লোকটিকে মুগ্ধ করাতে হবে ঘনিষ্ঠ প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে, শুধু টাকায় কিছু হবে না, টানতে হবে তার হৃদয়। চাইছিলেন এমন একজন নায়েব, যার ওপর চিরকাল অন্ধের মতো বিশ্বাস করে থাকা যায়, ভাসিলিয়েভ্স্কয়ে-তে যাতে তাঁর না এলেও চলবে। এই ছিল তাঁর আসল মতলব। নিকোলাই সের্গেয়িচকে তিনি এমন মুগ্ধ করেছিলেন যে তিনি সত্যিই তাঁর বন্ধুত্বে বিশ্বাস করেছিলেন। নিকোলাই সের্গেয়িচ ছিলেন ভারি ভালোমানুষ, ভারি সরল ও রোম্যাণ্টিক ধরনের লোকেদের একজন; আমাদের রাশিয়ায় ভারি সুন্দর মানুষ এরা, লোকে তাদের সম্পর্কে যাই বলুক না কেন, একবার যদি তারা কারো অনুরক্ত হয় (ঈশ্বর জানেন কেন), তাহলে মনপ্রাণ সঁপে দেয় তারা, মাঝে মাঝে সে অনুরাগ পৌঁছয় একেবারে হাস্যকর একটা মাত্রায়।

অনেক বছর কেটে গেল। শ্রীবৃদ্ধি হল মহালের। ভাসিলিয়েভ্স্কয়ে মহালের মালিক এবং নায়েবের মধ্যেকার সম্পর্কে উভয় পক্ষ থেকে এতটুকু কোনো তিক্ততার ছায়াপাত হল না, এবং তা সীমাবদ্ধ রইল নিতান্তই শুকনো কাজকর্মের পত্রালাপে। নিকোলাই সের্গেয়িচের ব্যবস্থাপনায় প্রিন্স এতটুকু হস্তক্ষেপ না করলেও মাঝে মাঝে এমন সব পরামর্শ দিতেন যে তার

অসাধারণ কার্যকারিতা আর ব্যবহারিকতায় আশ্চর্য হয়ে যেতেন নিকোলাই সের্গেয়িচ। বোঝা যেত, টাকার অপচয় উনি শুধু যে পছন্দ করতেন না তাই নয়, কী করে টাকা করতে হয় তাও তিনি জানতেন। ভাসিলিয়েভস্কয়েতে আসার বছর পাঁচেক পরে ঐ প্রদেশেই চারশ ভূমিদাসের আরো একটা চমৎকার মহাল কেনার দায়িত্বপত্র তিনি পাঠান নিকোলাই সের্গেয়িচের কাছে। নিকোলাই সের্গেয়িচের আনন্দ আর ধরে না; প্রিন্সের সাফল্য, তাঁর কৃতিত্ব আর পদোন্নতির খবর তাঁর কাছে ছিল যেন সেটা তাঁর আপন ভাইয়েরই ব্যাপার। উচ্ছ্বাস তাঁর চরমে উঠল যখন রাজাবাহদুর সত্যি করেই একবার তাঁর ওপরে অসাধারণ একটা আস্থা দেখান। ব্যাপারটা ঘটেছিল এই... তবে এক্ষেত্রে প্রিন্স ভালকোভস্কির জীবনের বিশেষ কয়েকটা খুঁটিনাটি বলে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। একদিক থেকে আমার কাহিনীর একটা প্রধান চরিত্রই হলেন এই রাজাবাহাদুর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আগেই বলেছি, প্রিন্স ছিলেন বিপত্নীক। বিয়ে করেছিলেন প্রথম যৌবনে এবং সেটা টাকার জন্যে। পিতামাতার কাছ থেকে তিনি প্রায় কিছু পান নি — সমস্ত সম্পত্তি তাঁরা উড়িয়ে দিয়েছিলেন মস্কোতে। ভাসিলিয়েভ্স্কয়ে বন্ধক রাখা হয়েছিল একাধিক বার; দেনা চেপেছিল প্রচুর। বাইশ বছর যখন বয়স তখন মস্কোর কী একটা সরকারী দপ্তরে চাকরি নিতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন, হাতে একটি পয়সাও ছিল না। জীবন শুরু করেছিলেন 'প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান' হিশেবে। বেনিয়া-ঠিকাদারের এক বেশী-বয়সী মেয়েকে বিয়ে করে তিনি বাঁচেন। ঠিকাদার অবিশ্যি যৌতুকের ব্যাপারে তাঁকে ঠকিয়েছিল। কিন্তু মোটের ওপর তিনি বৌয়ের টাকায় বন্ধক সম্পত্তি খালাস করে ফের নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন। বেনিয়ার যে মেয়েটি তাঁর জুটেছিল, সেটি ছিল প্রায় নিরক্ষর, গুছিয়ে দুটো কথা বলারও সাধ্য তার ছিল না, দেখতে কুৎসিত, তবে একটা বড়ো গুণ — ভালোমানুষ আর বাধ্য। এই গুণটির পুরো সদ্ব্যবহার করেন প্রিন্স: বিয়ের এক বছর পরেই সপুত্র স্ত্রীটিকে মস্কোয় তার ঠিকাদার বাপের কাছে রেখে চলে যান 'ক' প্রদেশে সরকারী কাজে। পিটার্সবুর্গের এক প্রভাবশালী আত্মীয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানে তিনি বেশ একটা বড়ো চাকরি জোটান।

মনে মনে তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল খ্যাতির, উন্নতির, একটা কেরিয়ারের। প্রিন্স ভাল্কোভ্স্কি নিজের বৌয়ের সঙ্গে তাঁর মস্কো বা পিটার্সবুর্গ কোথাও বাস করা অসম্ভব। তাই ঠিক করেছিলেন ভবিষ্যতে ভালো কিছু একটা না ঘটা পর্যন্ত আপাতত ভাগ্য শুরু করবেন মফস্বল থেকেই। শোনা যায়, এমন কি বৌয়ের সঙ্গে একত্রবাসের প্রথম বছরেই কদর্য আচরণে বৌটিকে প্রায় পিটিয়ে মেরেছিলেন। এ গুজব শুনলে নিকোলাই সের্গেয়িচ ভয়ানক চটে যেতেন। উত্তেজিতভাবে প্রিন্সের পক্ষ নিয়ে তিনি ঘোষণা করতেন প্রিন্সের পক্ষে নীচ কোনো আচরণ সম্ভব নয়। কিন্তু সাত বছর পরে শেষ পর্যন্ত প্রিন্সের স্ত্রী মারাই গেলেন। বিপত্নীক স্বামী তৎক্ষণাৎ ফিরে এলেন পিটার্সবুর্গে। সেখানে সত্যিই কিছুটা ছাপ ফেললেন। তখনও যুবক, দেখতে সুপুরুষ, টাকাকড়ি আছে, নিঃসন্দেহ রসজ্ঞান, রুচি আর নিরন্তর হাসিখুশি মেজাজের অধিকারী, পিটার্সবুর্গে তিনি দেখা দিলেন সৌভাগ্য আর পৃষ্ঠপোষকতার উমেদার হিশেবে নয়, রীতিমতো স্বাধীন অবস্থার একটি মানুষের মতো। শোনা যায় তাঁর মধ্যে সত্যিই একটা মোহনতা ছিল, এমন কিছু একটা প্রবল যার বশীভূত হত লোকে। মেয়েরা তাকে পছন্দ করত সাংঘাতিক। শুধু এই সমাজশ্রেষ্ঠা সুন্দরীদের সঙ্গে দহরম-মহরমেই একটা কলঙ্কিত খ্যাতিও জুটেছিল তাঁর। এমনিতে তিনি ছিলেন হিসেবী, যা প্রায় কার্পণ্যে পৌঁছত, তাহলেও অকাতরে টাকা ওড়াতেন, দরকার পড়লে তাসের জুয়ায়, মোটা লোকসানেও মুখ কোঁচকাতেন না। কিন্তু আমোদ করার জন্যে অবশ্য তিনি পিটার্সবুর্গে আসেন নি: তাঁর দরকার ছিল পাকাপাকি একটা পথ করে নেওয়া, বরাবরের মতো ভাগ্য ফেরানো। করলেনও তাই। তাঁর কেষ্টবিষ্টু এক আত্মীয় ছিলেন কাউণ্ট নাইন্স্কি। সাধারণ উমেদার হিশেবে এলে প্রিন্সের দিকে তিনি ফিরেও তাকাতেন না। কিন্তু অভিজাত সমাজে তাঁর সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর বোধ হল, এঁর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেখানো সম্ভব এবং শোভন; প্রিন্সের সাত বছরের ছেলেটিকে তিনি নিজের বাড়িতে রেখে মানুষ করতেও রাজী হয়ে গেলেন। এই সময়টাতেই আসেন ভাসিলিয়েভ্স্কয়ে-তে এবং পরিচয় হয় ইখমেনেভদের সঙ্গে। কাউণ্টের সুবাদে প্রিন্স অবশেষে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি রাষ্ট্রদূতাবাসে বিশিষ্ট একটি পদ পেয়ে বিদেশে চলে যান। এর পর তাঁর সম্পর্কে খবরাখবর খানিকটা ঘোলাটে হয়ে ওঠে। শোনা গেল, বিদেশে কী একটা অপ্রীতিকর কিছু হয়েছে তাঁর। কিন্তু ব্যাপারটা কী, সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে নি।

শুধু এইটুকু জানা গেল যে চারশ ভূমিদাসের একটা মহাল তিনি কিনতে পেরেছেন — সে কথা আগেই বলেছি। অনেক বছর পর তিনি বিদেশ থেকে ফেরেন সরকারের উঁচু একটি চাকরি নিয়ে, এবং এসেই পিটার্সবুর্গে অতি বিশিষ্ট একটি পদ পান। ইখমেনেভকায় গুজব রটল, শিগগিরই তিনি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করবেন, এবং অতি ধনী, অভিজাত ও প্রতিপত্তিশালী একটি পরিবারের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা স্থাপিত হবে। আনন্দে হাত ঘষতে ঘষতে নিকোলাই সের্গেয়িচ বলেছিলেন, 'এবার রাজসভাসদ হবেন উনি!' আমি তখন পিটার্সবুর্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে; মনে আছে, ইখমেনেভ আমায় বিশেষ করে চিঠি লিখে জানতে চান, বিয়ের গুজবটা সত্যি কিনা। রাজাবাহাদুরের কাছেও তিনি চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিলেন যাতে তিনি আমার মুরুব্বী হন, কিন্তু প্রিন্স সে চিঠির জবাব দেন নি। আমি শুধু এইটুকু জানতে পাই যে প্রিন্সের ছেলে প্রথমে থাকত কাউণ্টের বাড়িতে, পরে যায় লিসি'তে,* এবং তখন উনিশ বছর বয়সে তার পাঠ সাঙ্গ করেছে। আমি সে কথাটা ইখমেনেভদের লিখে জানাই, এও বলি যে প্রিন্স ছেলেকে ভারি ভালোবাসেন, ভারি লাই দেন, তার ভবিষ্যতের নানা পরিকল্পনা করছেন এখন থেকেই। তরুণ কুমারবাহাদুরকে আমার যে সব সহপাঠী চিনত তাদের কাছ থেকে এ সব আমি শুনেছিলাম। এই সময়েই হঠাৎ এক সুপ্রভাতে প্রিন্স ভালকোভস্কির কাছ থেকে নিকোলাই সের্গেয়িচ চিঠি পেলেন। তাতে ভারি অবাক হয়ে গেলেন তিনি...

আগেই বলেছি, প্রিন্স এযাবৎ নিকোলাই সের্গেয়িচের সঙ্গে যে পত্রালাপ করতেন সেটা সবসময়েই শুকনো কাজকর্মের প্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ থাকত, কিন্তু এবার তিনি খুবই খোলাখুলি ও বন্ধুর মতো তাঁর পারিবারিক ব্যাপার লিখে জানালেন সবিস্তারে। ছেলের সম্পর্কে তিনি নালিশ জানালেন, বললেন ছেলেটির দুর্ব্যবহারে ভারি কষ্ট পাচ্ছেন। অবশ্যই ছোঁড়াটার যা যা দুষ্টুমি সেটাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করা উচিত নয় (স্পষ্টতই ছেলেকে তিনি সমর্থন করতে চাইছিলেন), তবু ঠিক করেছেন ওকে একটু শাস্তি দেবেন, ভয় দেখাবেন, অর্থাৎ কিছু কালের জন্যে তাকে পাঠাবেন গ্রামে ইখমেনেভের তত্ত্বাবধানে। প্রিন্স লিখেছিলেন যে 'তাঁর অতি সদাশয়, মহানুভব নিকোলাই সের্গেয়িচ এবং বিশেষ করে আন্না আন্দ্রেয়েভনার ওপর' তিনি পুরোপুরি

* প্রাক্‌বিপ্লব রাশিয়ায় অভিজাত ছেলেদের জন্যে বিশেষ বিদ্যালয়। — সম্পাঃ

ভরসা করে আছেন। উভয়কেই তিনি অনুরোধ করলেন তাঁর চুলবুলে ছোঁড়াটাকে তাঁরা যেন তাঁদের সংসারে গ্রহণ করেন, নির্জনাবাসে রেখে কিছু কাণ্ডজ্ঞান যেন তার মাথায় ঢুকিয়ে দেন, পারলে যেন তাকে ভালোইবাসেন এবং সর্বোপরি তার চপল চরিত্রের সংশোধন করে 'জীবনযাত্রার জন্যে অতি প্রয়োজনীয় কিছু কঠোর সুনীতিতে দীক্ষিত করেন তাকে'। বলাই বাহুল্য, এ দায়িত্ব বুড়ো ইখমেনেভ গ্রহণ করেন সোৎসাহে। তরুণ কুমার এলেন। ছেলের মতো ওঁরা অভ্যর্থনা জানালেন তাঁকে। অচিরেই নিকোলাই সের্গেয়িচ নিজের মেয়ে নাতাশার মতোই ছেলেটাকেও ভারি ভালোবাসতে শুরু করলেন। এমনকি ভবিষ্যতেও, ছেলের বাপের সঙ্গে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটে যাবার পরেও তিনি মাঝে মাঝে আলিওশার কথা বলতেন সস্নেহে। প্রিন্স আলেক্সেই পেত্রোভিচকে তিনি আদর করে এই নামেই ডাকতেন। ছেলেটা সত্যিই ভারি মিষ্টি ছিল, সুদর্শন, মেয়ের মতো দুর্বল আর মেজাজী, অথচ সেই সঙ্গেই হাসিখুশি সরল গোছের, খোলামেলা মন, উদার ভাবাবেগের জায়গা ছিল তাতে, স্নেহশীল, ন্যায়পরায়ণ, কৃতজ্ঞতাবোধও ছিল — সংসারে সে হয়ে উঠল সকলের নয়নের মণি। উনিশ বছর বয়স হলেও একেবারে শিশু। শোনা গিয়েছিল বাপ তাকে খুব ভালোবাসেন, তা সত্ত্বেও ওকে নির্বাসন দিলেন কেন বোঝা কঠিন। গুজব ছিল বটে, ছেলেটা পিটার্সবুর্গে নিষ্কর্মা উড়ুউড়ু জীবন যাপন করছিল, কাজে ঢুকতে চায় নি, ফলে বাপের মনে খুব ঘা দেয়। প্রিন্স তাঁর চিঠিতে স্পষ্টতই পুত্রকে বিতাড়নের আসল কারণ সম্পর্কে নীরব ছিলেন দেখে নিকোলাই সের্গেয়িচ এ নিয়ে আলিওশাকে কোনো প্রশ্ন করেন নি। কী একটা ক্ষমার অযোগ্য নষ্টামি, মহিলার সঙ্গে কী নটঘটি, কী একটা ডুয়েলের আহ্বান, তাসে বেদম একটা হার সম্পর্কে অবশ্য আলিওশার নামে নানা কথা শোনা গিয়েছিল। একথাও কানে এসেছিল যে পরের টাকা উড়িয়ে দিয়েছে সে। এ রকম গুজবও ছিল যে প্রিন্স ছেলেকে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছেন তার কোনো দোষের জন্যে নয়, নিতান্তই নিজের একটা বিশেষ স্বার্থপর মতলবে। এ গুজবে সরোষে আপত্তি জানাতেন নিকোলাই সের্গেয়িচ, বিশেষ করে এই দেখে যে সারা শৈশব ও কৈশোর বাপ-ছাড়া হয়ে থেকেও তাকে ভারি ভালোবাসত আলিওশা। বাপের কথা সে বলত সোৎসাহে। বোঝা যেত সে বাপের পরিপূর্ণ প্রভাবাধীনে। মাঝে মাঝে এক কাউন্টেসের কথা নিয়েও বকবক করত আলিওশা, যার পেছনে নাকি ঘুরঘুর করত বাপ ছেলে দুজনেই। কিন্তু তার, আলিওশারই, নাকি জিত হয়, আর সেজন্যে

বাপ সাংঘাতিক চটে যায় তার ওপর। গল্পটা সে করত ভারি ফুর্তি করে, ছেলেমানুষী সারল্যে, খিলখিল খুশির হাসি হেসে, কিন্তু নিকোলাই সের্গেয়িচ অবিলম্বে তাকে থামিয়ে দিতেন। বাপ যে বিয়ে করতে চাইছেন, এ খবরেও সায় দিয়েছিল আলিওশা।

নির্বাসনে প্রায় এক বছর তার কাটল; নির্ধারিত মেয়াদের পর পর সে বাপকে সসম্মানে সুবিবেচনাপূর্ণ চিঠি লিখে পাঠাত এবং ক্রমে ভাসিলিয়েভ্স্কয়ে-তে থাকা তার এমন অভ্যেস হয়ে গেল যে বাপ যখন গ্রীষ্মকালে নিজেই এসে হাজির হলেন (আসার খবর তিনি নিকোলাই সের্গেয়িচকে আগেই জানিয়েছিলেন), তখন নির্বাসিত নিজেই বাপের কাছে অনুরোধ করলে ভাসিলিয়েভ্স্কয়ে-তে যতদিন পারা যায় ততদিন সে থাকতে চায়; জানাল গ্রাম্য জীবনই নাকি তার আসল জায়গা। আলিওশার সমস্ত সিদ্ধান্ত, কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে তার মাতন, সবই আসত একটা অসাধারণ ক্ষীণস্নায়বিক তীক্ষ্ন অনুভূতিপ্রবণতা, একটা উত্তেজিত হৃদয় থেকে, এমন একটা লঘুচিত্ততা থেকে যা মাঝে মাঝে পৌঁছত অর্থহীনতায়; আসত বাইরের যেকোনো প্রভাবেই আত্মসমর্পণ করার অত্যধিক প্রবণতা এবং ইচ্ছাশক্তির একান্ত অভাবের কারণে। কিন্তু প্রিন্স এ অনুরোধ শুনলেন কেমন যেন সন্দিগ্ধভাবে... সব মিলিয়ে নিকোলাই সের্গেয়িচের পক্ষে তাঁর ভূতপূর্ব 'বন্ধুকে' চেনা কঠিন হয়েছিল: প্রিন্স ভালকোভস্কি ভারি বদলে গিয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি নানা খুঁত ধরতে লাগলেন নিকোলাই সের্গেয়িচের। মহালের হিসাবপত্র দেখার সময় বিচ্ছিরি রকমের লোভ, কৃপণতা এবং দুর্বোধ্য একটা সন্দেহবাতিকতা দেখা গেল তাঁর মধ্যে। এসবের ফলে ভালোমানুষ ইখমেনেভ ভারি আহত বোধ করেছিলেন, বহু সময় পর্যন্ত তিনি তাঁর নিজের চোখ-কানকে বিশ্বাস করতে চান নি। চোদ্দ বছর আগে প্রিন্স যখন প্রথম ভাসিলিয়েভ্স্কয়ে-তে এসেছিলেন, তখন যা হয়েছিল এখন সবই ঘটতে লাগল ঠিক তার উল্টো। এবার প্রিন্স বন্ধুত্ব করলেন তাঁর যত প্রতিবেশী, অবিশ্যি তাদের মধ্যে যারা একটু গুরুত্বপূর্ণ তাদের সঙ্গে। নিকোলাই সের্গেয়িচের বাড়ি তিনি একবারও এলেন না, তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করতে লাগলেন অধীনস্থ কর্মচারীর মতো। হঠাৎ ঘটল একটা দুর্বোধ্য ব্যাপার: বাহ্যত কোনো কারণ ছাড়াই প্রিন্স এবং নিকোলাই সের্গেয়িচের মধ্যে একটা সাংঘাতিক ঝগড়া বাধল। শোনা গেল উভয় পক্ষ থেকেই উত্তেজিত, অপমানকর কটূক্তি। ঘৃণায় ইখমেনেভ ভাসিলিয়েভ্স্কয়ে থেকে সরে গেলেন, কিন্তু

সেখানেই ইতি হল না ব্যাপারটার। হঠাৎ জঘন্য একটা কুৎসা রটল সারা এলাকায়। শোনা গেল কুমারবাহাদুরের চরিত্র টের পেয়ে নিকোলাই সের্গেয়িচ তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নাকি নিজের কাজ হাসিল করতে চান; বিশ বছরের ছেলেটাকে নাকি তাঁর মেয়ে নাতাশা (সে তখন সতেরো) পটাতে পেরেছে। বাপ-মা নাকি ইচ্ছে করেই এ ভালোবাসাটাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, যদিও ভান করেছেন যেন তাঁরা কিছুই জানেন না; কুচক্রী 'চরিত্রহীনা' নাতাশা নাকি অবশেষে ছেলেটিকে পুরোপুরি যাদু করে ফেলেছে, আশেপাশের জমিদারদের সম্ভ্রান্ত ঘরে সত্যিকারের যেসব সৎ-কন্যারা প্রচুর সংখ্যায় ডাগর হয়ে উঠছে, নাতাশারই চেষ্টাচরিত্রে ছেলেটা তাদের প্রায় কারোরই দর্শন পায় নি এই গোটা এক বছর। শেষ কথা, প্রেমিকযুগল নাকি বিয়েরও ব্যবস্থা করে ফেলেছে গ্রিগোরিয়েভো গ্রামে, ভাসিলিয়েভ্স্কয়ে থেকে পনেরো ভার্স্ট দূরে; বাহ্যত সেটা যেন নাতাশার মা-বাপকে না জানিয়ে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে জানেন সবই, সমস্ত খুঁটিনাটি পর্যন্ত, কুৎসিত সব পরামর্শ দিয়ে মেয়েকে চালিয়েছেন তাঁরাই। মোটের ওপর, ব্যাপারটা নিয়ে এলাকার নারী পুরুষ উভয় দলের মন্থরা যা রটাল সে সমস্ত কুৎসা একত্র করলে একটা বইয়েতেও কুলোবে না। কিন্তু সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, প্রিন্স এই সবকিছুই নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেছিলেন, প্রদেশ থেকে পিটার্সবুর্গে পাঠানো একটা কানাভাঙানো বেনামা চিঠি পেয়ে তিনি এখানে এসেছিলেন শুধু এই কারণেই। অবশ্যই নিকোলাই সের্গেয়িচকে যারা অন্তত খানিকটাও চিনত তাদের পক্ষে দোষারোপগুলোর একটা কথাও বিশ্বাস করা বোধ হয় সম্ভব ছিল না। কিন্তু চিরকালই যা হয়, সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠল, কথা বলাবলি করতে লাগল, মাথা নাড়লে, এবং... চূড়ান্ত রায় দিলে তাঁর বিরুদ্ধে। ইখমেনেভের আত্মমর্যাদা ছিল তীব্র, বিশ্বনিন্দুকদের কাছে মেয়ের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে তিনি গেলেন না; কঠিন করে বারণ করে দিলেন, আন্না আন্দ্রেয়েভনা যেন পাড়াপড়শীর কাছে কোনো কৈফিয়ত দিতে না যায়। আর এমন নিন্দায় নিন্দিত নাতাশা নিজে কিন্তু আরো প্রায় এক বছর পরেও এই সব রটনা ও নিন্দার বিন্দুবিসর্গ জানত না; কাহিনীটা তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল সযত্নে, বারো বছরের মেয়ের মতো সে ছিল হাসিখুশি, নিশ্চিন্ত।

ইতিমধ্যে ঝগড়াটা বেড়েই চলল। ঘুমিয়ে থাকে নি পরোপকারী ব্যক্তিরা। সাক্ষীসাবুদ ফুট-কাটিয়েরা এগিয়ে এল। প্রিন্সকে তারা শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে দিল যে ভাসিলিয়েভ্স্কয়ে-তে নিকোলাই সের্গেয়িচ দীর্ঘদিন যে নায়েবী

করেছেন, তার মধ্যে তিনি নেহাৎ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে থাকেন নি। শুধু তাই নয়, তিন বছর আগে বন বিক্রি করে নিকোলাই সের্গেয়িচ নাকি বারো হাজার রুবল তছরূপ করেছেন, আদালতে তার অভ্রান্ত আইনসঙ্গত সাক্ষ্যও হাজির করা সম্ভব, বিশেষ করে এ বিক্রির জন্যে তিনি প্রিন্সের কাছ থেকে কোনো আমমোক্তারনামা না নিয়েই নিজের বুদ্ধিমতো কাজ করেছেন, পরে প্রিন্সকে বুঝিয়েছেন বিক্রি করা দরকার, আর বিক্রি করে আসলে যে টাকা পেয়েছেন তার চেয়ে অনেক কম দিয়েছেন কর্তাকে। এ সবই অবিশ্যি নেহাৎ রটনা, পরে তা প্রমাণও হয়েছে, কিন্তু প্রিন্স সবই বিশ্বাস করলেন এবং অন্যদের সম্মুখে নিকোলাই সের্গেয়িচকে বললেন 'চোর'। এটা সহ্য করার লোক ইখমেনেভ নন, সমান অপমান করে জবাব দিলেন। কাণ্ড ঘটল ভয়াবহ। অবিলম্বে শুরু হল এক মোকদ্দমা। নিকোলাই সের্গেয়িচের হাতে কী কয়েকটা দলিল না থাকায়, এবং বড়ো কথা ভালো মুরুব্বী বা এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞতার অভাব হেতু গোড়া থেকেই হারতে লাগলেন মামলায়। সম্পত্তি ক্রোক হল তাঁর। ক্ষিপ্ত বৃদ্ধ শেষ পর্যন্ত সব কিছু ফেলে রেখে দিয়ে ঠিক করলেন পিটার্সবুর্গে গিয়ে নিজেই মামলার তদ্বির করবেন। বিষয়সম্পত্তি দেখবার জন্যে একজন অভিজ্ঞ লোক রেখে দিলেন গ্রামে। প্রিন্স বোধ হয় টের পেতে শুরু করেছিলেন, নিকোলাই সের্গেয়িচকে তিনি অপমান করেছেন অকারণে। কিন্তু উভয় পক্ষেই অপমানটা এত চরমে উঠেছিল যে মিটমাটের কোনো কথাই আসে না। ক্ষিপ্ত প্রিন্স যথাশক্তি চেষ্টা করতে লাগলেন জেতবার — অর্থাৎ তাঁর ভূতপূর্ব নায়েবের শেষ অন্নমুষ্টিটুকুও কেড়ে নেবার জন্যে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইখমেনেভরা তাই উঠে এলেন পিটার্সবুর্গে। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর নাতাশার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের বর্ণনা এখানে দেব না। এই চার বছরে কখনো আমি তাকে ভুলি নি। অবিশ্যি যে মন নিয়ে আমি তার কথা ভাবতাম সেটা আমি নিজেও খুব বুঝি নি, কিন্তু ফের দেখা হওয়া মাত্রই টের পেলাম, ও যে আমার হবে সেটা বিধাতার নির্বন্ধ। ওঁরা আসার পর প্রথম কিছু দিন আমার মনে হয়েছিল, চার বছরে নাতাশা যেন বিশেষ বাড়ে নি, মোটেই বুঝি বদলায় নি, চলে আসার সময় সে যেমন ছিল এখনো যেন তেমনি ছোট্টটি। কিন্তু তারপরে প্রত্যেক দিনই ওর মধ্যে নতুন এক-একটা কিছু যেন চোখে

পড়তে লাগল, যা এতদিন পর্যন্ত আমার কাছে ছিল একেবারে অজানা, যেন আমার কাছ থেকে সেটা সে গোপন রেখেছিল ইচ্ছে করেই, আমার কাছ থেকে যেন ইচ্ছে করেই আড়ালে ছিল তরুণী, আর এমন প্রতিটি আবিষ্কারেই তখন কী আনন্দই না পেয়েছি। পিটার্সবুর্গে এসে বৃদ্ধ প্রথম প্রথম খিটখিটে বদরাগী হয়ে ওঠেন। মামলাটা তাঁর খারাপ যাচ্ছিল। গজরাতেন, ফুঁসতেন, ব্যস্ত থাকতেন নানা দলিলপত্র নিয়ে, তাই আমাদের দিকে নজর দেবার সময় ছিল না। এদিকে আন্না আন্দ্রেয়েভনা ছিলেন বিহ্বলের মতো, প্রথম প্রথম কিছুই বুঝে উঠতে পারতেন না। পিটার্সবুর্গ দেখে তাঁর ভয় লাগত। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি গুটিয়ে থাকতেন ভয়ে, কাঁদতেন পুরনো জীবন, ইখমেনেভকার জন্যে, আপসোস করতেন, নাতাশা বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠল অথচ সে কথা নিয়ে ভাবনা করবে এমন কেউ নেই। তাঁর কথা বলার মতো কোনো যোগ্যতর আস্থাভাজন লোক না পেয়ে মাঝে মাঝে আমাকে তা শোনাতেন অদ্ভুত আন্তরিকতায়।

এই সময়, ওঁরা আসার কিছু দিন আগেই, আমি আমার প্রথম উপন্যাস শেষ করি। ঐ ছিল আমার সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত; আনাড়ী বলে জানা ছিল না কোথায় সে বই দেব। এ ব্যাপার সম্পর্কে ইখমেনেভদের আমি প্রথমে কিছুই বলি নি। আলসেমি করে দিন কাটাচ্ছি, অর্থাৎ কোনো অফিসে ঢুকছি না, চাকরির সন্ধানও করছি না দেখে ওঁরা আমার সঙ্গে প্রায় ঝগড়া বাধিয়েই বসেছিলেন। বৃদ্ধ আমায় বেদম বকুনি দিলেন এমনকি ঝাঁজের সঙ্গে, সেটা অবিশ্যিই আমার সম্পর্কে পিতৃসুলভ উদ্বেগের দরুন। কী করছি তা বলতে আমার লজ্জাই করেছিল। মানে সত্যি, কী করে তাঁকে সোজাসুজি বলি যে অফিসে আমি ঢুকতে চাই না, চাই নভেল লিখতে! তাই আপাতত ওঁদের মিথ্যে করে বললাম যে চাকরি পাচ্ছি না, তবে আপ্রাণ চেষ্টা করছি। এ নিয়ে সত্যাসত্য যাচাইয়ের সময় ছিল না তাঁর। মনে আছে একদিন নাতাশা আমাদের আলাপ শুনে গোপনে একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে চোখের জলে আমায় অনুরোধ জানিয়েছিল, নিজের ভবিষ্যতের কথা যেন ভাবি। প্রশ্ন করে বার করতে চাইছিল, সত্যিই আমি কী করি। তার কাছেও যখন ফাঁস করলাম না, তখন আমাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিলে, নিষ্কর্মা আড্ডাবাজ হয়ে যেন নিজেকে নষ্ট না করি। আমি কী করছি তা ওর কাছেও প্রকাশ করি নি বটে, তবু মনে আছে, ভবিষ্যতে রসিক ও সমালোচকদের কাছ থেকে আমার রচনা, আমার প্রথম উপন্যাস সম্পর্কে যত স্তুতি শুনেছি তা সবই

বিনিময় করতে পারতাম ওর মুখের শুধু একটি প্রশংসায়। তারপর অবশেষে সেটি বেরল। প্রকাশ হবার অনেক আগেই সাহিত্য জগতে খুব সোরগোল উঠেছিল এ নিয়ে। আমার পাণ্ডুলিপি পড়ে একেবারে ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে উঠেছিলেন 'ব'*। কিন্তু তবু না! কখনো যদি আনন্দ বোধ করে থাকি, তবে সেটা সাফল্যের প্রথম মাতাল মুহূর্তেও নয়, পাণ্ডুলিপিখানা কাউকে পড়ে শোনানো বা দেখানোরও আগে। সে ছিল সেই সব দীর্ঘ রাত যা কাটিয়েছি উল্লসিত আশায় আর স্বপ্নে, সৃষ্টির তীব্র ভালোবাসায়, যখন এক হয়ে আছি আমার কল্পনার সঙ্গে, নিজেরই সৃষ্ট চরিত্রগুলোকে মনে হয়েছে আত্মীয়, বাস্তব মানুষ; ভালোবেসেছি তাদের, তাদের সুখে সুখী হয়েছি, দুঃখে দুঃখী, আমার আনাড়ী নায়কটির জন্যে মাঝে মাঝে সত্যি করেই চোখের জল ফেলেছি। আমার সাফল্যে বুড়োবুড়ি যে কী খুশিই না হয়েছিলেন তা বর্ণনা করা মুশকিল — যদিও প্রথমটা ভয়ানক অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা: ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত লেগেছিল তাঁদের কাছে। আন্না আন্দ্রেয়েভনা তো কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলেন না, নতুন যে লেখকটিকে সকলে এত প্রশংসা করছে, সে আসলে তাঁদের সেই ভানিয়াই যে কিনা... ইত্যাদি, ইত্যাদি; কেবলি মাথা নাড়তে লাগলেন তিনি। বৃদ্ধ অনেক দিন পর্যন্ত গোঁ ছাড়েন নি। প্রথম গুজবটা শুনে তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি; শোনাতে লাগলেন, চাকরি করে উন্নতির আশা গেল, সমস্ত লেখকদেরই আচার-আচরণ সাধারণত হয় ভারি সৃষ্টিছাড়া। কিন্তু অনবরত নতুন নতুন জনশ্রুতি, পত্রপত্রিকার মন্তব্য, এবং পরিশেষে তাঁর অতি আস্থাভাজন কতিপয় ব্যক্তির মুখে আমার প্রশংসা শুনে মত বদলাতে তিনি বাধ্য হলেন। যখন দেখলেন, হঠাৎ আমি টাকা পেয়ে গেছি, যখন শুনলেন সাহিত্যকর্মের জন্যে লোকে কী পরিমাণ দক্ষিণা পেতে পারে, তখন তাঁর শেষ সন্দেহও দূর হয়ে গেল। সন্দেহ থেকে একেবারে উল্লসিত আস্থায় দ্রুত পেঁৗছে গেলেন তিনি। আমার সৌভাগ্যে খুশি হয়ে উঠলেন ছেলেমানুষের মতো, এবং হঠাৎ আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বল্গাহীন আশায় আর চোখ-ধাঁধানো স্বপ্নে মেতে উঠলেন। দিন দিনই আমায় নিয়ে তাঁর নতুন নতুন সম্ভাবনা আর পরিকল্পনার উদয় হতে লাগল, আর কী না ছিল সেসব পরিকল্পনায়! আমার সম্পর্কে একটা অদ্ভুত রকমের সম্ভ্রমও দেখাতে শুরু

* দস্তয়েভস্কির প্রথম উপন্যাস 'অভাজন' এবং প্রথিতযশা রুশ সমালোচক বেলিন্স্কি কর্তৃক তাঁর অভিনন্দনের কথা এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। — সম্পাঃ

করলেন তিনি — যা কখনো করেন নি। তাহলেও মনে আছে আমার, তাঁর স্বপ্নের সবচেয়ে উল্লসিত কল্পনার মধ্যে সন্দেহ এসে হঠাৎ অভিভূত করে দিত তাঁকে।

'লেখক, কবি! অদ্ভুত লাগছে ব্যাপারটা... কবি দুনিয়ায় বেশ পথ করে নিতে পেরেছে আর কবে, কবে উঁচুতে উঠেছে? যতই হোক, কলমপেশা, ভরসা করা যায় না।'

লক্ষ্য করে দেখেছি, এই ধরনের যত সন্দেহ, যত খুঁতখুঁতে প্রশ্ন তাঁর মাথায় আসত বেশির ভাগ সন্ধ্যের সময় (তখনকার সমস্ত খুঁটিনাটি, সোনার সেই সময়টা আমার কাছে কী স্মরণীয়!)। সন্ধ্যের দিকে আমাদের এই বৃদ্ধটি হয়ে উঠতেন বিশেষ রকমের খিটখিটে, মেজাজী, সন্দিহান। নাতাশা আর আমার কাছে ব্যাপারটা সয়ে গিয়েছিল, তা নিয়ে আগে থেকেই হাসাহাসিও শুরু করতাম। মনে আছে ওঁকে উৎসাহ দেবার জন্যে আমি গল্প শুনিয়েছিলাম, সুমারকভ জেনারেল হয়েছিলেন, দেরঝাভিনকে একটা সোনার মোহর ভর্তি নস্যির কৌটো উপহার দেওয়া হয়, সম্রাজ্ঞী স্বয়ং দেখা করতে গিয়েছিলেন লমনোসভের সঙ্গে; বলেছিলাম পুশ্‌কিনের কথা, গোগলের কথা।

'জানি ভায়া, সবই জানি,' আপত্তি করতেন বৃদ্ধ, যদিও ওসব কাহিনী তিনি শুনলেন হয়ত এই প্রথম। 'হুঁ, শোনো ভানিয়া, তোমার ওই ভণিতাগুলো যে পদ্যে লেখ নি, এতেই যা হোক আমি খুশি। পদ্য হল যত ছাইভস্ম হে। তর্ক ক'রো না বাপু, বুড়ো মানুষটাকে বিশ্বাস ক'রো, আমি তোমার ভালোই চাই। একেবারে ছাইভস্ম, আলসেমি করে সময় কাটানো। পদ্য লেখা শুধু ইস্কুলের ছেলেদেরই মানায়। পদ্য লিখে লিখে তোমার ভাই-বেরাদার জোয়ান সব ছোকরারা শেষ পর্যন্ত পৌঁছয় পাগলাগারদে... মানছি, পুশ্‌কিন মহাপুরুষ — সেটা কথা নয়। কিন্তু নেহাৎ ওই টুংটাং মিল, আর কিছু নয়! মানে, সবই ঝিলিমিলি... আমি অবিশ্যি পুশ্‌কিনকে পড়েছি কমই... কিন্তু গদ্য হল অন্য বস্তু। গদ্য লেখক এমনকি কিছু শিক্ষাও দিতে পারেন — মানে, যেমন ধরো, তিনি দেশভক্তি, কিংবা সাধারণভাবে সদাচার সম্পর্কে কিছু একটা লিখে দিলেন... ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না হে, কিন্তু বুঝতে পারছ নিশ্চয়। মনের কথাই বলছি। যাকগে, এবার পড়ো!' বই নিয়ে এলাম আমি, চায়ের পর বসলাম গোল টেবিল ঘিরে। কথাটা উনি শেষ করলেন খানিকটা মুরুব্বীয়ানার চালে, 'পড়ো কীসব আঁচড় কেটেছ। সবাই তোমাকে নিয়ে খুব হৈচৈ করছে। দেখা যাক, দেখা যাক!'

বই খুলে পড়ার উদ্যোগ করলাম আমি। উপন্যাসটা ছাপাখানা থেকে বেরিয়েছিল সেই দিনই, একটা কপি দখল করে আমি ছুটে এসেছিলাম ওঁদের পড়ে শোনাতে।

পাণ্ডুলিপিটা ছিল প্রকাশকের হাতে, সেই পাণ্ডুলিপি থেকে আগেই তাঁদের পড়ে শোনাতে পারছিলাম না বলে কী দুঃখ, কী বিরক্তিই লাগত। নাতাশা ক্ষোভে সত্যি করেই কেঁদে ফেলেছিল, আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে অনুযোগ করেছিল, ও পড়ার আগেই অন্য লোকে লেখাটা পড়বে কেন... কিন্তু অবশেষে টেবিলের চারপাশে সেদিন আমরা বসলাম। বিশেষ রকমের একটা গুরুগম্ভীর এবং বিচারকসুলভ ভাব করলেন বৃদ্ধ। তিনি চেয়েছিলেন ভয়ানকরকম কড়া বিচার করবেন, 'নিজেই বুঝে দেখব ব্যাপারটা'। বৃদ্ধা মহিলাকেও দেখাল অসাধারণ ভারিক্কি, পাঠ উপলক্ষে উনি যেন একটা নতুন টুপি মাথায় দিতেও রাজী। অনেক আগে থেকেই তাঁর নজরে পড়েছিল, তাঁর সোনার নাতাশার দিকে আমি চাইতে শুরু করেছি অপরিসীম ভালোবাসা নিয়ে, নাতাশার সঙ্গে কথা কইতে গেলেই আমার নিঃশ্বাস আটকে আসত, দৃষ্টি আসত আচ্ছন্ন হয়ে, এবং নাতাশাও আমার দিকে যেন চাইতে শুরু করেছিল আগের চেয়ে জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে। সত্যিই, এল তাহলে, এল সেই সময়টা, সোনালী আশা আর সর্বোত্তম সুখ আর সাফল্যের মাহেন্দ্রক্ষণ, সব, সবকিছুই যেন একসঙ্গে এসে গেছে হঠাৎ! বৃদ্ধা মহিলার এও নজরে পড়েছিল যে তাঁর বৃদ্ধটি হঠাৎ আমাকে যেন অতিরিক্ত রকমের প্রশংসা করতে শুরু করেছেন, আমার আর তাঁর মেয়ের দিকে চাইছেন যেন একটা বিশেষ দৃষ্টিতে... এবং হঠাৎ আতঙ্ক হল বৃদ্ধার। হাজার হোক, আমি তো কাউণ্ট নই, নই একটা প্রিন্স কি কুমারবাহাদুর, বুকের ওপর পদক ঝোলানো তরুণ সুপুরুষ একজন আইনজীবী পর্যন্ত নই। আকাঙ্ক্ষার অর্ধপথে থেমে যাওয়া আন্না আন্দ্রেয়েভনার অভ্যাস নয়।

আমার সম্পর্কে ভাবলেন, "লোকটার প্রশংসা হচ্ছে, কে জানে কেন। লেখক, কবি... কিন্তু, লেখক সে আর এমন কী?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উপন্যাসখানা ওঁদের পড়ে শোনালাম এক বৈঠকেই। শুরু করেছিলাম চায়ের পর এবং চলল রাত দুটো পর্যন্ত। বৃদ্ধ প্রথমে ভ্রূকুঞ্চিত করেছিলেন। তাঁর আশা ছিল অনায়ত্ত মহান কিছু একটা পাওয়া যাবে, হয়ত সেটা তাঁরও

বোধাতীত, কিন্তু মহান সেটা হওয়া চাই। আর তার বদলে সহসা তাঁকে শুনতে হল কিনা যত মামুলী জানাশোনা ব্যাপার — তাঁর চারপাশে দৈনন্দিনই যা ঘটে চলেছে হুবহু তাই। নায়ক পর্যন্ত যদি খানিকটা বড়ো দরের বা মনোজ্ঞ লোক হত, অথবা রসলাভলেভ কি ইউরি মিলোস্লাভস্কির মতো ঐতিহাসিক কোনো চরিত্র। তার বদলে কিনা দেখানো হল ছোটোখাটো, গোবেচারা এমন কি বোকা গোছের এক কেরানিকে, কোটের বোতামটা পর্যন্ত যার ছেঁড়া। এসবও আবার লেখা হয়েছে নিতান্ত সাধারণ ভাষায়, হুবহু আমরা নিজেরা যেমন বলি... আশ্চর্য! সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বৃদ্ধা চাইতে লাগলেন নিকোলাই সের্গেয়িচের দিকে, একটু মুখ ভারও করলেন, যেন আহত হয়েছেন। ওঁর মুখের ওপর যেন লেখা, 'এই সব বাজে জিনিস ছাপিয়ে শোনানোর মানে হয় কিছু, আবার তার জন্যে নাকি টাকাও মেলে?' নাতাশা শুনছিল নিবিষ্ট মনে, তৃষিতের মতো, আমার ওপর থেকে চোখ তার আর সরে না। এক একটা শব্দ উচ্চারণ করি আর ও তাকিয়ে দেখে আমার ঠোঁটের দিকে, ওর নিজের সুন্দর ঠোঁট জোড়াও নড়তে থাকে। তারপর কী হল জানেন? অর্ধেকটা পড়া শেষ না হতেই দেখি সবক'টি শ্রোতার চোখেই জল। আন্তরিকভাবেই কাঁদতে শুরু করেছিলেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা। নায়কের দুঃখে সত্যি করেই দুঃখী হয়ে উঠেছিলেন তিনি, একান্ত সারল্যে চাইছিলেন লোকটার কষ্টে কোনোরকম একটু যাতে সাহায্য করতে পারেন। এটা টের পেয়েছিলাম থেকে থেকে তাঁর অস্ফুট মন্তব্যে। মহনীয় কিছু একটার আশা বৃদ্ধের আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। 'প্রথম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, তুমি আর ডগায় উঠতে পারবে না। এমনি, সাধাসিধে একটা গল্প এটা, তবে বুক মোচড়ায়,' উনি বললেন, 'মানে, চারপাশে যা ঘটছে তা বুঝতে শুরু করি, মনে হয়, দীনতম মানুষটাও মানুষ, আমাদেরই ভাই।' নাতাশা শুনলে, কাঁদলে, টেবিলের তলায় চুপি চুপি সজোরে হাত চেপে ধরছিল আমার। পড়া শেষ হতে ও উঠে দাঁড়াল। গালদুটো আরক্ত, চোখে জল। হঠাৎ আমার হাতটা টেনে নিয়ে চুমু খেয়ে ছুটে চলে গেল ঘর থেকে। মা আর বাপ মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন।

মেয়ের কীর্তিতে হতভম্ব হয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'হুঁ, ভারি ভাবাবেগ মেয়েটার। তবে ও কিছু না, মানে ভালোই জিনিসটা, ভালো, উদার একটা উচ্ছ্বাস! দয়ামায়া আছে মেয়েটার...' স্ত্রীর দিকে আড়চোখে চেয়ে তিনি বিড়বিড় করে যাচ্ছিলেন, যেন নাতাশাকে সমর্থন করতে চান আর কেন জানি সেই সঙ্গে আমাকেও।

আর আন্না আন্দ্রেয়েভনা নিজেও শুনতে শুনতে খানিকটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন বটে, তবু এমন ভাবে তাকালেন যেন বলতে চান, 'মাসিদোনিয়ার আলেক্সান্দার বীর তো নিশ্চয়ই, কিন্তু আসবাবগুলো ভাঙছ কেন?'*

নাতাশা শিগ্‌গিরই ফিরে এল হাসিখুশি হয়ে। আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় গোপনে একটা চিমটি কেটে গেল। বৃদ্ধ ফের আমার উপন্যাসের 'গুরুতর' সমালোচনার চেষ্টা করতে চাইছিলেন, কিন্তু আনন্দে ভূমিকাটা আর বজায় রাখতে পারলেন না।

'মানে ভায়া, ভানিয়া, লেখাটা ভালোই, ভালোই! খুব খুশি হয়েছি! এত খুশি হয়েছি যে আশা করি নি! জিনিসটা খুব উঁচু দরের মহান কিছু নয় সে তো বোঝাই যাচ্ছে... ওই দেখো "মস্কোর মুক্তি" বইখানা, লেখা হয়েছিল মস্কোয়। ও বইয়ে তুমি একেবারে প্রথম লাইন থেকেই দেখবে হে, লেখক যেন ঈগল পাখির মতো আকাশে উঠছে... কিন্তু তোমারটা হল গিয়ে, ভানিয়া, খানিকটা সহজ, বুঝতে কষ্ট হয় না। ঠিক এই বোঝা সহজ বলেই আমার ভালো লাগল, মানে আমাদেরই কাছাকাছি ব্যাপার অনেকটা। যেন আমার জীবনেই জিনিসটা ঘটেছে! আর ওই মহান জিনিসটা কী? নিজেই তা বুঝব না। তবু, আমি হলে কিন্তু কথাগুলো আরো একটু ভালো করতাম। প্রশংসা করছি বটে, কিন্তু যতই বলো লেখাটা যথেষ্ট মহনীয় হল না... কিন্তু কী আর করা, দেরি হয়ে গেছে, ছাপা শেষ। যদি অবশ্য একটা দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, নাকি হে, দ্বিতীয় সংস্করণ হবে? তাহলে ফের তো আবার টাকা... হুঃ!'

আন্না আন্দ্রেয়েভনা বললেন, 'কিন্তু সত্যিই অত টাকা পেয়েছ নাকি, ইভান পেত্রোভিচ? তাকিয়ে দেখি, কিন্তু কেমন বিশ্বাস হয় না। ভগবান, কী জিনিসের জন্যে লোকে আজকাল টাকা দিতে শুরু করেছে!'

বৃদ্ধের উৎসাহ ক্রমেই উঠছিল। বললেন, 'কী জানো ভানিয়া, সরকারী চাকরি এটা নয়, তবু এটা কেরিয়ার বৈকি। বড়ো বড়ো লোকেরাও পড়বে। এই তো তুমি বলছিলে, গোগল একটা বাৎসরিক ভাতা পেতেন, বিদেশেও পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। তোমাকেও যদি তাই করে? এ্যাঁ? নাকি এত শিগ্‌গিরই হবে না? আরো কিছু লিখতে হবে বুঝি? তাহলে লিখে ফেলো ভায়া, তাড়াতাড়ি লিখে ফেলো! প্রশংসাতেই বিভোর হয়ে থেকো না। কিসে আটকাচ্ছে তোমার?'

* গোগলের 'ইনস্পেক্‌টর জেনারেল' বইখানা থেকে। — সম্পাঃ

এ কথা তিনি বললেন এমন স্থির প্রত্যয়ে, এমন ভালো মন নিয়ে যে ওঁকে থামিয়ে ওঁর স্বপ্নে কিছু শীতল বারি বর্ষণ করার সাহস হল না।

'কিংবা হয়ত তোমায় একটা নস্যির কৌটোও দিতে পারে... না দেবার কী আছে? নানা রকমেই তো দান করা যায়। হয়ত তোমাকে উৎসাহ দিতে চাইবে ওরা। আর কে বলতে পারে, তোমার হয়ত দরবারেও ডাক পড়বে,' আধা-ফিসফিসে গলায় যোগ করলেন উনি, অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে কুঁচকিয়ে তুললেন বাঁ চোখটা, 'নাকি নয়? দরবারে ডাক পড়তে এখনো দেরি আছে?'

'দরবার বৈকি!' বললেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা যেন আহতভাবে।

দরাজ হেসে আমি জবাব দিয়েছিলাম, 'খানিক বাদেই আমায় জেনারেলের পদে প্রমোশন দিয়ে বসবেন দেখছি।'

বৃদ্ধও হাসলেন। ভারি খুশি হয়েছিলেন তিনি।

চটুল গলায় নাতাশা ডাক দিলে, 'মহামান্য হুজুর বাহাদুর, এখন কিছু খাবেন কি?' আমাদের জন্যে ইতিমধ্যেই ও খাবার আয়োজন করে ফেলেছে।

খিলখিলিয়ে হেসে ও ছুটে এল বাপের কাছে, তপ্ত দুই হাতে জড়িয়ে ধরল তাঁকে:

'বাবা, বাবা আমার, ভারি ভালোমানুষ তুমি বাবা!'

বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন বৃদ্ধ।

'হয়েছে, হয়েছে, থাম বাপু। আমি ও এমনি বলছিলাম। জেনারেল হও কি না হও, এখন খেতে যাওয়া যাক। ভারি ভাবপ্রবণ মেয়েটা!' নাতাশার আরক্ত গালে চাপড় মেরে তিনি বললেন — সুযোগ পেলেই এমনি আদর করা তাঁর অভ্যাস, — 'কী জানো, মন থেকেই বলছিলাম ভানিয়া। কিন্তু জেনারেল নাই বা হলে (তার ধারে কাছেও নয়) তবু যাই হোক তুমি এখন বিখ্যাত তো বটো, একজন লিখিয়ে।'

'আজকাল তাদের সাহিত্যিক বলে বাবা!'

'লিখিয়ে বলে না? জানতাম না। আচ্ছা নয় সাহিত্যিকই হল। কিন্তু আমি যা বলতে চাইছিলাম: একটা নভেল লিখেছ বলেই ওরা তোমায় কামের্‌হের্‌* করে দেবে তা অবশ্যই নয়, সে সব ভেবেও লাভ নেই। তবু সংসারে তুমি দাঁড়িয়ে যেতে পারো, অ্যাটাশে** বা অমনি কিছু একটা হয়ে যেতে পারো। হয়ত বিদেশেও পাঠাতে পারে, ধরো ইতালিতে স্বাস্থ্যোদ্ধারের

---

* দরবারী খেতাব। — সম্পাঃ

** দূতাবাসের সহকারী। — সম্পাঃ

জন্যে কিংবা হয়ত পড়াশুনো সম্পূর্ণ করার জন্যে; টাকা দিয়ে সাহায্য করবে। অবিশ্যি তোমার দিক থেকেও সম্মান রেখে চলা চাই। টাকা বা বৃত্তি যা পাবে সেটা কাউকে মুরুব্বী টুরুব্বী ধরে চলবে না, চাই কাজ, কাজের মতো কাজ।'

হেসে আন্না আন্দ্রেয়েভনা যোগ করলেন, 'আর তখন খুব পায়াভারি করে বসো না যেন ইভান পেত্রোভিচ।'

'চটপট তুমি ওকে একটা তারকা পদকই দিয়ে দাও বাবা, অ্যাটাশে সে আর এমন কি?'

আমার হাতে ফের সে চিমটি কাটলে।

নাতাশার গালদুটোয় আভা ফুটে বেরুচ্ছিল, চোখদুটো চিক্‌চিক্‌ করছিল তারার মতো। বৃদ্ধ সস্নেহে মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'কেবলি আমায় নিয়ে ঠাট্টা। আমি হয়ত সত্যিই একটু বেশি এগিয়ে গিয়েছিলাম, তা আমি তো চিরকাল ওই রকমই হে... তবে কী জানো ভানিয়া, তোমায় দেখে কেমন যেন ভারি সাদাসিধে লাগে...'

'বাঃ, তাছাড়া আবার কী হতে হবে ওকে, বাবা?'

'ও না, না, সে কথা বলতে চাইছি না... তাহলেও ভানিয়া, তোমার মুখখানা কেমন যেন মানে... ঠিক কবি গোছের নয়... জানো তো, লোকে বলে কবিদের মুখটা হয় ফ্যাকাশে, লম্বা লম্বা চুল আর চোখেও কী একটা থাকে... মানে গ্যেটে বা অমনি কারো মতো... "আবাদ্দোনা"* বইতে আমি পড়েছি... কী হল, আবার কিছু ভুল বললাম? ওই, দ্যাখো, দুষ্টু একেবারে, — ফের হাসছে! আমি পণ্ডিত নই রে, কিন্তু টের তো পাই। মানে, মুখ যাই হোক, সেটা এমন কিছু সর্বনাশের ব্যাপার নয়, — আমার কাছে তোমার মুখটাও বেশ, খুবই ভালো লাগে আমার... সে কথা আমি বলছিলাম না... কেবল সৎ হওয়া উচিত, সৎ হও, সেই হল আসল কথা, সৎভাবে থেকো, ধরাকে সরা জ্ঞান কোরো না। সামনে তোমার প্রশস্ত রাস্তা, সৎভাবে কাজ করে যাও, এই হল আমার বলবার কথা। আসলে এই কথাটাই বলতে চাইছিলাম!'

ভারি চমৎকার ছিল সময়টা! সমস্ত অবসর সময়টা, রোজ সন্ধ্যেটা কাটাতাম ওঁদের সঙ্গে। বৃদ্ধকে আমি শোনাতাম সাহিত্য জগত এবং সাহিত্যিকদের

---

* নিকোলাই পলেভই-এর (১৭৯৬-১৮৪৬) লেখা এক রোমান্টিক উপন্যাস। — সম্পাঃ

খবর — কেন জানি না, হঠাৎ তাতে ওঁর ভারি আগ্রহ দেখা গেল। 'ব'এর সমালোচনা প্রবন্ধগ্নলিও তিনি পড়া শ্নর্ন করলেন — 'ব'এর সম্পর্কে আমি অনেক বলেছিলাম, ওঁকে তিনি অল্পই ব্নঝতেন, কিন্তু প্রশংসা করতেন উচ্ছ্বসিত হয়ে, 'সেভের্নি ব্রুতেন'এ* 'ব'এর যে প্রতিপক্ষেরা লিখতেন, তাঁদের বিরন্দ্ধে ফ্রঁসতেন। ব্দ্ধা মহিলা চোখ রাখতে লাগলেন নাতাশা আর আমার ওপর, তবে সব কিছ্নই আর তাঁর নজরে পড়ল না। ছোট্টো একটা কথা আমাদের মধ্যে আগেই বিনিময় হয়ে গিয়েছিল; মাথা নিচু করে অর্ধস্ফুরিত অধরে নাতাশা প্রায় ফিসফিসিয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ'। কর্তারাও সে কথা জানলেন। তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা শ্নর্ন হল তাঁদের। বহ্নদিন ধরে আন্না আন্দ্রেয়েভনা মাথা নাড়তে লাগলেন, জিনিসটা তাঁর কাছে অদ্ভুত আর ভয়ের বলে মনে হল। আমার ওপর তাঁর ভরসা ছিল না।

বলতেন, 'উৎরোয় যদি তো ভালোই। কিন্তু যদি না উৎরোয় বা অন্য কিছ্ন একটা ঘটে তাহলে? কোথাও যদি একটা চাকরি বাকরি করতে!'

ভেবেচিন্তে ব্দ্ধ একটা সিদ্ধান্তে এলেন, 'শোনো ভানিয়া, তোমায় একটা কথা বলি। আমি নিজেই ব্যাপারটা দেখেছি, আমার নজরে পড়েছে, সত্যি করেই বলব আমার আনন্দই হয়েছিল যে তুমি আর নাতাশা... মানে ব্নঝতেই পারছ! কিন্তু জানো তো, তোমাদের দ্নজনেরই বয়স খ্নব কম, আন্না আন্দ্রেয়েভনা আমায় ঠিক কথাই বলেছেন। একটু সব্নর করা যাক নাহয়। ধরে নিচ্ছি তোমার গ্নণ আছে, বেশ উল্লেখযোগ্যই গ্নণ হয়ত... কিন্তু সবাই প্রথমে তোমায় নিয়ে যেরকম হৈচৈ করেছিল সে রকম কিছ্ন একটা প্রতিভা ঠিক নও, নেহাৎ গ্নণী। (আজকে 'মক্ষিকায়' তোমার সম্পর্কে যে লেখাটা বেরিয়েছে পড়েছি। তোমার সম্পর্কে খ্নব র্নঢ়ভাবে লিখেছে, কিন্তু হাজার হোক ও কাগজটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়!) হ্নঁ। তাই বলছি, গ্নণ তো আর কিছ্ন ব্যাঙ্কে রাখা টাকা নয়, অথচ তোমরা দ্নজনেই গরিব। কিছ্নটা সব্নরই করা যাক, দেড় বছর কি অন্তত এক বছর। তোমার ব্যাপারটা যদি ঠিকঠাক চলে, বেশ ভালোরকম দাঁড়াতে পারো, তাহলে নাতাশা তোমারই হবে। যদি না পারো, তাহলে নিজেই ভেবে দেখো!.. তুমি সৎ লোক, চিন্তা করে দেখো!..'

---

* উনিশ শতকে প্রতিক্রিয়াশীল সাংবাদিক ব্নলগারিন কর্তৃক প্রকাশিত 'সেভের্নায়া প্চেলা' (উত্তরী মক্ষিকা) পত্রিকাকে বিদ্রূপ করে দস্তয়েভস্কি বলছেন 'সেভের্নি ত্র্নতেন' (উত্তরী পরগাছা)। — সম্পাঃ

ব্যাপারটা তাই ওইখানেই স্থগিত রইল। আর এক বছর পরে ঘটল এই।

হ্যাঁ, ঠিক প্রায় এক বছর পরেই। ঝরঝরে এক সেপ্টেম্বরের বিকেলে আমার বুড়িবুড়ো দুটির কাছে গেলাম একেবারে অসুস্থ হয়ে, বুকটা ধড়ফড় করছিল; প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলাম, আমায় দেখে ওঁরা ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলেন। মাথা ঘুরছিল আমার আর কষ্ট হচ্ছিল বুকে — ওঁদের বাড়িতে ঢোকার আগে দশ বার দুয়োর পর্যন্ত গিয়ে দশবার ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু সেটা এ জন্যে নয় যে আমার ভাগ্যোদয় হয় নি, খ্যাতি কি অর্থ পাই নি, এ জন্যে নয় যে আমি তখনো কোনো 'অ্যাটাশে' হতে পারি নি, স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে ইতালি যাবার সম্ভাবনা ধারে কাছেও দেখা যাচ্ছে না। তার কারণ এক একটা বছরেই কাউকে পেরুতে হয় দশ বছরের মতো সময়, এবং এই এক বছরেই আমার নাতাশাও গেছে দশ বছরের মধ্যে নিয়ে। আমাদের মাঝখানে একটা অসীম ব্যবধান... মনে আছে, বৃদ্ধের সামনে আমি বসেছিলাম নির্বাক হয়ে, অন্যমনস্ক আঙুলগুলোয় যে টুপিখানার কানা মোচড়াচ্ছিলাম, সেটা আগে থেকেই দোলামোচড়া। বসে ছিলাম এবং জানি না কেন অপেক্ষা করছিলাম কখন নাতাশা আসবে। আমার পোশাক দীনহীন, মানায়ও নি। মুখটা বসে গেছে, রোগা হয়ে গেছে আমার চেহারা, হলদেটে। তবু মোটেই কবির মতো আমায় দেখাচ্ছিল না, চোখে তখনো তেমন কোনো মহিমা জাগে নি যা নিয়ে ভালোমানুষ নিকোলাই সের্গেয়িচ অত ভাবিত হয়েছিলেন এক সময়। বৃদ্ধা আমার দিকে চাইলেন অকপট, বড়ো বেশি শশব্যস্ত অনুকম্পায় আর মনে মনে ভাবছিলেন:

"দেখো দেখি, ঐ লোকটার সঙ্গে নাতাশার আর একটু হলেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল আর কি! ভগবান বাঁচিয়েছেন!"

জিজ্ঞাসা করলেন, 'একটু চা হবে ইভান পেত্রোভিচ?' (টেবিলে জল ফুটছিল সামোভারে), 'কী রকম চলছে?' এখনো আমার কানে বাজে তাঁর বিলাপের সুর। বলেছিলেন, 'অসুখ করেছে যেন?'

এখনো দেখি সেই মূর্তি: আমার সঙ্গে কথা কইছেন উনি, কিন্তু চোখে ওঁর অন্য একটা ভাবনা — সে ভাবনায় তাঁর বৃদ্ধ মানুষটির মুখও মেঘাবৃত, বসে বসে ভাবছেন বৃদ্ধ আর চা ঠাণ্ডা হয়ে চলেছে। জানতাম, ঐ মুহূর্তে তাঁরা প্রিন্স ভালকোভস্কির মোকদ্দমা নিয়ে ভয়ানক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। মোকদ্দমার গতি ভালো যাচ্ছিল না। তার ওপর নতুন একটা দুশ্চিন্তায় নিকোলাই সের্গেয়িচ একেবারে অসুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। যে তরুণ কুমার বাহাদুরকে নিয়ে

মোকদ্দমা শুরু হয়েছিল, পাঁচ মাস আগে সেই প্রিন্স একবার সুযোগ পেয়ে ইখমেনেভদের বাড়ি আসে। বৃদ্ধ তাঁর প্রিয় আলিওশাকে ভালোবাসতেন ছেলের মতো, প্রতিদিনই তার কথা বলাবলি করতেন। সানন্দে তাকে তিনি তখন অভ্যর্থনা করলেন। আন্না আন্দ্রেয়েভনা ভাসিলিয়েভ্স্কয়ের কথা তুলে কাঁদলেন। আলিওশা তার বাপকে না জানিয়ে ঘন ঘন ওদের সঙ্গে দেখা করতে লাগল। সৎ, খোলামেলা, সোজাসাপ্টা মানুষ নিকোলাই সের্গেয়িচ কোনো রকম সতর্কতা গ্রহণে ভারি ঘৃণা বোধ করতেন। ইখমেনেভদের ঘরে ছেলে আবার নিমন্ত্রণ পাচ্ছে এ খবর শুনে প্রিন্স কী ভাববেন সে কথা মহিমান্বিত গর্বিত আত্মগরিমায় ভাবতে পর্যন্ত তিনি চাইলেন না, এই সব বিদঘুটে সন্দেহে তাঁর মনে মনে ঘৃণা বোধ হত। কিন্তু ফের অপমান সইবার শক্তি তাঁর থাকবে কিনা তা বৃদ্ধের জানা ছিল না। তরুণ কুমার প্রায় রোজই তাঁদের কাছে আসতে শুরু করেছিল। ওকে পেয়ে বৃদ্ধদের ভালো লাগত। ওঁদের সঙ্গে সে কাটাত সারা সন্ধ্যেটা, মাঝ রাত্তিরও পেরিয়ে যেত। বাপ অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত সবই জানলেন। নিন্দা রটল জঘন্য। নিকোলাই সের্গেয়িচের কাছে প্রিন্স সেই আগের প্রসঙ্গ নিয়েই সাংঘাতিক একটা চিঠি পাঠালেন এবং ইখমেনেভদের বাড়ি যাওয়া সরাসরি নাকচ করে দিলেন ছেলের। এ সবই ঘটেছিল আমার সেদিনকার আসার দিন পনেরো আগে। ভারি মন খারাপ হয়ে গেল বৃদ্ধের। তাঁর নাতাশা, তাঁর নির্দোষ উন্নতমনা মেয়েটি কিনা ফের এই নোংরা কুৎসা, এই নীচতার মধ্যে জড়াচ্ছে! লোকটা তাঁকে আগেই অপমান করেছে, এখন নাতাশার নাম উচ্চারণ করছে অপমানের সুরে... তার শোধ না নিয়ে থাকতে হবে? হতাশায় প্রথম দিনকতক তিনি শয্যা নিয়েছিলেন। এ সবই আমি জেনেছিলাম। সমস্ত খুঁটিনাটি সমেত কাহিনীটা আমার কাছে পৌঁছেছিল যদিও ইদানীং সপ্তাহ তিনেক ধরে অসুস্থ, আশাহত আমি ওঁদের ওখানে যাই নি, নিজের লজিং-এ পড়েছিলাম। আমি তাছাড়াও জানতাম... কিন্তু না, ও শুধু আমি আগে থেকেই অনুমান করছিলাম, জানতাম যদিও বিশ্বাস হচ্ছিল না যে এই ঘটনাটা ছাড়াও ওঁদের এখন এমন একটা ব্যাপার আছে যা নিয়ে তাঁদের সবচেয়ে দুশ্চিন্তা হবার কথা। যন্ত্রণাকর অপেক্ষায় আমি লক্ষ্য করছিলাম ওঁদের। হ্যাঁ, যন্ত্রণাই হচ্ছিল আমার, অনুমান করতে ভয় হচ্ছিল, ভয় পেয়েছিলাম বিশ্বাস করতে, সর্বনাশা মুহূর্তটা পেছিয়ে দিতে চাইছিলাম যথাসাধ্য। অথচ এলাম সেই মুহূর্তের জন্যেই, সে সন্ধ্যেয় কে যেন আমায় টেনে নিয়ে এল ওঁদের কাছে!

হঠাৎ যেন ঘোর ভেঙে বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, 'বলছিলাম কি ভানিয়া, তোমার কি অসুখ করেছিল? এতদিন আসো নি কেন? তোমার কাছে একটা মাপ চাইবার আছে আমার। অনেকদিন থেকে ভাবছি তোমার কাছে যাব, কিন্তু নানা কারণে...' আবার চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন তিনি।

বললাম, 'শরীর ভালো ছিল না।'

মিনিট পাঁচেক পরে উনি পুনরাবৃত্তি করলেন কথাটার, 'হুঁ, ভালো ছিল না! ভালো না থাকাই বটে! তখনই, হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম, কিন্তু কথা তো শুনলে না। হুঁ! না হে ভানিয়া, না। অনাদি কাল থেকেই দেবী সরস্বতী কুঁড়েঘরে বসে অনশন দিয়ে যাচ্ছেন আর তাই দিয়েও যাবেন। এই হল ব্যাপার!'

ঠিকই, বৃদ্ধের মন খারাপ। নিজের বুকের মধ্যেই যদি তাঁর অমন একটা ঘা না থাকত, তাহলে উপবাসী সরস্বতীর কথা উনি আমায় শোনাতেন না। একাগ্রভাবে আমি ওঁর মুখের দিকে চাইলাম। মুখখানা হলদেটে হয়ে গেছে, চোখে কী একটা বিহ্বল চাউনি, প্রশ্নের আকারে কী একটা, যার সমাধানের সাধ্য তাঁর নেই। আচমকা আচমকা কথা কইছিলেন, এবং তা অস্বাভাবিক রকমের তিক্ত। মাঝে মাঝে অস্বস্তিভরে তাঁর দিকে চেয়ে মাথা নাড়ছিলেন স্ত্রী। উনি একবার মুখ ফেরাতে আন্না আন্দ্রেয়েভনা আমার দিকে চেয়ে গোপনে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলেন বৃদ্ধের দিকে।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ভদ্রমহিলার কাছে জিজ্ঞেস করলাম, 'নাতালিয়া নিকোলায়েভনা কেমন আছে? বাড়িতে আছে কি?'

'বাড়িতেই আছে গো, বাড়িতেই আছে,' জবাব দিলেন প্রশ্নটায় কেমন যেন বিব্রতভাবে, 'শিগ্‌গিরই দেখতে আসবে। কম কথা নয়! তিন সপ্তাহ একেবারে দেখাই নেই। মেয়েটাও হয়ে উঠেছে কেমন যেন... কী যে হয়েছে বুঝি না। ভালোই আছে, নাকি অসুখই হল, ভগবান জানেন!'

স্বামীর দিকে ভয়ে ভয়ে চাইলেন উনি।

নিকোলাই সের্গেয়িচ অনিচ্ছায় কেমন দমকে দমকে বললেন, 'কেন, কিছুই তো হয় নি ওর। ভালোই আছে। মেয়েটা আর খুকি নেই, বড়ো হয়ে উঠতে শুরু করেছে এই মাত্র। কে ওসব মাথা-মুণ্ডু বোঝে, উঠতি বয়সের যত মন পোড়ানি আর খেয়াল।'

'হ্যাঁ, খেয়াল বৈকি!' আহত গলায় আন্না আন্দ্রেয়েভনা মন্তব্য করলেন।

কিছু না বলে বৃদ্ধ টেবিলের ওপর টোকা দিতে শুরু করলেন। 'হায়

ভগবান, ওদের মধ্যে ইতিমধ্যেই কিছু একটা ঘটে গেছে নাকি?' মনের মধ্যে আতঙ্ক খেলে গেল আমার।

উনি ফের শুরু করলেন, 'তা, তোমাদের খবর কী? 'ব' কি এখনো সমালোচনা লিখছেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ, লিখছেন।'

হাতের একটা ঝটকা দিয়ে কথা থামিয়ে দিলেন উনি, 'হা রে ভানিয়া, সমালোচনায় আর কী হবে এখন?'

দরজা খুলে নাতাশা ভেতরে এল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হাতে ওর টুপিটা। ভেতরে ঢুকে সেটা রাখলে পিয়ানোর ওপর। তারপর আমার কাছে এসে নীরবে হাত বাড়িয়ে দিলে। ঠোঁটদুটো অল্প একটু নড়ল, যেন কিছু একটা বলতে চায়, কিছু একটা সম্ভাষণের মতো, কিন্তু কিছুই বললে না।

তিন সপ্তাহ আমাদের দেখা হয় নি। বিহ্বল হয়ে সভয়ে চাইলাম ওর দিকে। কী বদলিয়ে গেছে এই তিন সপ্তাহে! বসে যাওয়া বিবর্ণ গাল, যেন জ্বরতপ্ত শুকনো ঠোঁট, লম্বা গাঢ় আঁখিপল্লবের তল থেকে ধ্বকধ্বকে শিখায় আর উদগ্র একটা প্রতিজ্ঞায় জ্বলছে চোখ। দেখে বুক মুচড়ে উঠল আমার।

কিন্তু ঈশ্বর, কী সুন্দরই তাকে লাগছিল! ঐ সর্বনাশা দিনটায় ওকে যেমন দেখেছিলাম, এর আগে পরে আর কখনো তেমন ওকে দেখি নি। এ কি সেই নাতাশা, সেই মেয়ে যে এই এক বছর আগেই আমার উপন্যাস শুনেছে স্থির দুটি চোখে চেয়ে, ঠোঁটদুটো নড়েছে আমার ঠোঁট নড়া অনুসরণ করে, তারপর সন্ধ্যার খাওয়ার সময় আমাকে আর ওর বাপকে নিয়ে অমন নিশ্চিন্তে হেসেছে, রগড় করেছে? এ কি সেই নাতাশা যে ঐ ঘরের মধ্যে মাথা নামিয়ে আরক্ত গণ্ডে আমায় বলেছিল 'হ্যাঁ'?

সন্ধ্যার প্রার্থনার গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। নাতাশা চমকে উঠল। বৃদ্ধা মহিলা ক্রুশ করলেন।

'তুই তো গির্জায় যেতে চেয়েছিলি নাতাশা, আরাধনার ঘণ্টা তো শুরু হয়ে গেল। যা নাতাশা, গিয়ে প্রার্থনা করিস। জায়গাটাও তো কাছেই। কিছু

হাওয়াও পাবি। সব সময় অমন ঘরকুনো হয়ে থাকিস কেন? দ্যাখ দেখি, কী রকম ফ্যাকাশে হয়ে গেছিস, যেন কেউ চোখ দিয়েছে।'

'আজ... না হয়... নাই গেলাম।' নাতাশা বললে মৃদু গলায়, প্রায় ফিসফিসিয়ে, 'আমি... শরীরটা ভালো নয়।' কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল সে।

মেয়েকে যেন উনি ভয় পাচ্ছেন এমনি ভীরুর মতো চেয়ে আন্না আন্দ্রেয়েভনা নাতাশাকে বোঝাতে লাগলেন, 'যাওয়াই ভালো কিন্তু নাতাশা, এই তো যাবি বলছিলি, টুপিটাও এনেছিস। গিয়ে প্রার্থনা কর নাতাশা, ভগবান যেন তোর স্বাস্থ্য ভালো করে দেন।'

বৃদ্ধও বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা, একটু বেড়িয়েও আয়।' মেয়ের দিকে তিনিও চাইলেন উদ্বেগ নিয়ে, 'মা ঠিকই বলছে। এই তো ভানিয়া আছে, তোকে পেঁছে দেবে।'

মনে হল একটু তিক্ত হাসি ছুঁয়ে গেল নাতাশার ঠোঁটে। পিয়ানোর কাছে গিয়ে সে টুপিটা তুলে নিয়ে মাথায় দিলে। হাত তার কাঁপছিল। সমস্ত ভাবভঙ্গিই তার যেন মনে হচ্ছিল অচেতন, যেন সে নিজেই জানে না কী করছে। একাগ্রভাবে ওর দিকে চেয়ে ছিলেন বাবা-মা।

'বিদায়,' নাতাশা বললে, গলার স্বর প্রায় শোনাই যায় না।

'দ্যাখো দিকি, সোনা আমার, "বিদায়" আবার কী? খুব দূরে কি আর পাড়ি দিচ্ছিস! এক ঝলক তাজা হাওয়া অন্তত মিলবে, কীরকম ফ্যাকাশে হয়ে গেছিস দেখেছিস? ও হো, ভুলেই গিয়েছিলাম (বড্ডো ভুলো হয়ে গেছিরে) তোর জন্যে একটা কবচ তৈরি করেছি, প্রার্থনাটা শেলাই করে দিয়েছি তাতে। কিয়েভের এক সন্ন্যাসিনী আমায় গত বছর শিখিয়ে দিয়েছিল, ভারি ভালো প্রার্থনাটা। এই আগেই শেলাই করে শেষ করেছি। পরে নে নাতাশা, ভগবান হয়ত তোকে ভালো করে দেবেন। তুই যে আমাদের একমাত্র ধন।'

শেলাইয়ের দেরাজ থেকে উনি নাতাশার সোনার ক্রুশটি বার করলেন। ঐ একই ফিতের সঙ্গে আঁটা ছিল তাঁর তৈরি কবচটা। নাতাশার গলায় ফিতেটা পরিয়ে দিয়ে মেয়ের ওপর ক্রুশ করে বললেন, 'পরে নে, কুশল হোক তোর। আগে এক সময় রোজ রাতে তুই ঘুমুতে যাবার আগে তোর উপর আমি এইরকম ক্রুশ করে প্রার্থনাও করতাম। তুইও আওড়াতিস আমার সঙ্গে। কিন্তু এখন আর তুই সেই মেয়েটি নোস। প্রাণে তোর শান্তি দিচ্ছেন না

ভগবান! নাতাশারে! মায়ের প্রার্থনাতেও তোর কোনো কাজ দিচ্ছে না রে নাতাশা।'

বৃদ্ধা কাঁদতে লাগলেন।

নীরবে নাতাশা মায়ের হাতে চুমু খেয়ে দরজার দিকে এক পা বাড়াল। তারপর হঠাৎ দ্রুত ফিরে এল বাপের কাছে। বুক তার ফুলে ফুলে উঠেছিল।

রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'বাবা, আশীর্বাদ করুন... আপনিও আশীর্বাদ করুন মেয়েকে।' হাঁটু গেড়ে বাপের সামনে বসে পড়ল নাতাশা।

নাতাশার এই অপ্রত্যাশিত, বড়ো বেশি গুরুত্বময় আচরণে আমরা সকলেই বিব্রতের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

হতভম্বের মতো কয়েক মুহূর্ত বাবা চেয়ে রইলেন মেয়ের দিকে।

অবশেষে ককিয়ে উঠলেন তিনি, 'নাতাশা, সোনা আমার, খুকুমণি আমার, কী হয়েছে মা?' চোখ দিয়ে তাঁর অঝোরে জল ঝরছিল, 'কী তোর কষ্ট? দিনরাত কেন কাঁদছিস বল তো। আমি সবই তো দেখছি। রাতে আমার ঘুম হয় না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোর দরজায় কান পেতে থাকি!.. আমায় বল নাতাশা, সব খুলে বল। আমি বুড়ো হয়েছি, আমরা...'

কথা শেষ করতে পারলেন না উনি। মেয়েকে তুলে ধরে কাছে টেনে নিলেন। বাপের বুক আঁকড়ে কেঁপে কেঁপে তাঁর কাঁধে মুখ লুকোলে নাতাশা।

'কিছু না, কিছু না, এমনি... শরীরটা ভালো লাগছে না...' ভেতরের কান্না চেপে রুদ্ধকণ্ঠে কেবল বার বার করে বলতে লাগল নাতাশা।

বাপ বললেন, 'আদরের মেয়ে আমার, সোনামণি আমার! আমার আশীর্বাদের সঙ্গে সঙ্গে ভগবান তোকে আশীর্বাদ করুন। উনি যেন তোর মনে চিরকালের মতো শান্তি এনে দেন, সব কষ্ট থেকে তোকে যেন রক্ষা করেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিস মা, আমার পাপেভরা প্রার্থনা যেন তাঁর কাছে পৌঁছয়।'

'আর আমার আশীর্বাদ, আমার আশীর্বাদও রইল তোর ওপর!' মা যোগ করলেন। গাল বেয়ে তাঁর জল পড়ছে।

ফিসফিস করে নাতাশা বললে, 'বিদায়!'

দরজার কাছে ও আর একবার থামল, ওঁদের দিকে আর একবার তাকিয়ে দেখল। কী যেন বলতে চাইল, পারল না। দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অশুভ একটা আশঙ্কায় আমিও ছুটলাম ওর পেছনে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দ্রুত হাঁটছিল নাতাশা নীরবে, মাথাটা নিচু করে। আমার দিকে চাইছিল না। কিন্তু রাস্তা পেরিয়ে নদীর বাঁধে পৌঁছে হঠাৎ থেমে আমার হাতটা আঁকড়ে ধরল।

ফিসফিস করে বললে, 'দম আটকে আসছে, বুকটা চেপে ধরছে... দম পাচ্ছি না।'

ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ফিরে চলো নাতাশা!'

'কিন্তু ভানিয়া, তুমি কি বুঝতে পারছ না যে আমি চিরকালের মতো বেরিয়ে এসেছি, চিরকালের মতো ছেড়ে এলাম, আর কখনো ফিরে যাব না।' অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় আমার দিকে তাকিয়ে বললে নাতাশা।

আমার বুক হিম হয়ে এল। এ তো আমি আগেই টের পেয়েছিলাম ও'দের বাড়ি যাবার সময়েই। এ সবই যেন কুয়াসার মধ্য দিয়ে দেখেছিলাম তারো অনেক আগেই, তবু এখন নাতাশার কথাটা যেন বজ্রের মতো আমায় স্তম্ভিত করে দিল।

নদীর ধার দিয়ে আমরা চললাম বিষণ্ণের মতো। কথা বলতে পারছিলাম না আমি। ভাবছিলাম, মনের মধ্যে সবটা ঠাহর করে নেবার চেষ্টা করছিলাম, একেবারে সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। মাথা ঘুরছিল আমার। সবটাই ভারি বিকট, ভারি অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত ও জিজ্ঞেস করলে, 'আমায় দোষ দেবে, ভানিয়া?'

'না... কিন্তু... মানে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, এ হতে পারে না!..' কী বলছি না বুঝেই জবাব দিলাম আমি।

'হ্যাঁ, ভানিয়া, হয়েই গেছে! ও'দের কাছ থেকে আমি চলেই এসেছি, জানি না কী হবে ও'দের... আর আমারই বা কী হবে!'

'তুমি ওর কাছে যাচ্ছ নাতাশা, না?'

ও বললে, 'হ্যাঁ।'

ক্ষিপ্তের মতো চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কিন্তু সে যে অসম্ভব! বুঝতে পারছ না নাতাশা, বেচারা আমার, এ অসম্ভব! এ যে নিছক পাগলামি। এতে যে তুমি ও'দের মারবে, নিজেও মরবে! এটুকুও বুঝতে পারছ না নাতাশা?'

ও বললে, 'জানি, কিন্তু কী করব? এখন যে সবই আমার ইচ্ছের বাইরে!' তার কথাগুলোয় এমন হতাশা, যেন ফাঁসিকাঠে চলেছে ও।

মিনতি করলাম, 'ফেরো নাতাশা, ফিরে এসো, এখনো সময় আছে।' আর ততই আবেগে ততই জোর দিয়ে মিনতি করতে লাগলাম, যত নিজেই টের পাচ্ছিলাম আমার সমস্ত অনুরোধের ব্যর্থতা, এই মুহূর্তে তাদের সমূহ অবাস্তবতা। 'বুঝতে পারছ নাতাশা, কী করতে চলেছ তোমার বাপের? সেটা ভেবে দেখেছ? ওর বাপ যে তোমার বাপের শত্রু। প্রিন্স যে তোমার বাবাকে অপমান করেছে, টাকা চুরির অভিযোগ এনেছে, তাঁকে যে চোর বলেছে। মামলা চলেছে যে।... ঈশ্বর! কিন্তু মামলাটা কিছু নয়। কিন্তু জানো না নাতাশা... (ভগবান! সে তো তুমি সবই জানো!)... জানো না কি, আলিওশা যখন গ্রামে তোমাদের সঙ্গে ছিল তখন তোমার মা-বাবা নাকি তোমার সঙ্গে আলিওশার প্রেম ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন বলে প্রিন্সের সন্দেহ? একটু ভেবে দ্যাখো, শুধু মনে করে দ্যাখো, এ কুৎসার জন্যে তোমার বাবাকে তখন কী না সইতে হয়েছে। চুল পর্যন্ত তাঁর শাদা হয়ে গেল এই দু'বছরে — ও'র দিকে তাকিয়ে দ্যাখো! তাছাড়া, সবচেয়ে বড়ো কথা হল, তুমি এ তো সবই জানো নাতাশা হায় ভগবান! চিরকালের জন্যে তোমায় হারানো ও'দের পক্ষে কতটা, সে কথা তোমায় বলব না। তুমি যে তাঁদের নয়নের মণি, বুড়ো বয়সে তুমিই তাঁদের একমাত্র ধন। সে কথা আমি বলতেও চাই না, তোমার নিজেরই জানা থাকার কথা। কিন্তু মনে রেখো, তোমার বাবার ধারণা বিনা দোষে তোমার নিন্দা রটিয়েছে ওরা, অপমান করেছে ঐ গুমরে লোকগুলো, তার প্রতিশোধ নেওয়া হয় নি। আর এখন, ঠিক এই মুহূর্তেই আবার এসব নতুন করে জ্বলে উঠেছে, বেড়ে উঠেছে পুরনো শত্রুতার জ্বালা, কারণ আলিওশা তোমাদের বাড়িতে আতিথ্য পেয়েছে। প্রিন্স ফের অপমান করেছেন তোমার বাবাকে। এই নতুন অপমানে বুড়ো মানুষটার রক্ত এখনো টগবগ করছে, আর হঠাৎ কিনা এই সবকিছু, এই সমস্ত নিন্দাই সত্যি হতে চলেছে এবার। যে শুনবে সেই এখন প্রিন্সকে সমর্থন করবে, সব দোষ দেবে তোমার ওপর আর তোমার বাবার ওপর। কী দশা হবে তাঁর এখন? এর পর যে আর প্রাণে বাঁচবেন না উনি! লজ্জা কলঙ্ক, তাও কার জন্যে? তোমার জন্যে, তাঁর মেয়ে, তাঁর একমাত্র নয়নমণির জন্যে। আর তোমার মা? বৃদ্ধের পর তিনিও যে আর বাঁচবেন না... নাতাশা, নাতাশা, কী করতে চলেছ! ফিরে এসো, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ো না!'

ও কথা বললে না। অবশেষে যেন ভর্ৎসনাভরে তাকালে আমার দিকে। দৃষ্টিতে তার এমন মর্মভেদী যন্ত্রণা, এমন কষ্ট যে টের পেলাম, আমার কথাগুলোর অপেক্ষা না রেখেই আহত বুকখানায় ওর কী রক্তই না ঝরছে।

টের পেলাম, ওর সিদ্ধান্তের কী মূল্য দিচ্ছে ও নিজে, আর আমার নিষ্ফল, বিলম্বিত কথাগুলোয় কী যন্ত্রণা ওকে দিচ্ছি, ক্ষতবিক্ষত করে তুলছি। এ সবই আমি বুঝেছিলাম, কিন্তু আত্মসংবরণ করতে পারলাম না, বলেই চললাম:

'তুমি নিজেই তো এখুনি আন্না আন্দ্রেয়েভনার কাছে বলেছিলে, হয়ত তুমি আরাধনায় যাবে না... তার মানে, তুমি থাকতে চাইছিলে। তার মানে তুমি এখনো চূড়ান্ত মতস্থির করো নি?'

জবাবে ও শুধু তিক্তভাবে হাসলে। আর আমিই বা ওকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে গেলাম কেন? আমার তো বোঝাই উচিত ছিল যে সবই স্থির হয়ে গেছে, তা আর বদলাবার নয়। কিন্তু আমি নিজেও ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিলাম না।

অবশ হৃদয়ে ওর দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বললাম, 'তুমি কি ওকে এতই ভালোবেসেছ?' কী যে ছাই জিজ্ঞেস করছি তা আমি নিজেও প্রায় বুঝি নি।

'কী তোমায় বলব ভানিয়া? ও বলেছিল, এসো; আর দেখছই তো আমি অপেক্ষা করছি।' একইরকম তিক্ত হাসি নিয়ে ও বললে।

তৃণখন্ড আঁকড়ে ধরার মতো করে আমি ফের মিনতি শুরু করলাম, 'কিন্তু শোনো, একটু শুধু শোনো। এ সবেরই প্রতিকার করা যায়, অন্যভাবে ব্যবস্থা করা যাবে, একেবারে ভিন্ন কোনো একটা উপায়ে। বাড়ি ছেড়ে যাবার দরকার হবে না তোমার। কী করতে হবে আমি তোমায় শিখিয়ে দেব নাতাশা। সব ব্যবস্থা করার ভার আমি নিচ্ছি, দেখাসাক্ষাৎ, সব কিছুর ব্যবস্থা... শুধু বাড়ি ছেড়ে যেয়ো না!.. তোমাদের চিঠিপত্র আমি পেঁৗছে দেব, কেন দেব না বলো? এখনকার চেয়ে সেটা অনেক ভালো। সেটা আমি করতে পারি; তোমাদের দুজনেরই কাজে লাগব আমি, দেখে নিয়ো... তুমিও নিজেকে এখনকার মতো ধ্বংস করবে না নাতাশা, লক্ষ্মীটি... এখন যে তুমি একেবারে নিজেকে ধ্বংস করছ, একেবারে। রাজী হয়ে যাও নাতাশা, সব কিছু ভালো হবে, সুখের হবে, তোমরা যত খুশি পরস্পরকে ভালোবাসতে পারবে... তারপর যখন তোমাদের বাপেদের বিবাদ শেষ হয়ে যাবে (কেননা শেষ তো হবেই হবে), তখন...'

'থাক ভানিয়া, থাক।' জোরে আমার হাত চেপে ধরে আমায় থামিয়ে দিলে নাতাশা, চোখের জলের মধ্যে দিয়ে হাসলে, 'ভারি ভালো তুমি ভানিয়া, দরদী খাঁটি লোক তুমি! নিজের জন্যে একটা কথাও বললে না! আমিই যে প্রথম তোমায় ছেড়ে গেছি, কিন্তু সব তুমি ক্ষমা করলে। ভাবছ শুধু আমার সুখের কথা। আমাদের চিঠিও তুমি বইতে রাজী...'

ও কাঁদতে লাগল।

'আমি যে জানি ভানিয়া, আমায় তুমি কত ভালোবাসতে, এখনো বাসো। একটা ভর্ৎসনা, একটা কড়া কথা বলে তুমি আমায় বকলে না। কিন্তু আমি, আমি... ভগবান, তোমার কাছে আমি কত যে অপরাধী। মনে আছে ভানিয়া, একসঙ্গে যে দিনগুলো কাটিয়েছি? ওর সঙ্গে দেখা না হলেই ভালো ছিল... তোমার সঙ্গে যদি থাকতে পারতাম, ভারি লক্ষ্মী, ভালোমানুষ তুমি ভানিয়া!.. না, না আমি তোমার উপযুক্ত নই! দেখছ তো, আমি কেমন: এমনিতেই তোমার মন কত খারাপ আর ঠিক এই সময়েই কিনা আমাদের অতীত সুখের কথা তোমায় মনে করাতে বসেছি। তিন সপ্তাহ তুমি আসো নি, কিন্তু দিব্যি দিয়ে বলছি ভানিয়া, ঘুণাক্ষরেও মনে হয় নি যে তুমি আমায় এতটুকু ঘেন্না করেছ, অভিশাপ দিয়েছ। আমি জানতাম কেন তুমি সরে থাকছ। তুমি আমাদের পথে কাঁটা হয়ে থাকতে চাও নি। আমাদের চেয়ে দেখতে তোমারও কি কষ্ট হয় নি? তোমার জন্যে কত যে অপেক্ষা করেছি ভানিয়া, কী অসম্ভব তোমাকে কাছে পেতে চেয়েছি। শোনো ভানিয়া, আলিওশাকে দারুণ, পাগলের মতো ভালোবাসলেও বোধহয় বন্ধু হিসাবে তোমায় ভালোবাসি তার চেয়েও বেশি। আমার মন বলছে, আমি জানি যে তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারব না, তোমায় আমার চাই, তোমার হৃদয়, সোনায় গড়া তোমার প্রাণ... ওহ ভানিয়া, কী তিক্ত, কী ভয়ানক সময় আমাদের সামনে!'

কান্নার প্লাবনে ভেঙে পড়ল ও। সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল ওর সাংঘাতিক!

কান্না চেপে বলে চলল নাতাশা, 'কী অসম্ভবই না ইচ্ছে হচ্ছিল তোমায় দেখতে। কী রোগা হয়ে গেছ তুমি, কীরকম রুগ্ন, বিবর্ণ। সত্যিই তোমার অসুখ করেছিল নাকি ভানিয়া? অথচ আমি এতক্ষণ জিজ্ঞেস পর্যন্ত করি নি। কেবল নিজের কথাই বলে চলেছি। সমালোচকেরা এখন তোমার সম্পর্কে কী বলছে? তোমার নতুন উপন্যাসখানা এগুচ্ছে তো?'

'এখন কি আর আমার উপন্যাস নিয়ে ভাবনা করার সময় নাতাশা? আমার আর খবর কী, কিছু না, চলে যাচ্ছে। শুধু এইটুকু বলো নাতাশা, তুমি ওর সঙ্গে যাবে, এ দাবি কি ওই করেছিল?'

'না, না, সে একা নয়, তার চেয়েও বেশি আমি। ও অবিশ্যি বলেছিল, কিন্তু আমি নিজেই... শোনো লক্ষ্মীটি, তোমায় সবই বলি: ওরা ওর বিয়ের ব্যবস্থা করছে, পাত্রীটি বড়োলোক, সমাজে তার জায়গাটা খুব উঁচুতে, বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে। ওর বাপ ভয়ানক জেদ ধরেছে, ওকে বিয়ে

করতেই হবে — আর ওর বাপের কথা তো জানো, অসম্ভব ফন্দিবাজ। সবক'টা কলকাঠি নাড়তে শুরু করেছে — এটা এমন একটা দাঁও যে আর দশ বছরের মধ্যে মিলবে না। হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে সম্পর্ক, টাকাপয়সা... লোকে বলে মেয়েটি দেখতেও ভারি সুন্দরী, লেখাপড়া জানে, মনটা ভালো, সবই তার ভালো। ইতিমধ্যেই আলিওশার টান পড়েছে ওর ওপর। আলিওশার বাপ তাড়াতাড়ি নির্ঝঞ্ঝাট হতে চান, তাহলে উনি নিজেও বিয়ে করতে পারেন। তাই উনি একেবারে পণ করে বসেছেন যে করেই হোক আমাদের ছাড়াছাড়ি ঘটাতেই হবে। আমার সম্পর্কে, আলিওশার ওপর আমার প্রভাব সম্পর্কে ওঁর ভারি ভয়...'

অবাক হয়ে বাধা দিলাম, 'কিন্তু বলতে চাও, প্রিন্স তোমাদের প্রেমের কথা জানেন নাকি? সেটা তো ছিল তাঁর শুধু সন্দেহ, তাও পাকাপাকি কিছু নয়?'

'উনি জানেন। সবই জানেন।'

'কেউ বলেছে ওঁকে?'

'আলিওশা কিছু দিন আগে ওঁকে সবই জানিয়েছে। আলিওশা নিজেই আমায় বলেছে সে কথা।'

'সে কী! কী চলেছে তোমাদের! সবই ওঁকে বলে বসল, তাও আবার ঠিক এই সময়!..

নাতাশা আমায় বাধা দিল, 'ওকে দোষ দিয়ো না ভানিয়া, ওকে নিয়ে হাসাহাসি করো না। অন্য লোকের নিরিখে ওর বিচার করলে ভুল হবে। ন্যায্য হবার চেষ্টা করো। ও যে তোমার কি আমার মতো নয়। ও একেবারে ছেলেমানুষ, অমনিভাবেই যে মানুষ হয়েছে। ওর কি খেয়াল থাকে ও কী করছে? প্রথম যা মনে হল, প্রথম যে লোকটার প্রভাব পড়ল ওর ওপরে, তাতেই ও এক মিনিট আগে যা শপথ করেছে তা থেকে সরে যেতে পারে। ওর যে কোনো মেরুদণ্ড নেই। তোমার কাছে হয়ত ও শপথ করল, আবার সেই দিনই ঠিক অমনি সততার সঙ্গে অকপটে আত্মনিবেদন করবে অন্য কারো কাছে। তাই শুধু নয়, নিজেই প্রথম এসে তা সবই তোমায় বলবে। এমন কি খারাপ কাজও ও করে বসতে পারে, কিন্তু তার জন্যে ওকে দোষ দেওয়া যায় না, বরং দুঃখই হয়। আত্মত্যাগও করতে পারে, আর সে যে কী আত্মত্যাগ তা যদি জানতে! কিন্তু সে শুধু পরের একটা নতুন ভাবাবেগ পর্যন্ত, তখন এ সব কথাই সে ভুলে বসবে। সেই জন্যেই তো আমি যদি ওর সঙ্গে অনবরত না থাকি, তাহলে আমাকেও ভুলে যাবে যে। ও যে ওই রকম।'

'কিন্তু, নাতাশা, হয়ত ওসব কথা সত্যি নয়, হয়ত নিতান্তই একটা গুজব। ওর মতো নিতান্ত একটা খোকার বিয়ে হবে কী!'

'বলেছি তো, এর পেছনে ওর বাপের কী একটা মতলব আছে।'

'কিন্তু কী করে জানলে যে পাত্রীটি অমন সুন্দরী, ইতিমধ্যেই ওর মন টেনেছে?'

'ও নিজেই যে আমায় সব বলেছে।'

'সে কী! নিজেই তোমায় বলেছে যে অন্য একটি মেয়েকে ভালোবাসা তার সম্ভব, আর এখন এমন একটা আত্মত্যাগ দাবি করছে তোমার কাছ থেকে?'

'না, না, ভানিয়া, না। তুমি ওকে জানো না, ওর সঙ্গে তুমি থেকেছ কম। ওর সম্পর্কে রায় দেবার আগে ওকে ভালো করে জানতে হয়। ওর চেয়ে নিষ্পাপ ন্যায়পর হৃদয় দুনিয়ায় আর নেই। কেন, মিছে কথা বললে কি বেশি ভালো হত? আর মেয়েটির ওপর ওর টান — সে আর কী! এক সপ্তাহ না দেখলেই তো ও আমায় ভুলে গিয়ে অন্য মেয়েকে ভালোবাসবে, তারপর আমায় দেখা মাত্র ফের আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে। না, না, আমি যে জানি, আমার কাছে লুকনো নেই, এ বরং ভালোই, নইলে সন্দেহের জ্বালাতেই হয়ত আমি মারা যেতাম। হ্যাঁ ভানিয়া, আমি এই ঠিক করেছি: আমি যদি ওর সঙ্গে বরাবর অনবরত, প্রতি মুহূর্তে না থাকি তাহলে আমার প্রতি ওর ভালোবাসা উড়ে যাবে, ভুলে যাবে আমায়, ছেড়ে যাবে। ও যে ওই রকমই। যে কোনো মেয়েই ওকে পটাতে পারে। তখন কী করব আমি? তখন মরতে হবে আমায়... মরণ আর কি! এখুনি মরতেও আমি রাজী। কিন্তু ওকে ছাড়া বাঁচা সে কী করে সইব? সে যে মরারও বাড়া, তার মতো যন্ত্রণা যে আর নেই! ভানিয়া, ভানিয়া আমার, ওর জন্যে যে মা-বাপকে ছেড়ে এলাম, তার সত্যিই তো একটা কারণ আছে! বোঝাবার চেষ্টা কোরো না, সবই ঠিক করে ফেলেছি। প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মুহূর্তে ওকে থাকতে হবে আমার কাছে। ফিরতে আমি পারি না। জানি, আমি নিজেও মরেছি, অন্যদেরও মারছি... ওঃ ভানিয়া!' হঠাৎ ককিয়ে উঠল ও, সারা শরীর ওর কাঁপতে লাগল, 'ও যদি আমায় সত্যি এখন আর ভালো না বাসে, তাহলে। তুমি এখুনি যা বললে,' (আমি আদৌ বলি নি) 'ও নেহাৎ আমায় প্রতারণা করছে, ওকে সৎ আর অকপট বলে দেখায় মাত্র, আসলে একটা পাষণ্ড দাম্ভিক, তা যদি সত্যি হয়! এই তো তোমার কাছে ওর পক্ষ নিয়ে আমি কথা কইছি এখন, কিন্তু এই মুহূর্তেই হয়ত অন্য কোনো

মেয়ের কাছে নিজের কীর্তিতে হেসে কুটি কুটি হচ্ছে ও... আর আমি, আমি এমনি নীচ যে সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে রাস্তায় হে'টে বেড়াচ্ছি, খুঁজছি ওকে... ওহ্ ভানিয়া!'

বুকে থেকে তার এই আর্তনাদটা এমন যন্ত্রণায় বেরিয়ে এল যে দুঃখে মন মুচড়ে উঠল আমার। বুঝলাম নিজের ওপর নাতাশার আর কোনো দখল নেই। এমন একটা অবিশ্বাস্য সিদ্ধান্তে ও যে এসেছে সে শুধু এক অন্ধ উন্মাদ ঈর্ষার দরুন। কিন্তু আমার হৃদয়েও ঈর্ষা জেগে উঠেছিল এবং ফেটে বেরুল। হঠাৎ নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলাম না, কুৎসিত এই ভাবাবেগটায় ভেসে গেলাম আমি।

বললাম, 'নাতাশা, একটা কথা কেবল বুঝতে পারছি না। ওর সম্পর্কে তুমি নিজেই যা বললে তার পরেও কী করে তুমি ভালোবাসতে পারো ওকেই? ওর ওপর তোমার শ্রদ্ধা নেই, ওর প্রেমের ওপরে পর্যন্ত বিশ্বাস নেই তোমার, অথচ ওরই কাছে চলেছ ফেরার পথ না রেখে, ওর জন্যেই সর্বনাশ করতে চাও সকলের। এটা কেমনধারা ব্যাপার? সারা জীবন ধরেই ও তোমায় যন্ত্রণা দেবে, তুমিও কষ্ট দেবে ওকে। বড্ডো বেশি ওকে ভালোবাসছ নাতাশা, বড্ডোই বেশি। এমন ভালোবাসা আমি বুঝি না!'

'হ্যাঁ, আমি ওকে পাগলের মতোই ভালোবাসি,' ও বললে যেন কী একটা যন্ত্রণায় বিবর্ণ হয়ে, 'অমন করে তোমায় কখনো ভালোবাসি নি ভানিয়া! আমি নিজেই তো জানি যে পাগলা হয়ে উঠেছি, যা উচিত আমার ভালোবাসাটা তেমন নয়। যেভাবে ওকে ভালোবাসছি সেটা অন্যায়... শোনো ভানিয়া, আমি তো আগে থেকেই জানতাম, আমাদের সবচেয়ে সুখের মুহূর্তেও যে আমার মনে হয়েছে ও আমায় দেবে কেবল কষ্ট। কিন্তু কী করি যদি ওর দেওয়া সেই কষ্টটাই এখন আমার কাছে সুখ হয়ে দাঁড়ায়? আমি কি আর আনন্দ পাব বলে ওর কাছে চলেছি? কী আমার কপালে আছে, ওকে নিয়ে কী আমায় সইতে হবে, তা কি জানি না ভেবেছ? ভালোবাসার শপথ নিয়েছে ও আমার কাছে, কত রকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু তার একটাও আমি বিশ্বাস করি না। একটারও কোনো মূল্য দিই না আমি, কখনো দিই নি, অথচ জানি, ও মিথ্যে করে বলছে না, মিথ্যে বলা ওর সম্ভব নয়। নিজেই, নিজেই ওকে আমি বলেছি ওকে কোনো রকম বেঁধে রাখতে আমি চাই না। ওর বেলায় এই ভালো। কেউ তো আর বাঁধা থাকতে চায় না। আমি তো আদৌ নই। তবু ওর দাসী হয়েও আমার সুখ, স্বেচ্ছাদাসী; ওর সবকিছু সহ্য করব, সবকিছু —

শুধু ও আমার সঙ্গে থাকুক, আমি যেন ওকে দেখতে পাই! ও নাহয় অন্য কাউকেই ভালোবাসুক, কিন্তু সেটা হোক আমার সামনে, আমি কাছাকাছি থাকতে পেলেই হল... ভারি ঘেন্নার, না ভানিয়া?' হঠাৎ একটা উত্তপ্ত জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে ও। মুহূর্তের জন্যে মনে হল বুঝি ও ভুল বকছে, 'এমনি ধারা ইচ্ছে ভারি ঘেন্নার, না? কিন্তু হলই বা? সে তো আমি নিজেই বলছি, তবু ও যদি আমায় পরিত্যাগ করতে চায়, তাহলেও পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ওর পেছু পেছু আমি ছুটব, ও আমায় পায়ে ঠেলুক, তাড়িয়ে দিক, তবুও। এই যে তুমি আমায় ফিরে যেতে বলছ, কিন্তু তাতেই বা কী হবে? ফিরে গেলেও কালই আবার চলে আসব, ও বলা মাত্র আমি চলে আসব। কুকুরকে লোকে যেমন ডাকে ও আমায় তেমনি করে শিস দিয়ে ডাকবে অমনি ধেয়ে যাব আমি... যন্ত্রণা! ওর কাছ থেকে কোনো যন্ত্রণাতেই যে আমার ভয় নেই! এটুকু তো জানা থাকবে যে সে কষ্ট ওরই দেওয়া কষ্ট... ও ভানিয়া, কী করে যে বোঝাই!'

"কিন্তু বাপ, মা?" মনে মনে ভাবলাম। ও যেন ইতিমধ্যেই ও'দের কথা ভুলে গেছে।

'তাহলে ও তোমায় বিয়েটাও করবে না নাতাশা?'

'করবে, কথা দিয়েছিল বৈকি। কথা সে সবই দিয়েছে, সেই জন্যেই আমায় এখন ডেকে পাঠিয়েছে, কালই, গোপনে, শহরের বাইরে বিয়ে করার জন্যে। কিন্তু ও যে জানে না কী করছে। কী করে বিয়ে হয়, সেটাও হয়ত ওর জানা নেই। এ কি আর একটা স্বামী! সত্যিই হাসির ব্যাপার। আর বিয়ে যদি আমায় করে, তাহলে ও অসুখী হবে, আমায় অনুযোগ করতে শুরু করবে... আমি চাই না কখনো কিছুর জন্যে ও আমায় অনুযোগ করুক। ওর জন্যে আমি সবকিছু দিতে রাজী, ওকে কিছুই দিতে হবে না! বিয়ে করে যদি ও অসুখী হয়, তাহলে কী লাভ ওকে অসুখী করে?'

বললাম, 'না, না নাতাশা, এ কেমন যেন নেশার ঘোর! তা এখন কি সোজা ওর কাছে চলেছ?'

'না। ও বলেছিল এখানে এসে আমায় নিয়ে যাবে। সেই কথা হয়েছিল...' উদ্‌গ্রীব হয়ে ও তাকালে দূরে, তখনো কারো আসার কোনো লক্ষণ নেই।

সরোষে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'অথচ এখনো ওর পাত্তা নেই। তুমি এসে দাঁড়িয়েছ আগেই।' যেন একটা আঘাতে টলে উঠল নাতাশা, মুখ ওর বিকৃত হয়ে উঠল রুগ্নের মতো।

তিক্ত হেসে বললে, 'আদৌ হয়ত ও আসবে না। গত পরশুদিন ও লিখে পাঠিয়েছিল, আসব বলে যদি কথা না দিই তাহলে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার এই পরিকল্পনাটা ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও পেছিয়ে দিতে বাধ্য হবে, বাপ ওকে নিয়ে যাবে সেই পাত্রীর কাছে। কথাটা ও লিখেছিল এমন অনায়াসে, এমন সহজে যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়... আচ্ছা, সত্যিই যদি ও মেয়েটার কাছে চলে গিয়ে থাকে ভানিয়া?'

উত্তর দিলাম না। আমার হাতখানা সজোরে চেপে ধরল নাতাশা, চোখ ওর চিকচিক করছিল।

প্রায় শোনা যায় না এমন স্বরে ও বলেই ফেললে, 'মেয়েটার কাছেই ও গেছে। ভেবেছিল আমি এখানে আসব না, ও তখন মেয়েটার কাছে যেতে পারবে। পরে বলবে আমারই দোষ, আগেই তো সে সাবধান করে দিয়েছিল, আমি নিজেই তো আসি নি। আমায় নিয়ে এখন ওর ক্লান্তি লাগছে, তাই আমার ওপর টান কমছে... হায় ভগবান, মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার! গত বার নিজেই তো বলেছিল, আমার সঙ্গে ও ক্লান্ত... তাহলে কেনই বা অপেক্ষা করছি?'

'ওই যে আসছে!' দূরে বাঁধের ওপর হঠাৎ ওকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

নাতাশা চমকে উঠল, চিৎকার করে উঠল, আলিওশার আসন্ন মূর্তিটার দিকে চাইলে উন্মুখ হয়ে, তারপর হঠাৎ আমার হাত ছেড়ে দিয়ে ছুটে গেল ওর দিকে। আলিওশার পদক্ষেপও দ্রুত হয়ে উঠল। মিনিট খানেকের মধ্যেই নাতাশা বাঁধা পড়ল ওর বাহুবন্ধনে। রাস্তায় আমরা ছাড়া আর বিশেষ কেউ ছিল না। ওরা চুমু খেল, হাসল। নাতাশা যত হাসে তত কাঁদে, যেন এক অসীম বিচ্ছেদের পর মিলন হয়েছে ওদের। বিবর্ণ গালে ওর রঙ ফিরে এল, মনে হল যেন মত্ত হয়ে উঠেছে... আমায় দেখতে পেয়ে আলিওশা তৎক্ষণাৎ এসে দাঁড়াল আমার কাছে।

নবম পরিচ্ছেদ

এর আগে ওকে বহুবারই আমি দেখেছি, তবু উন্মুখ হয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম ওকে। ওর চোখের দিকে চাইলাম, আমায় যা বিমূঢ় করে দিচ্ছে তার সবকিছুর ব্যাখ্যা যেন আমি পাব ওর দৃষ্টি থেকে; যেন বোঝা যাবে, কী করে ছেলেটা নাতাশাকে অমন যাদু করতে পারল, অমন একটা উন্মাদ ভালোবাসা

জাগিয়ে তুলল ওর মধ্যে, অমন একটা ভালোবাসা যাতে প্রাথমিক কর্তব্যটা ও ভুলে বসেছে, ওর কাছে এতদিন পর্যন্ত পবিত্র যাকিছু ছিল সব জলাঞ্জলি দিতে চলেছে নির্বিচারে। আমার দুই হাত ধরে কুমারবাহাদুর সজোরে চাপ দিলে। ওর নিরীহ স্বচ্ছ দৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে বিঁধল।

মনে হল ও আমার প্রতিপক্ষ শুধু এই কারণেই ওর সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্তে ভুল করে বসতে পারি। না, ওকে আমার ভালো লাগে নি। কখনোই যে ওকে আমার ভালো লাগবে না, তা স্বীকার করে নিচ্ছি এবং এদিক থেকে ওকে যারা জানে তাদের মধ্যে আমি এক ব্যতিক্রম। ওর অনেক জিনিসই আমার একেবারে পছন্দ হত না, এমনকি ওর সুদর্শন চেহারাটা পর্যন্ত, — হয়ত-বা বড়ো বেশি সুদর্শন বলেই। পরে বুঝেছিলাম, এই ক্ষেত্রেও আমার বিচারটা হয়েছিল পক্ষপাতদুষ্ট। দেখতে ও ছিল লম্বা, সুঠাম, একহারা। মুখখানা লম্বাটে, সর্বদাই ফ্যাকাশে। হালকা সোনালি চুল, বড়ো বড়ো নিরীহ ভাবালু নীল চোখ, তাতে মাঝে মাঝে হঠাৎ অতি সহজ, অতি ছেলেমানুষী খুশির চমক। নিখুঁত গড়নের সুপুষ্ট, রক্তিমাভ ছোটো ছোটো দুটি ঠোঁট, প্রায় সর্বদাই তাতে কেমন একটা গম্ভীর ঠাট। ফলে হঠাৎ যখন তাতে হাসি ফুটত, সেটা ভারি অপ্রত্যাশিত, ভারি মোহন, এতই তা সরল আর অকপট — যে তক্ষুনি অমনি একটা হাসি দিয়ে সাড়া দেবার তাগিদ বোধ হত, তা যে মেজাজেই লোকটা তখন থাক না কেন। সাজপোশাকে ওর অতিরিক্ত ফ্যাশনের ঘটা ছিল না, যদিও সে সাজ হত বেশ শোভন, বোঝা যেত, সবকিছুতে এই শোভনতার জন্যে ওকে সামান্য চেষ্টাও করতে হয় নি, ওটা যেন ওর সহজাত। তার মধ্যে খারাপ চাল-চলনও কিছু ছিল অবিশ্যি, উঁচু দরের কিছু বদভ্যাস — লঘুচিত্ততা, আত্মসন্তুষ্টি এবং অমায়িক ঔদ্ধত্য। কিন্তু হৃদয়টা তার এত স্বচ্ছ আর সরল যে সর্বাগ্রে সে নিজেই এ দোষ তুলে ধরে, নিজেকেই দোষী মেনে উপহাস করত তা নিয়ে। মনে হয় যে ছেলেটা ঠাট্টা করেও কখনো মিছে কথা বলতে পারবে না, যদিও বা বলে তবে কথাটা যে অসত্য সে সন্দেহই ওর হয় নি। ওর স্বার্থপরতাটুকুরও কেমন যেন আকর্ষণ ছিল, হয়ত সে শুধু এই জন্যে যে সেটা গোপন নয়, প্রকাশ্য। ওর মধ্যে কিছুই চাপা ছিল না। মনে মনে ও দুর্বল, বিশ্বাসপ্রবণ, ভীরু। নিজের ইচ্ছাশক্তি বলতে কিছু ছিল না। একটা শিশুকে ঠকানো বা তার ক্ষতি করা যা, ওকে ঠকানো বা ওর ক্ষতি করাও ঠিক তেমনি নীচতা আর পাপ। বয়সের তুলনায় ও ছিল কাঁচা, বাস্তব জীবনের প্রায় কোনো ধারণাই তার ছিল না। এবং মনে হয়, চল্লিশে পড়লেও

সে ধারণা ওর কখনো হবে না। ওর মতো লোকেরা যেন একটা চিরন্তন নাবালকত্বে দণ্ডিত। আমার মনে হয় এমন কেউ নেই যে ওকে ভালো না বেসে পারবে। শিশুর মতো ও আদর কাড়বে। নাতাশা ঠিকই বলেছিল, কোনো একটা প্রবল প্রভাবে পড়ে অন্যায় ও করে বসতে পারো; কিন্তু পরে ও যখন সে অন্যায়ের ফলাফলটা দেখবে, তখন অনুশোচনাতেই ও মরে যেতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। ভেতরে ভেতরে নাতাশা অনুভব করেছিল যে সেই হবে ওর কর্ত্রী, ওর চালিকা; এমনকি ছেলেটা হবে তারই বলি। আত্মহারা হয়ে ভালোবাসা আর ভালোবাসে বলেই প্রেমাস্পদকে যন্ত্রণা দিয়ে জ্বালানোর রভস যেন নাতাশা আগেই অনুমান করতে পেরেছিল আর বোধ হয় সেই জন্যেই প্রথমে নিজেকেই ওর কাছে আত্মবলি দিতে এগিয়ে এসেছে সে। কিন্তু ছেলেটার চোখেও প্রেম জ্বলজ্বল করছিল, সানন্দে ও চাইলে নাতাশার দিকে। বিজয়গর্বে নাতাশা আমার দিকে তাকাল। সেই মুহূর্তে ও ভুলে গেল সবকিছুই: মা-বাপের কথা, বিদায়, সন্দেহ, সবকিছুই... ও সুখী।

চেঁচিয়ে বললে, 'ভানিয়া, অন্যায় করেছি ওর ওপর, আমি ওর যোগ্য নই। ভাবছিলাম আলিওশা, তুমি আর আসবে না। আমার কুচিন্তার কথা ভুলে যেয়ো ভানিয়া।' তারপর অসীম একটা ভালোবাসায় ওর দিকে তাকিয়ে নাতাশা যোগ করলে, 'তার প্রায়শ্চিত্ত আমি করব।' আলিওশা হাসল, চুমু খেল ওর হাতে, তারপর হাতটা ধরে রেখেই আমার দিকে ফিরে বললে:

'আমারও দোষ ধরবেন না কিন্তু। কতদিন থেকে আপনাকে ভাইয়ের মতো আলিঙ্গন করব বলে ভেবে আসছি। আপনার সম্পর্কে নাতাশা আমায় কত কথাই বলেছে! অথচ আমাদের জানাশোনা প্রায় নেই, এখনো পর্যন্ত কেন জানি বন্ধুত্ব হল না। আসুন বন্ধুত্ব পাতাই আর...' একটু লাল হয়ে নিচু গলায় যোগ করলে, 'আমাদের ক্ষমা করবেন।' বলেই এমন অপূর্ব করে হাসলে যে সর্বান্তঃকরণে ওর সে কথায় সাড়া না দিয়ে আমি পারলাম না।

প্রসঙ্গের জের টেনে নাতাশা বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আলিওশা, ও আমাদের পক্ষে, আমাদের ভাইয়ের মতো, আগেই ও আমাদের ক্ষমা করে রেখেছে, ও নইলে আমাদেরও সুখ হবে না। আগেই তোমায় বলেছি... ওহ্, আমরা ভারি নিষ্ঠুর আলিওশা! কিন্তু আমরা তিনজনেই একসঙ্গে থাকব...' ও বলে চলল, ঠোঁট কাঁপতে লাগল ওর, 'ভানিয়া, তুমি তো এখন ওঁদেরই কাছে বাড়ি ফিরে যাবে। সোনার মন তোমার। ওঁরা যদি আমায় ক্ষমা নাও করেন তবু যখন দেখবেন

তুমি ক্ষমা করেছ, তখন হয়ত মনটা একটু নরম হবে ও'দের। সবকিছু বোলো ও'দের, সবকিছু তোমারই হৃদয় থেকে বোলো, তেমন ভাষা খুঁজে নিও... আমার পক্ষে দাঁড়িয়ো, আমায় বাঁচিয়ো। কারণগুলো তুমি যা বুঝেছ সব ওঁদের জানিও। কী জানো ভানিয়া, হয়ত এ কাজ করার সাহসই হত না আমার যদি আজ তোমায় সঙ্গে না পেতাম! তুমি আমায় বাঁচালে। তোমায় দেখেই ভরসা হল যে কথাটা এমনভাবে বলতে তুমি পারবে, যাতে অন্তত প্রথম আতঙ্কটা কিছু কমে। আহ্ ভগবান!.. আমার হয়ে ও'দের বোলো ভানিয়া। আমি জানি ক্ষমা আমি আর পাব না। ও'রা ক্ষমা করলেও ভগবান করবেন না। কিন্তু ও'রা যদি আমায় অভিশাপও দেন, তবু ও'দের জন্যে আমি শুভকামনা করেই যাব, প্রার্থনা করব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। আমার সমস্ত মন পড়ে রইল তাঁদের কাছে! ওহ্, কেন আমরা সকলেই সুখী হতে পারি না! কেন, কেন!.. ভগবান, এ আমি কী করে বসলাম!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ও যেন এইমাত্র সম্বিৎ ফিরে এসেছে ওর, আতঙ্কে কাঁপতে লাগল সারা শরীর। দুই হাতে মুখ ঢাকল সে। আলিওশা ওকে জড়িয়ে ধরে নীরবে টেনে নিল নিজের কাছে। নীরবে কাটল কয়েক মিনিট।

ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে আলিওশার দিকে তাকিয়ে আমি বলে উঠলাম, 'এতটা আত্মাহুতির দাবি আপনি করতে পারলেন!'

ও বললে, 'আমায় দোষ দেবেন না। বিশ্বাস করুন, এ কষ্ট এখন যতই ভয়ানক হোক, এ শুধু মুহূর্তের জন্যে। এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। শুধু এই মুহূর্তটা সহ্য করার মতো দৃঢ়তা দরকার। নাতাশা নিজেই তাই বলেছে। এ শুধু একটা পারিবারিক অভিমানের ব্যাপার — একেবারেই অকারণ যত সব ঝগড়াঝাঁটি, কীসব আবার মামলা-মোকদ্দমা। সেই হল এ সবের কারণ, জানেন তো। কিন্তু... (আমি ব্যাপারটা নিয়ে খুব ভেবেছি বিশ্বাস করুন) এসব বন্ধ করতে হবে। ফের আমাদের মিল হবে। তখন আমাদের সুখে আর কোনো কাঁটা থাকবে না, আমাদের দেখে বুড়ো কর্তারা পর্যন্ত সব মিটমাট করে নেবেন। বলা যায় না তো, হয়ত ও'দের মধ্যে মিটমাট করিয়ে দেবার দিক থেকে আমাদের বিয়েটাই হবে প্রথম ধাপ। তা না হয়েই পারে না বলে আমার মনে হয়। আপনি কী বলেন?'

'বলছেন "বিয়ে"। কখন হবে বিয়েটা?' বললাম নাতাশার দিকে তাকিয়ে।

'কাল কি পরশু। অন্তত পরশু নিশ্চয়। মানে, আমিও ব্যাপারটা সম্পর্কে খুব পরিষ্কার নই: সত্যি কথা বলতে কি, এখনো কোনো ব্যবস্থা বন্দোবস্ত

করি নি। মনে হয়েছিল, নাতাশা হয়ত আজ আসবে না। তাছাড়া বাবা জিদ করছিলেন আমায় পাত্রীর কাছে আজ নিয়ে যাবেন (আমার তো বিয়ে ঠিক হয়ে আছে; নাতাশা বলেছে কি? আমি অবশ্য ও বিয়ে করতে চাই না)। তাই আর কি, পাকাপোক্ত ভরসা করা যায় নি। তবে সে যাই হোক, পরশুই আমাদের বিয়ে হবে। অন্তত আমার তাই ধারণা, তা না হয়ে যে পারে না। কালই আমরা পস্কভের পথ ধরে যাব। ওখানে আমার স্কুলের এক বন্ধু আছে, বেশি দূরে নয়, গাঁয়ে, ভারি চমৎকার ছেলে। আপনার সঙ্গে হয়ত পরিচয় করিয়ে দেব। গাঁয়ে পুরুতও আছে, অবিশ্যি আছে কিনা ঠিক জানি না। আগে থেকে সব খোঁজখবর ঠিকঠাক রাখা দরকার ছিল, কিন্তু সময় হল না... তবে সত্যি বলতে, এসব নেহাৎ খুঁটিনাটি ব্যাপার। আসলে দরকার প্রধান কথাটা মনে রাখা। আশেপাশের কোনো গাঁ থেকেও তো পুরুত ডাকা যায়; আপনি কী বলেন? আশেপাশে গ্রাম তো আছে ওখানে! শুধু দুঃখ হচ্ছে যে এক ছত্র ওদের লিখে পাঠাবার সময় পেলাম না। আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া উচিত। আমার বন্ধু হয়ত বা এখন বাসাতেই নেই... কিন্তু সেটা মোটেই দুশ্চিন্তার নয়। দৃঢ়সংকল্প থাকলে আপনা থেকেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, তাই না? আপাতত কাল কি পরশু পর্যন্ত ও এখানেই থাকবে আমার সঙ্গে। আলাদা একটা ফ্ল্যাট আমি নিয়েছি, ফিরে এসেও ওখানেই আমরা উঠব। বাবার কাছে তো আর থাকতে যাব না, তাই না? আপনি এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে যাবেন, খুব সুন্দর করে ফ্ল্যাটখানা সাজিয়েছি। স্কুলের বন্ধুরাও এসে দেখা করে যাবে, সান্ধ্য আসরের ব্যবস্থা করব...'

আমি হতবুদ্ধি হয়ে যন্ত্রণায় চাইলাম ওর দিকে। নাতাশার দু' চোখে মিনতি, অত কঠোরভাবে যেন ওর বিচার না করি, যেন একটু প্রশ্রয় দিই। ছেলেটার কথা নাতাশা শুনে যাচ্ছিল কেমন একটা বিষণ্ণ হাসি নিয়ে, অথচ একই সঙ্গে ওর দিকে মমতায় এমন ভাবে চাইছিল যেন মিষ্টি হাসিখুশি একটা শিশুর দিকে তাকিয়ে আছে সে, শুনছে তার অসার তবু মধুর কাকলী। ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালাম নাতাশার দিকে। অসহ্য কষ্ট হচ্ছিল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু আপনার বাবা? আপনি কি খুব নিশ্চিত যে উনি ক্ষমা করবেন?'

বললে, 'নিশ্চয় করবেন। তাছাড়া করার আর কী আছে? মানে, আমায় অবিশ্যি প্রথমে উনি অভিশাপ দেবেনই যে তাতে আমার সন্দেহ নেই। উনি ঐ রকমই, আমার ওপর ভারি কড়া। তা কারো কারো কাছে হয়ত আমার

নামে লাগাবেন। অর্থাৎ ওঁর পিতৃ অধিকার খাটাবেন আর কি... কিন্তু এসব তো আর বিশেষ গুরুতর কিছু নয়। উনি আমায় বেদম ভালোবাসেন। প্রথমটা রাগ করবেন পরে মাপ করে দেবেন। তখন সবাইয়ের মধ্যে ফের মিলমিশ হয়ে যাবে, সকলেই আমরা সুখী হতে পারব। নাতাশার বাবাও সুখী হবেন।'

'কিন্তু যদি মাপ না করেন তাহলে? সে কথা ভেবেছেন?'

'মাপ করবেন সে নিশ্চয়, যদিও হয়ত খুব তাড়াতাড়ি নয়। তাতে আর কি? ওর কাছে আমি প্রমাণ করে দেব যে আমারও একটা চরিত্র আছে। আমার চরিত্র নেই, হালকা মগজ এই বলে অনবরত উনি আমায় বকেন। এবার উনি দেখুন আমার মগজ হালকা কিনা। একটা সংসার পাতা তো আর তামাশার ব্যাপার নয়, তখন আর ছেলেমানুষটি থাকব না আমি... মানে, বলতে চাইছিলাম যে ঠিক অন্য সবার মতোই হয়ে উঠব... মানে, সংসারী লোকেদের মতো। নিজের মেহনতে নিজে চলব। নাতাশা বলে, আমরা সবাই যেভাবে থাকি, সেভাবে পরের ঘাড়ে চেপে থাকার চেয়ে সে অনেক ভালো। নাতাশা কত যে ভালো ভালো কথা আমায় বলে যদি জানতেন! নিজে থেকে ও কথাটা আমার মাথাতেই কখনো আসত না — অন্যভাবে আমি বেড়ে উঠেছি, শিক্ষা পেয়েছি। সত্যি কথা। আমি নিজেই জানি যে আমি চপলমতি, বিশেষ কোনো কম্মের নই। কিন্তু জানেন, পরশু একটা চমৎকার আইডিয়া আমার মাথায় এসেছে। এখন ঠিক সময় নয়, তবু আপনাকে বলি, কেননা নাতাশাও শুনুক আর আপনি আমাদের পরামর্শ দিন। মানে, হয়েছে কি, আমি চাই গল্প লিখে পত্রিকা থেকে টাকা রোজগার করব, ঠিক আপনি যা করেন। সম্পাদকদের ব্যাপারে আপনি একটু সাহায্য করবেন, তাই না? আপনার ওপর আমার খুব ভরসা। কাল সারা রাত জেগে জেগে একটা উপন্যাস ভেবেছি, কী রকম দাঁড়ায় দেখা যাক এই করে। কিন্তু জানেন, সত্যিই বেশ একটা সুন্দর জিনিস হতে পারে। স্ক্রাইবের একটা কমেডি থেকে বিষয়টা নিয়েছি... কিন্তু পরে আপনাকে বলব। সবচেয়ে বড়ো কথা, এর জন্যে টাকা মেলে... আপনাকে তো টাকা দেয়।'

মুচকি না হেসে পারলাম না।

প্রতিদানে সেও হাসল। বললে, 'হাসছেন, কিন্তু শুনুন,' এবং অসাধারণ একটা সরলতায় জানাল, 'দেখে যা মনে হয় তেমন কিছু বলে আমায় ভাববেন না। সত্যিই আমার পর্যবেক্ষণশক্তি আছে খুব, নিজেই দেখবেন। চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি? কিছু একটা দাঁড়িয়েও যেতে পারে... কিন্তু আপনি

হয়ত ঠিকই বলেছেন। বাস্তব জীবনের যে আমি কিছুই জানি না। নাতাশাও তাই বলে, মানে, সবাই তাই বলে; কী রকমের লেখক হব তাহলে? তা হাসবেন হাসুন, তবে আমাকে শুধরে দিন, এটা করুন নাতাশার জন্যে, ওকে তো আপনি ভালোবাসেন। খোলাখুলিই আপনাকে বলছি, ওর যোগ্য আমি নই, সে আমি টের পাই। তাতে অসহ্য কষ্ট হয় আমার — জানি না অমন করে আমায় ও ভালোবাসল কী দেখে! আর আমি তো মনে হয় আমার গোটা জীবনই দিয়ে দিতে পারি ওর জন্যে। সত্যি বলতে কি, এই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত আমার কোনো ভয় ছিল না, কিন্তু এখন ভয় লাগছে: কী কান্ড বাধাচ্ছি আমরা! হায় ভগবান, লোকে যখন একটা কর্তব্য পুরোপুরি গ্রহণ করেছে, তখন হঠাৎ তা পালনের মতো দৃঢ়তা আর বুদ্ধি থাকবে না, এ কি সম্ভব! অন্তত আপনি আমাদের সাহায্য করুন, আপনি তো আমাদের বন্ধু! আপনি ছাড়া কোনো বন্ধু আমাদের আর নেই। একলা আমি কতটুকুই বা বুঝি? আপনার ওপর এত ভরসা করছি বলে কিছু মনে করবেন না। আপনাকে আমি অতি মহৎ বলে মনে করি — আমার চেয়ে ঢের ভালো। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি শুধরে নেব নিজেকে, আপনাদের দুজনেরই যোগ্য হতে পারব।'

এই পর্যন্ত বলে ও ফের আমার করমর্দন করল; সুন্দর চোখদুটোয় ওর ঝলক দিল সদাশয়, সুন্দর একটা অনুভূতি। অসীম একটা ভরসায় ও হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, বিশ্বাস করে আছে যে আমি ওর বন্ধু!

ও বলে চলল, 'নাতাশা আমায় শোধরাতে সাহায্য করবে। তবে আপনি কিন্তু খুব একটা খারাপ কিছু ভাববেন না, আমাদের জন্যে খুব একটা দুঃখ করবেন না। যাই হোক না কেন, আশার কারণ আছে অনেক, টাকাপয়সার দিক থেকে আমাদের মোটেই ভাবনা থাকবে না। উপন্যাসটা যদি না উৎরোয় (সত্যি বলতে কি কিছু আগেও ভাবছিলাম যে উপন্যাসের কথাটা নেহাৎ বাজে, বললাম শুধু আপনার মত কী জানবার জন্যে), তাই উপন্যাসটা যদি না উৎরোয়, তাহলে আমি অন্তত বাজনা শেখাতে পারি। আমি যে বেশ বাজাতে পারি, তা জানতেন না? এ রকম খেটে দিন চালাতে আমার কোনো লজ্জা নেই। এ দিক থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা বেশ প্রগতিশীল। তাছাড়া আমার একগাদা দামী দামী টুকিটাকি জিনিস, প্রসাধন দ্রব্যাদি আছে। সে সবে কী দরকার আমাদের? বিক্রি করে দেব। তাই দিয়েই আমাদের অনেক দিন বেশ চলে যাবে। আর শেষ কথা, সত্যি করেই যদি সব থেকে খারাপটাই

ঘটে, তাহলে সত্যিই কোনো একটা দপ্তরে আমি চাকরিও নিতে পারি। বাবা তখন খুশিই হবেন। উনি অনবরত আমায় তাগাদা দিচ্ছেন চাকরি নেবার জন্যে, কিন্তু আমি এড়িয়ে এড়িয়ে গেছি, বলেছি শরীর ভালো নেই। (তবে আমার নামটা কোথায় যেন দাখিল হয়েই আছে।) তখন তিনি যেই দেখবেন যে বিয়ে করে আমার মঙ্গল হয়েছে, সুস্থির হয়েছি, সত্যি করেই চাকরিতে ঢুকেছি, তখন খুশি হয়ে আমায় মাপ করে দেবেন...'

'কিন্তু আলেক্সেই পেত্রোভিচ, আপনার বাপ আর ওর বাপের মধ্যে এখন কী কাণ্ড বেধে যাবে তা ভেবেছেন কি? ওদের বাড়িতে এই সন্ধ্যায় অবস্থাটা কী দাঁড়াবে বলে আপনার ধারণা?'

আমি ইঙ্গিত করলাম নাতাশার দিকে। আমার কথায় ও মরার মতো শাদা হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমি নির্মম।

ও বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, ভারি বিচ্ছিরি ব্যাপার। আমি আগেই তা ভাবছিলাম, কষ্ট হচ্ছিল... কিন্তু কী করার আছে? আপনি ঠিকই বলেছেন। অন্তত নাতাশার মা-বাবা যদি আমাদের মাপ করে দেন! কী ভালোই যে ওঁদের বাসি, যদি জানতেন! ওঁরা আমার মা-বাপের মতোই, আর সে ঋণ আমি পরিশোধ করছি এই করে!.. উঃ! যতসব ঝগড়া, যতসব মামলা মোকদ্দমা! আপনি কল্পনা করতে পারবেন না এসব এখন কী খারাপ লাগছে আমাদের কাছে! আর ঝগড়াই বা কী নিয়ে! আমরা সবাই সকলকেই এত ভালোবাসি অথচ বিবাদ করছি! মিটমাট করে চুকিয়ে নিলেই হত। সত্যি, আমি হলে তাই করতাম... আপনার কথায় ভয় লাগছে আমার। তুমি আর আমি একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড করছি, নাতাশা! আমি আগেই তো সে কথা বলেছিলাম... তুমিই জেদ করলে... কিন্তু ইভান পেত্রোভিচ, হয়ত এতে শেষ পর্যন্ত ভালোই হবে, কী বলেন? শেষকালে তো ওঁদের মধ্যে মিটমাট হয়েই যাবে! আমরা মিটমাট করিয়ে দেব। তাই-ই হবে, কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের ভালোবাসার সামনে ওঁরা গোঁজ হয়ে থাকতে পারবেন না... অভিশাপ দিতে চান দিন, তবু আমরা ওঁদের ভালোই বেসে যাব, তখন ওঁরা আর পারবেন না। আপনি বিশ্বাস করবেন না মাঝে মাঝে আমার বাবা কত সদয় হয়ে ওঠেন! আড়চোখে ওটা এমনি তাকান, মাঝে মাঝে কিন্তু বিবেচনা দেখান খুব। আজকে আমায় বোঝাবার জন্যে উনি কী রকম নরম হয়ে কথা বলছিলেন তা যদি জানতেন! আর ঠিক এই আজকেই আমি চলেছি ওঁর বিরুদ্ধে — তাতে ভারি মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। শুধু ওঁদের যত বাজে

কুসংস্কারের জন্যে। একেবারে পাগলামি! কেন, নাতাশার দিকে উনি যদি একবার ভালো করে তাকাতেন, আধ ঘণ্টাখানেকও ওর সঙ্গে কাটাতেন? তাহলে নির্ঘাৎ উনি সঙ্গে সঙ্গেই সবকিছুতে রাজী হয়ে যেতেন।' এই বলে আলিওশা নাতাশার দিকে তাকাল কোমল করে, তীব্র আবেগে।

'কতবার যে আমি আনন্দ করে কল্পনা করেছি,' বকেই চলল ও, 'নাতাশার সঙ্গে জানাশোনা হলেই উনি কী রকম ভালোবাসবেন ওকে। সকলকেই অবাক করে দেবে নাতাশা। সত্যি, ওর মতো মেয়ে তো ওরা কেউই দেখে নি! বাবার ধারণা নাতাশা নেহাতই ফন্দিবাজ। ওর মর্যাদা রক্ষা আমার কর্তব্য এবং তাই আমি করব। আহ্ নাতাশা, সকলেই তোমায় ভালোবাসবে, সকলেই, না ভালোবেসে কারো জো নেই,' উচ্ছ্বসিত হয়ে যোগ করলে সে, 'তোমার যোগ্য আমি একেবারেই নই তবু তুমি আমায় ভালোবাসো নাতাশা, আর আমি... তুমি তো আমায় জানো! সুখী হবার জন্যে আমাদের সত্যিই কত আর দরকার! না, আমার ভারি বিশ্বাস, এই সন্ধ্যেটা থেকেই আসবে আমাদের সকলকার সুখ শান্তি আর মিটমাট! ধন্য হোক এই সন্ধ্যেটা! তাই না নাতাশা? কিন্তু কী হল? হায় ভগবান, কী হল তোমার?'

মরার মতো বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল নাতাশা। আলিওশা বকবক করে যাচ্ছিল আর সারাটা সময় ও একদৃষ্টে তাকিয়েছিল আলিওশার দিকে, কিন্তু দৃষ্টি তার ক্রমেই ঝাপসা আর স্থির হয়ে উঠছিল, মুখখানা শাদাটে। আমার মনে হয়, শেষের দিকে যেন ও আর শুনছিলও না, ছিল কেমন একটা ঘোরের মধ্যে। আলিওশার চিৎকারে হঠাৎ ওর ঘোর ভাঙল। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চারদিকে একবার ও তাকাল, তারপর হঠাৎ ছুটে এল আমার কাছে। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে আলিওশাকে না দেখিয়ে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে আমায় দিলে। চিঠিটা ওর মা-বাবার নামে, আগের দিন লেখা। চিঠিটা দেবার সময় একাগ্র দৃষ্টিতে ও এমন ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল যেন দৃষ্টি দিয়ে গেঁথে গেছে আমার সঙ্গে। সে দৃষ্টিতে চরম হতাশা। সে ভয়ংকর দৃষ্টি আমি কখনো ভুলব না। আমিও ভয় পেয়ে গেলাম। বুঝলাম, মাত্র এতক্ষণে ওর পুরোপুরি ঠাহর হয়েছে, ওর কীর্তিটা কত ভয়ানক। কী একটা বলবার চেষ্টা করল নাতাশা, বলতে শুরুও করল, কিন্তু মূর্ছিত হয়ে পড়ল হঠাৎ। কোনো ক্রমে ওকে ধরে ফেললাম। আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেল আলিওশা। নাতাশার কপাল ঘষতে লাগল ও, হাতে আর মুখে চুমু খেলে। মিনিট দুয়েক পরে ওর চৈতন্য ফিরল। যে গাড়িখানায় আলিওশা এসেছিল

সেটা দাঁড়িয়েছিল অদূরে। গাড়িটাকে সে ডাকলে। গাড়িতে উঠে নাতাশা পাগলের মতো আমার হাতটা আঁকড়ে ধরল, তপ্ত অশ্রুজলের ছেঁকা লাগল আমার আঙুলে। গাড়ি ছেড়ে দিল। অনেকক্ষণ ওখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি দেখতে লাগলাম। আমার সমস্ত সুখ চূর্ণ হয়ে গেল এই মুহূর্তে, জীবন ভেঙে গেল দুখানা হয়ে। সেটা টের পাচ্ছিলাম প্রচণ্ডভাবে... ধীরে ধীরে আগের রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতে লাগলাম বুড়োবুড়ির কাছে। জানি না, কী বলব ওঁদের, কী করে গিয়ে সামনে দাঁড়াব। চিন্তা আমার অসাড়, পায়ের ওপর খাড়া থাকতেও পারছি না...

এই হল আমার সুখ কাহিনীর সবখানি, আমার প্রেমের পরিশেষ এবং সমাপ্তি। এবার কাহিনীটা যেখানে ছেড়ে এসেছি সেখান থেকে শুরু করা যাক।

দশম পরিচ্ছেদ

স্মিথের মৃত্যুর দিন পাঁচেক পরে আমি তার বাসায় উঠে আসি। সারাটা সময় সেদিন অসহ্য খারাপ লেগেছে। আবহাওয়াটা ঠাণ্ডা মেঘলা। ভেজা ভেজা তুষার পড়ছিল, মাঝে মাঝে বৃষ্টি। শুধু সন্ধ্যের দিকে মুহূর্তের জন্যে সূর্য মুখ বাড়াল, পথহারানো একঝলক রোদ্দুর হয়ত বা কৌতূহলের বশেই উঁকি দিলে আমার ঘরে। এখানে উঠে এসেছি বলে আফসোস করতে শুরু করেছিলাম আমি। ঘরখানা বড়ো হলেও ছাতটা ভারি নিচু, ভারি ঝুল ভরা, অত্যন্ত গুমোট এবং আসবাবপত্র কিছু থাকলেও অসহ্য রকমের ফাঁকা-ফাঁকা। মনে হয়েছিল, আমার স্বাস্থ্যের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা নির্ঘাৎ এখানেই খোয়াতে হবে। হলও তাই।

সেদিন আমার কাগজপত্রগুলো নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম সারা সকালটা। বেছে-টেছে গুছিয়ে রাখছিলাম। পোর্টফোলিও নেই, তাই ওগুলোকে রেখেছিলাম একটা বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে। সব দলামোচড়া এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর লিখতে বসি। বড়ো উপন্যাসটা তখনও লিখছি কিন্তু কাজ এগুচ্ছিল না; মন ভরে ছিল অন্য সব জিনিসে...

কলম রেখে জানলার কাছে গিয়ে বসলাম। গোধূলি গাঢ় হয়ে আসছিল, আর কেবলি বিষণ্ণ লাগতে লাগল আমার। নানা রকমের গুরুভার ভাবনা পেয়ে বসছিল আমায়! কেবলি মনে হচ্ছিল, পিটার্সবুর্গেই শেষ পর্যন্ত

আমার মরণ। বসন্ত এল বলে; ভাবছিলাম শুধু যদি এই অন্ধকূপ ভেঙে দিনের আলোয় যেতে পারতাম, বন আর মাঠের তাজা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে পারতাম তাহলে নিশ্চয় ফের ফিরে আসতাম জীবনে। কতদিন যে ওসব দেখি নি!.. মনে হল কী ভালোই না হত যদি কোনো একটা যাদু বা অলৌকিক ঘটনায় গত কয়েক বছরের ব্যাপারগুলো সব নিঃশেষে ভুলে যেতে পারতাম, একেবারে ভুলে গিয়ে যদি তাজা মনে নতুন উৎসাহে সব কিছু শুরু করতে পারতাম। তখনো আমি এ সবের স্বপ্ন দেখতাম, আশা রাখতাম পুনরুজ্জীবনের। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, “অন্তত কোনো একটা পাগলাগারদে যাওয়াই আমার ভালো, মাথার মধ্যেকার ঘিলুটাকে নাড়া দিয়ে নতুন করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে ফের ভালো হয়ে ওঠা।” তখনো জীবনের তৃষ্ণা আমার অটুট, বিশ্বাস আছে তাতে!.. কিন্তু মনে আছে, কথাটা ভেবেই হাসি পেয়েছিল। “কিন্তু পাগলাগারদ থেকে ফেরার পরই বা কী করার আছে? ফের উপন্যাস লিখব কি?..”

এই সব ভাবছিলাম আর মন খারাপ করছিলাম। ওদিকে সময় বয়ে যাচ্ছিল। রাত হয়ে এল। সেই সন্ধ্যেয় নাতাশার ওখানে যাওয়ার কথা ছিল আমার। আগের দিন একটা চিরকুট পাঠিয়ে ও একান্ত মিনতি করে বলেছিল যেতে। লাফিয়ে উঠে তৈরি হতে লাগলাম। এমনিতেই ঘরখানা থেকে কোথাও পালাতে চাইছিলাম আমি, তা সে যদি কাদা আর বৃষ্টির মধ্যে হয় তাও সই।

অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরখানা যেন আরো বড়ো হয়ে উঠতে লাগল, যেন সরে যেতে লাগল দেয়ালগুলো। মনে হল, যেন প্রতি রাত্রে ঘরখানার প্রতি কোণে স্মিথকে দেখা যাবে; বসে বসে ও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে আমার দিকে, ঠিক যেমন করে সে তাকিয়েছিল মিষ্টিখানায় আদাম ইভানিচের দিকে, আজর্কা পড়ে থাকবে ওর পায়ের কাছে। ঠিক সেই মুহূর্তে এমন একটা ঘটনা ঘটল, যা খুব ছাপ ফেলেছিল আমার ওপর।

তবে সব খোলাখুলি স্বীকার করে নেওয়া উচিত: হয় আমার স্নায়ুবৈকল্যের দরুন, নয়ত আমার নতুন বাসার নতুন অনুভূতিগুলোর ফলে, কিংবা আমার সাম্প্রতিক তিক্ততাবোধের জন্যে গোধূলির সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে ক্রমশ মনের এমন একটা অবস্থা হত আমার, যা রাত্রে আমার অসুখের সময় প্রায়ই আমায় পেয়ে বসছে। এটার নাম দিয়েছি আমি অতীন্দ্রিয় আতঙ্ক। এটা এমন একটা কিছু নিয়ে অতি গুরুভার কষ্টকর আতঙ্ক যা আমি নিজেই বুঝতে

পারি না। সে আতঙ্ক এমন একটা কিছুর যা সমস্ত বোধশক্তির বাইরে, স্বাভাবিক ঘটনার অতীত, তবু হয়ত এই মুহূর্তেই যা অবশ্য-অবশ্যই রূপ নিচ্ছে এবং যেন সমস্ত যুক্তিবুদ্ধি উপহাস করেই আমার কাছে এসে দাঁড়াবে এক অকাট্য ঘটনার মতো — ভয়ংকর, বিকট, আর নির্মম। যুক্তির সর্ববিধ সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও এ আতংক সাধারণত কেবলি বাড়তে থাকে এবং এই সব মুহূর্তে মনটা সম্ভবত অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে উঠলেও শেষ পর্যন্ত এই সব অনুভূতি প্রতিরোধের ক্ষমতা তার কিছুই থাকে না। মনের কোনো জোরই থাকে না, অকেজো হয়ে পড়ে মন এবং এই আভ্যন্তরীণ সংকটের ফলে প্রতীক্ষার ভীত যন্ত্রণাটাই বেড়ে ওঠে। ওটা খানিকটা প্রেতের ভয় পাওয়া লোকেদের যন্ত্রণার মতো বলে আমার ধারণা। কিন্তু আমার বেলায় আতঙ্কটা অনিশ্চিত বলে কষ্টটা হয় আরো অসহ্য।

মনে আছে, দরজার দিকে পেছন ফিরে টেবিল থেকে টুপিটা নিচ্ছি, হঠাৎ সেই মুহূর্তেই মনে হল ঘুরলেই নির্ঘাৎ স্মিথকে দেখতে পাব। প্রথমে আস্তে করে সে দরজাটা খুলবে, চৌকাটে দাঁড়িয়ে ঘরের চারিদিকটা দেখবে, তারপর মাথা নুইয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসবে আমার দিকে, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিষ্প্রভ চোখদুটো স্থির করে রাখবে আমার ওপর। তারপর হঠাৎ হেসে উঠবে আমার মুখের ওপর — দীর্ঘ, দন্তহীন নিঃশব্দ হাসি; হাসিতে সারা শরীর তার কাঁপতে থাকবে এবং কাঁপবে অনেকক্ষণ ধরে। ছবিটা হঠাৎ অস্বাভাবিক রকম প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট হয়ে আমার কল্পনায় ফুটে উঠল এবং অতি পরিপূর্ণ, অতি নিঃসংশয় এই প্রত্যয় আমায় পেয়ে বসল যে এ সব কিছু ঘটবেই ঘটবে, ইতিমধ্যেই তা যেন ঘটে গেছে, দেখতে পাচ্ছি না শুধু এই জন্যে যে দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়ে আছি এবং ঠিক এই মুহূর্তেই হয়ত দরজাটা খুলতে শুরু করে দিয়েছে। ঝট করে ঘুরে তাকালাম, দেখি — দরজাটা আস্তে করে নিঃশব্দে খুলছে, ঠিক এক মিনিট আগে যা মনে হয়েছিল তেমনি। চিৎকার করে উঠলাম। অনেকক্ষণ কাউকে দেখা গেল না, দরজাটা যেন নিজে থেকেই খুলে গেছে। হঠাৎ অদ্ভুত একটা প্রাণীর আবির্ভাব হল চৌকাটে। অন্ধকারে যতটুকু বোঝা গেল, কারো চোখ যেন স্থির একাগ্র দৃষ্টিতে আমায় চেয়ে চেয়ে দেখছে। সারা শরীর শিউরে উঠল আমার। তীব্র আতংকে দেখতে পেলাম, একটা মেয়ে, খুকি। এই সময় ঠিক এমন এক মুহূর্তে আমার ঘরে অচেনা একটা খুকির এই অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে

যতটা ভয় পেয়েছিলাম স্মিথ স্বয়ং এসে দাঁড়ালেও বোধ হয় ততটা ভয় পেতাম না।

আগেই বলেছি, মেয়েটা খুব আস্তে, খুব নিঃশব্দে দরজা খুলেছিল যেন ভেতরে আসতে সাহস পাচ্ছে না। তারপর ঢুকে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে আশ্চর্য হয়ে, প্রায় আড়ষ্ট হয়ে তাকিয়ে রইল সে অনেকক্ষণ। শেষ পর্যন্ত আস্তে করে ধীরে ধীরে দু'পা এগিয়ে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। তখনো একটা কথাও সে বলে নি। আরো নজর করে মেয়েটার দিকে তাকালাম। বারো কি তেরো বছর বয়সের একটি মেয়ে, লম্বা নয়, রোগা, ফ্যাকাশে, যেন সবে কোনো একটা বিষম অসুখ থেকে উঠেছে; তাতে করে আরো জ্বলজ্বল করছিল ওর বড়ো বড়ো কালো চোখদুটো। বাঁ হাতে একটা পুরনো ছেঁড়া শাল জড়িয়ে ধরেছে, বুক ঢেকেছে ওই দিয়ে, সন্ধ্যার শীতে সে বুক তখনো কাঁপছিল। ন্যাতাকানি বললেই ওর পোশাকের ভালো বর্ণনা দেওয়া হয়। মোটা কালো চুলের গোছা পাট করা নয়, এলোমেলো।

মিনিট দুয়েক আমরা অমনি দাঁড়িয়ে রইলাম পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে।

'দাদু কোথায়?' ও অবশেষে জিজ্ঞেস করলে প্রায় শোনা যায় না এমন একটা ভাঙা ভাঙা গলায় যে মনে হবে বুঝি ওর গলার কি বুকের রোগ আছে।

এ প্রশ্নে আমার অতীন্দ্রিয় আতঙ্ক সব দূর হয়ে গেল। স্মিথের কথা জিজ্ঞেস করছে ও। লোকটার সূত্র দেখা দিয়েছে অপ্রত্যাশিতভাবে।

'তোমার দাদু? তিনি তো মারা গেছেন!' প্রশ্নটার জন্যে তৈরি ছিলাম না, তাই হঠাৎ জবাবটা বেরিয়ে এল এবং সঙ্গে সঙ্গেই অনুশোচনা হল। একই ভাবে মেয়েটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মিনিটখানেক, হঠাৎ ওর সারা শরীর কাঁপতে লাগল। এত থরথর করে যে মনে হল এই বুঝি ওর ভয়ানক একটা স্নায়বিক বিক্ষেপ হবে। পাছে পড়ে যায় তাই ওকে ধরে রাখলাম আমি। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ও সামলে উঠল একটু। পরিষ্কার দেখলাম আমার সামনে ওর ব্যাকুলতা চেপে রাখার জন্যে মেয়েটা সাধ্যাতীত চেষ্টা করছে।

বললাম, 'মাপ করো, মাপ করো খুকি! মাপ করো! আচমকা বলে বসেছি কথাটা, হয়ত ঠিক নাও হতে পারে... আহা বেচারি!.. কার খোঁজ করছিলে? যে বৃদ্ধ এখানে থাকত, তাঁর?'

'হ্যাঁ,' অতি কষ্টে ফিসফিসিয়ে ও বললে আমার দিকে অস্থির হয়ে তাকিয়ে।

'তাঁর নাম কি স্মিথ, এ্যাঁ?'

'হুঁ-হ্যাঁ!'

'তাহলে তিনি... মানে, উনিই তাহলে মারা গেছেন... দুঃখু কোরো না খুকি। আগে এখানে আস নি কেন? কোত্থেকে এলে এখন? গত কাল ওঁর কবর দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ মারা গেছেন... তুমি তাহলে ওঁর নাতনী?'

আমার দ্রুত অসংলগ্ন প্রশ্নের কোনো জবাব দিলে না মেয়েটা। নিঃশব্দ ফিরে চুপ করে বেরিয়ে গেল। এত অভিভূত হয়েছিলাম যে ওকে থামিয়ে আরো কিছু প্রশ্ন করার চেষ্টাও করি নি। দোরগোড়ায় থেমে অর্ধেকটা ফিরে ও ফের জিজ্ঞেস করলে, 'আজর্কাও মারা গেছে, না?'

বললাম, 'হ্যাঁ, আজর্কাও মারা গেছে।' ওর প্রশ্নটা কেমন অদ্ভুত লাগল আমার কাছে, যেন ওর নিশ্চিতই জানা যে বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আজর্কাও অবশ্যই মারা যাবে।

আমার উত্তর শোনার পর মেয়েটা নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যাবার সময় সযত্নে দরজাটি ভেজিয়ে দিলে।

কেন যে ওকে যেতে দিলাম এই ভেবে নিজের ওপর ভয়ঙ্কর বিরক্ত হয়ে আমি ওর পেছু পেছু ছুটলাম মিনিটখানেক পর। এত নিঃশব্দে ও গিয়েছিল যে সিঁড়ির দরজা ও কখন খুলেছে তার শব্দ পাই নি। ভাবলাম, নিশ্চয় এর মধ্যেই ও সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে পারে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইলাম। চারিদিক নিস্তব্ধ, কোথাও পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। নীচের কোনো তলায় দরজা বন্ধের শব্দ শুনলাম একবার, তারপর ফের আবার সব নীরব।

দ্রুত নামলাম সিঁড়ি ভেঙে। পাঁচতলায় আমার ফ্ল্যাটটা থেকে চারতলায় নামার সিঁড়িটা ঘোরানো, তারপর থেকে নিচু পর্যন্ত সাধারণ সিধে। সিঁড়িটা কালচে, নোংরা আর সর্বদাই অন্ধকার, ছোটো ছোটো ফ্ল্যাটে ভাড়া দেওয়া বড়ো বাড়িগুলোতে প্রায়ই যা দেখা যায়। ইতিমধ্যে সেটা একেবারেই আঁধার হয়ে গিয়েছিল। হাতড়ে হাতড়ে চারতলা পর্যন্ত নেমে স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। হঠাৎ যেন ভেতর থেকে ধাক্কা খেলাম, মনে হতে লাগল, অলিন্দে কেউ যেন লুকিয়ে আছে আমার কাছ থেকে। হাতড়াতে লাগলাম চারিদিক। মেয়েটাই বটে, ঠিক একেবারে কোণটিতে। দেয়ালের দিকে মুখ করে নিঃশব্দে কেঁদে চলেছে।

বললাম, 'শোনো, ভয় কিসের? তোমায় ভারি ভয় পাইয়ে দিয়েছি, আমারই দোষ। মরার সময় তোমার দাদু তোমার কথা বলছিলেন। সেই তাঁর শেষ কথা... কয়েকটা বই পড়ে আছে আমার কাছে, বোধ হয় সেগুলো তোমারই। নাম কী তোমার? কোথায় থাকো? উনি ছয় নম্বর লাইনের কথা বলছিলেন...'

কিন্তু শেষ করতে পারলাম না আমি। মেয়েটা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল যেন কোথায় সে থাকে তা আমি জেনে ফেলায় ওর আতঙ্ক হয়েছে। রোগা হাড্ডিসার হাত দিয়ে আমায় ঠেলে দিয়ে ছুটে পালাল সিঁড়ি চেয়ে। আমি ওর পিছু নিলাম। নিচে ওর পায়ের শব্দ তখনো শোনা যাচ্ছিল। হঠাৎ সে শব্দ থেমে গেল... ছুটতে ছুটতে যখন রাস্তায় পেঁছলাম তখন ও আর নেই। ভজ্‌নেসেন্‌স্কি স্ট্রিট পর্যন্ত এসে বুঝলাম আমার সব চেষ্টাই বৃথা: অদৃশ্য হয়ে গেছে মেয়েটা। ভাবলাম, "খুব সম্ভবত সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় কোথাও লুকিয়ে গেছে আমার কাছ থেকে।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাস্তাটার ভেজা কাদাকাদা ফুটপাথের ওপর পা দিতেই একজন পথচারীর সঙ্গে ধাক্কা খেলাম। মাথা নিচু করে সে কোথাও তাড়াহুড়ো করে চলছিল, সম্ভবত ডুবে ছিল ভাবনায়। অবাক হয়ে দেখলাম, সে আমারই বৃদ্ধ ইখমেনেভ। এ যেন কেবলি হঠাৎ হঠাৎ দেখা হবার এক সন্ধ্যে। জানতাম, দিন তিনেক থেকে বৃদ্ধের ভারি অসুখ। অথচ বাইরের এই স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় ওঁরই সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাছাড়া সন্ধ্যেয় বাইরে বেরুনো ওঁর অভ্যেস নয় এবং নাতাশা চলে যাবার পর থেকে অর্থাৎ প্রায় গত ছয়মাস যাবৎ উনি একেবারে ঘরকুনো। আমায় দেখে ওঁর যা আনন্দ হল সেটা ঠিক সচরাচরের মতো নয় — সে আনন্দ যেন এমন একজনের যে অবশেষে মনের কথা বলার মতো এক বন্ধু পেয়েছে। আমার হাত জাপটে ধরে সাবেগে চাপ দিলেন উনি, কোথায় যাচ্ছি কিছু জিজ্ঞেস না করেই সঙ্গে টেনে নিয়ে চললেন। কিছু একটা ব্যাপারে উনি বিচলিত হয়ে ছিলেন, ভাবে-ভঙ্গিতে কেমন একটা তাড়া আর ঝটকানির ভাব। ভাবলাম, "কোথায় গিয়েছিলেন উনি?" ওঁকে প্রশ্ন করা ভুল। সাংঘাতিক সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন উনি, অতি সাধারণ একটা প্রশ্ন কি মন্তব্যেই মাঝে মাঝে অপমান কি আঘাতের ইঙ্গিত আবিষ্কার করে বসতেন।

আড়চোখে চাইলাম ও'র দিকে — মুখখানা অসুস্থ, ইদানীং ভারি রোগা হয়ে গেছেন উনি; গালে এক হপ্তা না কামানো দাড়ি। চুল একদম শাদা হয়ে গিয়েছিল, দলামোচড়া টুপির তল থেকে তা এখন বিশৃঙ্খলভাবে বেরিয়ে এসে জীর্ণ পুরনো ওভারকোটের কলারের ওপর লম্বা লম্বা গুচ্ছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। আগেও লক্ষ্য করেছি, এক একসময় উনি বড়ো ভুলোমন হয়ে উঠতেন। যেমন, হঠাৎ হয়ত ঘরে অন্য কেউ আছে ভুলে গিয়ে নিজের মনে হাত নেড়ে কথা কইতে শুরু করে দিলেন। ওঁর দিকে তাকালে কষ্ট হত।

বললেন, 'কী হে ভানিয়া, কী খবর? কোথায় যাচ্ছিলে? একটু বেরিয়েছি হে — মানে, কাজ আর কি। তুমি ভালো আছ তো!'

বললাম, 'কিন্তু আপনি ভালো তো? এইতো সেদিন আপনি অসুখে পড়েছিলেন, আর আজই বাইরে বেরিয়েছেন?'

বৃদ্ধ বোধ হয় আমার কথা শুনতে পান নি, কোনো জবাব দিলেন না।

'আন্না আন্দ্রেয়েভনা কেমন আছেন?'

'ভালো আছেন, ভালো আছেন... তবে একটু খারাপই বটে। মন খারাপ গোছের... তোমার কথা বলছিলেন, বলছিলেন কেন তুমি আর আসছ না। আচ্ছা, তুমি কি এখন আমাদের ওখানে যাচ্ছিলে, ভানিয়া? নাকি না? তোমার কি অসুবিধা করলাম কিছু, আটকে রাখছি?' হঠাৎ আমার দিকে সন্দিগ্ধ অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন উনি। বাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধ এমন স্পর্শকাতর আর খিটখিটে হয়ে উঠেছিলেন যে তখন যদি বলতাম, না, ও'দের ওখানে যাচ্ছিলাম না, তাহলে নিশ্চয় উনি ভারি আহত বোধ করতেন এবং গোমড়া মুখে বিদায় নিতেন। তাড়াতাড়ি করে বললাম হ্যাঁ, আন্না আন্দ্রেয়েভনাকে দেখতেই যাচ্ছিলাম, যদিও জানতাম দেরি হয়ে যাবে, হয়ত আদৌ নাতাশার ওখানে যাওয়া হয়ে উঠবে না।

আমার উত্তরে একান্ত নিশ্চিন্ত হয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'বেশ ভালো কথা। ভালো কথা...' তারপর হঠাৎ থেমে এমনভাবে চুপ করে গেলেন যেন কিছু একটা বলা বাকি রইল।

মিনিট পাঁচেক পরে, যেন দীর্ঘ একটা চিন্তা থেকে জেগে উঠে যন্ত্রের মতো পুনরাবৃত্তি করলেন, 'হ্যাঁ তা ভালো! হুঁ... জানো তো ভানিয়া, তুমি বরাবর আমাদের ছেলের মতো। ভগবান আমাদের... ছেলে তো দেন নি... কিন্তু তোমায় দিয়েছেন। চিরকাল আমি তাই বলি। আমার বুড়ি গিন্নীও তাই মনে করেন... হ্যাঁ! তুমিও সুপুত্রের মতো চিরকাল আমাদের মান্যি

করেছ, ভালোবেসেছ। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন ভানিয়া, আমরা দুই বুড়োবুড়িও তোমার মঙ্গল চাই, ভালোবাসি... হ্যাঁ!'

গলার স্বর ওঁর কেঁপে গেল। মুহূর্তের জন্যে থামলেন।

'তা কী ব্যাপার? অসুখবিসুখ হয় নি তো? এতদিন আমাদের দেখতে আস নি কেন?'

স্মিথের ঘটনাটা সব তাঁকে বললাম। ঐ ব্যাপারটার জন্যে আটকে ছিলাম বলে ক্ষমা চেয়ে নিলাম। বললাম, তাছাড়াও প্রায় অসুখে পড়ার মতোই হয়েছিল, ঘাড়ের ওপর এই সব ঝামেলা নিয়ে আপনাদের ওখানে, ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপে যাওয়া, পথ তো অনেকখানি (ওঁরা তখন ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপেই থাকতেন)। প্রায় বলতে যাচ্ছিলাম যে এর মধ্যেও নাতাশাকে দেখতে যাবার সুযোগ করতে হয়েছিল, কিন্তু সময়মত চুপ করে গেলাম।

স্মিথের ঘটনাটায় বৃদ্ধের ভারি আগ্রহ দেখা গেল। বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন। যখন উনি শুনলেন যে আমার নতুন বাসাটা স্যাঁতসেঁতে, পুরনো বাসাটার চেয়েও হয়ত খারাপ, এবং ভাড়া মাসে ছয় রুবল, তখন রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। মোটের ওপর ভারি খিটখিটে আর অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন উনি। এরকম মুহূর্তে ওঁকে সামলাতে পারতেন শুধু আন্না আন্দ্রেয়েভনাই, তাও সবসময় নয়।

প্রায় সরোষেই চেঁচিয়ে উঠলেন উনি, 'হুঁম্! এই হল গে তোমার সাহিত্যের পরিণতি ভানিয়া! তার ফলে গিয়ে পেঁছেছ তো এক চিলেকোঠায়, কবরখানাটাও দূরে নয়! সেসময় আগেই বলেছিলাম। ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম!.. 'ব' কি এখনো সমালোচনা লিখছেন?'

'তিনি তো মারা গেছেন ক্ষয়রোগে। আপনাকে বোধ হয় আগেই বলেছি।'

'মারা গেছেন, হুঁম... মারা গেছেন তাহলে! হুঁ, সে তো জানা কথা। স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের জন্যে রেখে গেছেন কিছু? তুমি বলেছিলে না, ওঁর স্ত্রী আছে... কেন যে বিয়ে করে এসব লোক!'

জবাব দিলাম, 'না, কিছুই রেখে যেতে পারেন নি।'

'দ্যাখো! ঠিক যা ভেবেছিলাম!' উনি চেঁচিয়ে উঠলেন এমন আবেগে যেন ব্যাপারটার সঙ্গে তাঁর খুব একটা ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, লোকান্তরিত 'ব' যেন তাঁরই আপন ভাই। 'কিছুই রেখে যান নি! একেবারে কিছুই না! জানো ভানিয়া, আগেই কেমন আমার মনে হয়েছিল ওই হবে ওঁর পরিণতি। তুমি যখন ওঁর গুণ গাইতে, মনে আছে? সেই তখনই। কিছু রেখে যান নি,

বলাটা তো ভারি সহজ, হুঁম... খ্যাতি পেয়েছেন। বেশ, মানলাম না হয় সে খ্যাতি অমর। কিন্তু খ্যাতিতে তো আর পেট ভরে না। তোমার সম্পর্কেও আমার তখন থেকেই একটা অশুভ আশঙ্কা ছিল হে ভানিয়া। তোমায় প্রশংসা করতাম বটে, কিন্তু মনে একটা দুশ্চিন্তা ছিল। 'ব' তাহলে মারাই গেলেন? তা মারা যাবেন না তো কী! খাশা জীবন... খাশা জায়গা, চেয়ে দ্যাখো!'

হাতের একটা দ্রুত অনিচ্ছাকৃত ভঙ্গি করে উনি কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তাটার দিকে দেখালেন, স্যাঁতসেঁতে কুহেলীতে মিটমিটে বাতিগুলোয় সামান্য আলো। দেখালেন নোংরা বাড়িগুলোর দিকে, ফুটপাথের ভেজা চিকচিকে পাথরগুলোর দিকে, পথচারীদের রাগী রাগী, গোমড়া ভেজা ভেজা মূর্তিগুলোর দিকে, কালি ঢালা পিটার্সবুর্গ আকাশের গম্বুজ যা ঢেকে আছে সেই গোটা ছবিটার দিকে। ততক্ষণে আমরা স্কোয়ারের মধ্যে এসে পড়েছিলাম। অন্ধকারে আমাদের সামনে স্মৃতিস্তম্ভ, নিচে থেকে গ্যাসের শিখায় আলোকিত, আরো দূরে দাঁড়িয়ে আছে সেণ্ট ইসাক গির্জার বিপুল অন্ধকারাচ্ছন্ন পিণ্ড, আকাশের বিষণ্ণ পটে অস্পষ্ট ফুটে আছে।

'তুমি-না বলতে ভানিয়া, উনি ছিলেন ভালো লোক, উদারহৃদয়, দরদী, অনুভূতি আছে, প্রাণ আছে। কিন্তু দেখছ তো, সকলেই ও'রা ঐরকম, যত তোমার ভালোমানুষ, দরদীরা। পারেন শুধু অনাথের সংখ্যা বাড়াতে! হুঁম্... অমন করে মরতে বেশ খুশিই লেগেছিল তাঁর বোধ করি!.. উহ্! এখান থেকে কোথাও সরে পড়তে পারলে হত, এমন কি সাইবেরিয়াতেও... কী চাই খুকি?' ফুটপাথে একটি বাচ্চা মেয়েকে ভিক্ষে করতে দেখে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন উনি।

ছোটো, রোগা একটা মেয়ে, সাত-আটের বেশি বয়স নয়, পরনে নোংরা ন্যাতাকানি। মোজা না পরা ছোটো ছোটো পায়ে ছেঁড়া জুতো। হিহি করে কাঁপা ছোট্টো দেহটাকে সে যা দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করছিল সেটা বহুদিন ছোটো হয়ে যাওয়া একটা ক্ষুদে জামার জীর্ণ সংস্করণ। শীর্ণ, বিবর্ণ, অসুস্থ মুখখানা আমাদের দিকে ফেরানো; কোনো কথা না বলে ভয়ে ভয়ে মেয়েটা চেয়ে দেখছিল আমাদের দিকে, প্রত্যাখ্যানের কেমন একটা দীন আতঙ্ক নিয়ে বাড়িয়ে দিচ্ছিল কাঁপা কাঁপা হাত। ওকে দেখে ভয়ানক কেঁপে উঠলেন বৃদ্ধ। এমন দ্রুত ওর দিকে ফিরে দাঁড়ালেন যে মেয়েটা পর্যন্ত ভয় পেয়ে চমকে উঠে একপা পিছিয়ে গেল।

বৃদ্ধ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী ব্যাপার? কী চাই খুকি? এ্যাঁ? ভিক্ষে চাই? এই নে... এই যে!'

ব্যস্তসমস্ত হয়ে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে উনি পকেট হাতড়াতে লাগলেন। বার করে আনলেন দুটি কি তিনটি খুচরো রৌপ্য মুদ্রা। কিন্তু সেটা ও'র কাছে মনে হল খুবই কম। মানিব্যাগটা নিয়ে এক রুবলের একটা নোট বার করলেন তিনি — মানিব্যাগটায় ওই ছিল সম্বল, বাচ্চা ভিক্ষুকটির হাতে গুঁজে দিলেন।

'যীশু তোকে রক্ষা করুন খুকি... বাছা আমার। দেবদূতরা তোকে দেখুন!'

কাঁপা কাঁপা হাতে মেয়েটার শরীরের ওপর ক্রুশের চিহ্ন দিলেন উনি কয়েকবার। কিন্তু আমিও দাঁড়িয়ে আছি, ও'কে দেখছি, এটা চোখে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ভুরু কুঁচকে দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন।

বেশ খানিকটা দীর্ঘ ক্রুদ্ধ নীরবতার পর উনি শুরু করলেন, 'ও জিনিসটা আমি দেখতে পারি না ভানিয়া। নিরীহ ছোট্ট একটি জীব ঠাণ্ডায় কাঁপছে রাস্তায়... সব ঐ হতভাগা মা-বাপগুলোর জন্যে। তবে নিজে চরম একটা কষ্টের মধ্যে না পড়লে কোন মা-ই বা তার বাচ্চাকে অমন ভয়ানক একটা অবস্থায় পাঠাবে!.. খুবই সম্ভব বাড়িতে ও-মায়ের আরো ক'টি অনাথ কাচ্চাবাচ্চা আছে, এটাই হয়ত সবচেয়ে বড়ো; বুড়িটা নিজেই অসুস্থ... হুঁম! ওরা তো আর রাজাবাহাদুরদের ছেলেমেয়ে নয়! দুনিয়ায় অনেক ছেলেই আছে ভানিয়া... যারা রাজাবাহাদুরদের ছেলে নয়! হুঁম্!'

মুহূর্তের জন্যে যেন কী একটা অসুবিধা বোধ করে উনি থামলেন।

'মানে ভানিয়া, আন্না আন্দ্রেয়েভনাকে কথা দিয়েছিলাম,' একটু এলোমেলো ভাবে উনি শুরু করলেন, 'আমি কথা দিয়েছিলাম... মানে, আন্না আন্দ্রেয়েভনা আর আমি, দুজনেই ঠিক করেছিলাম ছোটো একটি অনাথ মেয়েকে নিয়ে মানুষ করব... মানে, কোনো একটি গরিব অনাথ মেয়ে আর কি। আমাদের সংসারে তাকে চিরকালের জন্যেই নিয়ে নেব, বুঝলে? নইলে আমরা বুড়োবুড়ি, একলা একলা ভারি একঘেয়ে লাগে। আন্না আন্দ্রেয়েভনা কেবল কেন জানি তাতে আপত্তি করতে শুরু করেছেন। ও'র সঙ্গে তুমি একটু কথা বলো, বলবে? মানে, আমার হয়ে নয়, বুঝলে, যেন তোমার নিজের পক্ষ থেকে... ওকে বুঝিয়ে রাজী করাও... বুঝলে? অনেক দিন ভাবছি তোমায় এ কথা বলব... ও'কে রাজী করাও। মানে, জানো, ও'কে বার বার বলাটা আমার পক্ষে খানিকটা অস্বস্তিকর... যাক গে, বাজে কথা যত! মেয়ে

একটা নিয়ে আমার আর কী হবে? কোনো দরকারই নেই; শুধু খানিকটা সান্ত্বনা আর কি... শিশুর একটা গলা শোনা যাবে এই আর কি... তবে সত্যি করেই তোমায় বলি, এটা করতে চাইছি আমার বুড়ির জন্যে, আমার সঙ্গে একা একা কাটাবার চেয়ে এতে ও'র খানিকটা মন ভালো থাকবে। কিন্তু ওসব বাজে কথা। শোনো বলি ভানিয়া, এতে অনেক দেরি হবে, একটা ছেকড়া গাড়ি নেওয়া যাক; অনেকটা পথ, নইলে আন্না আন্দ্রেয়েভনা আবার দুশ্চিন্তা করবেন...'

যখন ও'দের বাড়িতে পে'ৗছলাম তখন সাড়ে সাতটা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বুড়োবুড়ির মধ্যে ভালোবাসা ছিল খুবই। প্রেম এবং দীর্ঘকালের অভ্যাসে ও'রা চিরকালের মতো বাঁধা হয়ে গেছেন। অথচ নিকোলাই সের্গেয়িচ শুধু এখনই নয়, সবচেয়ে সুখের দিনগুলিতেও আন্না আন্দ্রেয়েভনার সঙ্গে আচরণে কেমন যেন অমিশুকের মতো থাকতেন, মাঝে মাঝে বিশেষ করে অন্য লোক উপস্থিত থাকলে তাঁকে এমন কি কঠোরও মনে হত। কিছু কিছু কোমল সংবেদনশীল স্বভাবের মানুষ আছেন, যাঁদের মধ্যে মাঝে মাঝে কেমন একটা একগু'য়েমি দেখা যায়, শুধু লোকের সামনে নয়, নিজেরা একা থাকলেও — একা থাকলেই বরং বেশি — তাঁরা আত্মপ্রকাশ করতে, নিজের প্রিয়তমের কাছেও মন খুলে ধরতে এক ধরনের শুচিশুদ্ধ অরুচি পোষণ করেন। বিরল এক একটা মুহূর্তেই শুধু তাঁদের ভালোবাসা বাঁধ ভেঙে বেরোয়, এবং সংযমটা যত দীর্ঘ হয় ততই উদগ্র আর উৎক্ষেপক হয়ে ওঠে এই উৎসার। আন্না আন্দ্রেয়েভনার সঙ্গে আচরণে ইখমেনেভ ছিলেন খানিকটা এই ধরনের লোক, এমন কি সেই গোড়ার দিন থেকে। আন্না আন্দ্রেয়েভনা নেহাৎ একজন ভালোমানুষ মহিলা ছাড়া বেশি কিছু নন — স্বামীকে ভালোবাসা ছাড়া আর কোনো গুণ তাঁর ছিল না। এ সত্ত্বেও কিন্তু ইখমেনেভ তাঁকে সম্মান করতেন, অসীম ভালোবাসতেন, এবং এই দেখে তাঁর অসহ্য বিরক্ত লাগত যে আন্না আন্দ্রেয়েভনা সরল মনে অসতর্কের মতো মাঝে মাঝে তাঁর মনটা বড়ো বেশি মেলে ধরছেন। নাতাশা চলে যাবার পর কিন্তু পরস্পরের প্রতি ও'রা কেমন করে যেন আরো নরম হয়ে ওঠেন, যন্ত্রণার সঙ্গে অনুভব করতেন যে দুনিয়ায় ও'রা এখন একা। নিকোলাই সের্গেয়িচ মাঝে মাঝে অসম্ভব

গোমড়া হয়ে উঠতেন বটে, কিন্তু দুজনেই মন কেমন না করে, বিনা কষ্টে ঘণ্টা দুয়েকও পরস্পর ছেড়ে থাকতে পারতেন না। এক ধরনের অনুক্ত চুক্তি হয়ে গিয়েছিল ওঁদের, নাতাশার সম্পর্কে কোনো কথা বলা হবে না, নাতাশা বলে কেউ যেন ছিলই না কখনো। স্বামীর উপস্থিতিতে স্পষ্ট করে নাতাশার কোনো ইঙ্গিত করতেও আন্না আন্দ্রেয়েভনা সাহস পেতেন না, যদিও সেটা ছিল তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। মনে মনে তিনি বহু আগেই নাতাশাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। আমি গেলেই তাঁর আদরের না-ভোলা মেয়েটির কিছু সংবাদ আনব, এ যেন একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমাদের ভেতরে।

দীর্ঘ দিন খবর না পেলেই বৃদ্ধা অসুস্থ হয়ে পড়তেন। খবর নিয়ে আমি এলেই উনি একেবারে অতি খুঁটিনাটিগুলি পর্যন্ত সব জানতে চাইতেন, কাঁপা কাঁপা ঔৎসুক্যে প্রশ্ন করে চলতেন। আমার দেওয়া খবরে তাঁর বুক হালকা হত। একবার নাতাশা অসুখে পড়েছিল শুনে তিনি ভয়েই মরেন, নিজেই দেখতে যান আর কি। কিন্তু সেটা হল এক চূড়ান্ত ঘটনা। প্রথম প্রথম তিনি আমার কাছেও মেয়েকে দেখবার ইচ্ছেটা প্রকাশ করে উঠতে পারতেন না। আমার কাছ থেকে সবটুকু খবর নিঙড়ে নেবার পর আলাপের শেষে প্রায় সর্বদাই তিনি কঠোরতার একটা ভান করা আবশ্যিক বলে মনে করতেন; বলতেন মেয়ের ভাগ্য সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল থাকলেও নাতাশা এমন অপরাধ করেছে যে তাকে ক্ষমা করা যায় না। কিন্তু এ ছিল শুধু তাঁর ভান। মাঝে মাঝে মন খারাপ করে ভেঙে পড়তেন তিনি, কাঁদতেন, আমার সামনে নাতাশার উল্লেখ করতেন যত আদরের নামে, নিকোলাই সের্গেয়িচের উদ্দেশে তিক্ত নালিশ জানাতেন, এবং তাঁর সামনেই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ইঙ্গিত করে বলতেন যে কোনো কোনো লোক বড়ো অহংকারী, পাষাণ হৃদয়, বলতেন আমরা অন্যায় ক্ষমা করতে পারি না, যে ক্ষমা করে না ভগবানও তাকে ক্ষমা করেন না। কিন্তু ওঁর সামনে এর বেশি আর তিনি এগুতেন না। এরকম মুহূর্তে বৃদ্ধ হঠাৎ খুব গোমড়া থমথমে হয়ে উঠতেন, বসে থাকতেন নিঃশব্দে, ভ্রূ কুঁচকে, নয়ত হঠাৎ, সাধারণত অতি বেখাপ্পার মতো উচ্চস্বরে অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতেন, কিংবা পালাতেন নিজের ঘরে, একা রেখে যেতেন আমাদের — আন্না আন্দ্রেয়েভনা যাতে আমার কাছে চোখের জলে বিলাপে তাঁর দুঃখ উজাড় করে দিতে পারেন, তার সুযোগ করে দিতেন। আমি এলেই তিনি সবসময়ই এই ভাবে নিজের ঘরে চলে যেতেন, মাঝে মাঝে ভদ্রতার সম্ভাষণটুকু কোনোক্রমে

সেরেই আন্না আন্দ্রেয়েভনার কাছে নাতাশার সর্বশেষ সংবাদ সবকিছু যাতে জানাতে পারি তার সময় দিতেন। এবারেও তিনি তাই করলেন।

ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন, 'একেবারে ভিজে গেছি, আমার ঘরে চললাম। আর ভানিয়া, তুমি এখানে থাকো। বাসা নিয়ে ও এমন ঝঞ্ঝাটে পড়েছে। ওঁকে ব্যাপারটা বলো না, আমি এখুনি আসছি...'

দ্রুত চলে গেলেন উনি, আমাদের দিকে একবারও তাকালেন না, যেন আমাদের দুজনকে একসঙ্গে রেখে যাচ্ছেন বলে উনি লজ্জিত। এই সব সময়, বিশেষ করে যখন ফিরতেন, তখন কড়া খিটখিটে হয়ে উঠতেন আমার আর আন্না আন্দ্রেয়েভনা দুজনের ওপরই, ভারি খুঁতখুঁত করতেন, যেন নিজের কোমলতায় নিজের ওপরেই ক্রুদ্ধ বিরক্ত হয়ে উঠেছেন।

কিছু দিন থেকে আমার সম্পর্কে কাঠিন্য আর দ্বিধা আন্না আন্দ্রেয়েভনার কেটে গিয়েছিল। বললেন, 'দেখেছ তো, আমার সম্পর্কে সবসময় উনি ঐরকম ব্যবহার করছেন। অথচ জানেন যে ওঁর ফিকির আমরা সবই টের পাচ্ছি। আমার কাছেও এমন ভান করে কী লাভ? আমি কি তাঁর পর? মেয়েটা সম্পর্কেও ওঁর ঐ এক ধরন। মেয়েটাকে ক্ষমা তো উনি করতেও পারেন, কী জানি হয়ত ক্ষমা করতেই চাইছেন। ঈশ্বর জানেন! রাত্রে কাঁদেন, আমি শুনেছি। কিন্তু বাইরে কড়া ভাব। অহঙ্কারে মরছেন... ইভান পেত্রোভিচ শিগ্‌গির করে বলো তো, কোথায় গিয়েছিলেন উনি?'

'নিকোলাই সের্গেয়িচ? জানি না তো। আমিই আপনাকে জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম।'

'যখন বেরিয়ে গেলেন, এত ভয় পেয়েছিলাম। জানো তো, অসুখ অথচ অত রাত্তিরে, আকাশের এই অবস্থায়। ভাবলাম, জরুরি কোনো কাজের জন্যেই নিশ্চয় বেরিয়েছেন, আর আমাদের ওই ব্যাপারটার চেয়ে জরুরি আর কীই বা হতে পারে? মনে মনেই ভাবি, কিন্তু জিজ্ঞেস করার আর সাহস হয় না। আজকাল তো কোনো কিছু সম্পর্কেই ওঁকে জিজ্ঞেস করতে সাহস পাই না। মাগো! ওঁর জন্যে আর ঐ মেয়েটার জন্যে আমি একেবারে ভয়ে কাঠ হয়ে ছিলাম। ভাবলাম, মেয়েটার কাছেই গেলেন? তাহলে ওকে ক্ষমা করবেন বলেই ঠিক করেছেন কি! উনি তো সবই জানেন, মেয়েটার একেবারে শেষ খবরটাও ওঁর জানা। আমার নিশ্চয় মনে হয় উনি জানেন অথচ কোত্থেকে খবর পান জানি না। গতকাল ভারি মন কেমন করেছে ওঁর, আজকেও। কিন্তু তুমি কিছু বলছ না যে? আর কী ঘটল মেয়েটার বলো না। তোমার জন্যে হাপিত্যেশ

করে আছি, যেন ভগবান তোমায় পাঠাচ্ছেন। পথ চেয়ে আছি তোমার জন্যে। বলো, বাছা! বদমাইশটা কি নাতাশাকে পরিত্যাগ করতে চাইছে?'

যা জানতাম আন্না আন্দ্রেয়েভনাকে তখনি সবই বললাম। তাঁর কাছ থেকে কখনো কিছু আমি চেপে রাখি নি। বললাম, অবস্থাটা সত্যিই নাতাশা আর আলিওশার মধ্যে যেন একটা ছাড়াছাড়ির দিকে গড়াচ্ছে। তাদের আগেকার মন-কষাকষির চেয়ে এবারকার ব্যাপারটা অনেক গুরুতর। আগের দিন নাতাশা আমায় একটা চিরকুট পাঠিয়ে আজ সন্ধ্যায় নয়টার সময় যেতে বলেছে। সেই জন্যে আজ সন্ধ্যায় এখানে আসার ইচ্ছে ছিল না। নিকোলাই সের্গেয়িচ স্বয়ং আমায় টেনে এনেছেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ব্যাখ্যা করে তাঁকে বললাম যে অবস্থাটা এখন মোটের ওপর সংকটজনক। আলিওশার বাপ এখানে ছিলেন না, ফিরেছেন দিন পনেরো আগে, কোনো কথাই তিনি শুনতে চান না, আলিওশাকে রেখেছেন কড়া শাসনে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা প্রস্তাবিত বিয়েটায় আলিওশা মনে হয় নিজেই বিশেষ অনিচ্ছুক নয়, শোনা যাচ্ছে, ওই মেয়েটির সঙ্গে ও নাকি প্রেমেই পড়েছে। বললাম, যতটা বুঝছি, নাতাশার চিরকুটটা খুবই তাড়াহুড়া করে লেখা। লিখেছিল আজ রাত্রেই যা হবার সব হয়ে যাবে, কিন্তু কী যে হবে তা বুঝছি না। এটাও খুব আশ্চর্য যে লিখেছে গতকাল অথচ আসতে বলছে আজকে। সময়ও ঠিক করে দিয়েছে — নয়টা। সুতরাং আমায় যেতেই হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

'যাও বাপু, যাও, নিশ্চয় যাবে,' শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন বৃদ্ধা। 'উনি ফিরলে এক কাপ চা খেয়েই চলে যাবে... যাহ্! সামোভারটা আনে নি দেখছি! মাত্রিওনা, সামোভারের কী হল! মেয়েটা রাক্ষসী, আমাদের এই ঝিটা... তা চা-টা খেয়েই একটা ভালোমতো অজুহাত দিয়ে চলে যাও। আর কাল অবিশ্যি-অবিশ্যি আসবে আমার কাছে, সবকিছু বলবে। আর যত তাড়াতাড়ি করে পারো এসো। মাগো! আবার একটা সর্বনাশ কিছু হল নাকি! এখনকার চেয়ে খারাপ আর কীবা হবে? নিকোলাই সের্গেয়িচ কিন্তু সবই জানেন, আমার মন বলছে উনি জানেন। মাত্রিওনার কাছ থেকে অনেক কিছু তো আমি শুনি, ও শোনে আগাশার কাছ থেকে, আগাশা হল গে মারিয়া ভাসিলিয়েভনার ধর্ম-মেয়ে — মারিয়া ভাসিলিয়েভনা থাকে প্রিন্সের বাড়িতে... কিন্তু ও সব তো তুমি জানোই। নিকোলাই সের্গেয়িচ আবার আজ ভারি চটে ছিলেন। আমি ওঁকে নানা ভাবে শান্ত করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমায় একেবারে ধমকে দিলেন। তারপর আবার মায়া হল, বললেন, টাকার টানাটানি যাচ্ছে। যেন টাকার জন্যে

চেঁচামেচি করার মতো লোক উনি। খাবারের পর উনি একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলেন। দরজার ফুটো দিয়ে আমি উঁকি দিয়ে দেখলাম একবার (দরজায় যে একটা ফুটো আছে উনি জানেন না)। দেখি হা ভগবান, চুপি চুপি হাঁটু গেড়ে উনি আইকনগুলোর সামনে প্রার্থনা করছেন। দেখেই আর পায়ের ওপর খাড়া থাকতেও পারছিলাম না। ঘুমোলেন না উনি, চাও খেলেন না, টুপিটি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। চারটে বাজার পর বেরিয়েছিলেন। কিছু জিজ্ঞেস করার আর সাহস হয় নি, আমার ওপর ধমকে উঠতেন। আজকাল উনি চেঁচামেচি করতে শুরু করেছেন ঘন ঘন — মাত্রিওনার ওপরেই বেশি, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার ওপরেও। আর ধমক দিলেই আমার পাদুটো যেন একেবারে অসাড় হয়ে আসে, বুক হিম হয়ে যায়। নেহাতেই খামখেয়ালীপনা তা জানি, তবু ভয় লাগে তো। উনি চলে যাবার পর পুরো একঘণ্টা ধরে আমি প্রার্থনা করলাম, যাতে ভগবান ওঁকে সুমতি দেন। মেয়েটার চিরকুটটা কই, দেখি তো!'

দেখালাম চিরকুটটা। জানতাম, আন্না আন্দ্রেয়েভনার একটা গোপন স্বপ্ন ছিল, যে-আলিওশাকে তিনি কখনো বলতেন বদমাইশ, কখনো নির্বোধ হৃদয়হীন ছেলে, সেই আলিওশা পরিশেষে নাতাশাকে বিয়ে করবে, আলিওশার বাপ, প্রিন্স পিয়তর আলেক্সান্দ্রভিচ তাতে সায় দেবেন। কথাটা তিনি আমার সামনেও ফাঁস করেছেন, যদিও অন্যসময় আবার সেজন্যে আফসোস করেছেন, ঘুরিয়ে নিয়েছেন কথাটা। কিন্তু নিকোলাই সের্গেয়িচের উপস্থিতিতে এ আশা প্রকাশ করার সাহস তাঁর কখনো হয় নি, যদিও তিনি জানতেন যে স্বামী তা সন্দেহ করেন, এমন কি একাধিকবার তাঁকে সেজন্যে অপ্রত্যক্ষভাবে তিরস্কারও করেছেন। এ বিয়ের সম্ভাবনার কথা জানতে পারলে তিনি নাতাশাকে অভিশাপ দিয়ে মন থেকে চিরকালের জন্যেই উপড়ে ফেলে দিতেন বলেই আমার বিশ্বাস।

তখন আমরা সবাই তাই ভাবতাম। মেয়ের জন্যে সর্বান্তঃকরণে তিনি অপেক্ষা করে ছিলেন, কিন্তু সে শুধু একলা নাতাশার জন্যেই, যে নাতাশা অনুতাপ করছে, আলিওশার সব স্মৃতি তার হৃদয় থেকে নিঃশেষে মুছে দিতে পেরেছে। ক্ষমার এই ছিল একমাত্র শর্ত; কথায় তা কখনো প্রকাশ না পেলেও ওঁর দিকে চাইলেই তা বোঝা যেত নিঃসন্দেহে।

আন্না আন্দ্রেয়েভনা ফের শুরু করলেন, 'মেরুদণ্ড নেই ওর, মেরুদণ্ডহীন ছেলে, কোনো মেরুদণ্ড নেই, পাষাণহৃদয়, বরাবরই তো আমি তাই বলে আসছি। মানুষ করতে পারে নি ওকে, বেড়ে উঠেছে একেবারে অকালকুষ্মাণ্ডের

মতো। মেয়েটার অত ভালোবাসা, তাকে কিনা ত্যাগ করতে চলেছে। হায় ভগবান, বেচারা নাতাশা! কী হবে ওর? নতুন মেয়েটার মধ্যে কী পেল ও তাই ভাবি।'

বললাম, 'আমি শুনেছি আন্না আন্দ্রেয়েভনা, মেয়েটি অপরূপ, নাতাশাও তাই বলে...'

বুড়ি বাধা দিয়ে বললেন, 'বাজে কথা! অপরূপ বৈকি! স্কার্ট ঝোলালেই তোমরা লেখকেরা সবাইকে ভাবো অপরূপ। নাতাশা ভালো বলে থাকলে সে বলেছে শুধু তার বড়ো মন বলে। আলিওশাকে কী করে ধরে রাখতে হয় মেয়ে তা জানে না, ওর সব কিছু ক্ষমা করে বসে আর যন্ত্রণায় মরে নিজে। কতবারই তো ও ওকে ঠকাল! নিষ্ঠুর বদমাইশ সব! ভয়ে মরি ইভান পেত্রোভিচ। অহঙ্কারে সব একেবারে ক্ষেপে আছে। উনি যদি একটু নরম হয়ে বাছাকে আমার ক্ষমা করে বাড়ি নিয়ে আসতেন! মেয়েটাকে আমি বুকে জড়িয়ে ধরে কেবল চেয়ে চেয়ে দেখতাম! রোগা হয়ে নাকি?'

'হ্যাঁ, রোগা হয়ে গেছে আন্না আন্দ্রেয়েভনা।'

'বাছারে! কী যে বিপদ আমার ইভান পেত্রোভিচ! সারা রাত আর সারা দিন আজ কেঁদেছি... কেন?.. পরে তোমায় বলব। কতবার আমি থতোমতো খেয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলবার চেষ্টা করেছি মেয়েটাকে যেন ক্ষমা করেন। সোজাসুজি তো বলতে পারি না, তাই ঘুর পথে ইশারা-ইঙ্গিত করে বলতে হয়। বুক আমার হিম হয়ে আসে ভারি, এই বুঝি চটে উঠে মেয়েটাকে একেবারেই অভিশাপ দিয়ে বসেন! অভিশাপ তো ওঁর মুখে এখনো শুনি নি... তাই আমার ভয়, মেয়েকে শাপ যেন না দেন। কী যে হবে তাহলে? বাপ যদি সন্তানকে অভিশাপ দেয়, তাহলে ভগবান যে শাস্তি দেবেনই। প্রতিটি দিন তাই আমার কাটছে আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে। আর তোমারও লজ্জা হওয়া উচিত, ইভান পেত্রোভিচ, — আমাদের সংসারে বেড়ে উঠেছ, দুজনেই আমরা তোমায় ছেলের মতো দেখি, আর তোমারও কিনা মাথায় ঢুকেছে, অপরূপ! কিন্তু ওই তো ওদের মারিয়া ভাসিলিয়েভনা, সেই বরং বলেছে ভালো। (একটা অপরাধ করেছি আমি, আমার উনি যখন একদিন সারা সকালটা কাজে বেরিয়েছিলেন তখন কফি খেতে ডেকে পাঠাই তাকে।) ঘটনাটার আগাগোড়া সে আমায় খুলে বলেছে। আলিওশার বাপ, ঐ প্রিন্সের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল এই কাউণ্টেসের। লোকে বলে, প্রিন্স তাকে বিয়ে করছে না বলে কাউণ্টেস অনেক দিন থেকেই অনুযোগ করছে, কিন্তু প্রিন্স এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে।

স্বামী বেঁচে থাকতেও এই কাউণ্টেসটির কেলেঙ্কারির কুখ্যাতি ছিল। স্বামী মারা যাবার পর ও চলে যায় বিদেশে। যত সব ফরাসী আর ইতালিয়ান ঘিরে থাকত ওকে, ব্যারন-ফ্যারন গোছের কীসব লোক জুটিয়েছিল, ওইখানেই পাকড়াও করে প্রিন্স পিয়তর আলেক্সান্দ্রভিচকেও। ওদিকে ওর সৎমেয়ে, ঠিকাদার প্রথম স্বামীর মেয়েটি বড়ো হয়ে উঠছিল। কাউণ্টেসের যা ছিল সবই সে উড়িয়ে দিয়েছিল অথচ সৎমেয়েটি বেড়ে উঠছে আর বাপ তার নামে যে বিশ লাখ টাকা রেখে গিয়েছিল সেটাও সুদে বেড়েছে। লোকে বলে, এখন সেটা দাঁড়িয়েছে তিরিশ লাখে। প্রিন্সের মাথায় খেলল, আলিওশার সঙ্গে বিয়ে দিলে হয়। (তুখোড় লোক, দাঁও ফসকাতে দেবে না!) এখন কাউণ্ট, মনে আছে, ওদের সেই আত্মীয়, হোমরাচোমরা লোক, দরবারে যাঁর ভারি প্রতিপত্তি, তিনিও সম্মতি দিয়েছেন — তিরিশ লাখ তো আর ঠাট্টার ব্যাপার নয়। বলেছেন, "বেশ তো, কাউণ্টেসের সঙ্গে কথা কয়ে ঠিক করে ফেলুন।" প্রিন্স তাই কাউণ্টেসকে তার অভিপ্রায়টি জ্ঞাপন করলে। কাউণ্টেস অমনি চালালে একেবারে লাথি ঘুষি। নীতির বালাই নেই তো ওর। লোকে বলে, একেবারে খাঁটি উগ্রচণ্ডী! শুনছি এখানে অনেকে নাকি ওকে আর সমাজে ডাকছে না — বিদেশের মতো ব্যাপার আর নয়। কাউণ্টেস বলছে, "না, তুমি নিজে আমায় বিয়ে করো প্রিন্স। আর আলিওশার সঙ্গে আমার সৎমেয়ের বিয়ে — সে প্রশ্নই ওঠে না!" লোকে বলে, কনেটি নাকি সৎমা বলতে অন্ধ। একেবারে পুজো করে বললেই হয়, যা বলে তাই শোনে। লোকে বলে, মেয়েটি খুব শান্তশিষ্ট, একেবারে দেবীর মতো! প্রিন্স বুঝল ব্যাপারখানা। কাউণ্টেসকে বললে, "ভাবনা কোরো না। তোমার সব টাকা তো উড়িয়েছ, দেনা যা চেপেছে তা আর শোধ দিতে পারবে না। কিন্তু তোমার সৎমেয়ে আলিওশাকে বিয়ে করলে তোমার নিরীহটি আর আমার বোকাটি মিলে মানিকজোড় হবে। ওদের দায়িত্ব নিয়ে দুজনে একত্রে আমরা অভিভাবক হয়ে দাঁড়াব। তখন ঢের টাকা থাকবে তোমারও হাতে। আমায় বিয়ে করে কী লাভ তোমার?" ধড়িবাজ লোক! একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা। তা ছয়মাস আগেও কাউণ্টেস মন ঠিক করতে পারে নি, তারপরে ওরা নাকি দুজনে গিয়েছিল ওয়ারসয়, সেখানে একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছে। এই তো আমি শুনেছি। মারিয়া ভাসিলিয়েভনা আমায় সব বলেছে, ভেতরকার সব কথা। ভালো লোকের কাছ থেকে সে এসব শুনেছে। দেখছ তো, এ সবই হল টাকার ব্যাপার, লাখ লাখের ব্যাপার — অপরূপ-টপরূপ কিছু নয়!'

আন্না আন্দ্রেয়েভনার গল্পটা আমায় অবাক করল। আলিওশার কাছ থেকে আমি নিজেও সম্প্রতি যা শুনেছিলাম তার সঙ্গে এটা খুবেই মিলে যায়। এই সব বলার সময় বেশ একটা বুক চিতিয়ে সে ঘোষণা করে যে, টাকার জন্যে সে কখনোই বিয়ে করবে না। কিন্তু কাতেরিনা ফিওদরোভনাকে দেখে ও অভিভূত, আকৃষ্ট। আলিওশার কাছ থেকে এও শুনেছি তার বাবাও বিয়ের কথা ভাবছেন, যদিও পাছে আগেই কাউণ্টেসকে চটিয়ে দেন এই ভয়ে তার সমস্ত গুজব তিনি অস্বীকার করছেন। আগেই বলেছি, আলিওশা বাপের ভারি ভক্ত, ভারি মুগ্ধ, বাপের কথা নিয়ে বড়াই করত, দেবতার মতো বিশ্বাস করত বাপকে।

'খুব একটা উ'চু কুলেও ওর জন্ম নয়, তোমার ঐ অপরূপেটার!' কুমার বাহাদুরের ভাবী বধূ সম্পর্কে আমার প্রশংসায় ভারি রাগ করে আন্না আন্দ্রেয়েভনা বলে চললেন। 'নাতাশাকে ওর সঙ্গে ঢের বেশি মানাবে। ও তো এক ঠিকাদারের বেটি, আর নাতাশা হল ভালো বনেদী বংশের মেয়ে। কাল বুদ্ধ তো আমার (বলতে ভুলে গিয়েছিলাম) সিন্দুকটা খুলেছিলেন, — ওই যে যেটা লোহা বাঁধানো — আমার সামনে বসে বসে সারা সন্ধ্যেটা আমাদের বংশের সব পুরনো কাগজপত্র বাছাই করছিলেন। কী গম্ভীর দেখাচ্ছিল তাঁকে। বসে বসে আমি মোজা বুনছিলাম, ও'র দিকে চাই নি, ভয় হচ্ছিল। উনি দেখলেন আমি চুপ করে আছি, তখন চটে গিয়ে নিজেই ডাকলেন আমায়, সারা সন্ধ্যেটা আমাদের বংশের কাহিনী শোনাতে লাগলেন। আর, কী জানো, 'রুদ্র' ইভানের আমলেও ইখমেনেভরা ছিল জায়গীরদার, আর আমাদের বংশ শুমিলভদের নাম ছিল আলেক্সেই মিখাইলভিচের সময়েও। সেসব দলিলপত্রও আমাদের আছে, কারামজিনের ইতিহাসেও তা লেখা আছে। বুঝলে বাপু, এদিক থেকে আমরা কারো চেয়ে ছোটো নই। উনি এসব কথা শুরু করতেই টের পেলাম কী ও'র মনে রয়েছে। মানে, নাতাশাকে তুচ্ছ করা হচ্ছে দেখে ও'রও মনে লেগেছে। শুধু টাকার জোরে ওরা উঠে গেছে আমাদের ওপরে। বেশ, পিয়তর আলেক্সান্দ্রভিচের, ওই ডাকাতটার যদি টাকার খাঁই থাকে তো থাক, সকলেই জানে লোভী, পাষণ্ড। লোকে বলে, ওয়ারসয় থাকায় সময় নাকি গোপনে জেসুইট-দের* দলে নাম লিখিয়েছে। সত্যি নাকি রে?'

---

* জেসুইট — সন্ন্যাসী, ক্যাথলিক ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত (যিশু সমাজ)। এদের লক্ষ্য হল যাজকতন্ত্রের প্রচার ও স্থাপনা। নিজ লক্ষ্য সাধনে এরা কোনো কিছুতেই পিছপা

বললাম, 'ও একটা বাজে গুজব।' যদিও এ গুজবটা কেন যে অমন জোর ছড়াচ্ছে, তা নিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা কৌতূহল ছিল। কিন্তু নিকোলাই সের্গেয়িচ বংশধারা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখছিলেন, এ খবরটা আশ্চর্য। কুল নিয়ে উনি এর আগে কখনো গর্ব করেন নি।

আন্না আন্দ্রেয়েভনা বলে চললেন, 'সবাই ওরা হল গে বদমাইশ, পাষণ্ড! যাক গে, তা আমার মেয়েটা কি দুঃখ করছে, কাঁদছে? ইস্, ওর কাছে তোমার যাবার তো দেখি সময় হয়ে এল! মাত্রিওনা, মাত্রিওনা! ভারি পাজি মাগীটা! ওরা ওকে অপমান করে নি তো? বলো না ভানিয়া।'

কী জবাব দেব। বৃদ্ধা কেঁদে ফেললেন। জিজ্ঞেস করলাম, নতুন আবার কী বিপদ হয়েছে, যা নিয়ে উনি কিছু আগে আমায় বলতে যাচ্ছিলেন।

'কী বলব বাপু, বিপদ যেন কাটে না, দেখছি গেরোর আর শেষ নেই! মনে আছে বাপু, হয়ত তোমার মনে নেই, ছোট্টো একটা সোনার লকেট ছিল আমার — একটা স্মৃতি আর কি, আতে নাতাশার ছেলেবেলার একটা ছবি বাঁধানো। তখন ওর আট বছর বয়েস, ছোট্টো সোনাটি আমার। ভ্রাম্যমাণ এক শিল্পীকে দিয়ে তখন জিনিসটা করিয়েছিলাম। নাঃ, তুমি সব ভুলে গেছ দেখছি! লোকটা বেশ ভালো শিল্পী — ওকে এঁকেছিল কিউপিডের মূর্তিতে! সে সময় এমন হালকা রঙের চুল ছিল ওর, কোঁকড়া কোঁকড়া। ওকে এঁকেছিল যেন একটা মসলিনের শেমিজ গায়ে, তার ভেতর থেকে ছোট্ট শরীরটুকু ওর সব দেখা যেত আর এমন সুন্দর হয়েছিল ছবিটা যে চোখ ফেরানো যেত না। শিল্পীকে বলেছিলাম ছোট্ট দুটি পাখাও লাগিয়ে দিতে, কিন্তু কিছুতেই ও রাজী হল না। তা এখন হয়েছে কি জানো, আমাদের এই সব বিপদ-আপদের পর ঝাঁপি থেকে জিনিসটা বার করে আমি রশি বেঁধে গলায় দিয়েছিলাম, তখন থেকে ওটা আমার ক্রুশের সঙ্গে পরে আসছি যদিও ভয়ে মরতাম এই বুঝি স্বামীর চোখে পড়ল। জানো তো, সে সময় উনি হুকুম দিয়েছিলেন মেয়েটার যত কিছু জিনিস সব ছুড়ে ফেলতে নয়ত পুড়িয়ে দিতে, কিছুতেই যেন ওর কথা মনে না পড়ে। কিন্তু আমার জন্যে ওর ছবিটা অন্তত থাক, মাঝে মাঝে তা দেখে আমি কাঁদি, একটু মন হালকা হয়। মাঝে মাঝে একলা থাকলে ছবিটায় চুমু খাই, মনে হয় সত্যি করে ওকেই বুঝি চুমু দিচ্ছি। আদর করে ছবিটাকে ডাকি, রোজ রাত্রে ক্রুশের চিহ্ন দিই

হত না, এইজন্যে লোকের কাছে জেসুইট বলতে মিথ্যাচারী দুমুখো ব্যক্তি বোঝাত। — সম্পাঃ

তার ওপর। একলা থাকলে আপন মনে কথা কই ছবিটার সঙ্গে। কোনো একটা কথা শুধোই, মনে হয় যেন ছবিটা সত্যিই জবাব দিল, তারপর আর একটা কিছু জিজ্ঞেস করি। কী বলব ভানিয়া, বলতে গেলে মন খারাপ হয়ে যায়! তা, আমি তো এই ভেবে খুশি আছি যে উনি লকেটটার কথা কিছু জানেন না, চোখে পড়ে নি ওঁর। কিন্তু কাল সকাল থেকে লকেটটা আর পাচ্ছি না। রশিটা লটপট করছে। নিশ্চয় ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছিঁড়ে পড়ে গেছে। একেবারে বজ্রাহত হয়ে গেলাম। তন্নতন্ন করে সবখানে খুঁজে দেখলাম, কোনো হদিশ নেই। একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে! কিন্তু পড়বে কোথায়? ভাবলাম হয়ত বিছানায় পড়ে আছে, সব ওলটপালট করে দেখলাম। না, কোথাও নেই! গলা থেকে খসে পড়ে গিয়ে থাকলে নিশ্চয় কেউ তা কুড়িয়ে পেয়েছে। কিন্তু উনিই কি মাত্রিওনা ছাড়া কে আর তা পাবে? কিন্তু মাত্রিওনার কথা তো ওঠেই না, সে আমার ভারি বিশ্বাসী... (মাত্রিওনা, সামোভারটা আনবে কি আনবে না?) ভাবছি, উনি যদি পেয়ে থাকেন তাহলে কী হবে! বসে বসে হায় হায় করছি, কেবলি কাঁদছি, চোখের জল আর বাধ মানছে না। নিকোলাই সের্গেয়িচও ওদিকে যেন ভারি নরম হয়ে উঠেছেন আমার ওপর, আমায় দেখে কষ্ট পান, যেন জানেন কেন কাঁদছি, আমার জন্যে দুঃখ পান। তাই ভাবছি, জানলেন কী করে? হয়ত সত্যিই লকেটটা পেয়ে উনি জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন নি তো। রাগের মাথায় উনি তা করেও বসতে পারেন, জানো তো? ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন বলে এখন নিজেরই কষ্ট হচ্ছে, আফসোস করছেন। মাত্রিওনার সঙ্গে গিয়ে জানলার নিচেটা আমি দেখে এসেছিলাম: কিছু নেই। একেবারে হাওয়া। সারা রাত ধরে আমি কেঁদেছি। রাতে ওকে ক্রুশ করা হল না এই প্রথম। খুব খারাপ ইভান পেত্রোভিচ, খুব খারাপ লক্ষণ। সর্বনাশের লক্ষণ। দুদিন থেকে কেঁদে ভাসাচ্ছি। তোমার জন্যে অপেক্ষা করে ছিলাম বাপু, দেবতা তোমায় পাঠিয়েছেন, বুকটা কেবল একটু হালকা করে নেব বলে...'

ভারি কাঁদতে লাগলেন বৃদ্ধা।

'ও হো, তোমায় বলতে ভুলে গিয়েছিলাম,' যেন মনে পড়াতে খুশি হয়েছেন এই ভাবে হঠাৎ শুরু করলেন আবার, 'উনি তোমায় অনাথ মেয়ের কথা কিছু বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ, বলেছিলেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা। বলেছিলেন, আপনারা দুজনেই কথাটা ভেবেছেন, ঠিক করেছেন একটা অনাথ গরিব মেয়েকে নিয়ে পালন করবেন। সত্যি নাকি?'

'মোটেই ভাবি নি বাপু, মোটেই ভাবি নি। অনাথ মেয়ের আমার কোনো দরকার নেই। তাতে আমাদের পোড়া কপাল, আমাদের দুর্ভাগ্যের কথাই আরো বেশি মনে পড়বে। নাতাশা ছাড়া আর কাউকে আমি চাই না। মেয়ে আমাদের একটি, সেই একটিই থাকবে। কিন্তু এই অনাথ মেয়ের কথাটা ওঁর মাথায় এল কেন বাপু? কী মনে হয় তোমার বলো তো ইভান পেত্রোভিচ? কাঁদছি তাই আমায় সান্ত্বনা দেবার জন্যে, নাকি নিজের মেয়েকে মন থেকে একেবারেই দূর করে দিয়ে অন্য একটাতে মন বসাবেন বলে? রাস্তায় উনি কী বলছিলেন আমার সম্পর্কে? কী রকম দেখলে ওঁকে, কড়া, রাগী? শ্‌শ! উনি এসে পড়েছেন! থাক, পরে হবে বাপু, পরে... কাল আসতে ভুলো না...'

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধ এসে আমাদের দিকে তাকালেন উৎসুক দৃষ্টিতে। তারপর কিসের জন্যে যেন লজ্জিত বোধ করে, ভুরু কুঁচকে টেবিলে গিয়ে বসলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, 'সামোভার কই? এখনো পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারল না?'

ব্যস্তসমস্ত হয়ে আন্না আন্দ্রেয়েভনা বললেন, 'আনছে গো, আনছে। এই তো এসে গেছে!'

নিকোলাই সের্গেয়িচকে দেখা মাত্র মাত্রিওনা সামোভার নিয়ে হাজির হল, যেন এতক্ষণ সে অপেক্ষা করছিল ওঁর আসার জন্যেই। মেয়েটা বাড়ির পুরোনো পরীক্ষিত বিশ্বাসী দাসী, কিন্তু দুনিয়ার সব দাসীর মধ্যে সবচেয়ে জেদী আর মুখরা, চরিত্রটা একরোখা, একগুঁয়ে। নিকোলাই সের্গেয়িচকে ও ভয় পেত, ওঁর সামনে মুখ বুজে চলত, কিন্তু তার শোধ নিত আন্না আন্দ্রেয়েভনার ওপর। প্রতি পদে রুক্ষ ব্যবহার করত তাঁর সঙ্গে, প্রভুপত্নীর ওপর প্রভুত্বের একটা পরিষ্কার ঝোঁক ছিল তার, অথচ তাঁর এবং নাতাশার জন্যে তার ভালোবাসা ছিল আন্তরিক এবং অকপট। ইখমেনেভ্‌কার সেই দিনগুলো থেকেই আমি মাত্রিওনাকে জানি।

বৃদ্ধ চাপা গলায় বিড়বিড় করলেন, 'হুঁম্‌... ভিজে যাওয়াটা আনন্দের কিছু নয়, আর ওরা একটু চাও দিতে পারছে না।'

সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে চোখের ইশারা করলেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা। এই সব রহস্যময় চোখ টেপাটেপি উনি সহ্য করতে পারতেন না; এবং এই

মুহূর্তে আমাদের দিকে না চাইবার চেষ্টা করলেও মুখ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল. ওঁর সম্পর্কে আন্না আন্দ্রেয়েভনা যে এই মাত্র একটা ইঙ্গিত করেছেন, তা উনি বেশ টের পেয়েছেন।

'আমার মামলাটার ব্যাপারে গিয়েছিলাম ভানিয়া,' হঠাৎ বলতে শুরু করলেন উনি, 'এমন হতচ্ছাড়া একটা ঝামেলা। তোমায় বলেছি কি? পুরোপুরি আমার বিপক্ষেই গড়াচ্ছে।' মানে, প্রমাণ নেই। দরকারী দলিলপত্র আমার হাতে নেই, কাগজগুলো দেখা যাচ্ছে অসিদ্ধ... হুঁম্...'

প্রিন্সের সঙ্গে ওঁর মামলাটার কথা বলছিলেন উনি। মামলাটা তখনো গড়িয়ে চলেছে, নিকোলাই সের্গেয়িচের পক্ষে জিনিসটা গেছে এখন খারাপের দিকে।

আমি চুপ করে রইলাম। কী জবাব দেব, জানি না। সন্দিগ্ধভাবে উনি আমার দিকে চাইলেন।

'বেশ!' যেন আমাদের নীরবতায় বিরক্ত হয়েই হঠাৎ বলে উঠলেন উনি, 'যত তাড়াতাড়ি চোকে ততই ভালো! আমায় টাকাটা পরিশোধ করে দিতে হবে এই রায়ও যদি দেয়, তাহলেও তো আর আমি বদমাইশ বনে যাচ্ছি না। বিবেক আমার ঠিক আছে, যা খুশি রায় দিতে চায় দিক। মামলাটা তো অন্তত চুকবে; নিষ্পত্তি করে দেবে... সর্বনাশ করবে আমার... যাক গে, সব চুলোয় দিয়ে সাইবেরিয়ায় চলে যাব।'

'মাগো! যাবার মতো জায়গা বটে! তা অতো দূরে কেন?' আন্না আন্দ্রেয়েভনা না বলে পারলেন না।

'এটাই বা কোন কাছে?' রূঢ়ভাবে জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ, মনে হল আপত্তিতে যেন উনি খুশিই হয়েছেন।

'মানে, যতই হোক... লোকজনের কাছে তো...' সকাতরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা।

'কোন লোকজনের কাছে?' উত্তেজিত দৃষ্টিটা আমার ওপর থেকে স্ত্রীর দিকে এবং ফের সেখান থেকে আমার দিকে ফিরিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন উনি, 'কোন লোকজন? ডাকাত, নিন্দুক, বেইমান? অমন লোক সবখানেই আছে ঢের; ভাবনা নেই, সাইবেরিয়াতেও পাওয়া যাবে। তবে তুমি যদি আমার সঙ্গে আসতে না চাও তো এখানে থাকতে পারো। জোর করে নিয়ে যাব না।'

বেচারী আন্না আন্দ্রেয়েভনা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'নিকোলাই সের্গেয়িচ, কী

বলছ! তুমি ছাড়া কার কাছে আমি থাকব! সারা দুনিয়ায় তুমি ছাড়া আমার কেউ যে...'

থতমত খেয়ে থেমে গেলেন, ভীত দৃষ্টিতে চাইলেন আমার দিকে, যেন সাহায্য আর সমর্থন চান। বৃদ্ধের তখন মেজাজ খারাপ, সবকিছুতেই খিটখিটে; ওঁর প্রতিবাদ করা তখন চলে না।

বললাম, 'মানে, আন্না আন্দ্রেয়েভনা, যা ভাবছেন সাইবেরিয়াটা তত খারাপ নয়। সত্যিই যদি খারাপটাই ঘটে, ইখমেনেভ্‌কা যদি আপনাদের বিক্রি করে দিতে হয়, তাহলে নিকোলাই সের্গেয়িচের প্রস্তাবটা খুব ভালোই হবে। সাইবেরিয়ায় উনি একটা ভালোমতো বেসরকারী চাকরি পেতে পারেন, এবং তাহলে...'

'যাক, তুমি অন্তত একটু বুদ্ধিমানের মতো কথা বললে ভানিয়া। ওই তো আমি ভেবেছি, সবকিছু চুলোয় দিয়ে চলে যাব।'

'কী বলছ বাপু!' হতাশার ভঙ্গি করে আন্না আন্দ্রেয়েভনা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আর তুমিও আচ্ছা ভানিয়া! তোমার কাছ থেকে এ আমি কখনো আশা করি নি... আমাদের কাছ থেকে কেবল স্নেহই পেয়ে এসেছ তুমি আর এখন...'

'হা-হা-হা! তা ছাড়া আর কী আশা করো তুমি? কী করে এখানে চলবে সেটা ভেবে দেখো! টাকা তো নিঃশেষ, শেষ কড়িটায় এসে ঠেকেছি। রাজাবাহাদুর পিয়তর আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষে করতে বলবে নাকি?'

প্রিন্সের নাম শুনে আন্না আন্দ্রেয়েভনা ভয়ে কেঁপে উঠলেন। হাতের চামচটা ডিশে লেগে ঠং ঠং করে উঠল।

'না, সত্যি,' একগুঁয়ে আক্রোশের আনন্দে নিজেকে উত্তেজিত করে তুলে ইখমেনেভ বলে চললেন, 'তুমি কী বলো ভানিয়া? হয়ত সত্যি ওঁর কাছেই যাওয়া আমার উচিত, সাইবেরিয়া গিয়ে কী হবে বরং কাল পোশাক-টোশাক চাপিয়ে, চুল আঁচড়ে, পাট করে নেব। আন্না আন্দ্রেয়েভনা আমায় নতুন একটা শার্ট-ফ্রণ্ট কড়া মাড় দিয়ে ইস্ত্রি করে দেবেন (ওটা ছাড়া অমন এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া তো চলে না!), প্রমাণসই নতুন একজোড়া দস্তানাও কিনে নেব, তারপর ধর্না দেব হুজুরের কাছে। "হুজুর, বাপুজী, অন্নদাতা, হুজুর আমাদের পিতৃতুল্য! ক্ষমা করুন, দয়া করুন! ভাতে মারবেন না, বউ আছে, ছেলেমেয়ে আছে আমার!.." তাই না, আন্না আন্দ্রেয়েভনা? তাই কি চাও?'

'মাগো... কিছুই আমি চাই না। এমনি একটা কথা বলেছিলাম। ঘাট হয়ে থাকলে মাপ করো, শুধু চেঁচিয়ো না।' ভয়ে ক্রমেই আরো কাঁপতে কাঁপতে বললেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হতভাগিনী স্ত্রীর আতঙ্ক আর অশ্রুজল দেখে এই মুহূর্তে ওঁর বুক নিশ্চয় টাটিয়ে উঠেছিল, যন্ত্রণায় মোচড়াচ্ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, স্ত্রীর চেয়ে ওঁরই কষ্ট হচ্ছিল বেশি। কিন্তু নিজেকে সংযত করতে পারছিলেন না উনি। অতি সহৃদয় কিন্তু স্নায়বিক লোকের বেলায় এরকম মাঝে মাঝে হয়। সহৃদয়তা সত্ত্বেও নিজেরই শোকে ও ক্রোধে মেতে ওঠে আত্মতৃপ্তিতে, অন্য একজন নিরপরাধ এবং প্রায়শ সর্বদাই তারই একান্ত আপনজনকে আঘাত দিয়েও যে করেই হোক ফেটে পড়তে চায়। যেমন, দুঃখ কি আঘাত না থাকলেও মেয়েরা মাঝে মাঝে নিজেদের দুঃখিনী বা আহতা বলে ভাবার তাগিদ অনুভব করে। এদিক দিয়ে অনেক পুরুষ ঠিক মেয়েদের মতোই — এমনকি যারা দুর্বল নয়, নারীসুলভ দিক যাদের বেশি নেই, তারাও। কলহের একটা তাগিদ পেয়ে বসেছিল বৃদ্ধকে, যদিও নিজেই কষ্ট পাচ্ছিলেন তাতে।

মনে আছে সে সময় একটা চিন্তা খেলে গিয়েছিল আমার মনে: আন্না আন্দ্রেয়েভনা যা সন্দেহ করছেন, এর আগে সত্যিই তেমন একটা ছলনা উনি করেন নি তো? খুবই সম্ভবত ঈশ্বর তাঁকে সুবুদ্ধি দিয়েছিলেন, সত্যি করেই হয়ত নাতাশার কাছে যাচ্ছিলেন উনি, কিন্তু পথে মত বদলিয়েছেন বা কিছু একটা ভেস্তে যায়, সংকল্পটা টেকে না, কিছু একটা হওয়ারই কথা, — তাই এখন বাড়ি ফিরেছেন ক্ষুব্ধ, হতমান, নিজের কিছুক্ষণ আগেকার হৃদয়াবেগ আর আকাঙ্ক্ষায় নিজেই লজ্জিত, নিজেরই দুর্বলতার জন্যে তাঁর যা রাগ তার ঝাল ঝাড়বার মতো কাউকে চাইছেন, এবং ঠিক তাকেই বেছে নিচ্ছেন, যার মধ্যে ওই একই হৃদয়াবেগ আর আকাঙ্ক্ষা আছে বলে তাঁর সন্দেহ। সম্ভবত মেয়েকে ক্ষমা করার কথা ভাবার সময় বেচারী আন্না আন্দ্রেয়েভনার সুখ আর আনন্দের কথাই তাঁর মনে হয়েছিল, কিন্তু তাঁর ইচ্ছেটা ব্যর্থ হওয়ায় আন্না আন্দ্রেয়েভনার ওপরই পড়ছে প্রথম চোটটা।

কিন্তু ওঁর সামনে ভয়ে কম্পমান আন্না আন্দ্রেয়েভনার বিধ্বস্ত মূর্তিটা ওঁর মনে ঘা দিল। নিজের রাগে যেন লজ্জা পেয়ে এক মিনিটের জন্যে সংযত করলেন নিজেকে। আমরা সকলেই চুপচাপ, আমি চেষ্টা করলাম ওঁর দিকে না তাকাতে। কিন্তু শুভ মুহূর্তটা বেশিক্ষণ টিকল না। যে করেই হোক, এমনকি ফেটে পড়ে, এমনকি অভিশাপ দিয়েও আত্মপ্রকাশ ওঁকে করতেই হবে।

হঠাৎ বলে উঠলেন, 'শোনো ভানিয়া, দুঃখ হচ্ছে আমার, বলতে আমি চাই নি, কিন্তু সময় এসে গেছে, সিধে লোকেদের যা উচিত তেমনি করে কিছু না এড়িয়ে সব খুলে বলতে হবে আমায়... বুঝেছ ভানিয়া? তুমি এসেছ দেখে আমার ভালোই হল, তোমার সামনেই জোরে জোরে আমার যা বলবার বলব, অন্যেরাও শুনে বুঝুন যে এই সব যত বাজে ব্যাপার, যত চোখের জল আর হাহুতাশ আর মনকষ্টে আমি তিতিবিরক্ত হয়ে গেছি। সম্ভবত রক্ত ঝরিয়ে যন্ত্রণা সয়ে বুক থেকে যেটা আমি উপড়ে ফেলেছি, সেটা আর ফেরার নয়! না! এই আমি বললাম এবং এই আমি করব। বলছি ওই ছ'মাস আগে যে ব্যাপারটা ঘটে গেছে তার কথা — বুঝলে ভানিয়া? কথাটা আমি এত খোলাখুলি, এত সরাসরি বলছি যাতে আমার কথার মানে বুঝতে তোমায় কোনো ভুল না হয়,' আতপ্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে এবং স্পষ্টতই ওঁর স্ত্রীর সভয় দৃষ্টিপাত এড়িয়ে যোগ করলেন উনি, 'ফের বলছি, ছাইভস্ম যতসব! চাই না আমি!.. সবচেয়ে এইটে আমায় ক্ষেপিয়ে তুলছে যে সকলেই ভাবছে আমার মধ্যে অমন একটা নীচ, অমন দুর্বল একটা হৃদয়াবেগ থাকা সম্ভব, যেন আমি একটা বাতুল, যেন নিতান্ত একটা পামর... ভাবছে শোকে বুঝি আমি পাগলই হয়ে গেলাম... বাজে কথা! ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি, ভুলে গিয়েছি আমি আমার পুরনো স্নেহ! কোনো স্মৃতি আমার কিছু নেই... নেই! নেই! নেই! নেই!..'

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে উনি টেবিলের ওপর ঘুষি মারলেন। কাপগুলো ঝনঝন করে উঠল।

নিজেকে আর সংযত রাখতে না পেরে ওঁর দিকে প্রায় সরোষে তাকিয়েই বলে ফেললাম, 'নিকোলাই সের্গেয়িচ, আন্না আন্দ্রেয়েভনার ওপর কি আপনার এতটুকু দয়াও নেই। দেখুন, কী অবস্থা করেছেন ওঁর!' কিন্তু তাতে শুধু আগুনে ঘি পড়ল।

কাঁপতে কাঁপতে শাদা হয়ে উনি চিৎকার করে উঠলেন:

'না, দয়া নেই! নেই, কারণ আমাকেও কেউ দয়া করছে না। কেননা আমারই বাড়িতে বসে আমার মাথা হেঁট করে আমার বিরুদ্ধেই চক্রান্ত চলছে ভ্রষ্টা মেয়েটার পক্ষ নিয়ে, অভিশাপ আর শাস্তিই যার প্রাপ্য!'

'মাগো, নিকোলাই সের্গেয়িচ, শাপ দিয়ো না!.. যা খুশি করো শুধু শাপ দিয়ো না মেয়েটাকে!' চেঁচিয়ে উঠলেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা।

'দেব অভিশাপ!' আগের চেয়েও দ্বিগুণ জোরে হাঁক পাড়লেন বৃদ্ধ, 'কেননা

আঘাত আর কলঙ্কের পরেও এই আমি ঐ অভিশপ্তা মেয়েটার কাছে গিয়ে মাপ চাইব এই রকম দাবি করা হচ্ছে! হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই! দিনরাত এই ভাবে আমার নিজের বাড়িতেই চোখের জল আর হাহুতাশ আর নির্বোধ যত আকারে-ইঙ্গিতে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে আমায়! আমার মন গলাতে চাইছে... দ্যাখো, চেয়ে দ্যাখো ভানিয়া,' কাঁপা কাঁপা হাতে পাশের পকেট থেকে কতকগুলো কাগজপত্র তাড়াহুড়ায় বার করে উনি বললেন, 'এই হল আমার মোকদ্দমার নোট! এখন অবস্থা দাঁড়াচ্ছে যে আমি একটা চোর, প্রবঞ্চক, আমার যে উপকার করেছে তাকেই আমি লুট করেছি!.. মান গেল, মর্যাদা গেল, কেবল ঐ মেয়েটার জন্যে! এই দ্যাখো, চেয়ে দ্যাখো!..'

কোটের পাশের পকেট থেকে উনি নানা রকমের কাগজপত্র একের পর এক টেবিলের ওপর ফেলে বিশেষ করে যে কাগজটা আমায় দেখাতে চাইছিলেন সেটা খুঁজতে লাগলেন অধৈর্যের মতো, কিন্তু হবি তো হ', সেই কাগজটাই পাওয়া যাচ্ছিল না। হাতে যা ঠেকছিল সবই তিনি অধৈর্যে টান মেরে আনছিলেন: হঠাৎ ঠং করে কী একটা ভারি জিনিস পড়ল টেবিলের ওপর... আন্না আন্দ্রেয়েভনা চিৎকার করে উঠলেন। জিনিসটা সেই হারানো লকেট।

নিজের চোখকেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। বৃদ্ধের মাথায় রক্ত চড়ে গিয়ে লাল করে দিল গাল দুখানা; চমকে উঠলেন উনি। দুই হাত জড়ো করে অনুনয়ের দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা। মুখখানা তাঁর আলো হয়ে উঠল একটা প্রসন্ন সানন্দ আশায়। বৃদ্ধের আরক্তিম মুখ, আমাদের সামনে তাঁর অপ্রস্তুত ভাব... না, আন্না আন্দ্রেয়েভনার ভুল হয় নি, তিনি বুঝলেন, লকেটটা কী করে অদৃশ্য হয়েছিল!

বুঝতে পারলেন যে উনিই সেটা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, পেয়ে খুশি হয়েছিলেন, হয়ত আনন্দে কাঁপতে কাঁপতে ঈর্ষাবশে ওটাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন সবার চোখ থেকে; নির্জনে কেউ যখন দেখছে না তখন তাঁর স্নেহের সন্তানের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন অপরিসীম ভালোবাসায়, দেখে বুঝি তাঁর তৃপ্তি মিটত না; হতভাগিনী মায়ের মতো উনিও বুঝি সবার আড়ালে গিয়ে সোনার নাতাশার সঙ্গে কথা কয়েছেন, নাতাশার জবাব কল্পনা করে নিয়ে নিজেই সে জবাব দিয়েছেন। রাত্রে অসহ্য দুঃখে, বুকের চাপা কান্নায় আদর করেছেন মধুর ছবিটাকে, চুমু খেয়েছেন আর অভিশাপের বদলে ক্ষমা আর আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছেন সেই তারই জন্যে, অন্যের সম্মুখে যার মুখ দর্শন করতে চান নি, যাকে অভিশাপ দিয়েছেন উনি।

'ওগো, তুমি তাহলে ওকে এখনো ভালোবাসো!' এখনি তাঁর নাতাশাকে যে অভিশাপ দিয়েছে সেই কঠোর পিতার সম্মুখে আর আত্মসংবরণ করতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা।

কিন্তু সে কথা শোনা মাত্র একটা উন্মাদ ক্রোধে ঝলসে উঠল তাঁর চোখ। লকেটটা টেনে নিয়ে সজোরে মেঝের ওপর নিক্ষেপ করলেন তিনি, তারপর পাগলের মতো পা দিয়ে সেটাকে মাড়াতে শুরু করলেন।

হাঁপাতে হাঁপাতে ভাঙা গলায় চ্যাঁচালেন, 'চিরকালের মতো শাপ দিচ্ছি তোকে, জন্মের মতো, জন্মের মতো!'

মা কেঁদে উঠলেন, 'হায় ভগবান, ওর ওপর, আমার নাতাশার! বাছার আদরের মুখখানার ওপর... মাড়াচ্ছে! পা দিয়ে মাড়াচ্ছে!.. নিষ্ঠুর! কী নিষ্ঠুর পাষাণ অহঙ্কারী মানুষ!'

স্ত্রীর হাহাকার শুনে উন্মাদ বৃদ্ধ হঠাৎ থেমে গিয়ে কী করছেন দেখে আঁতকে উঠলেন। তারপর মেঝে থেকে হঠাৎ লকেটটা তুলে নিয়ে ছুটলেন দরজার দিকে, কিন্তু দু'পা এগুতে না এগুতেই হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে সামনের সোফাটায় ভর দিয়ে মাথা নুইয়ে অসহায়ের মতো লুটিয়ে পড়লেন।

শিশুর মতো, নারীর মতো ফোঁপাতে লাগলেন উনি। ফোঁপানি চেপে ধরছিল তাঁর বুক, যেন ফেটে যাবে। ক্রুদ্ধ বৃদ্ধ মুহূর্তের মধ্যে দুর্বল হয়ে উঠলেন একটা শিশুর চেয়েও। না, এখন আর উনি নাতাশাকে শাপমন্যি করতে পারেন না, আমাদের কারো সামনেই এখন আর ওঁর লজ্জা নেই। এক মিনিট আগে যা পায়ে দলছিলেন, ভালোবাসার দমকে দমকে হঠাৎ সেই ছবিটাকেই তিনি আমাদের সামনেই ভরে দিতে লাগলেন চুমোয় চুমোয়। মনে হল যেন এত দিন অবদমিত থাকার পর মেয়ের জন্যে তাঁর সবটুকু স্নেহ সবটুকু মায়া এখন দুর্বার শক্তিতে ভেঙে বেরিয়ে এসে তাঁর সমস্ত সত্তাকে বুঝি চূর্ণ করে দিচ্ছে।

ঝুঁকে পড়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে আন্না আন্দ্রেয়েভনা ডুকরে ডুকরে উঠলেন, 'ক্ষমা করো গো মেয়েটাকে, ক্ষমা করো! বাড়ি নিয়ে এসো ওকে, লক্ষ্মীটি, শেষ বিচারের দিন ঈশ্বর তোমার করুণা আর নিরহঙ্কারের কথা মনে রাখবেন!'

'না, না! কিছুতেই না! কখনো না!' ভাঙা ভাঙা রুদ্ধ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ, 'কখনো না!'

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

নাতাশার ওখানে পেঁছিলাম দেরি করে, রাত দশটায়। নাতাশা তখন থাকত ফন্‌তান্‌কা বাঁধে সেমিওনভস্কি সেতুর কাছে ব্যবসায়ী কলোতুশকিনের নোংরা ফ্ল্যাট বাড়ির চার তলায়। বাড়ি ছাড়ার পর প্রথম কিছুদিন সে আলিওশার সঙ্গে ছিল ভারি সুন্দর একটা ফ্ল্যাটে, লিতেইনি রাস্তার একটি বাড়িতে, তিন তলায়, ফ্ল্যাটটা ছোটো কিন্তু সুন্দর এবং আয়েশী। কুমার বাহাদুরের সম্পদ অবিশ্যি শিগ্‌গিরই শেষ হয়ে যায়। পিয়ানো শিক্ষক না হয়ে সে টাকা ধার করতে থাকে এবং অচিরেই অত্যন্ত দেনাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। টাকাটা সে উড়িয়ে দেয় ফ্ল্যাট সাজিয়ে এবং নাতাশাকে উপহার কিনে দিয়ে। এই অমিতব্যয়িতার বিরোধিতা করত নাতাশা, ওকে অনুযোগ করত, মাঝে মাঝে কেঁদেও ফেলত। ভাবালু এবং অনুভূতিপ্রবণ স্বভাবের দরুন আলিওশা মাঝে মাঝে গোটা সপ্তাহ ধরে আনন্দে বিভোর হয়ে থাকত নাতাশাকে কী উপহার সে দেবে, কী করে সেটা গ্রহণ করবে নাতাশা তারই কল্পনায়। নিজের কাছে ব্যাপারটা সে সত্যিকারের উৎসবের মতো করে তুলত, এবং আগে থেকেই তার প্রত্যাশা আর স্বপ্নের কথা আমায় শোনাত উচ্ছ্বসিত হয়ে। তারপর নাতাশার ভর্ৎসনা আর চোখের জলে ও এমনি মুষড়ে পড়ত যে কষ্ট হত। পরের দিকে তিরস্কার ক্ষোভ আর কলহের উপলক্ষ হয়ে উঠল এই উপহারগুলোই। তাছাড়া নাতাশাকে না বলেও বেশ টাকা ওড়াত আলিওশা। বন্ধুদের সঙ্গে মেতে নাতাশার প্রতি অন্যায় করত, যেত যত সব জসেফিন আর মিনাদের বাড়ি। অথচ তাহলেও সে প্রবলভাবে ভালোবাসত নাতাশাকে। ভালোবাসত কেমন একটা কষ্টের ভালোবাসায়; প্রায়ই সে আমার কাছে আসত মনমরা হতাশ ভাব নিয়ে, বলত সে নাতাশার কড়ে আঙুলেরও যোগ্য নয়, স্থূল আর খারাপ লোক সে, নাতাশাকে বোঝবার ক্ষমতা ওর নেই, তার প্রেমের পক্ষে সে অপাত্র। অংশত তার কথা ঠিক: ওরা ছিল একেবারেই অসমান। নাতাশার কাছে নিজেকে ওর মনে হত শিশু, নাতাশাও সর্বদাই ওকে দেখত শিশুর মতো। চোখে জল নিয়ে ও আমার কাছে জসেফিনের সঙ্গে ওর পরিচয়ের কথা স্বীকার করেছিল, অথচ আবার মিনতি করেছিল কথাটা যেন নাতাশাকে না বলি। আর এই সমস্ত স্বীকারোক্তির পর ও যখন ভয়ে ভয়ে দুরুদুরু বুকে নাতাশার কাছে ফিরত আমার সঙ্গে (একান্তরূপে আমার সঙ্গেই, বলত, তার পাপের পর নাতাশার দিকে চাইতে ওর ভয় লাগবে, শুধু আমিই ওকে সাহায্য করতে পারি), তখন এক ঝলকেই

নাতাশা বুঝে নিত কী ব্যাপার। অসম্ভব ঈর্ষাপরায়ণা সে, বুঝি না কী করে তবু ওর সব অপরাধ নাতাশা মার্জনা করত সর্বদাই। সাধারণত ব্যাপারটা ঘটত এই রকম: আলিওশা যেত আমার সঙ্গে, নাতাশার সঙ্গে কথা কইত ভয়ে ভয়ে, ভীরু ভীরু কোমলতায় তাকাত ওর চোখের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে নাতাশা টের পেয়ে যেত, কিছু একটা অন্যায় করে এসেছে ও, কিন্তু বুঝেছে যে তার কোনো লক্ষণ দেখাত না, ব্যাপারটা নিয়ে নিজে থেকে কখনো প্রথমে কোনো কথা শুরু করত না, জিজ্ঞেস করত না কিছু, বরং তার বদলে কেবল দ্বিগুণ করে তুলত সোহাগ, হয়ে উঠত আরো স্নেহময়ী আরো হাসিখুশি — এটা কিন্তু ওর দিক থেকে কোনো অভিনয় বা ভেবেচিন্তে ঠিক করা একটা চালাকি নয়। না, অপরূপ এই মানুষটির ক্ষমা করা, মার্জনা করা ছিল কেমন একটা অপরিসীম তৃপ্তির ব্যাপার, যেন আলিওশাকে ক্ষমা করার মধ্যেই একটা বিশেষ রকমের সূক্ষ্ম মাধুর্য খুঁজে পেত নাতাশা। অবশ্য একথা সত্যি, তখনো পর্যন্ত ব্যাপারটা ছিল শুধু জসেফিনদের নিয়ে। নাতাশাকে অমন নম্র আর ক্ষমাশীল দেখে আলিওশা আর সইতে পারত না, জিজ্ঞেস না করতেই পুরো ঘটনাটা নিজেই স্বীকার করে বসত — চাইত বুক হালকা করে, ওরই ভাষায়, "ঠিক আগের মতো হয়ে উঠতে"। নাতাশার ক্ষমায় ও মাতাল হয়ে উঠত, আনন্দে কেঁদেও ফেলত মাঝে মাঝে, চুমোয় আলিঙ্গনে ভরে দিত ওকে। তখন মুহূর্তে মেজাজ ফিরে আসত তার, শিশুর সরলতায় জসেফিনের সঙ্গে ওর কাণ্ডটার সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ দাখিল করত ও, হাসত হো-হো করে, আশীর্বাদ করত নাতাশাকে, প্রশংসায় আকাশে তুলে দিত ওকে। সন্ধ্যা কাটত সুখে, হাসিখুশিতে। টাকা সবটুকু ফুরিয়ে যাবার পর ও জিনিসপত্র বিক্রি করতে শুরু করলে। নাতাশার জেদাজেদিতে একটা সস্তা ছোটো ফ্ল্যাট নেওয়া হল ফন্‌তান্‌কায়। জিনিসপত্র বিক্রি চলতেই থাকল; নিজের গাউন পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে হয় নাতাশাকে, কাজ খুঁজতে থাকে সে। একথা শুনে আলিওশার হতাশা অপরিসীম হয়ে ওঠে। নিজেকে অভিশাপ দিল সে, চিৎকার করে বলল যে নিজের ওপর তার ঘেন্না ধরে গেছে, অথচ অবস্থার উন্নতির জন্যে কিছুই করল না। শেষ সম্পদটুকুও ওদের এবার শেষ হয়ে এসেছিল, অতি অল্প উপার্জনের কাজটা ছাড়া নাতাশার এখন আর কিছুই নেই।

একেবারে গোড়ায় যখন ওরা একসঙ্গে ছিল, তখন এই নিয়ে আলিওশা তার বাপের সঙ্গে তুমুল কলহ করে। নিজের ছেলের সঙ্গে কাউন্টেসের সৎমেয়ে, কাতেরিনা ফিওদরোভনা ফিলিমোনভার বিয়ে দেবার জন্যে প্রিন্স ভালকোভস্কির

অভিলাষটা তখন মাত্র একটা পরিকল্পনা হিসেবেই ছিল ; তবু তার জন্যে তিনি খুবই জেদ করছিলেন। কনে দেখাবার জন্যে তিনি আলিওশাকে নিয়ে যান, ছেলেকে ভজিয়েছিলেন যেন সে মেয়েটার চোখে লেগে যাবার চেষ্টা করে, যুক্তি দিয়ে, কড়া হয়েও বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কাউণ্টেসের জন্যে ব্যাপারটা ফেঁসে যায়। অতঃপর নাতাশার সঙ্গে ছেলের যোগাযোগটা উনি না দেখার ভান করে কালের ভরসায় থাকেন। আলিওশার চপলমতি জানা থাকায় আশা করেছিলেন, প্রেমের ব্যাপারটা অচিরেই শেষ হয়ে যাবে। আর নাতাশার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যেতে পাবে, এ দুশ্চিন্তা প্রিন্স প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। এদিকে প্রেমিক যুগলও বাপেদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক মিলমিশ এবং সাধারণভাবে অবস্থার একটা পরিবর্তন হওয়া পর্যন্ত প্রশ্নটাকে মুলতুবী রেখে দেয়। অবিশ্যি, বোঝা যায় কথাটা নিজে থেকে পাড়তে নাতাশার অনিচ্ছা ছিল। আলিওশা গোপনে আমায় জানায় যে সমস্ত ব্যাপারটায় তার বাপকে যেন খানিকটা খুশি বলেই মনে হয়: এ ব্যাপারে ইখমেনেভের যে মাথা হেঁট হয়েছে তাইতেই ওঁর আনন্দ। লোক দেখানির জন্যে উনি ছেলের ওপর অসন্তোষের ভান বজায় রেখে চলেন, এমনিতে যা পর্যাপ্ত নয় (ছেলের সঙ্গে উনি ভারি কৃপণতা করতেন) ছেলের সেই ভাতাটাও কমিয়ে দেন এবং হুমকি ছাড়েন একেবারেই বন্ধ করে দেবেন। পোল্যাণ্ডে কাউণ্টেসের কাজ ছিল। তাঁর পেছু পেছু অচিরেই উনিও পোল্যাণ্ড চলে যান, আর অবিরাম ঘটকালি চালিয়েই যেতে থাকেন। আলিওশার অবিশ্যি বিয়ের বয়স হয় নি, কিন্তু কনেটি ভারি ধনী, অমন একটা সুযোগ ছেড়ে দেবার কথা ভাবাই যায় না। শেষ পর্যন্ত প্রিন্সের লক্ষ্য সিদ্ধ হল। শোনা গেল, বিয়ের ব্যাপারটায় শেষ পর্যন্ত নাকি সমঝোতা হয়েছে। যে সময়টার কথা বলছি, তখন প্রিন্স সবে পিটার্সবুর্গে ফিরেছেন। ছেলেকে তিনি গ্রহণ করেন সস্নেহে, কিন্তু নাতাশার সঙ্গে আলিওশার অবিচলিত সম্পর্কে তাঁর বিস্ময়টা প্রীতিকর হয় নি। সন্দেহ ঘনাতে লাগল তাঁর, ভয় পেতে শুরু করলেন; কড়া করে জোর দিয়ে দাবি জানালেন যেন সম্পর্কটা ছিন্ন করা হয়। কিন্তু অচিরেই অনেক বেশি কার্যকরী একটা উপায় বার করলেন তিনি, আলিওশাকে নিয়ে গেলেন কাউণ্টেসের কাছে। কাউণ্টেসের সৎমেয়েটি বয়সে নিতান্ত বালিকা হলেও দেখতে প্রায় নিখুঁত সুন্দরী, হাসিখুশি, বুদ্ধিমতী এবং মধুর, অমন ভালো অন্তঃকরণ কদাচিৎ দেখা যায়, মনটি নিষ্কলুষ সরল। প্রিন্স ধরে নিয়েছিলেন যে যতই হোক ছয় মাস কেটে যাবার একটা ফল ফলবেই,

ছেলের চোখে নাতাশার নতুনত্বের সে মোহ নিশ্চয় আর নেই, ভাবী বধূর প্রতি ছয় মাস আগে ছেলের যে মনোভাব ছিল, এখন তা নিশ্চয় পালটাবে। অনুমানটা তাঁর সত্যি কেবল অংশত... আলিওশা সত্যিই আকৃষ্ট হল। আরো বলা যাক যে বাপ ছেলের প্রতি হঠাৎ অস্বাভাবিক রকমের স্নেহশীল হয়ে উঠলেন (যদিও টাকা দিতেন না)। আলিওশা বুঝত, বাপের এই স্নেহের পেছনে লুকনো আছে অপরিবর্তিত অনড় একটা লক্ষ্য। ফলে কষ্ট লাগত তার, তবে কাতেরিনা ফিওদরোভনাকে প্রতিদিন না দেখতে পেলে যতটা কষ্ট হত, ততটা নয়। জানতাম, গত পাঁচদিন থেকে সে নাতাশার কাছে যায় নি। ইখমেনেভদের এখান থেকে নাতাশার কাছে যাবার পথে শঙ্কিত হয়ে ভাবছিলাম, কী কথা ও বলতে চায় আজ? দূর থেকেই চোখে পড়ল ওর জানলায় আলো। আমাদের মধ্যে অনেক আগে থেকেই ঠিক হয়ে ছিল যে, যদি আমায় ওর ভারি জরুরি দরকার পড়ে তাহলে জানলায় ও একটা মোমবাতি দিয়ে রাখবে। তাহলে ঘরের কাছ দিয়ে যাবার সময় (সেরকম যাওয়া ঘটত প্রায় প্রতি সন্ধ্যেয়) অসাধারণ ওই আলোটা দেখে আমি টের পাব ও আমার অপেক্ষায় আছে, আমায় ওর প্রয়োজন। ইদানীং জানলায় ও মোমবাতি দিয়ে রাখছিল ঘন ঘন...

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ঘরে ও ছিল একা। বুকের কাছে দুহাত জড়ো করে চিন্তায় ডুবে গিয়ে আস্তে আস্তে পায়চারি করছিল। টেবিলে আমার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে আছে একটা সামোভার, কয়লাগুলো তার নিভে গেছে। কোনো কথা না বলে মৃদু হেসে ও হাত বাড়িয়ে দিলে আমার দিকে। মুখখানা বিবর্ণ, অসুস্থের মতো। হাসিতে কেমন একটা যন্ত্রণা, কোমলতা, ধৈর্যের ভাব। পরিষ্কার নীল চোখদুটি যেন বড়ো হয়ে উঠেছে, চুল যেন ঘন হয়ে উঠেছে আগের চেয়েও। তা মনে হচ্ছিল ওর মুখের শীর্ণতা আর রুগ্নতার জন্যে।

আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, 'ভাবছিলাম তুমি বুঝি আর এলে না। কী ব্যাপার জেনে আসার জন্যে মাভরাকে পাঠাচ্ছিলাম তোমার কাছে। ভয় হয়েছিল ফের অসুখে পড়লে না তো।'

'না, অসুখ নয়। আটকে পড়েছিলাম, বলছি সব। কিন্তু কী ব্যাপার নাতাশা? কী হয়েছে?'

'কিছু তো হয় নি।' জবাব দিলে ও যেন অবাক হয়ে, 'কেন বলো তো?'

'তার মানে, তুমি লিখে পাঠালে... কাল লিখে পাঠালে আসতে, সময়ও বেঁধে দিয়েছিলে, যেন আগুপিছু না করি; ব্যাপারটা অস্বাভাবিক।'

'ও হ্যাঁ! আমি আশা করেছিলাম গতকাল ও বুঝি আসবে।'

'ও আসে নি তাহলে?'

'না।' তারপর একটু থেমে জানালে, 'তাই ভাবছিলাম ও যদি না আসে, তাহলে তোমার সঙ্গে একটা আলোচনা করে নিতে হবে।'

'আর আজ সন্ধ্যেয়? ও আসবে আশা করেছিলে?'

'না, সন্ধ্যেয় ও থাকে সে-ই বাড়িতে।'

'কী মনে হয় তোমার নাতাশা, ও কি আর ফিরবেই না?'

'নিশ্চয় ফিরবে।' একটা অদ্ভুত গুরুত্ব দিয়ে আমার দিকে চেয়ে জবাব দিলে ও।

ঝট করে আমার এ প্রশ্নটা ওর ভালো লাগে নি। ঘরের মধ্যে নীরবে পায়চারি করতে লাগলাম আমরা।

ফের একটু হাসি নিয়ে ও শুরু করলে, 'এতক্ষণ ধরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম ভানিয়া, আর জানো কী করছিলাম? পায়চারি করতে করতে কবিতা আবৃত্তি করছিলাম। মনে পড়ে সেই ঘণ্টি আর শীতের রাস্তা, "টেবিলে মম গুঞ্জরিত উষ্ণ সামোভার..." আমরা একসঙ্গে সেই পড়েছিলাম:

গিয়াছে থেমে তুষার ঝড়, আলোর ঝলকানি
লক্ষ চোখে দৃষ্টি মেলে তাকায় নিশীথিনী।

'আর তারপর:

যেন বা কার গলার স্বর বাজে আবেগভরে,
ঘণ্টাধ্বনি মিশিয়া যায় তাহার একতানে;
কখন, ওগো কখন প্রিয়তম আসবে ঘরে
মাথাটি তার রাখবে মম বুকের উপাধানে!
দেখো গো দেখো, কী মায়া ঘেরা আমার ঘরদ্বার!
বাতায়নের তুহিন কাচে আলোক ঝলকায়,
টেবিলে মম গুঞ্জরিত উষ্ণ সামোভার,
খুশিতে জ্বলে আগুন, নাচে দপদপানি তার
সুচিত্রিত পর্দা ঢাকা কোণের বিছানায়...

'কী সুন্দর! কী বেদনার এই কবিতা ভানিয়া। কল্পনার কী অপূর্ব ছবি। এ যেন একটা এম্ব্রয়ডারির খসড়া — পাঠকের ওপরেই তা ফুটিয়ে তোলার ভার! দুটি অনুভূতি: অতীত আর বর্তমান। সামোভারটা, রঙীন কাপড়ের পর্দাটা কী আশ্চর্য ঘরোয়া... যেন আমাদের সেই ছোটো শহরটারই কোনো একটি মধ্যবিত্ত বাড়ি। বাড়িটাকে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি: নতুন একটা বাড়ি, কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি, এখনো তক্তা মারা হয় নি... তারপর আর একটা ছবি:

সহসা যেন ওইতো শুনি সেই তো স্বর যে,
গাইছে আর বিষাদে বাজে ঘণ্টির রণন
কোথায়, মম বন্ধু কোথা? সভয়ে ভাবি সে
আসবে নিয়ে আদর ভরা ব্যাকুল আলিঙ্গন।
হায় কী জীবন! এ ঘরে মোর গুমোট আঁধিয়ারা,
জানলা দিয়ে হিমেল হাওয়া; বড্ডো লাগে একা
বাহিরে শুধু চেরি গাছের একটি ছোট চারা,
তুষারে ঢাকা শার্শি দিয়ে তাও যায় না দেখা,
হয়ত বুঝি, এতদিনেতে শুকিয়ে গেছে মারা...
পর্দার রঙ গিয়েছে জ্বলে, নেইকো ঘরে সখা:
রুগ্ন আমি ঘুরি ফিরি, যাই না কারো কাছে,
সে যে নেইকো আমায় কিছু করবে বকা-ঝকা...
একলা বুড়ির গজগজানি...'

'রুগ্ন আমি ঘুরি ফিরি...' কী অদ্ভুত খেটে গেছে ওই 'রুগ্ন' কথাটা। 'আমায় কিছু করবে বকা-ঝকা' কী মায়া কী মমতা ওই লাইনটিতে, স্মৃতির কী যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা আবার নিজেই টেনে আনছি, নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি তাই নিয়ে... সত্যি, কী সুন্দর! কী সত্যি!'

থেমে গেল ও, যেন গলায় একটা বিক্ষেপ শুরু হয়েছে।

'ভানিয়া, লক্ষ্মীটি!' ও বললে মিনিটখানেক পরে, তারপর আবার হঠাৎ চুপ করে গেল, যেন কী বলতে যাচ্ছিল ভুলে গেছে কিংবা কথাটা বলে ফেলেছে কিছু না ভেবেই, আচমকা আবেগের বশে।

তখনো আমরা পায়চারি করে চলেছিলাম। আইকনের সামনে একটা বাতি। ইদানীং নাতাশার ভক্তি কেবলি বেড়ে উঠছে, সে সম্পর্কে কোনো কথা বললেও ওর ভালো লাগত না।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কাল কি পার্বণের দিন? তোমার বাতিটা যে জ্বলছে।'

'না, পার্বণ নয়... কিন্তু ভানিয়া, বসো না। নিশ্চয় হয়রান হয়ে আছ। চা খাবে? নিশ্চয় এখনো চা খাওয়া হয় নি তোমার?'

'আচ্ছা, বসা যাক। কিন্তু চা আমি খেয়ে এসেছি নাতাশা।'

'কোত্থেকে আসছ এখন?'

'ওঁদেরই ওখান থেকে।' নাতাশার বাপের বাড়ি সম্পর্কে কথা বলতে হলে ঐভাবেই আমরা বলতাম।

'ওঁদের ওখান থেকে? কী করে গেলে? নিজেই গিয়েছিলে? নাকি ও'রা ডেকেছিলেন?..'

প্রশ্নে প্রশ্নে আমায় জর্জরিত করে ফেলল নাতাশা। অস্থিরতায় আরো বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল মুখখানা। ওর বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ, মায়ের সঙ্গে আলাপ এবং লকেট নিয়ে কাণ্ডটার কথা সবিস্তারে ওকে বললাম। বললাম সবিস্তারেই, তাৎপর্যগুলো সমেত। ওর কাছে কখনো কিছু আমি লুকিয়ে রাখি না। ও শুনলে উদ্‌গ্রীব হয়ে, গিললে প্রতিটি কথা। চিকচিক করে উঠল চোখের জল। লকেটের ঘটনাটায় ও বিচলিত হয়ে উঠল খুবই।

আমার কাহিনীতে ঘন ঘন বাধা দিয়ে ও বলতে লাগল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও ভানিয়া, সব, সব কিছু আমায় খুঁটিয়ে বলো, যদ্দুর সম্ভব খুঁটিয়ে। তুমি তেমন খুঁটিয়ে বলছ না...'

দ্বিতীয়, তৃতীয় বার পুনরাবৃত্তি করলাম কাহিনীটা, প্রতি মুহূর্তে থেমে থেমে জবাব দিয়ে গেলাম ওর অবিরাম প্রশ্নের।

'উনি সত্যিই আমার কাছে আসছিলেন বলে তোমার ধারণা?'

'জানি না নাতাশা, সত্যি বলতে কি, সে সম্পর্কে কোনো ধারণা করাও আমার মুশকিল। তবে তোমার জন্যে যে উনি কষ্ট পাচ্ছেন, তোমায় ভালোবাসেন সেটা খুবই পরিষ্কার; কিন্তু তোমার কাছে আসছিলেন কিনা, সেটা... সেটা...'

নাতাশা আমাকে বাধা দিল, 'লকেটটায় চুমু দিচ্ছিলেন উনি? কী বলছিলেন চুমু খেতে খেতে?'

'যা বলছিলেন তা খুবই অসংলগ্ন, উচ্ছ্বাসের শব্দ কেবল। তোমার আদরের নামগুলো বলছিলেন, তোমায় ডাকছিলেন...'

'আমায় ডাকছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল ও।

বললে, 'আহা!' তারপর একটু থেমে যোগ করলে, 'সব কিছু যদি তিনি জেনে থাকেন তবে আশ্চর্য নয়। আলিওশার বাপ সম্পর্কেও উনি অনেক খবর রাখেন।'

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'নাতাশা, চলো ও'দের কাছে ফিরে যাই...'

'কখন?' চেয়ার থেকে খানিকটা উঠে দাঁড়িয়ে বিবর্ণ হয়ে জিজ্ঞেস করলে ও, ভেবেছিল আমি তক্ষুনি যেতে বলছি।

'না ভানিয়া,' আমার কাঁধে দুহাত রেখে বিষণ্ণ হেসে ও বললে, 'না, লক্ষ্মীটি, তুমি অনবরত তাই বলছ বটে, কিন্তু... ও কথা বরং আর তুলো না।'

সখেদে বলে উঠলাম, 'এই ভীষণ মনান্তরটা কি তাহলে কখনোই আর মিটবে না? আগু বেড়ে প্রথম এগুতে চাও না, এতই তোমার অহঙ্কার! সে দায়িত্ব যে তোমারই — তোমায় প্রথম এগুতে হবে। খুব সম্ভব, তোমার বাবা তোমায় ক্ষমা করার জন্যে শুধু সেইটুকুরই অপেক্ষা করছেন... উনি তোমার বাবা; ওঁর মনে ঘা দিয়েছ তুমিই! ওঁর গর্বে শ্রদ্ধা করতে হয়। এ গর্ব সঙ্গত, স্বাভাবিক! এ তোমায় করতেই হবে। এটুকু করে দ্যাখো, বিনা শর্তে উনি তোমায় ক্ষমা করবেন।'

'বিনা শর্তে! সে অসম্ভব। আমায় অযথা অনুযোগ কোরো না ভানিয়া। দিনরাত কথাটা নিয়ে আমি ভেবেছি ভাবছি। ও'দের ছেড়ে আসার পর থেকে বোধ হয় একটা দিনও কাটে নি যেদিন এই কথাটা না ভেবেছি। তাছাড়া কতবারই তো তোমায় আমায় এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে! তুমি নিজেই জানো সে অসম্ভব!'

'চেষ্টা করে দ্যাখো না!'

'না ভানিয়া, সে হয় না। চেষ্টা করতে গেলে উনি শুধু আমার ওপর আরো তিক্ত হয়ে উঠবেন। যা ফেরার নয় তাকে ফেরানো যায় না। এক্ষেত্রে কী ফিরবে না জানো তো? ফিরবে না সেই ছেলেবেলার সুখের দিনগুলো, ও'দের সঙ্গে যা আমি কাটিয়েছি। বাবা যদি আমায় ক্ষমাও করেন, তবু আমায় তিনি আর চিনতে পারবেন না। তিনি ভালোবাসতেন এক বালিকাকে, বড় হলেও যে খুকিটি হয়ে আছে। আমার ছেলেমানুষী সরলতায় উনি মুগ্ধ, আদর করতে গিয়ে উনি আমার মাথায় হাত বুলোতেন এমন ভাবে যেন আমি সেই সাতবছরের খুকিটিই আছি, ও'র কোলের ওপর উঠে আমার ছোটো ছোটো ছেলেমানুষী গান গাইছি। সেই ছেলেবেলা থেকে শুরু করে শেষ দিন পর্যন্ত উনি আমার বিছানার কাছে এসে রাতের জন্যে ক্রুশ করে গেছেন।

এ দুর্ভাগ্যের মাসখানেক আগে উনি চুপি চুপি এক জোড়া দুল কিনে এনেছিলেন (আমি অবিশ্যি আগেই তা টের পেয়ে গিয়েছিলাম), উপহারটা পেয়ে আমার কী রকম আহ্লাদ হবে কল্পনা করে উনি একেবারে ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে উঠেছিলেন, তারপর আমার কাছেই যখন শুনলেন যে দুল কেনার কথা আমি অনেক আগে থেকেই জানি, তখন সকলের ওপর বিশেষ করে আমার ওপর চটে গিয়েছিলেন ভয়ানক। ও'দের ছেড়ে আসার তিন দিন আগে উনি দেখেছিলেন আমি মনমরা হয়ে আছি, তাতে উনি নিজেই এমন বিষণ্ণ হয়ে উঠলেন যে অসুখ করে আর কি। আর জানো, আমার মন ভালো করার জন্যে উনি কিনে নিয়ে এলেন থিয়েটারের টিকিট!.. হায় ভগবান, এই দিয়ে উনি সারিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন আমায়। ফের বলছি, ছোট্ট খুকিটিকেই উনি চিনতেন এবং ভালোবাসতেন, আমিও যে একদিন নারী হয়ে উঠতে পারি, তা উনি মানতেই চাইতেন না... সে সম্ভাবনাটাই কখনো তাঁর মাথায় আসে নি। এখন যদি আমি বাড়ি ফিরে যাই আমায় উনি চিনতেও পারবেন না। আমায় ক্ষমা করলেও উনি দেখবেন কাকে? আমি সেই লোক নই, খুকি নই, বহু কিছুর মধ্যে দিয়ে আমি এসেছি। আমি যদি ও'র মনেও ধরি, তাহলেও ও'র দীর্ঘশ্বাস পড়বে সেই অতীত সুখের জন্যেই, খেদ করবেন, উনি যে খুকিটিকে ভালোবাসতেন আমি তা আর নই। অতীত দিনটা সবসময়েই মনে হয় সেরা দিন! মনে পড়ে যন্ত্রণার সঙ্গে! ওহ্ ভানিয়া, যা গেছে সে যে কী সুন্দর!' চেঁচিয়ে উঠল ও। নিজের কথায় নিজেই ভেসে গিয়ে নিজেই থেমে গেল নিজের উচ্ছ্বাসে, যা বেদনায় বেরিয়ে এল ওর বুক চিরে।

বললাম, 'যা বললে সবই সত্যি নাতাশা। তার অর্থ নতুন করে তোমায় চিনে ভালোবাসতে হবে ও'কে। প্রধান কথা হল তোমায় চেনা। তাতে কী হয়েছে? তোমায় ভালোই বাসবেন উনি। তুমি কি একথাই ভাবছ যে, ওঁর মতো বড়ো হৃদয় যাঁর তিনি তোমায় কিছুতেই চিনতে বুঝতে পারবেন না?'

'ওহ্ ভানিয়া, অন্যায় কথা বোলো না! আমার মধ্যে বোঝার কী আছে? সে কথা আমি বলি নি। দেখছ না, অন্য একটা ব্যাপারও যে রয়েছে: বাপের ভালোবাসায় ঈর্ষাও যে আছে। ও'র মনে ঘা লাগছে, কেননা আলিওশার সঙ্গে ব্যাপারটার সূত্রপাত ও স্থিরীকৃত হয়েছে তাঁকে ছাড়াই; উনি জানতেন না, নজর এড়িয়ে গেছে। উনি জানেন যে তেমন কোনো সন্দেহ পর্যন্ত ও'র হয় নি; আমাদের প্রেমের অশুভ ফলাফল, আমার পলায়নের জন্যে উনি আমার 'অকৃতজ্ঞ' চুপিসার স্বভাবটাকে দায়ী করে রেখেছেন। শুরুতেই আমি ও'র

কাছে যাই নি, পরেও আমার প্রেমের শুরু থেকে হৃদয়াবেগের প্রতিটি ঘটনা ও'র কাছে স্বীকার করি নি; তার বদলে সবকিছু চেপে রেখেছি নিজের মধ্যে, ও'র কাছ থেকে ব্যাপারটা লুকিয়ে রেখেছি। তোমায় বলছি ভানিয়া, মনের গভীরে এইটেই হল ও'র সবচেয়ে বড়ো আঘাত, ও'দের ছেড়ে আমি আমার প্রিয়তমের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, প্রেমের এই পরিণামটার চাইতেও বড়ো অপমান। এখন যদি উনি আমায় পিতার মতোই সস্নেহ আন্তরিকতায় গ্রহণও করেন, তবু বিরোধের বীজটা থেকেই যাবে। কাল কি পরশুই ফের হতাশা, ভুল বোঝাবুঝি এবং অনুযোগ শুরু হবে। তাছাড়া বিনা শর্তে উনি আমায় ক্ষমা করবেন না। ধরে নিচ্ছি, আমি ও'কে গিয়ে বললাম, সত্যি করে মন থেকেই আমি কথাটা বললাম যে, ও'কে কী আঘাত দিয়েছি, কতটা অন্যায় করেছি ও'র ওপর তা এখন বুঝতে পেরেছি। আলিওশার সঙ্গে আমার এই সুখাভিসারের কী মূল্য আমায় দিতে হয়েছে, কতখানি আমায় নিজে সইতে হয়েছে, তা উনি বুঝতে না চাইলেও সেটা আমার পক্ষে কষ্টকর হবে, তাহলেও আমি না হয় আমার কষ্টটা চেপে রইলাম, সব কিছু সয়ে গেলাম — কিন্তু তাতে ওঁর মন উঠবে না। এক অসম্ভব প্রায়শ্চিত্ত দাবি করবেন উনি, দাবি করবেন আমি যেন আমার অতীতকে অভিশাপ দিই, অভিশাপ দিই আলিওশাকে, তাকে ভালোবেসেছি বলে অনুতাপ করি। তিনি প্রত্যাশা করবেন অসম্ভবের: জীবন থেকে গত ছয়মাসকে একেবারে ছেঁটে দিয়ে অতীতকে ফিরিয়ে আনা। কিন্তু অভিশাপ যে আমি কাউকে দিতে পারি না, অনুতাপ যে আমার আসবে না... এই যে ঘটেছে, এই যে অবস্থা... না ভানিয়া, এখন নয়। এখনো সময় হয় নি।'

'সে সময় কখন হবে?'

'জানি না... ভবিষ্যৎ সুখের জন্যে আরো অনেক কষ্ট সইতে হবে; মূল্য দিতে হবে নতুন যন্ত্রণায়। যন্ত্রণায় বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে সবকিছু... ওঃ ভানিয়া, কত কষ্টই যে আছে পৃথিবীতে!'

চুপ করে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে।

'অমন করে আমার দিকে চেয়ে আছ কেন আলিওশা — ইয়ে, ভানিয়া?' নিজের ভুলে হাসল ও।

'তোমার হাসিটা এখন চেয়ে দেখছি নাতাশা। কোথায় পেলে ও হাসি? আগে তো তোমার অমন হাসি দেখি নি।'

'কেন, কী আছে আমার হাসিতে?'

'পুরনো ছেলেমানুষী সারল্যটা তাতে আছে বটে কিন্তু আরো কী একটা... কিন্তু যখন হাসো, তখন মনে হয় ভয়ানক কী একটা যন্ত্রণা বিঁধছে তোমার বুকে। তুমি রোগা হয়ে গেছ ন্যাতাশা, কিন্তু চুল তোমার যেন আরো ঘন হয়ে উঠেছে... কী পরেছ ওটা? ও'দের সঙ্গে যখন ছিলে, পোশাকটা কি তখনই বানানো?'

'কী ভালোই না তুমি আমায় বাসো ভানিয়া!' মায়াভরে আমার দিকে তাকিয়ে ও বললে, 'আর তুমি, কী করছ তুমি আজকাল? কী রকম চলছে সব?'

'ঠিক আগের মতোই। উপন্যাসটা এখনো লিখে চলেছি, কিন্তু কঠিন লাগছে। এগুতে চাইছে না। প্রেরণাটা কেমন শুকিয়ে গেছে। তবু কোনো রকমে দাঁড় করাতে অবশ্য পারি, বলতে কি, চিত্তবিনোদনও করবে। কিন্তু চমৎকার একটা আইডিয়া নষ্ট হলে সে ভারি দুঃখের হবে। আমার সবচেয়ে প্রিয় আইডিয়ার ওটা একটা। অথচ পত্রিকায় দিতে হবে সময়মতো। ভাবছি, উপন্যাসটা নয় আপাতত ফেলে রেখে চট করে একটা আখ্যান-টাখ্যান লিখে ফেলি, লঘু, সুকুমার, বিষাদের একটু ছিটেও তাতে থাকবে না... মোটেই না... সকলেরই বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকা চাই!..'

'খেটে খেটেই সারা হবে, বেচারি! আর স্মিথের খবর কী?'

'স্মিথ তো মারা গেছে।'

'কিন্তু তোমায় দেখা দিচ্ছে না? ঠাট্টা নয় ভানিয়া, তুমি অসুস্থ, স্নায়ুগুলো তোমার বিকল হয়ে গেছে। এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন তোমায় পেয়ে বসে। যখন ঐ ঘরখানা ভাড়া নেবার কথা বলছিলে তখনই তোমার মধ্যে ওটা আমি লক্ষ্য করেছি। ঘরখানা তাহলে সোঁদা আর বিচ্ছিরি?'

'ভালো কথা! আজ সন্ধ্যেয় ওখানে আর একটা ব্যাপার ঘটেছে... তবে সেটা পরে বলব।'

আমার কথা ও আর শুনছিল না। বসে রইল চিন্তায় ডুবে গিয়ে।

'বুঝতে পারছি না, কেমন করে ও'দেরই আমি তখন ছেড়ে আসতে পেরেছিলাম। উত্তেজিত ছিলাম,' শেষ পর্যন্ত বলে ফেলল ও। আমার দিকে যে দৃষ্টিতে চেয়েছিল তাতে উত্তরের কোনো প্রত্যাশা নেই।

সেই মুহূর্তে যদি আমি ওকে কিছু বলতামও তাহলেও ও শুনতে পেত না।

প্রায় শোনা যায় না এমন একটা গলায় ও বললে, 'ভানিয়া, তোমায় আসতে বলেছিলাম তার একটা বিশেষ কারণ ছিল।'

'কী?'

'ওকে ছেড়ে দিচ্ছি।'

'ছেড়ে দিয়েছ নাকি ছেড়ে দেবে?'

'এই ধরনের জীবনের একটা সমাপ্তি টানতে হবে আমায়। তোমায় আসতে বলেছিলাম আজ সন্ধ্যেয় সবকিছু তোমায় বলব বলে, সবকিছু যা ইতিমধ্যে জমে উঠেছে, তোমায় যা এতদিনও জানাই নি।'

ওর গোপন অভিপ্রায়ের কথা প্রতিবারেই ও আমায় জানাতে শুরু করত এইভাবেই এবং প্রায় সর্বদাই দেখা যেত যে সেসব কথা সে অনেক আগে নিজেই আমায় বলেছিল।

'আহ্ নাতাশা, ও কথা তোমার কাছ থেকে আমি হাজার বার শুনেছি। অবশ্যই একসঙ্গে তোমাদের থাকা চলে না; তোমাদের সম্বন্ধটা ভারি অদ্ভুত রকমের, তোমাদের মধ্যে কিছুই মিল নেই। কিন্তু... তেমন জোর আছে কি তোমার?'

'আগে এটা ছিল শুধুই একটা ইচ্ছে ভানিয়া, কিন্তু আজ আমি মন একেবারে ঠিক করে ফেলেছি। ওকে আমি অসম্ভব ভালোবাসি, তবু দেখা যাচ্ছে আমিই ওর সবচেয়ে বড়ো শত্রু। ওর ভবিষ্যৎ আমি নষ্ট করে দিচ্ছি। মুক্তি ওকে দিতে হবে। আমায় বিয়ে করতে ও পারে না, বাপের বিরুদ্ধে যাবার শক্তি ওর নেই। আমিও চাই না ওকে বেঁধে রাখতে। তাই যে মেয়েটির সঙ্গে ওর বিয়ের ঠিক হচ্ছে তার প্রেমে ও পড়েছে দেখে আমি সত্যিই খুশি। তাতে ছাড়াছাড়িটা ওর পক্ষে বেশি সহজ হবে। এ আমায় করতেই হবে! আমার কর্তব্য এটা... ওকে যদি আমি ভালোবাসি, তাহলে ওর জন্যে সবকিছু আমায় ত্যাগ করতে হবে। ওর প্রতি আমার ভালোবাসার প্রমাণ দিতে হবে। এ যে আমার কর্তব্য! তাই না?'

'কিন্তু ওকে বোঝাতে তো তুমি পারবে না।'

'আমি ওকে বোঝাতে যাব না। এই মুহূর্তেই যদি ও আসে তবুও আমি ওর সঙ্গে ঠিক আগের মতোই ব্যবহার করব। কিন্তু একটা পথ আমায় বার করতে হবে, যাতে বিবেকদংশন অনুভব না করেই ও আমায় ত্যাগ করতে পারে সহজে। এই হয়েছে আমার জ্বালা, ভানিয়া। আমায় একটু সাহায্য করো তুমি। কিছু একটা পরামর্শ দিতে পারো না?'

বললাম, 'শুধু একটিই উপায় আছে, ওর প্রতি ভালোবাসা একেবারে মুছে দিয়ে অন্য কারো প্রেমে পড়া। কিন্তু সেটা ঠিক উপায় হবে কি না

সন্দেহ। ওর চরিত্র তো তুমি ভালোই জানো, নয় কি? আজ পাঁচদিন তোমার কাছে আসে নি। ধরে নাও ও তোমায় একেবারেই ছেড়ে দিল। কিন্তু যেই তুমি ওকে লিখে জানাবে যে তুমিই ওকে ছেড়ে দিচ্ছ, সেই মুহূর্তে ও ছুটে আসবে তোমার কাছে।'

'ওকে তুমি কেন দেখতে পারো না ভানিয়া?'

'আমি?'

'হ্যাঁ, তুমি, তুমি! গোপনে এবং প্রকাশ্যে তুমি ওর শত্রু। বিনা আক্রোশে তুমি ওর কথা কইতে পারো না। হাজার বার লক্ষ্য করে দেখেছি, ওর নিন্দা করা, ওর মুখে চুনকালি দেওয়াতেই তোমার সবচেয়ে বেশি আনন্দ! হ্যাঁ, চুনকালি দেওয়াই — খাঁটি কথা বলছি!'

'তুমিও হাজার বার এই কথাটাই বলে আসছ। যথেষ্ট হয়েছে নাতাশা, এ আলাপটা থাক।'

খানিক চুপ করে থেকে ও ফের বললে, 'আমি অন্য একটা বাসায় উঠে যেতে চাই। শোনো ভানিয়া, রাগ কোরো না...'

'তাতে কী, সেই অন্য বাসাতেই ও যাবে, আর সত্যি বলছি, রাগ করছি না।'

'ভালোবাসার শক্তি অনেক; নতুন ভালোবাসায় ও হয়ত আটকে থাকবে! আমার কাছে এলেও সে হবে শুধু এক মুহূর্তের জন্যে, তোমার কী মনে হয়?'

'জানি না নাতাশা। ওর ভেতর সবকিছুই ভয়ানক রকমের সব গরমিলে ভরা। ও চায় অন্য মেয়েটিকেও বিয়ে করতে আবার তোমাকেও ভালোবাসতে। কী করে যেন একই সঙ্গে দুটোই ও পারে।'

'যদি নিশ্চিত জানতাম যে ওই মেয়েটিকে সে ভালোবাসে, তাহলে মন ঠিক করতে দেরি হত না... ভানিয়া! কিছু লুকিয়ো না আমার কাছ থেকে! আমায় বলতে চাও না, এমন কিছু ঘটনা তোমার জানা আছে নাকি?'

জেরা করার মতো উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে ও চাইল আমার দিকে।

'সত্যি কিছু জানি না নাতাশা, হলফ করে বলছি। তোমার কাছে তো আমি কখনো কিছুই লুকোই না। তবে আমার যা ধারণা সেটা বলি: আমরা যা ভাবছি কাউণ্টেসের সৎমেয়ের সঙ্গে তেমন একটা কিছু প্রেমে ও পড়ে নি হয়ত। মানে শুধু একটা আকর্ষণ...'

'তাই মনে হয় তোমার ভানিয়া? ভগবান! যদি সেটা নিশ্চয় করে জানতে পারতাম! ওহ্ কী ইচ্ছে হচ্ছে ওকে এক্ষুনি একবার দেখতে, শুধু ওর মুখের দিকে চাইতে। ওর মুখ দেখেই সবকিছু টের পেতাম! কিন্তু ও যে নেই! নেই!'

'তুমি কি তাহলে ওর অপেক্ষায় আছ নাতাশা?'

'না, ও আছে ওরই সঙ্গে; লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিয়েছি। ভারি ইচ্ছে হয় মেয়েটার দিকেও একবার চেয়ে দেখতে... শোনো ভানিয়া, হয়ত বাজে বকছি, কিন্তু সত্যিই কি মেয়েটাকে একবার দেখতে পাওয়া অসম্ভব, কোথাও কি ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায় না? তুমি কী বলো?'

কী বলি শোনার জন্যে ও উৎকণ্ঠিত হয়ে রইল।

'দেখতে পাওয়া তো যায়। কিন্তু শুধু দেখে আর কতটা হবে।'

'শুধু একবার দেখতে পেলেই হবে। নিজেই তখন আমি সব বুঝে ফেলব। শোনো, ভারি বোকার মতো হয়ে গেছি আমি। অনবরত একা একা এখানে পায়চারি করে যাই, আর কেবলি ভাবি; সে ভাবনা যেন ঝড়ের মতো, কী অসহ্য! একটা কথা আমি ভেবেছি ভানিয়া, তুমি ওর সঙ্গে আলাপ করতে পারো না? তুমি তো নিজেই বলেছিলে, তোমার উপন্যাসখানা কাউণ্ডেসের ভালো লেগেছিল। প্রিন্স 'র'এর সান্ধ্য আসরে তুমিও তো মাঝে মাঝে যাও; মেয়েটিও যায় সেখানে। ওর সঙ্গে তোমার যাতে পরিচয় করিয়ে দেয়, তেমন কিছু করো। তা আলিওশাও তো তোমাদের আলাপ করিয়ে দিতে পারে। তখন ওর কথা আমায় সব বলবে।'

'নাতাশা, লক্ষ্মীটি, সে কথা পরে হবে। কিন্তু এইটে বলো, ছাড়াছাড়ি সহ্য করার মতো জোর তোমার আছে বলে সত্যিই কি ভাবো? নিজের দিকেই এখন একবার চেয়ে দেখো: সত্যিই কি তুমি সুস্থির?'

'জোর... আমি... পাব!' প্রায় অস্ফুট স্বরে ও বললে, 'ওর জন্যে সবকিছু আমি পারি! আমার গোটা জীবনটাই যে ওর জন্যে! কিন্তু কী জানো ভানিয়া, ও ওর সঙ্গে আছে, আমায় ভুলে থাকছে, বসে আছে ওই মেয়েটার সঙ্গে, কথা কইছে, হাসছে, ঠিক এখানে যেমন করত তেমনি, এইটে আমি কিছুতেই সইতে পারি না... মেয়েটার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে আছে, ওর তাকানোর ধরনটাই এমনি — আর ওর মনেও হচ্ছে না যে আমি এখানে... তোমার সঙ্গে।'

কথাটা শেষ না করেই ও থেমে গেল, হতাশায় চেয়ে রইল আমার দিকে।

'আচ্ছা নাতাশা, এই মাত্র তুমি আমায় বলছিলে...'

'আমাদের ছাড়াছাড়িটা হোক দুদিক থেকে, দুজনে একে সঙ্গে!' জ্বলন্ত চোখে ও বাধা দিলে আমার কথায়, 'এর জন্যে আমি নিজেই ওকে আশীর্বাদ করব। কিন্তু ভানিয়া, ও আগেই আমায় ভুলে যাবে তা সহ্য করা ভারি কঠিন! ওহ ভানিয়া, সে যে কী কষ্ট! নিজেকেই আমি নিজে বুঝি না: ভেবে-চিন্তে দাঁড়াল একরকম, কাজে অন্যরকম। কী যে হবে আমার!'

'যথেষ্ট হয়েছে নাতাশা, শান্ত হও!..'

'আজ নিয়ে পাঁচ দিন। প্রতিটি ঘণ্টা, প্রতিটি মুহূর্ত... ঘুমে জেগে কেবলি ওর চিন্তা! শোনো ভানিয়া, চলো যাই ওখানে, তুমি আমায় নিয়ে চলো!'

'যথেষ্ট হয়েছে, নাতাশা।'

'না, না চলো! তোমার জন্যেই শুধু অপেক্ষা করছিলাম! গত তিন দিন ধরে এই কথা ভাবছি। তোমায় যে চিঠিটা লিখেছিলাম, সে কেবল এই ভেবেই... আমায় নিয়ে যেতেই হবে, না করতে পারবে না... তোমারই অপেক্ষা করছিলাম... গত তিন দিন ধরে... আজ সন্ধ্যেয় ওখানে একটা পার্টি আছে। ও আছে ওখানে... চলো যাই!'

প্রায় যেন প্রলাপ বকছিল ও। বারান্দায় গোলমাল শোনা গেল। কারো সঙ্গে যেন কথা কাটাকাটি হচ্ছে মাভরার।

বললাম, 'চুপ করো তো নাতাশা, কে ও? শুনতে পাচ্ছ?'

অবিশ্বাসী হাসি নিয়ে ও শুনলে, তারপর হঠাৎ ভয়ানক শাদা হয়ে গেল।

প্রায় অস্ফুটস্বরে বললে, 'মাগো! কে ওখানে?'

আমাকে ধরে রাখতে যাচ্ছিল নাতাশা, কিন্তু আমি ওর হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম মাভরার কাছে। যা ভেবেছিলাম, লোকটা আলিওশা! মাভরাকে কী জিজ্ঞাসাবাদ করছিল ও; মাভরা ওকে প্রথমে ঢুকতে দিতে চাইছিল না।

কর্তৃত্বের ভাব দেখিয়ে মাভরা বলছিল, 'কোত্থেকে হাজির হলে বাপু? কী? কোথায় ঘুরঘুর করছিলে? বেশ, তাহলে এসো, ভেতরে এসো! কিন্তু আমায় তেল দিতে হবে না! জবাবটা কী দেবে?'

'কাকেও ভয় করি না আমি,' আলিওশা বললে বটে, তবে খানিকটা বিব্রতভাবে, 'চললাম ভেতরে!'

'বেশ, এসো ভেতরে! ভারি সেয়ানা লোক বাপ্‌্ তুমি।'

'হ্যাঁ, ঢুকবই তো! আরে! আপনিও দেখছি এখানে!' ও বললে আমায় দেখতে পেয়ে, 'ভালোই হয়েছে আপনি এখানে! আমিও এসে পড়েছি, দেখছেন তো... এবার কী করি...'

বললাম, 'সোজা ভেতরে চলে যান, ভয় কেন?'

'ভয় আমার কিছুই নেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কারণ সত্যি বলছি, কোনো অন্যায় আমি করি নি। আপনি কি ভাবছেন, করেছি? দেখবেন, এখনি সব দোষ কাটান করে দিচ্ছি। নাতাশা, ভেতরে যেতে পারি?' বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কেমন একটা জোর করা সাহস দেখিয়ে ও জিজ্ঞেস করলে।

কেউ জবাব দিলে না।

অস্বস্তিতে ও শুধালে, 'কী ব্যাপার?'

বললাম, 'কিছুই না। ও তো এক্ষুনি ছিল এখানে। হয়ত কেবল...'

সন্তর্পণে দরজা খুলে ভয়ে ভয়ে ভেতরে তাকাল আলিওশা। কাউকে দেখা গেল না ঘরে।

হঠাৎ ওর নজরে পড়ল জানলা আর আলমারির মাঝখানে কোণে ও দাঁড়িয়ে আছে লুকিয়ে, প্রায় মড়ার মতো। আজো পর্যন্ত ছবিটা মনে এলেই না হেসে পারি না। ধীরে ধীরে সাবধানে আলিওশা এগিয়ে গেল ওর দিকে।

'নাতাশা, কী ব্যাপার? শুভ সন্ধ্যে নাতাশা!' নাতাশার দিকে কেমন একটা আতঙ্কের দৃষ্টিতে চেয়ে ও বললে ভয়ে ভয়ে।

'কেন, কী আবার... কিছুই না!..' ভয়ানক বিচলিতভাবে জবাব দিলে নাতাশা, যেন দোষটা তারই, 'তুমি... একটু চা খাবে নাকি?'

একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে আলিওশা বলার চেষ্টা করলে, 'নাতাশা, শোনো... বোধ হয় তোমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে দোষটা আমার... কিন্তু আমার দোষ নেই, একটুও নেই। দাঁড়াও, তোমায় এখুনি সব বলছি।'

'কী দরকার?' ফিসফিস করে বললে নাতাশা, 'না, না, কোনো দরকার নেই... তার বদলে তোমার হাতটা বরং দাও আর অবিশ্যি... প্রতিবারের মতো...' কোণ থেকে বেরিয়ে এল ও। গালে রঙ ফিরল।

চোখদুটো ওর নামানো, যেন আলিওশার দিকে চাইতে ভয় পাচ্ছে। উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল আলিওশা, 'ঈশ্বর! সত্যি দোষ করলে কি তারপর ওর দিকে তাকাবার সাহস হত? দেখুন না, দেখুন না!' আমার দিকে ফিরে

ও বললে, 'এই তো, ওর ধারণা আমার দোষ; সবই আমার বিরুদ্ধে, বাইরে থেকে দেখলে সবকিছুই আমার বিরুদ্ধে! পাঁচ দিন আমি এখানে আসি নি! গুজব রটেছে, আমি আছি আমার ভাবী বউয়ের কাছে। কিন্তু কী দেখা গেল? নাতাশা আমায় আগে থেকেই ক্ষমা করে আছে! আসতেই ও বললে, "তোমার হাতটা দাও!" নাতাশা, লক্ষ্মী আমার, আমার দেবী! কোনো অন্যায় আমি করি নি, তুমি তা জেনে রেখো, একটুও না! বরং উল্টো, বরং উল্টো!'

'কিন্তু... কিন্তু তোমার যে ওখানেই থাকার কথা... তোমার নেমন্তন্ন আছে... এখানে এলে কেন বলো তো? ক-ক'টা... বেজেছে এখন?'

'সাড়ে দশটা! আমি গিয়েছিলাম ওখানে... কিন্তু শরীর ভালো নেই বলে চলে এসেছি, আর — এই প্রথম, পাঁচ দিনের মধ্যে এই প্রথম ছাড়া পেলাম। পেয়েই তোমার কাছে চলে এলাম নাতাশা। মানে, আগেও আসতে পারতাম, কিন্তু ইচ্ছে করেই আসি নি। কেন আসি নি? বলছি দাঁড়াও, সব বুঝিয়ে বলছি; সেই জন্যেই তো এলাম, বুঝিয়ে বলবার জন্যে; শুধু ভগবানের দিব্যি, এবার তোমার কাছে আমার একটুও দোষ হয় নি, একটুও না, একছিটে না!'

নাতাশা মাথা তুলে ওর দিকে চাইল... কিন্তু প্রত্যুত্তরের দৃষ্টিটা এত সততায় ভরা, মুখখানা ওর এত আনন্দিত, এত অকৃত্রিম আর খুশি যে তাকে অবিশ্বাস করা কঠিন। ভেবেছিলাম, এই ধরনের পুনর্মিলনের সময় আগেও কয়েক বার যা ঘটেছে তেমনি অস্ফুট চিৎকার করে ওরা এবার পরস্পরের আলিঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু নাতাশা যেন তার সুখের আতিশয্যে মাথাটা বুকের ওপর নামিয়ে হঠাৎ... নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। আলিওশা আর থাকতে পারল না। নাতাশার পা জড়িয়ে ধরলে ও। চুমু খেতে লাগল ওর হাতে পায়ে। যেন পাগলা হয়ে উঠেছিল ও। নাতাশার দিকে একটা আরামকেদারা এগিয়ে দিলাম। ও বসল তাতে। পায়ের ওপর খাড়া হয়ে থাকতে আর ও পারছিল না।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

মিনিটখানেক পরে আমরা সকলেই হাসতে শুরু করেছিলাম আধপাগলার মতো।

আমাদের সবাইকে ছাপিয়ে আলিওশার ঝঙ্কৃত গলার আওয়াজ উঠল, 'আরে আমাকে বলতে দাও না, বলতে দাও, এরা ভাবছে, সবই বুঝি আগের মতো... কোনো একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে আমি এসেছি... কিন্তু সত্যি বলছি, ভারি জরুরী একটা ব্যাপার আছে। আর, আপনারা কি চুপ করবেন না কখনো!'

কাহিনীটা বলার জন্যে ওর আগ্রহের সীমা ছিল না। সারা চেহারা থেকে ফুটে বেরুচ্ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটা খবর ওর আছে। কিন্তু সে খবরের সরল অহঙ্কারে যে গুরুগম্ভীর ভাব করেছিল ও তাতে সঙ্গে সঙ্গেই নাতাশা হেসে ফেললে। আমিও আপনা থেকেই হাসলাম তার পরে। ও যত চটতে লাগল, তত হাসি পেল আমাদের। আলিওশার বিরক্তি এবং তারপর তার ছেলেমানুষী হতাশায় অবশেষে আমাদের দশা হল গোগলের সেই নৌসেনানীর মতো, কেউ তার দিকে আঙুল দেখালেই যে হেসে কুটোপাটি হত। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মাভরা গভীর রোষে তাকিয়ে দেখতে লাগল আমাদের। গত পাঁচদিন ধরে ও পরিতৃপ্তি সহকারে যা আশা করে এসেছে তেমন একটা ভালোরকম 'ধোলাই' আলিওশাকে না দিয়ে আমরা সবই অমন ফুর্তিতে মেতে উঠেছি দেখে ভয়ানক বিরক্ত লাগছিল ওর।

আমাদের হাসিতে আলিওশার মনে ঘা লাগছে দেখে অবশেষে নাতাশা হাসি থামালে।

বললে, 'তা কী বলতে চাইছিলে?'

এতটুকু সম্মান না দেখিয়ে আলিওশাকে বাধা দিয়ে মাভরা জিজ্ঞেস করলে, 'তা কী, সামোভারে আঁচ দেব?'

'যাও তো, মাভরা, ভাগো এখন!' মাভরাকে দ্রুত তাড়াবার জন্যে হাত নাড়তে লাগল আলিওশা, 'যা যা ঘটেছে, ঘটছে এবং ঘটবে সব তোমাদের বলছি, কেননা এসবই আমি জেনে গেছি। দেখতে পাচ্ছি, বন্ধু, এ পাঁচদিন কোথায় ছিলাম তোমরা জানতে চাও — সেই কথাই তো আমি বলতে চাইছি, কিন্তু তোমরা বলতে দিচ্ছ না। মানে প্রথমত, এই গোটা সময়টা আমি তোমায় ঠকিয়েছি নাতাশা, অনেক দিন ধরে ঠকিয়ে আসছি। এই হল গে আসল ব্যাপার।'

'ঠকিয়েছ।'

'হ্যাঁ, পুরো একমাস ধরে তোমায় ঠকিয়ে আসছি। বাবা আসার আগে থেকেই শুরু করেছিলাম। এখন সবটা পুরোপুরি খুলে বলার সময় এসেছে। বাবা তখনো ফেরেন নি, মাসখানেক আগে আমি একটা লম্বা চিঠি পাই তাঁর কাছ থেকে, তোমাদের দুজনের কাউকেই তা বলি নি। চিঠিতে উনি স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিয়েছিলেন — এবং এমন কড়া করে যে আমি সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম — জানিয়ে দেন যে আমার বিয়ে স্থির হয়ে গেছে, কনেটি নিখুঁত; বলাই বাহুল্য, আমি তার যোগ্য নই, তবু ওকেই বিয়ে করতে হবে আমার। তাই আমি যেন তৈরি হতে শুরু করি, মাথা থেকে যত ছাইভস্ম যেন ঝেড়ে ফেলি, ইত্যাদি ইত্যাদি — ছাইভস্ম বলতে উনি যে কী বলতে চাইছেন তা তো বোঝাই যায়। তা, ওই চিঠিটির কথা আমি তোমাদের বলি নি...'

'না, বলো নি বৈকি!' বাধা দিল নাতাশা, 'দেখেছ, ভারি বড়াই! আসলে তুমি চিঠি পেয়েই সবই তো জানিয়েছিলে। বেশ মনে আছে, হঠাৎ কী রকম নরম আর বাধ্য হয়ে পড়েছিলে তুমি, আমার কাছ-ছাড়া হতে চাইছিলে না, যেন একটা দোষ করে এসেছ। তারপর টুকরো টুকরো করে গোটা চিঠিটার কথাই তুমি আমাদের বলেছিলে।'

'অসম্ভব! প্রধান কথাটা আমি নিশ্চয় তখন বলি নি। তোমরা দুজনে হয়ত কিছু আন্দাজ করে থাকতে পার, কিন্তু সে তোমাদের ব্যাপার। আমি নিজে বলি নি। জিনিসটা চেপে রেখেছিলাম বলে ভারি কষ্ট হচ্ছিল আমার।'

'মনে আছে, আলিওশা, আপনি অনবরত তখন আমার পরামর্শ চাইছিলেন, একটু একটু করে হলেও সবটাই তখন আমায় বলে দিয়েছিলেন, এমনভাবে, যেন জিনিসটা যদি ঘটে তাহলে কী হয়, এই রকম করে।' নাতাশার দিকে তাকিয়ে আমি যোগ করলাম।

নাতাশা বললে, 'সবই তুমি বলেছিলে বড়াই কোরো না বাপু! কিছু লুকিয়ে রাখার ক্ষমতা যেন তোমার আছে! কাউকে ঠকাবার সাধ্যিই যে তোমার নেই। মাভরা পর্যন্ত ব্যাপারটা সব জানে, জানো না, মাভরা?'

দরজা দিয়ে মাথাটা বার করে মাভরা জবাব দিলে, 'জানি না আবার! তিন দিন কাটতে না কাটতেই সবই তুমি বলে ফেলেছিলে। তোমার সাধ্যিই নেই চালাকি করার!'

'ধুত্তোরি সব! তোমাদের কাছে কিছু বলতে যাওয়াই একটা ঝামেলা! রাগের জ্বালায় তুমি এই সব করছ, নাতাশা! তুমিও ভুল করেছ মাভরা। বেশ মনে আছে, আমি তখন প্রায় পাগলের মতো হয়ে উঠেছিলাম। মনে আছে তোমার মাভরা?'

'মনে আবার থাকবে না। পাগলের মতো তুমি তো এখনো।'

'না, না, সে কথা মোটেই বলছি না। মনে আছে, তখন আমাদের কোনো টাকা ছিল না, আমার রুপোর চুরুট-বাক্সটা তুমি তখন বাঁধা দিতে গিয়েছিলে। কিন্তু প্রধান কথা, আমায় বলতেই হবে যে আমার কাছে তুমি বড়ো বেয়াদপি করো, মাভরা। নাতাশা তোমায় শিখিয়েছে এই সব। বেশ, না হয় ধরাই যাক, আমি তখন একটু একটু করে সবই বলেছিলাম (এখন মনে পড়ছে), কিন্তু সুর, চিঠির সুরটা সম্পর্কে তোমরা কিছুই জানো না। চিঠির সুরটাই হল ওর প্রধান কথা। সেই কথাটাই বলতে চাইছি।'

নাতাশা জিজ্ঞেস করলে, 'কেন, কী ছিল সুরে?'

'শোনো নাতাশা, তোমার কথায় মনে হচ্ছে যেন ঠাট্টা করছ। না, ঠাট্টা করো না। সত্যি বলছি, খুবই জরুরী ব্যাপার। চিঠির সুরটা ছিল এমন যে আমি হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম। বাবা কখনো আমায় অমন করে বলেন নি। ভূমিকম্পে লিস্‌বন তলিয়ে গেলেও তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে, এমনি ধারা একটা সুর!'

'তা বলো, বলো-না। কেন লুকিয়ে রেখেছিলে আমার কাছ থেকে?'

'আহ্, কেন আবার! তুমি ভয় পেয়ে যাবে বলে। ভেবেছিলাম, নিজেই সব ফয়সালা করে নেব। যাক, তারপরে তো ওই চিঠির পরে বাবা এলেন, আর আমার মুশকিল শুরু হল। তৈরি হচ্ছিলাম, কড়া করে, পরিষ্কার করে, গুরুত্ব দিয়ে ওঁকে জবাব দিয়ে দেব; কিন্তু কেমন যেন হয়ে উঠল না। আমায় কোনো প্রশ্নই উনি জিজ্ঞাসা করলেন না, সেয়ানা লোক তো! বরং এমন ভাব করলেন যেন সমস্ত ব্যাপারটা চুকে গেছে, আমাদের মধ্যে কোনো রকম ঝগড়াঝাঁটি, ভুল বোঝাবুঝি আর হতেই পারে না। বুঝতে পারছ, আর

হতেই পারে না — এমনি একটা আত্মবিশ্বাস! আর আমার সঙ্গে উনি ভারি সস্নেহ আর সুন্দর ব্যবহার করতে লাগলেন। স্রেফ অবাক হয়ে গেলাম। কী বুদ্ধিমান উনি, যদি জানতেন, ইভান পেত্রোভিচ। সবকিছু ওঁর পড়া, সবকিছু ওঁর জানা; একবার ওঁর দিকে তাকালেই উনি আপনার মনের ভাব সব বুঝে নেবেন। সেই জন্যেই বোধ হয় ওঁকে লোকে জেসুইট বলে। আমি ওঁর প্রশংসা করলে নাতাশা সইতে পারে না। রাগ কোরো না নাতাশা, যাক, এই হল গে ব্যাপার... ভালো কথা, আমায় উনি টাকা দিতেন না তো, এখন দিলেন, কালকে। নাতাশা, রানী আমার, আমাদের গরিবি এবার ঘুচল! এই দ্যাখো! গত ছয়মাসে শাস্তি হিসাবে আমার ভাতা থেকে উনি যা কেটে রেখেছিলেন সব কাল শোধ করে দিয়েছেন। দ্যাখো, কত টাকা — আমি এখনো গুনি নি। মাভরা, দ্যাখো, কত টাকা — বোতাম চামচে আর বাঁধা দিতে হবে না আমাদের!'

পকেট থেকে বেশ মোটা একতাড়া নোট বার করলে ও, হাজার দেড়েক রুবল। টেবিলের ওপর রাখলে। সহর্ষে টাকাটার দিকে তাকিয়ে মাভরা বাহবা দিলে আলিওশাকে। নাতাশা ওকে কথা চালিয়ে যাবার জন্যে খুব তাড়া দিচ্ছিল।

আলিওশা বলে চলল, 'তারপর তো ভাবলাম কী করি? মানে, কী করে ও'র বিরুদ্ধে যাই? মানে, উনি যদি আমার সঙ্গে খারাপ কিছু করতেন, অমন চমৎকার ব্যবহার না করতেন, তাহলে, তোমাদের দুজনের দিব্যি, এতটুকু চিন্তা করতাম না আমি। সোজাসুজি বলে দিতাম, আমি রাজী নই, আমি বড়ো হয়েছি, পুরুষমানুষ, ঐ আমার শেষ কথা। বিশ্বাস করো, নিজের গোঁ ধরে থাকতাম। কিন্তু এখন কী ওঁকে বলি? কিন্তু দোষ দিয়ো না আমায়। দেখতে পাচ্ছি, তুমি যেন খুশি হও নি নাতাশা। অমন মুখ চাওয়াচাওয়ি করছ কেন? বুঝি ভাবছ, ওকে ফাঁদে ফেলেছে, মনের জোর ওর এতটুকু নেই। আছে, যা ভাবছ তার চেয়ে অনেক বেশি জোর আমার আছে! তার প্রমাণ, ঐ অবস্থা সত্ত্বেও মনে মনে ঠিক করলাম, এ আমার কর্তব্য, বাবাকে সবকিছু বলতে হবে, সবকিছু। এবং তা বলেও দিয়েছি, সবকিছু বললাম, উনি শুনলেন।'

উদ্বিগ্ন হয়ে নাতাশা জিজ্ঞেস করলে, 'কিন্তু কী? কী কথাটা ও'কে বললে?'

'কেন, বললাম, আমি আর কাউকে বিয়ে করতে চাই না, কনে আমার আছে, সে — তুমি। মানে, কথাটা সরাসরি সব বলি নি, কিন্তু ও'কে তার আভাস দিয়ে এসেছি, কাল বলব; এই আমি ঠিক করেছি। প্রথমে, বললাম যে টাকার

জন্যে বিয়ে করাটা নিন্দের কাজ, নীচ কাজ, আমাদের নিজেদের অভিজাত বলে ভাবা বোকামি (একেবারে খোলাখুলি আলাপ, ভাইয়ে ভাইয়ে যেমন কথা হয় তেমনি)। পরে আমি ও'কে বোঝালাম, যে আমি tiers-état*, tiers-état c'est l'essentiel**, আমি ঠিক অন্য সকলের মতো বলে আমি গর্বিত, অন্য কারো থেকে পৃথক হয়ে থাকতে চাই না... বললাম বেশ উত্তেজিত হয়ে, বেশ আবেগ ভরে। নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। শেষকালে ও'র দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমি প্রমাণ করে দিলাম... সিধে কথায় ও'কে জানিয়ে দিলাম, আমরা যে রাজাবাহাদুর সেটা কী কিসিমের? শুধু বংশ, কিন্তু আসলে আমাদের মধ্যে রাজাবাহাদুরির কী আছে? প্রথমত, বিশেষ টাকাপয়সা আমাদের নেই, আর ধনই হল আসল কথা। আজকালকার সবচেয়ে বড়ো রাজাবাহাদুর হলেন রথশিল্ড। দ্বিতীয়ত, সত্যিকার উ'চু সমাজে দীর্ঘ দিন আমাদের কোনো নাম নেই। শেষ যাঁর নাম ছিল তিনি সেমিওন ভালকোভস্কি, খুড়ো, তাও তাঁর নাম যা ছিল সে শুধু মস্কোতে, এবং তাঁর শেষ তিনশ ভূমিদাসের সম্পত্তিটা উড়িয়ে দেবার জন্যেই। বাবা যদি নিজে টাকা উপার্জন না করে যেতেন তাহলে তাঁর নাতিদের বোধ হয় নিজ হাতেই চাষ করতে হত। এই তো সব রাজাবাহাদুর। তা নিয়ে আমাদের গুমোর করার কিছু নেই। মোট কথা, মনে মনে যাকিছু জমে উঠেছিল সবই তাঁকে বললাম, সবই — বললাম উত্তেজিত হয়ে, খোলাখুলি, এবং আরো কিছু যোগও করে দিয়েছিলাম। উনি এমনকি আপত্তি পর্যন্ত করলেন না। কাউণ্ট নাইন্‌স্কির কাছে যাতায়াত ছেড়ে দিয়েছি বলে কেবল বকলেন। পরে বললেন, আমার ধর্মমা প্রিন্সেস 'ক'এর সুনজরে পড়ার জন্যে আমি যেন চেষ্টা করি, উনি যদি আমায় ভালোভাবে নেন, তাহলে সবখানেই আমার আমন্ত্রণ আসবে, কেরিয়ার আমার পাকা হয়ে যাবে। এই সব বলে বলেই চললেন। পেছনকার ইঙ্গিতটা এই যে, আমি তোমার সঙ্গে থেকে সবাইকে নাকি বর্জন করেছি, এবং এ সবই নাকি তোমার প্রভাব। তবে এ পর্যন্ত সরাসরি উনি তোমার কথা তোলেন নি। ও কথাটা এড়িয়েই যেতে চান বোঝা যাচ্ছে। আমরা দুজনেই প্যাঁচ কষছি, তালে আছি, বেকায়দায় ফেলছি, আর তুমি নিশ্চিত থাকতে পার, আমাদেরই দিন আসবে।'

---

* তৃতীয় সম্প্রদায় (বা অনভিজাত) সাধারণ শ্রেণী। (ফরাসী ভাষায়)

** তৃতীয় সম্প্রদায় হল প্রধান কথা। (ফরাসী ভাষায়)

'সে ঠিক আছে, কিন্তু শেষটা কী হল; কী ঠিক করলেন উনি? সেই হল আসল কথা। আচ্ছা বকবক করতে পারো তুমি আলিওশা...'

'ওঃ, সে শুধু ঈশ্বরই বলতে পারেন। কী যে উনি ঠিক করেছেন তা বোঝার সাধ্যি নেই কারো। তাছাড়া বকবক আমি করছি না, কাজের কথাই কইছি: কোনো কিছুই উনি ঠিক করছিলেন না, শুধু আমার সব কথা শুনে হাসলেন। এবং সে এমন হাসি যেন আমায় করুণা করছেন। জানি জিনিসটা আমার পক্ষে অপমানকর, কিন্তু তাতে আমার লজ্জা নেই। বললেন, "তোমার সঙ্গে আমি একমত, তবু চলো কাউণ্ট নাইন্‌স্কির কাছে যাওয়া যাক, কিন্তু মনে রেখো এসব কোনো কথা সেখানে বলে বোসো না। আমি তোমায় বুঝতে পারছি, কিন্তু ও'রা তো বুঝবেন না।" আমার ধারণা উনি নিজেও বিশেষ পাত্তা পাচ্ছেন না সেখানে, কী একটা ব্যাপারে সকলেই চটে গেছে ও'র ওপরে। সমাজে ও'র প্রতি এখন একটা বিরাগ দেখা দিয়েছে। কাউণ্ট প্রথমে খুব জাঁক দেখান, কী জাঁক, যেন আমি যে তাঁর বাড়িতেই বেড়ে উঠেছি সে কথা তাঁর একদম মনে নেই। চেষ্টা করে যেন তাঁকে মনে করতে হল, বাপরে! স্রেফ আমার অকৃতজ্ঞতায় চটে গিয়েছিলেন উনি, যদিও আসলে আমার দিক থেকে কোনো অকৃতজ্ঞতাই ছিল না। ও'দের বাড়িটা অসহ্য একঘেয়ে, তাই সেখানে যাতায়াত করা ছেড়ে দিয়েছিলাম মাত্র। বাবার সঙ্গেও খুব একটা অবজ্ঞার ভাব দেখিয়েছিলেন তিনি, এতটা অবজ্ঞা যে বুঝি না কেন আদৌ তিনি যান ওখানে। ভারি বিচ্ছিরি লাগছিল আমার। ও'র সামনে নিজেকে একেবারে হেয় করে তুলতে হয়েছিল বেচারি বাবাকে। জানি তা নাকি শুধু আমার জন্যে, কিন্তু আমি তো কিছুই চাই না। মনে হচ্ছিল পরে তা সব বাবাকে বলব, কিন্তু সংযত করে নিলাম নিজেকে। সত্যি কী বা লাভ হত তাতে? ও'র বিশ্বাস তো আমি বদলে দিতে পারব না, শুধু ও'র মনঃকষ্টটাই বাড়িয়ে দেব — এমনিতেই তো বেশ মন খারাপ ও'র। ভাবলাম যাক গে, চালাকির আশ্রয় নেওয়াই ভালো, চালাকিতে হারিয়ে দেব ওদের সবাইকে, কাউণ্টের কাছ থেকে সম্মান আদায় করতে হবে। এবং কী হল বলো তো? অভীষ্ট সিদ্ধ করে নিলাম, একটি দিনের মধ্যেই সব বদলিয়ে গেল। কাউণ্ট নাইন্‌স্কির মুখে আমার প্রশংসা এখন আর ধরে না, আর এ সবই হল আমার কীর্তি, এ সবই আমার বুদ্ধির জোরে — বাবা একেবারে অবাক হয়ে গেছেন!..'

'শোনো আলিওশা, কাজের কথাটা বরং বলো!' অধীর হয়ে উঠল নাতাশা, 'ভাবছিলাম আমাদের সম্পর্কে কিছু বলবে, কিন্তু কেমন করে কাউণ্ট

নাইন্স্কির ওখানে আসর জমিয়েছ, শুধু সেইটেই শোনাতে চাও। তোমার ঐ কাউন্ট নিয়ে **কী হবে আমার?'**

'কী হবে তোমার! শুনলেন ইভান পেত্রোভিচ, শুনলেন তো কী বলছে নাতাশা? কিন্তু সেইটাই যে সবচেয়ে প্রধান ব্যাপার! পরে বুঝবে, সবটাই শেষে খোলসা হয়ে যাবে। ওই আমায় বলতে দাও... আর তারপর তো — (কেনই বা খোলাখুলি বলব না!) ব্যাপারটা তোমায় বলি, নাতাশা, আর ইভান পেত্রোভিচ, আপনাকেও বলি, বোধ হয় মাঝে মাঝে আমি সত্যিই ভারি অবিবেচকের মতো কাজ করি, মানে বলা যেতে পারে এমন কি বোকার মতো (আমি জানি মাঝে মাঝে বোকামিও করি আমি)। কিন্তু এই ক্ষেত্রে, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো, আমি রীতিমতো চালাকি খাটিয়েছি... মানে... শেষ পর্যন্ত এমন বুদ্ধিই দেখিয়েছি যে মনে হল, আমি সর্বদাই অমন... নির্বোধ নয় দেখে তোমরা নিজেরাই খুশি হবে।'

'ও কী কথা আলিওশা, কী বলছ, ছি, লক্ষ্মীটি!..'

আলিওশাকে নির্বোধ ভাবা হচ্ছে এটা নাতাশা সইতে পারত না। বিশেষ ভদ্রতা না করে আলিওশাকে যখন দেখিয়ে দিতাম তার কিছু একটা বোকামি, কতবার সে যে আমার ওপর চটেছে, অথচ মুখ ফুটে কিছু বলে নি? মনের মধ্যে এই ছিল তার একটা জখম জায়গা — আলিওশাকে হেয় করা হচ্ছে তা ও সইতে পারত না, সম্ভবত সেটা আরো এই জন্যে যে আলিওশার সীমাবদ্ধতাটা ও নিজেই বুঝত। কিন্তু পাছে আলিওশার অভিমানে লাগে এই জন্যে তার নিজের অভিমত সে কখনো তার কাছে প্রকাশ করে নি। কিন্তু এই ব্যাপারটায় আলিওশার অনুভূতি ছিল অত্যন্ত প্রখর, নাতাশার গোপন মনোভাব সে সর্বদাই ধরে ফেলত। তা দেখে খুব কষ্ট হত নাতাশার, সঙ্গে সঙ্গেই ওর প্রশংসা করে আদর করার চেষ্টা করত। সেই জন্যেই আলিওশার কথায় ওর মনে এখন এত কষ্ট লাগল...

বললে, 'যত বাজে কথা আলিওশা; তুমি একটু লঘুচিত্ত এই মাত্র। নিজেকে যা ভেবে ছোটো করছ মোটেই তুমি তা নও।'

'বেশ তো, না হলে ভালোই; তা এখন শেষ করতে দাও। কাউন্টের ওখানে ঢুঁ মারার পর বাবা আমার ওপর ভারি রেগে উঠলেন। মনে মনে ভাবলাম, আর একটু রোসো! তখন আমরা প্রিন্সেসের ওখানে যাচ্ছিলাম। বহুদিন আগেই শুনেছিলাম, ওঁকে বাহাত্তুরে ধরেছে, তার ওপর কানে কালা, ক্ষুদে কুকুরের ভয়ানক ভক্ত। এক দঙ্গল ক্ষুদে কুকুর আছে ওঁর, প্রায় পুজো করেন

সেগ্যলোকে। এসব সত্ত্বেও সমাজে ওঁর ভয়ানক প্রতিষ্ঠা। এমনকি le superbe* কাউণ্ট নাইন্‌স্কিও তাঁকে antichambre** করে থাকেন। পথে যেতে যেতে তাই আমার ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতির একটা পরিকল্পনা ছকে ফেললাম। কিসের ভরসায় ছকলাম বলো তো? কুকুরেরা আমায় খুব পছন্দ করে, এই ভরসায়, সত্যি! সে আমি লক্ষ্য করেছি। হয় আমার মধ্যে কিছু একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, নয়ত সব জন্তুজানোয়ারই আমার ভালো লাগে, ঠিক জানি না। তবে শুধু কুকুরেরা আমায় পছন্দ করে এই হল গে কথা! আকর্ষণী শক্তির কথা বলতে গিয়ে মনে হল তোমায় বুঝি বলি নি নাতাশা, সেদিন আমরা "প্রেত ডেকেছিলাম," একজন প্রেততত্ত্ববিদের কাছে গিয়েছিলাম আমি; ভয়ানক অদ্ভুত ব্যাপার, ইভান পেত্রোভিচ, একেবারে থ হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ডেকেছিলাম জুলিয়াস সীজারকে।'

খিলখিল করে হেসে উঠে নাতাশা বললে, 'আ, মরণ। জুলিয়াস সীজারকে কেন? এইটাই বাকি ছিল বটে!'

'কেন নয়... যেন আমি একটা... কেন জুলিয়াস সীজারকে ডাকব না শুনি? তাতে কী হবে ও'র? আর নাতাশা হাসছে!'

'তাঁর কিছু অবিশ্যি হবে না... উঃ, আচ্ছা লোক বটে তুমি! তা জুলিয়াস সীজার কী বললেন তোমায়?'

'আরে না, তিনি কিছু বলেন নি। আমি শুধু পেনসিলটা ধরে ছিলাম আর পেনসিলটা আপনা থেকেই কাগজের ওপর লিখে যেতে থাকল। ওরা বললে, জুলিয়াস সীজারই নাকি লিখছেন। আমার সেটা বিশ্বাস হয় না।'

'কিন্তু কী লিখলেন সীজার?'

'মানে ওই গোগলের "ভিজিয়ে নাও"*** ধরনের খানিকটা... দোহাই, হাসি থামাও!'

'থাক, এবার প্রিন্সেসের কথা বলো!'

'কিন্তু তোমরা অনবরত বাধা দিচ্ছ আমায়। প্রিন্সেসের ওখানে পেঁছে আমি তো মিমি'র সঙ্গে প্রেম জমাতে শুরু করলাম। মিমি হল গে একটা বুড়ো বিচ্ছিরি বীভৎস কুকুর — তার ওপর একগুঁয়ে, কামড়াতে ভালোবাসে।

---

* গণ্যমান্য। (ফরাসী ভাষায়)

** উপকক্ষ। (ফরাসী ভাষায়) এখানে — তোষামোদ করার অর্থে। — সম্পাঃ

*** গোগলের একটি নাটকে জমিদার গিন্নির উইলে নামোল্লেখে হাস্যকর ভুল। — সম্পাঃ

কুকুরটাকে নিয়ে প্রিন্সেস পাগল, প্রায় পুজো করেন বললেই হয়। আমার ধারণা, ওরা দুজনেই বোধ হয় সমবয়সী। মিমিকে মিষ্টি খাওয়াতে শুরু করলাম। মিনিট দশেকের মধ্যেই হ্যান্ডশেক করা শিখিয়ে দিলাম কুকুরটাকে, ও'রা এ জিনিসটা ওকে আগে শেখাতে পারেন নি। প্রিন্সেস একেবারে আনন্দে আটখানা, খুশিতে কেঁদে ফেলেন আর কি। "মিমি! মিমি! মিমি যে হ্যান্ডশেক করছে!" কে একজন এল: "মিমি হ্যান্ডশেক করছে, আমার ধর্মব্যাটা শিখিয়ে দিয়েছে!" কাউণ্ট নাইন্‌স্কি এলেন: "মিমি হ্যান্ডশেক করছে!" বৃদ্ধা আমার দিকে তাকালেন প্রায় স্নেহের অশ্রু নিয়ে। অদ্ভুত সদয়া এক বৃদ্ধা। ও'র জন্যে আমার কষ্টই হল। কিন্তু সুযোগ ফসকাতে দিলাম না। ফের ও'কে তেল দিতে শুরু করলাম: একটি নস্যির কৌটো আছে ও'র, তাতে কনে হিসেবে ও'র একটা ছবি, বছর ষাটেক আগেকার। নস্যির কৌটোটা ও'র পড়ে গেল। আমি তুলে দিয়ে যেন চিনি না এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠলাম, Quelle charmante peinture!* নিখুঁত সুন্দর! ব্যস্, তাতে উনি একেবারেই গলে গেলেন; এটা সেটা গল্প করতে লাগলেন আমার সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলেন কোথায় পড়েছি, বন্ধুবান্ধব কে আছে; বললেন, আমার চুলগুলো ভারি সুন্দর, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমিও একটা কেচ্ছার চুটকি শুনিয়ে ওঁকে হাসালাম। ওসব জিনিস উনি বেশ পছন্দ করেন। আঙুল তুলে আমায় শাশালেন বটে, কিন্তু হাসলেন প্রাণ খুলে। আমায় যখন ছাড়লেন, তখন চুমু খেয়ে আশীর্বাদ জানালেন। জেদ করলেন, রোজ এসে যেন তাঁকে আনন্দ দিই। কাউণ্ট আমার হাতে চাপ দিলেন, চোখ তাঁর একেবারে সোহাগে রসসিক্ত। আর আমার বাবা — দুনিয়ায় সব থেকে সৎ, সদয়, আর ভদ্র লোক হওয়া সত্ত্বেও, বিশ্বাস করো চাই না করো, বাড়ি ফেরার সময় উনি প্রায় আনন্দে কেঁদে ফেললেন। আমায় জড়িয়ে ধরলেন, কেরিয়ার, মুরুব্বী, বিয়ে, টাকা এই সব নিয়ে অদ্ভুত রকমের সব গোপনীয় কথা কইতে লাগলেন খোলাখুলি। তার অনেক কথাই আমি বুঝি নি। তখনই টাকাটা দিলেন আমাকে। ব্যাপারটা ঘটেছে কাল। আগামী কাল ফের প্রিন্সেসের ওখানে যেতে হবে। কিন্তু যাই হোক, বাবা আমার খুব সজ্জন লোক — তোমার কাছ থেকে আমায় উনি সরিয়ে নিতে চাইলেও অন্য কিছু ভেবো না, নাতাশা, তার কারণ শুধু এই যে, ও'র চোখ ঝলসিয়ে গেছে, কাতিয়ার লাখ লাখ টাকা উনি চান, তোমার

* কী চমৎকার ছবি। (ফরাসী ভাষায়)।

তো টাকা নেই, — আর সে টাকা উনি চান তো শুধু আমারই জন্যে। তোমার ওপরে উনি অবিচার করছেন তোমায় জানেন না বলে। কোন বাপে না সন্তানের মঙ্গল চায়? টাকার অংক দিয়ে সুখের হিসাব করা যদি ও'র অভ্যাস হয়ে থাকে তবে সেটা ও'র দোষ নয়। ও'রা সকলেই হলেন ওইরকমই। সেই দিক থেকে ও'কে বিচার করলে, দেখা যাবে উনি ঠিকই করছেন। তোমার কাছে তাড়াহুড়ো করে এলাম ইচ্ছা করেই, নাতাশা, এইটে তোমার বুঝিয়ে বলব বলে। কেননা জানি তুমি ও'র বিপক্ষে, কিন্তু সে অবিশ্যি তোমার দোষ নয়। সেজন্যে তোমায় দোষ দিই না...'

নাতাশা শুধাল, 'তার মানে, যা ঘটেছে তা শুধু এই যে প্রিন্সেসের ওখানে তুমি একটা ঠাঁই করে নিয়েছ। এই হল গে তোমার সবখানি বুদ্ধিমত্তা, তাই তো?'

'মোটেই না! কী বলছ তুমি! এ তো শুধু শুরু... প্রিন্সেসের কথা তোমায় বললাম এই জন্যে, বুঝেছ তো, তাঁর মারফত বাবাকে আমি হাতে পাব, কিন্তু আমার আসল গল্প এখনো শুরুই হয় নি।'

'তাহলে বলো সেটা!'

'আজ সকালে আর একটি অ্যাড্‌ভেঞ্চার হয়েছে আমার। ভারি অদ্ভুতও বটে। এখনো তার ঘোর কাটে নি,' আলিওশা বলে চলল। 'তোমাদের বলে রাখতে চাই যে যদিও কাউণ্টেস আর বাবার মধ্যে আমার বিয়ে সম্পর্কে সব কথা ঠিক হয়ে গেছে তবু এখনো পর্যন্ত সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় নি, তাই লোক নিন্দা-ফিন্দার ভয় না করেই এখনই আমরা তা ভেঙে দিতে পারি। একমাত্র কাউণ্ট নাইন্‌স্কিই ব্যাপারটা জানেন, কিন্তু ও'কে আমাদের আত্মীয় আর হিতৈষী বলে ধরা হয়। তার চেয়ে বড়ো কথা, এই পনেরো দিনের মধ্যে কাতিয়ার সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হলেও আজ সন্ধ্যের আগে ভবিষ্যৎ অর্থাৎ বিয়ে... মানে, প্রেম সম্পর্কে আমরা একটা কথাও বলি নি। তাছাড়া প্রিন্সেস 'ক'এর সম্মতি আমাদের চাইতে হবে প্রথমে, কেননা ও'রই নেকনজরের আশায় আছি আমরা, আমাদের জন্যে সোনাদানা ঢালবেন। আর উনি যা বলবেন, সম্ভ্রান্ত সমাজও তাই বলবে। এমনি প্রতিষ্ঠা আছে ও'র... এদিকে ও'দের ভারি ইচ্ছে, সমাজে আমায় এগিয়ে দেওয়া। এ সব ব্যাপারে কিন্তু কাতিয়ার সৎমা, কাউণ্টেসই সবচেয়ে বেশি জেদাজেদি করছেন। কারণ, বিদেশে ও'র কীর্তিকলাপের জন্যে প্রিন্সেস হয়ত ও'কে তাঁর নিজের বাড়িতে ডাকতে রাজী হবেন না, আর প্রিন্সেস রাজী না হলে আর কেউই হয়ত

রাজী হবে না। তাই কাতিয়ার সঙ্গে আমার বিয়েটা তাঁর পক্ষে একটা ভালো সুযোগ। আর কাউণ্টেস আগে এই বিয়ের ভারি বিপক্ষে থাকলেও প্রিন্সেসের কাছে আমার খাতির দেখে আজ ভারি খুশি হয়ে গেছেন। কিন্তু সে হল অন্য কথা। আসল কথা হল এই যে, গত বছর থেকে কাতেরিনা ফিওদরোভনার সঙ্গে আমার চেনা, কিন্তু তখন আমি নেহাৎ ছোটো, কিছুই বুঝতাম না, তাই ওর মধ্যে তখন কোনো কিছু দেখি নি...'

নাতাশা বাধা দিল, 'তার কারণ তখন আমায় তুমি অনেক বেশি ভালোবাসতে। তাই ওর মধ্যে কিছু দেখ নি, কিন্তু এখন...'

'ও রকম কথা বলো না, নাতাশা।' উত্তেজিতভাবে বললে আলিওশা, 'ওটা তোমার মস্ত ভুল, আমারও অপমান করছ তুমি... ও কথার প্রতিবাদ পর্যন্ত আমি করব না। আরো সবটা শোনো, তাহলেই বুঝতে পারবে... ওহ্, কাতিয়ার সঙ্গে শুধু যদি তোমার আলাপ থাকত! যদি জানতে, কী নরম, নির্মল, কপোতের মতো পবিত্র ওর মনটা! কিন্তু সে তুমি দেখতেই পাবে, শুধু সবটা পুরো শোনো! দিন পনেরো আগে, তাঁরা ফিরে আসতেই বাবা আমায় যখন কাতিয়ার সঙ্গে দেখা করাবার জন্যে নিয়ে গেলেন, তখন আমি ওকে খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করতে শুরু করেছিলাম। দেখলাম, কাতিয়াও আমায় লক্ষ্য করছে। এতে আমার খুবই কৌতূহল হল অবিশ্যি। ওকে আরো ভালো করে জানার একটা বিশেষ সংকল্প যে আমার ছিল, সে কথা নয় ছেড়েই দিচ্ছি — সেই যে বাবার ওই চিঠিটা আমায় অমন করে দিয়েছিল, সেটা পাবার পরই সংকল্পটা জাগে। কিন্তু ওর কথা কিছু বলতে চাই না, ওর প্রশংসা করতে যাব না। শুধু একটি কথা বলব, ও'দের মহলে ও একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। এমন একটা মৌলিক ধরনের স্বভাব ওর, এমন দৃঢ় সত্যনিষ্ঠ মন, পবিত্রতা আর সততার জন্যেই তার এমন জোর, — যে ওর পাশে আমায় লাগে একটা বালকের মতো, যেন ওর ছোটো ভাই, অথচ বয়স ওর মাত্র সতেরো। আরো একটা ব্যাপারও লক্ষ্য করেছি — ওর মধ্যে যেন ভারি দুঃখ আছে, কেমন যেন একটা গোপনতা, বেশি কথা ও বলে না। বাড়িতে অধিকাংশ সময়েই থাকে চুপ করে, যেন কথা কইতে ভয় পায়... কী যেন ভাবে। আমার ধারণা আমার বাবাকে ও ভয় করে। সৎমাকেও পছন্দ করে না, সেটা ধরতে পেরেছি। কাউণ্টেস নিজে থেকেই কোনো একটা মতলবে ওই গল্পটা চালু করেছেন যে সৎমেয়ে নাকি ও'কে ভয়ানক ভালোবাসে। সে কথা একদম বাজে। বিনা প্রশ্নে কাতিয়া শুধু ও'র কথা মেনে চলে, মনে হয় এই রকম কোনো একটা বোঝাপড়া আছে ওদের

মধ্যে। এই সব লক্ষ্য করে করে চারদিন আগে মন ঠিক করে ফেললাম, আমার সংকল্প কাজে করে ফেলতে হবে, আর আজ সন্ধ্যেয় তা করেও এলাম। ব্যাপারটা হল, কাতিয়াকে সব বলা, সব স্বীকার করা, ওকে আমাদের পক্ষে টেনে এনে ব্যাপারটা সব চুকিয়ে দেওয়া...'

'তার মানে? কী বলা? কী স্বীকার করা?' অস্বস্তিভরে জিজ্ঞেস করলে নাতাশা।

'সবকিছু, একেবারে সমস্ত কথা,' জবাব দিলে আলিওশা, 'ভগবানের কৃপায় চিন্তাটা খুব এসে গিয়েছিল মাথায়, কিন্তু শোনো, শোনো! চারদিন আগে ঠিক করলাম, তোমাদের কাছ থেকে সরে গিয়ে নিজেই ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলব। তোমরা সঙ্গে থাকলে অনবরত ইতস্তত করতাম, তোমাদের কথা শুনতাম, ফলে আর সাহসই পেতাম না। কিন্তু একলা থাকায় নিজেকে এমন অবস্থায় ফেলেছি যে প্রতি মুহূর্তে মনে মনে আওড়েছি যে ব্যাপারটা শেষ করতে হবে, শেষ করা আমার কর্তব্যই, বুকে বল এনে ব্যাপারটা শেষ করে দিয়েছি! ঠিক করেছিলাম সব সমাধান হাতে নিয়ে তোমাদের কাছে আসব, এবং তাই এসেছি!'

'সে কী, সে কী! কী ঘটল? তাড়াতাড়ি বলো-না।'

'খুব সোজা! সরাসরি, সততা নিয়ে সাহস করে গেলাম ওর কাছে... কিন্তু এর আগেই একটা ব্যাপার ঘটেছিল, সেটা প্রথমত তোমাদের বলা দরকার। ঘটনাটা খুব অবাক করে দিয়েছিল আমায়। বেরুবার আগে বাবা কী একটা চিঠি পান। আমি সেই সময় ও'র কাজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ি। উনি আমায় দেখতে পান নি। চিঠিটায় উনি এমন অভিভূত হন যে নিজের মনে মনেই বিড়বিড় করতে থাকেন, অস্ফুট কী চিৎকার করলেন, অপ্রকৃতিস্থের মতো পায়চারি করতে লাগলেন ঘরের মধ্যে, তারপর হঠাৎ হেসে উঠলেন — চিঠিটি তাঁর হাতের মধ্যে ধরা। ভেতরে যেতে সাহস পাচ্ছিলাম না। আরো কিছু অপেক্ষা করে ঢুকলাম। কোনো কারণে বাবা বেদম খুশি হয়ে গিয়েছিলেন, ভীষণ খুশি। কেমন অদ্ভুতভাবে কথা কইলেন আমার সঙ্গে। তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন চট করে তৈরি হয়ে নিতে; অথচ তখনো যাবার সময় হয় নি। ওদের ওখানে আজ আর কেউ ছিল না, শুধু আমরা দুজন। মিছেই তুমি ভেবেছ নাতাশা যে পার্টি ছিল, একটা বাজে খবর পেয়েছ...'

'আহ্, যা বলছিলে সেইটে বলো আলিওশা; কাতিয়াকে কী বললে?'

'সৌভাগ্যক্রমে কাতিয়ার সঙ্গে একলা ছিলাম পুরো দু'ঘণ্টা। ওকে স্রেফ বলে দিলাম যে যদিও ওর সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে, তবু সে বিয়ে অসম্ভব, ওর প্রতি আমার খুবই টান আছে এবং ও-ই শুধু আমাকে বাঁচাতে পারে। তারপর সবকিছু আমি খোলাখুলি বললাম। আর জানো, আমাদের ঘটনাটা ও কিছুই জানত না নাতাশা, তোমার আমার ব্যাপারটা। কী রকম ও বিচলিত হয়েছিল যদি দেখতে। প্রথমটা ভয়ই পেয়ে গেল। শাদা হয়ে গেল একেবারে। আমাদের পুরো কাহিনীটা ওকে বললাম — আমার জন্যে তুমি যে বাড়ি ছেড়েছ, একসঙ্গে আমরা থেকেছি, কী রকম বিপদে পড়েছি, কত কী ভয় পেয়েছি। এখন ওর দ্বারস্থ হয়েছি (তোমার নাম করেও বলেছি নাতাশা), আমাদের পক্ষ নিয়ে সোজাসুজি ওর সৎমাকে বলে দিক যে আমায় ও বিয়ে করবে না। ওই হল আমাদের পরিত্রাণের একমাত্র পথ, কারো কাছ থেকে আর কিছু আশা করার আমাদের নেই। ভারি আগ্রহ নিয়ে, ভারি দরদ দিয়ে ও শুনলে। চোখদুটো ওর কী রকম যে দেখাচ্ছিল সে সময়! ওর সমস্ত অন্তর যেন দৃষ্টিতে ভেসে উঠেছিল। একেবারে নিখুঁত নীল চোখ। ওকে অবিশ্বাস করি নি বলে ও আমায় ধন্যবাদ জানিয়ে প্রতিশ্রুতি দিলে যথাসাধ্য সাহায্য করবে। তারপর তোমার কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। বললে তোমার সঙ্গে আলাপ করার ওর ভারি ইচ্ছে, তোমায় বলতে বলেছে, বোনের মতো ও তোমায় ভালোবাসে, তুমিও যেন ওকে বোনের মতো ভালোবাসো। তারপর আমি পাঁচদিন তোমায় দেখি নি শুনেই তোমার কাছে যাবার জন্যে আমায় পীড়াপীড়ি করতে লাগল...'

অভিভূত হয়ে পড়ল নাতাশা।

'অথচ দ্যাখো দিকি আলিওশা, কোন এক কালা প্রিন্সেসের কাছে কী কেরামতি দেখিয়েছ সেই গল্পটাই করতে পারলে আগে।' ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে আলিওশার দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, 'আচ্ছা, কাতিয়া বিদায় দেবার সময় কি ওকে খুশি দেখাচ্ছিল?'

'হ্যাঁ, কিছু একটা উপকার করতে পেরেছে বলে ও খুশি হয়েছিল বটে, কিন্তু নিজে কাঁদছিল। কেননা কাতিয়াও যে আমায় ভালোবাসে নাতাশা! ও স্বীকার করলে যে আমায় ও ভালোবাসতে শুরু করেছিল; লোকজনের সঙ্গে বিশেষ মিশতে পায় না, অনেক দিন থেকেই আমাকে ওর ভালো লেগেছিল; আমায় ওর পছন্দ বিশেষ করে এই কারণে যে চারিদিকে ও শুধু ধূর্তামি আর প্রতারণা দেখছে, আমায় ওর মনে হয়েছিল সৎ অকপট মানুষ। উঠে দাঁড়িয়ে ও

বললে, "তা ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, আলেক্সেই পেত্রোভিচ, ওদিকে আমি ভেবেছিলাম..." কথা শেষ না করেই কেঁদে ফেলে ও ঘর ছেড়ে চলে যায়। আমরা ঠিক করেছি, আগামী কাল ও সৎমাকে জানাবে যে আমায় বিয়ে করতে ও রাজী নয়, আমিও কাল বাবাকে সবই বলব, বলব নির্ভয়ে, শক্ত হয়ে। আগেই বাবাকে বলি নি বলে ও আমায় ভর্ৎসনা করলে। বললে, "সৎ লোকের কিছুতেই ভয় পাওয়া উচিত নয়।" ভারি উঁচু মন মেয়েটির। আমার বাবাকেও ও পছন্দ করে না। বলে, উনি ভারি ধূর্ত, শুধু টাকার খাঁই। আমি বাবার পক্ষ নিয়ে কথা কইলাম, কিন্তু ও আমায় মানলে না। আগামী কাল যদি বাবাকে রাজী করাতে না পারি (ওর দৃঢ় ধারণা পারব না) তাহলে প্রিন্সেস 'ক'কে সাহায্য করার জন্যে বলব, এতে ও-ও রাজী। তখন কেউ আর তার বিরুদ্ধতা করতে সাহস পাবে না। আমরা শপথ করেছি, পরস্পর ভাই-বোনের মতো থাকব আমরা। ওহ্, যদি ওর কাহিনীটি তুমিও শুনতে! কী রকম দুঃখী ও, সৎমায়ের সঙ্গে এই জীবনযাপন, ঐ পরিবেশ সম্পর্কে কী ঘেন্নাই না ওর আছে... সরাসরি ও আমায় বলে নি, আমাকেও বলতে সাহস পাচ্ছিল না, কিন্তু কয়েকটা কথা যা বলেছে তা থেকেই আমি আন্দাজ করতে পেরেছি। নাতাশা, লক্ষ্মী আমার! তোমায় একবার দেখলে ও যে কী মুগ্ধ হবে! কী ভালো ওর মন! মিষ্টি স্বভাব! তোমরা যেন জন্মেছই দুই বোন হয়ে, পরস্পরকে ভালোবাসতে হবে তোমাদের। সারাক্ষণ শুধু সেই কথাই ভাবছি। সত্যি, ইচ্ছে করে তোমাদের দুটিকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখি। কিছু মনে করো না নাতাশা, লক্ষ্মীটি আমার, ওর কথা একটু বলতে দাও। ইচ্ছে করে শুধু তোমার কাছে ওর কথা আর ওর কাছে তোমার কথা বলি। তুমি তো জানো, সকলের চেয়ে, ওর চেয়েও তোমায় আমি ভালোবাসি... তুমি যে আমার সর্বস্ব!'

নীরবে নাতাশা তাকিয়ে রইল ওর দিকে, সে দৃষ্টিতে সোহাগ আছে তবু কেমন যেন বিষণ্ণ। আলিওশার কথায় ওর তৃপ্তি আছে, তবু যন্ত্রণাও আছে যেন।

আলিওশা বলে চলল, 'অনেক আগে, হপ্তা দুয়েক আগে কাতিয়ার মূল্য বুঝেছিলাম। রোজ সন্ধ্যেয় যে ওদের ওখানে যেতাম। ফিরে এসে কেবলি তোমাদের দুজনের কথা ভাবতাম, দুজনের তুলনা করতাম।'

'কাকে ভালো বলে মনে হত?' হেসে জিজ্ঞেস করলে নাতাশা।

'কখনো তোমায়, কখনো ওকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমিই জিততে। আবার

ওর সঙ্গে যখন কথা কই, তখন নিজেই হয়ে উঠি ভালো, আরেকটু যেন বুদ্ধিমান, উঁচু। কিন্তু কাল, কালকেই সব নিষ্পত্তি হয়ে যাবে!'

'ওর জন্যে কষ্ট হচ্ছে না তোমার? ও তো তোমায় ভালোবাসে, বললে, তুমি নিজেই তা লক্ষ্য করেছ, তাই না?'

'হ্যাঁ, কষ্ট হচ্ছে নাতাশা! কিন্তু তিনজনেই আমরা পরস্পরকে ভালোবাসব, তখন...'

'তখন বিদায়!' মৃদুস্বরে বললে নাতাশা যেন নিজের মনেই। অবুঝ দৃষ্টিতে আলিওশা তাকাল তার দিকে।

কিন্তু আমাদের আলাপ হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে থেমে গেল। এ বাড়ির যেটি রান্নাঘর, সেইটেই ঘরে ঢোকার বারান্দা। সেখান থেকে একটু গোলমাল শোনা গেল, যেন কেউ এসেছে। মিনিটখানেক পরে মাভরা দরজা খুলে চুপিসারে ডাকলে আলিওশাকে। সকলেই আমরা চোখ ফেরালাম ওর দিকে।

রহস্যময় কণ্ঠে মাভরা জানালে, 'তোমাকে একজন খুঁজছে, একটু এসো।'

'কে আবার এখন আমার খোঁজে এল?' আমাদের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আলিওশা বললে, 'গিয়ে দেখে আসি।'

চাপরাশ আঁটা প্রিন্সের চাকরটা দাঁড়িয়ে ছিল রান্নাঘরে। জানা গেল, বাড়ি যাবার পথে প্রিন্স নাতাশার বাসার সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেখতে পাঠিয়েছে আলিওশা আছে কিনা। এইটুকু জানিয়েই চাপরাশী চলে গেল।

'আশ্চর্য! আগে তো কখনো এমন করেন নি,' বিহ্বল হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললে আলিওশা, 'কী ব্যাপার?'

নাতাশা ওর দিকে চাইলে শঙ্কার দৃষ্টিতে। হঠাৎ ফের দরজা খুলল মাভরা।

'প্রিন্স নিজেই এসে গেছেন!' চাপা গলায় তাড়াতাড়ি খবরটা দিয়েই ও অদৃশ্য হল।

বিবর্ণ হয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নাতাশা। হঠাৎ চোখদুটো ঝিকিয়ে উঠল ওর। টেবিলের ওপর একটু ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চঞ্চলভাবে ও তাকালে দরজার দিকে, যেখান দিয়ে অনাহূত অতিথির প্রবেশ করার কথা।

'নাতাশা, ভয় নেই! আমি তোমার সঙ্গে আছি। তোমার অপমান হতে আমি দেব না।' ফিসফিসিয়ে বললে আলিওশা, বিব্রত হলেও সে অবিচলিত।

কপাট খুলে গেল। দরজায় এসে দাঁড়ালেন একমেবাদ্বিতীয়ম্ স্বয়ং প্রিন্স ভালকোভস্কি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্রুত সন্ধানী দৃষ্টিতে আমাদের সকলকে উনি একবার দেখে নিলেন। সে দৃষ্টি দেখে বোঝা অসম্ভব কীভাবে তিনি এসেছেন, শত্রুরূপে না মিত্ররূপে। খুঁটিয়ে ও'র চেহারার বর্ণনা দেওয়া যাক। সে সন্ধ্যেয় তিনি আমায় খুবই তাজ্জব করে দিয়েছিলেন।

ও'কে এই প্রথম দেখলাম এমন নয়। বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশি হবে না, সুগঠিত এবং অত্যন্ত সুদর্শন মুখ, সে মুখের ভাব বদলায় অবস্থানুযায়ী; কিন্তু বদলায় একেবারে হঠাৎ করে, পুরোপুরি, অস্বাভাবিক তাড়াতাড়ি, অতি প্রসন্ন থেকে হঠাৎ রাগত অপ্রসন্নে, যেন হঠাৎ কোনো একটা স্প্রিঙ ছিটকে উঠেছে। ডিম্বাকার মুখ, রঙটা কিছু তামাটে, চমৎকার দাঁত, ছোটো ছোটো, সুগঠিত, বেশ পাতলা ঠোঁট, ঈষৎ লম্বাটে সোজা নাক, উ'চু কপালে কোনো বলি রেখা এখনো চোখে পড়ে না, বড়ো বড়ো ধূসর চোখ — এ সবের ফলে রূপে তিনি প্রায় নিখুঁত, তবু মুখটা কেমন যেন মিষ্টি লাগে না। দেখে বিতৃষ্ণা জাগে নিতান্ত এই জন্যে যে মুখের ভাবটা যেন নিজস্ব নয়, সবসময়ই যেন ভান করা, ভেবে ঠিক করে রাখা, ধার করা; কেমন একটা অন্ধ বিশ্বাস জন্মায় যে সে মুখের আসল ভাবটা বোধ করি কখনোই ধরা যাবে না। নজর করে দেখলে সন্দেহ হয়, চিরস্থায়ী ঐ মুখোশটার আড়ালে ধূর্ত, বিদ্বেষপরায়ণ এবং অসম্ভব স্বার্থপর কিছু একটা আছে। বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও'র বাহ্যত সুন্দর চোখজোড়া — ধূসর, খোলামেলা। শুধু এই চোখদুটিই যেন তাঁর ইচ্ছার বশে পুরোপুরি নেই। নরম করে সস্নেহে উনি হয়ত তাকাতে চাইছেন, কিন্তু চোখের ছটা যেন দ্বিধা হয়ে যায়, নরম সস্নেহ দৃষ্টির মধ্যে দেখা দেয় নিষ্ঠুর অবিশ্বাসী সন্ধানী, বিদ্বেষী ঝলক... মাথায় উনি বেশ লম্বাই, সুঠাম গড়ন, খানিকটা রোগাটে, বয়সের তুলনায় দেখায় অনেক ছোটো। নরম গাঢ়-বাদামী চুলে এখনো প্রায় পাকই ধরে নি। কান হাত পা — এ সবই তাঁর আশ্চর্য সুন্দর। এ রূপ তাঁর পুরোপুরি বংশগত। পোশাক পরিচ্ছদে অতি সূক্ষ্ম একটা পরিপাটীত্ব এবং তাজাভাব, খানিকটা ছোকরা-ছোকরা চালও আছে, কিন্তু সেটা তাঁকে মানায়। দেখে মনে হয় যেন আলিওশার বড়ো ভাই। অন্তত, এই বয়সের একটি পুত্রের পিতা বলে কেউ তাঁকে ভাববে না। সোজা নাতাশার কাছে গেলেন উনি। স্থিরভাবে তাকিয়ে বললেন:

'আগে থেকে না জানিয়ে এত রাত্রে আপনার এখানে আমার আসাটা অদ্ভুত এবং নিতান্ত সৌজন্যবহির্ভূত। তবে আমার আচরণের উৎকেন্দ্রিকতা বিষয়ে আমি যে অন্তত সচেতন, আশা করি তা বিশ্বাস করবেন। কার সঙ্গে আমায় কথা কইতে হবে তাও আমি জানি। জানি যে আপনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং উদারহৃদয়। শুধু দশ মিনিট সময় আমায় দিন, আশা করি আপনি নিজেই আমায় বুঝবেন এবং সমর্থনও করবেন।'

এসব কথাই উনি বললেন সৌজন্যসহকারে, তবে বেশ জোর দিয়ে এবং খানিকটা যেন জিদ ধরে।

নাতাশা বললে, 'বসুন,' তখনো তার প্রাথমিক হতভম্ব ভাব আর কিছুটা ভয় কাটে নি।

ঈষৎ মাথা নুইয়ে উনি বসলেন।

ছেলেকে দেখিয়ে বললেন, 'প্রথমে ওর সঙ্গে দুটো কথা বলে নিই। আমার জন্যে অপেক্ষা না করে, এমনকি আমাদের বিদায় না জানিয়েই তুমি চলে যাওয়া মাত্রই কাউণ্টেস খবর পান যে, কাতেরিনা ফিওদরোভনা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কাউণ্টেস ওর কাছে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, এমন সময় কাতেরিনা ফিওদরোভনা নিজেই হঠাৎ ভারি হতাশ এবং বিচলিতভাবে এসে হাজির হয়। আমাদের সে সোজাসুজি জানিয়ে দিলে যে তোমায় ও বিয়ে করতে পারবে না, মঠে চলে যাবে। বললে যে, তুমি নিজে ওর সাহায্য চেয়েছ, নাতালিয়া নিকোলায়েভনাকে তুমি ভালোবাসো সে কথা ওর কাছে স্বীকার করেছ... কাতেরিনা ফিওদরোভনার কাছ থেকে বিশেষ করে এই সময় এমন অস্বাভাবিক একটা ঘোষণার কারণ অবশ্যই ওর সঙ্গে তোমার অতি অদ্ভুত রকমের ঐ আলাপ। মেয়েটি প্রায় পাগলের মতো হয়ে উঠেছিল। বুঝতে পারছ, কীরকম বজ্রাহত এবং শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম আমি। গাড়ি করে যাবার পথে দেখলাম, আপনার জানলায় আলো জ্বলছে।' নাতাশাকে লক্ষ্য করে বলে চললেন উনি, 'অনেকদিন থেকে যা আমায় পীড়া দিচ্ছিল সেই ইচ্ছে তখন হঠাৎ আমায় একেবারে পেয়ে বসল, ঝোঁকটাকে আর আটকাতে পারলাম না। আপনার কাছে এলাম। উদ্দেশ্য? বলছি, কিন্তু তার আগেই অনুরোধ, আমার কৈফিয়তের মধ্যে কিছু তীক্ষ্ণতা থাকলে অবাক হবেন না। জিনিসটা এত হঠাৎ...'

থতমত খেয়ে নাতাশা বললে, 'আশা করি বুঝতে পারব... আপনি যা বলবেন, তাতে উচিতমতো মূল্য দেব।'

প্রিন্স ওকে লক্ষ্য করলেন স্থির দৃষ্টিতে, যেন একমুহূর্তে দ্রুত ওকে বুঝে নিতে চান।

তারপর বলে চললেন, 'তলিয়ে বোঝার ক্ষমতা আপনার আছে, সেই আমার ভরসা। এবং এখন যে আপনার কাছে আসতে পারলাম তার কারণ শুধু এই যে আমি জানি, কার কাছে যাচ্ছি। অনেকদিন থেকে আপনাকে আমি জানি, যদিও একসময় আপনার প্রতি অবিচার করেছি, অন্যায় করেছি। আমার কথাটা সব শুনুন। আপনি জানেন, আপনার বাবার সঙ্গে আমার দীর্ঘ দিনের একটা মন কষাকষি চলছে। নিজের দোষ ক্ষালন করতে চাইছি না। ওঁর প্রতি আমার ব্যবহারে, এতদিন যা ভেবে এসেছি হয়ত তার চেয়ে অনেক বেশি দোষ আমার। কিন্তু তা যদি হয়ে থাকে, তবে তার কারণ লোকে আমায় ভুল বুঝিয়েছিল। আমি সন্দেহবাতিক লোক, তা স্বীকার করছি। ভালোর চেয়ে মন্দই আমি দেখি বেশি — ওটা একটা বদভ্যাস, কঠিন মনের লক্ষণ। তবে নিজের দোষ ঢেকে রাখতে আমি চাই না। লোকরটনা সবই আমি বিশ্বাস করেছিলাম, তাই আপনি যখন মা-বাবাকে ছেড়ে চলে এলেন, তখন আলিওশার কথা ভেবে ভারি ভয় হয়েছিল। কিন্তু তখন আমি আপনাকে জানতাম না। অল্প অল্প করে যে খবর এতদিন সংগ্রহ করেছি, তাতে আমি একেবারে নিশ্চিত হয়েছি। আপনার ওপর নজর রেখেছি আমি, বিচার করে দেখেছি এবং শেষ পর্যন্ত স্থির বিশ্বাস হয়েছে যে আমার সন্দেহগুলো ছিল অমূলক। এখন জানতে পেরেছি যে আপনি আপনার পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছেন, এও জানি, আপনার বাবা আমার ছেলের সঙ্গে আপনার বিয়ের একেবারে বিপক্ষে। এবং আলিওশার ওপর এতখানি প্রভাব, বলা যেতে পারে এতখানি কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও আপনি যে আজো পর্যন্ত সে ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে আপনাকে বিয়ে করতে ওকে বাধ্য করেন নি, শুধু এই একটা ঘটনাই আপনাকে অতিরিক্ত রকমের ভালো বলে প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সেটা আপনার কাছে পুরোপুরি স্বীকার করছি, সে সময় আমার ছেলের সঙ্গে আপনার বিয়ের যেকোনো রকম সম্ভাবনায় বাধা দেব বলে আমি একেবারে বদ্ধপরিকর ছিলাম। আমি জানি, খুব সোজাসাপটা ভাবে বলছি, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার দিক থেকে সোজা অকপটতারই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, আমার কথা সব শোনার পর আপনিও তা মানবেন। আপনি বাপের বাড়ি ছেড়ে আসার কিছু পরেই আমি পিটার্সবুর্গ থেকে চলে যাই, কিন্তু গেলেও আলিওশার জন্যে তখন আমার আর কোনো ভয় ছিল

না। আপনার মহৎ গর্ববোধের ওপর আমার ভরসা ছিল। বুঝেছিলাম, আমাদের পারিবারিক মনান্তর না মেটা পর্যন্ত আপনি নিজেই এ বিয়ে চাইবেন না, আলিওশা এবং আমার মধ্যে যে সম্প্রীতি আছে সেটা নষ্ট করতে আপনার অনিচ্ছা ছিল — কেননা, আপনার সঙ্গে এ বিয়ে আমি কখনো ক্ষমা করতাম না। লোকে যে বলবে, আপনি একজন প্রিন্সকে স্বামী হিসেবে পাকড়াও করে আমাদের বংশের সঙ্গে সম্পর্ক পাততে চাইছেন, এও আপনি চান নি। বরং আমাদের সম্পর্কে আপনি খানিকটা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়েছেন, এবং বোধ হয় অপেক্ষা করছিলেন, এমন একটা মুহূর্ত আসবে যখন আমি নিজে এসে আমার পুত্রের পাণিপীড়ন করে আমাদের সম্মানিত করার জন্যে আপনাকে অনুরোধ জানাব। তা সত্ত্বেও আমি কিন্তু জেদ করে আপনার অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়েই ছিলাম। সেটা উচিত ছিল তা প্রমাণ করতে চাইছি না, কিন্তু তার কারণ চেপে যাব না। সেটা এই: আপনার টাকাপয়সা নেই, কুলখ্যাতিও নেই। আমার যদিও কিছু সম্পত্তি আছে, তাহলেও আমাদের চাই আরো অনেক বেশি। আমাদের পরিবার এখন পড়তির দিকে। টাকাপয়সা এবং বড়ো বড়ো লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো আমাদের দরকার। কাউণ্টেস জিনাইদা ফিওদরোভনার সৎমেয়েটির কোনো বড়ো ঘরানা না থাকলেও টাকা আছে প্রচুর। আর একটু দেরি করলেই অন্য কোনো প্রার্থীর উদয় হবে, কেড়ে নেবে আমাদের কনেটিকে। ও রকম একটা দাঁও ফসকাতে দেওয়া চলে না, আলিওশার বয়স এখনো বেশ কম, তাহলেও ঠিক করেছিলাম ওর বিয়ে দিয়ে দেব। দেখছেন তো, কিছুই ঢেকে চেপে রাখছি না আমি। নিজেই যে কবুল করছে, কুসংস্কার এবং অর্থলিপ্সার বশে ছেলেকে যে কুকর্মে প্ররোচিত করেছে সে বাপকে আপনি ঘৃণা করতে পারেন। আমার ছেলের জন্যে যে সবকিছু ত্যাগ করেছে, যার প্রতি আমার ছেলে অত্যন্ত অন্যায় করেছে, তেমন একটি উদারহৃদয়া মেয়েকে ছেড়ে আসা কুকর্ম ছাড়া কী। তবে নিজের দোষ ক্ষালন আমি করছি না। কাউণ্টেস জিনাইদা ফিওদরোভনার সৎমেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ের পক্ষে দ্বিতীয় কারণ ছিল এই যে, মেয়েটি ভালোবাসা এবং সমাদরের একান্ত যোগ্য। দেখতে সুন্দরী, খাসা শিক্ষাদীক্ষা, চমৎকার স্বভাব এবং অতি বুদ্ধিমতী, যদিও নানা দিক থেকে এখনো ও বালিকা। আলিওশার চরিত্রবল কিছু নেই, ভারি লঘুচিত্ত, অসম্ভব অবিবেচক, এবং বাইশ বছর বয়স হলেও নিতান্ত এক শিশু, বোধ হয় শুধু একটি সুগুণ ওর আছে — মনটা ভালো, — কিন্তু অন্যান্য দোষ থাকায় এ সুগুণটিও

ভারি বিপজ্জনক। অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করছি, ওর ওপর আমার প্রভাব কমতে শুরু করেছে, আবেগপ্রবণতা, তারুণ্যের নেশা তার প্রাপ্য আদায় করে নেয়, এমনকি সত্যকার কয়েকটা কর্তব্যের চেয়েও ওগুলো বড়ো হয়ে ওঠে। আমি ওকে হয়ত একটু বেশি রকমই ভালোবাসি, কিন্তু বেশ টের পাচ্ছি ওকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া একা আমায় দিয়ে আর কুলোচ্ছে না। অথচ কোনো না কোনো একটা সুপ্রভাব ওর পেছনে অনবরত থাকা চাই। স্বভাবটা ওর পরনির্ভরশীল, দুর্বল এবং মমতাময় — হুকুম করার চেয়ে হুকুম মানা আর ভালোবাসাই ওর বেশি পছন্দ। সারা জীবনই ও ওইরকমই থেকে যাবে। ছেলের বৌ হিসেবে যা চাইছিলাম, কাতেরিনা ফিওদরোভনার মধ্যে ঠিক সেই আদর্শ মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে যে কী খুশি হয়েছিলাম, তা আপনি কল্পনা করে নিতে পারেন। কিন্তু খুশি হয়েছি একটু দেরিতে। কেননা, তার আগেই একটা অটুট প্রভাবে পড়েছে সে — আপনার প্রভাব। একমাস আগে পিটার্সবুর্গে ফেরার পর থেকে খুঁটিয়ে আমি ওকে লক্ষ্য করে আসছি, অবাক হয়ে দেখেছি, ওর মধ্যে বেশ একটা বদল ঘটেছে ভালোর দিকেই। ওর ছেলেমানুষি এবং দায়িত্বহীনতা এখনো প্রায় একই আছে, কিন্তু কয়েকটা সদুপদেশ ওর মনে বেশ গেঁথেছে; শুধু ছেলেখেলায় নয়, সমুন্নত, মহৎ এবং সৎ, এমন কিছু জিনিসেও ওর আগ্রহ দেখা দিচ্ছে। ধ্যানধারণাগুলো ওর খানিকটা বিচিত্র রকমের, নড়বড়ে, কখনো বা বিদঘুটে, কিন্তু ওর কামনা, প্রেরণা, ওর অন্তঃকরণটি হয়ে উঠেছে আগের চেয়ে ভালো এবং সেইটাই তো সবকিছুর বনিয়াদ। আর এই ভালোটা ও সবই পেয়েছে আপনার কাছ থেকে। ওকে আপনি ঢেলে সেজেছেন। সত্যি বলছি, তখনই আমার মাথায় এই চিন্তাটা এসেছিল যে, ওর সুখ এনে দিতে পারবে আর কেউ নয় আপনিই। কিন্তু সে চিন্তা আমি নিজেই নাকচ করে দিয়েছিলাম, তাকে প্রশ্রয় দিই নি। যেকোনো উপায়ে আপনার কাছ থেকে ওকে সরিয়ে আনা দরকার ছিল আমার। সেই অনুসারে কাজও করতে শুরু করি এবং ধারণা হয় যে আমার লক্ষ্য সিদ্ধ হয়েছে। এক ঘণ্টা আগেও ভেবেছি, আমারই জয় হল। কিন্তু কাউণ্টেসের ওখানে যা ঘটল, তাতে আমার সব অনুমান বানচাল হয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি করে আমায় অবাক করেছে অপ্রত্যাশিত একটা বস্তু — আপনার প্রতি আলিওশার ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা, এ অনুরাগের একাগ্রতা ও দুর্মরতা — আলিওশার পক্ষে ব্যাপারটা অদ্ভুত। ফের বলি, আপনি ওকে পুরোপুরি ঢেলে সেজেছেন। হঠাৎ টের পেলাম, যা ভেবেছিলাম তার

চেয়েও অনেক বদলিয়ে গেছে আলিওশা। আজ ও হঠাৎ এমন একটা বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, যা ওর পক্ষে অকল্পনীয়। সেই সঙ্গে দেখিয়েছে হৃদয়াবেগের অসাধারণ একটা সূক্ষ্মতা, ক্ষিপ্রতা। দুরূহ একটা পরিস্থিতি বলে ও যা ভাবছিল তা থেকে বেরিয়ে আসার সঠিক পথটাই ও বেছে নিয়েছে। মানব হৃদয়ের উচ্চতম তন্ত্রীটাকেই সে স্পর্শ করে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে — যথা, ক্ষমা করা এবং অনিষ্টের প্রতিদানে উদারতার প্রবৃত্তি। যাকে সে আঘাত দিয়েছে, তার হাতেই ও নিজেকে সঁপে দিয়ে সেই মেয়েটির কাছেই আবেদন করেছে সহযোগিতা আর সাহায্যের জন্যে। যে মেয়েটি ওকে ইতিমধ্যেই ভালোবাসতে শুরু করেছে, খোলাখুলি তার কাছে তার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর কথা স্বীকার করেছে ও মেয়েটির গর্ববোধে ঘা দিয়েছে, সেই সঙ্গে আবার তার মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে প্রতিদ্বন্দ্বিনীর জন্যে সহানুভূতি আর নিজের জন্যে ক্ষমা এবং নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃস্নেহের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে। মনে ঘা না দিয়ে অপমান না করে অমনভাবে বোঝাবুঝিতে আসা — সে শুধু অতি বিচক্ষণ প্রাজ্ঞের পক্ষেই কখনো কখনো সম্ভব, এবং শুধু তেমন হৃদয়ই তা পারে, যা ওর মতো তাজা, নিষ্কলুষ, সুপরিচালিত। নাতালিয়া নিকোলায়েভনা, আমি নিশ্চয় জানি যে ওর আজকের আচরণে কথা কয়ে বা পরামর্শ দিয়ে কোনো ভূমিকা আপনি নেন নি। খুব সম্ভব, আপনি এই মাত্রই ওর কাছ থেকে ব্যাপারটা শুনেছেন। নিশ্চয় ভুল হয় নি আমার, তাই না?'

নাতাশা বললে, 'ঠিকই ভেবেছেন।' মুখখানা ওর জ্বলজ্বল করছিল, চোখে কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুপ্রেরণার মতো আলো। প্রিন্স ভালকোভস্কির বাগ্মিতা কাজ দিচ্ছিল। বললে, 'আজ পাঁচ দিন আলিওশার সঙ্গে আমার দেখা নেই। ও নিজেই এই সব ভেবেছে, নিজেই করেছে।'

'অবশ্যই তাই,' বললেন প্রিন্স, 'কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর এই অভাবিত অন্তর্দৃষ্টি, এই সিদ্ধান্ত এবং কর্তব্যবোধ, শেষত এই মহনীয় দৃঢ়তা — এ সবই আসলে ওর ওপর আপনার প্রভাবের ফল। বাড়ি ফেরার সময় আমি ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝতে পারলাম এবং ভেবে দেখলাম। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনস্থির করার শক্তি পেয়ে গেলাম। কাউণ্টেসের সৎমেয়েটির সঙ্গে বিয়ের ওই প্রস্তাব তো ভেঙে গেছে, তা আর জোড়া লাগবে না, জোড়া লাগলেও বিয়ে আর সম্ভব নয়। মানে, আমি নিজে এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হয়েছি যে ওকে সুখী করার মতো মেয়ে আপনিই, আপনিই ওকে সত্যি করে চালিয়ে নিতে

পারবেন, ওর ভবিষ্যৎ সুখের ভিত্তি তো আপনি ইতিমধ্যেই পত্তন করে দিয়েছেন! আপনার কাছ থেকে কিছুই আমি লুকোই নি, এখনো লুকোচ্ছি না: প্রতিষ্ঠা, অর্থ, খ্যাতি, এমনকি সরকারি কাজে উঁচু পদ — এসব আমি খুব ভালোবাসি। আমি বেশ বুঝি যে এর অনেকখানিই হল নিতান্ত কুসংস্কার, কিন্তু এ কুসংস্কার আমি ভালোবাসি, মোটেই তা বর্জন করতে চাই না। কিন্তু এমন অবস্থাও ঘটে, যখন অন্য কথাও ভাবতে হয়, একই মাপকাঠিতে যখন সব মাপা চলে না... তাছাড়া ছেলেকে আমি খুবই ভালোবাসি। মোট কথা, আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে আলিওশার সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ চলবে না, কেননা আপনাকে ছাড়া ও মারা পড়বে। আর সত্যি বলব? এই সিদ্ধান্তে আমি এসেছিলাম বোধ হয় মাসখানেক আগে, কিন্তু শুধু আজকে বুঝতে পারছি, সে সিদ্ধান্ত সঠিকই ছিল। অবশ্যই প্রায় মাঝরাত্রে এসে আপনাকে জ্বালাতন না করে আগামী কাল এসব কথা বলতে পারতাম; কিন্তু এই যে অধৈর্য, এই থেকেই বোধ হয় বুঝতে পারছেন এ ব্যাপারটা আমি নিচ্ছি কতটা আকুলতা, এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, কতটা আন্তরিকতার সঙ্গে। আমি ছেলেমানুষ নই, অতি সাবধানে না ভেবেচিন্তে কোনো একটা কাজ আমার বয়সে করা সম্ভব নয়। এখানে আসার আগে সবকিছুই ভেবে ঠিক করে এসেছি। কিন্তু টের পাচ্ছি, আমার আন্তরিকতার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে আপনার এখনো অনেক সময় লাগবে... কিন্তু আসল কথায় আসি। কেন এখানে এসেছি, তা কি আর বলার দরকার আছে? আপনার প্রতি আমার কর্তব্য করার জন্যে আমি এসেছি, এবং আনুষ্ঠানিকভাবে, আপনার প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা সহকারে অনুরোধ করি আমার ছেলের পাণিপীড়ন করে তাকে সুখী করুন। না, না, একথা ভাববেন না যে আমি, একজন রাগী বাপ, অবশেষে ছেলেদের ক্ষমা করে করুণাপরবশ হয়ে তাদের সুখের পরিকল্পনায় সায় দিচ্ছি। না, না! তেমন কোনো একটা চিন্তা আমার আছে একথা ভাবলে অন্যায় করবেন। একথাও ভাববেন না যে আমার ছেলের জন্যে আপনি যে আত্মত্যাগ করছেন তাতেই আপনার সম্মতি পাবই এমন ভরসাও আমি করি নি; তাও না! উচ্চকণ্ঠে আগেই আমি বলে রাখছি, ও আপনার যোগ্য নয়... (ও ভালো মানুষ, শাদা মন) — ও নিজেই তা স্বীকার করবে। কিন্তু তাই সব নয়। শুধু এই জন্যেই এত রাতে আমি এখানে আসি নি... আমি এসেছি... (সশ্রদ্ধভাবে এবং খানিকটা গাম্ভীর্য রেখে উনি উঠে দাঁড়ালেন) আমি এসেছি আপনার বন্ধু হবার জন্যে! জানি, সে অধিকার আমার নেই, বরং উল্টো!

কিন্তু — সে অধিকার অর্জন করতে দিন আমায়, আশা করবার অনুমতি দিন!'

উত্তরের প্রত্যাশায় নাতাশার সামনে মাথা নুইয়ে উনি দাঁড়িয়ে রইলেন সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে। উনি যখন কথা কইছিলেন তার সারাটা সময় আমি ওঁকে নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করছিলাম। উনিও তা টের পেয়েছিলেন।

বক্তব্যটা উনি বলছিলেন ঠাণ্ডা গলায় কিছুটা বাগ্মিতা ঢেলে এবং কখনো কখনো খানিকটা তাচ্ছিল্য সহকারে। প্রথম সাক্ষাতের পক্ষে এমন অশোভন একটা মুহূর্তে, বিশেষ করে এক্ষেত্রে পারস্পরিক যা সম্পর্ক তাতেও যে প্রেরণায় উনি এখানে এসে হাজির হয়েছেন বলছেন, তার সঙ্গে তাঁর গোটা বক্তৃতার সুরটা মাঝে মাঝে খাপই খাচ্ছিল না। তাঁর কতকগুলো বাক্য স্পষ্টতই ভেবে ভেবে বানানো, এবং তাঁর দীর্ঘ, আর দীর্ঘতার জন্যেই অদ্ভুত ভাষণটার কোনো কোনো জায়গায় উনি যেন এক উৎকেন্দ্রিক মানুষের কৃত্রিম ভাব করছিলেন যে নাকি তার স্ফুরিত ভাবাবেগ চাপা দিতে চাইছে রহস্য রসিকতা তাচ্ছিল্যের আড়ালে। কিন্তু এসব কথা আমার অবিশ্যি মনে হয়েছিল পরে। তখন কিন্তু অন্য রকম লেগেছিল। শেষ কথাগুলো উনি এমন অকপটে, এমন আবেগে এবং নাতাশার প্রতি এমন একটা অকৃত্রিম সম্মানের ভাব করে বললেন যে আমরা সকলেই জল হয়ে গেলাম। চোখের পাতা ওঁর এমনকি জলের মতোই কিছু চিকচিক করে উঠল। নাতাশার উদার মন একেবারে গলে গেল। সেও উঠে দাঁড়ালে, কথা না বলে ভয়ানক বিচলিত হয়ে হাতটি বাড়িয়ে দিলে। সে হাত গ্রহণ করে উনি সস্নেহে সাবেগে চুম্বন করলেন। আলিওশা একেবারে আনন্দে আত্মহারা।

চেঁচিয়ে উঠল সে, 'কী বলেছিলাম তোমায়, নাতাশা? আমায় তো বিশ্বাসই করছিলে না! বিশ্বাসই করো নি যে উনি অমন উঁচু মনের লোক! এখন তো দেখলে, নিজের চোখেই দেখলে!..'

বাপের কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে সাগ্রহে জড়িয়ে ধরল আলিওশা। সমান আবেগে প্রতিদান দিলেন বাপ, কিন্তু স্পষ্টতই আবেগ প্রকাশ পাওয়ায় লজ্জা বোধ করে এই ভাবাকুল দৃশ্যটাকে সংক্ষিপ্ত করে দিতে চাইলেন।

বললেন, 'হয়েছে, হয়েছে!' তারপর টুপিটা তুলে নিয়ে হেসে বললেন, 'এখন যেতে হয়। দশ মিনিট সময় চেয়েছিলাম, রইলাম পুরো এক ঘণ্টা। কিন্তু যথাসম্ভব আপনার সঙ্গে ফের দেখা হবে এই অধীরতা নিয়ে যাচ্ছি। প্রায়ই আপনার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিচ্ছেন তো?'

নাতাশা বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যত বার আপনার খুশি!' আর বিব্রতভাবে যোগ করলে, 'আমি চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব... আপনার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক শুরু করতে...'

ওর জবাবে হেসে প্রিন্স জানালেন, 'কী উদার আপনি, কী অকপট! ভদ্রতার খাতিরেও আপনি রেখে ঢেকে বলতে চান না। কিন্তু কৃত্রিম ঐ ভদ্রতার চাইতেও আপনার অকপটতার দাম অনেক বেশি। সত্যি! বুঝতে পারছি, আপনার প্রীতি অর্জন করতে আমার ঢের ঢের দিন লাগবে!'

থতমত খেয়ে নাতাশা ফিসফিসিয়ে বললে, 'না, না! আমায় অমন বড়ো করবেন না।' সেই মুহূর্তে ওকে কী সুন্দরই না লাগছিল!

'বেশ তাই সই,' প্রিন্স ভালকোভস্কি সমাপ্তি টানলেন, 'শুধু কাজের ব্যাপারগুলো নিয়ে আরো দুটো কথা। আমি যে কী ভীষণ হতভাগ্য তা আপনার ধারণা নেই! কাল আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারছি না, কালও নয় পরশুও নয়। আজ সন্ধ্যায় খুব জরুরী একটা চিঠি পেয়েছি (কাজ আছে, অবিলম্বে সেখানে আমার যেতে হবে), কিছুতেই ওটা এড়ানো সম্ভব নয়। কাল সকালেই পিটার্সবুর্গ ছেড়ে যাচ্ছি। কাল কি পরশু কোনো সময় পাব না বলেই যে আজ এত রাত্রে আপনার এখানে এসেছি, তা কিন্তু ভাববেন না। আপনি অবশ্যই তা ভাবতেই পারেন না, কিন্তু ঐ হল আমার সন্দিগ্ধ স্বভাবের এক নমুনা। ভাববেনই তা মনে আসেই বা আমার কেন? সত্যি, এই অবিশ্বাস প্রবণতায় জীবনে অনেক ক্ষতি হয়েছে আমার, আপনাদের পরিবারের সঙ্গে আমার কলহটাও বোধ হয় এই লক্ষ্মীছাড়া স্বভাবের দরুনই!.. আজ সবে মঙ্গলবার। বুধ, বিষ্যুদ্, শুক্র আমি পিটার্সবুর্গে থাকব না। শনিবারে নিশ্চয় ফিরব আশা করি। সেই দিনই আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি। সারা সন্ধ্যেটা সে দিন আপনার সঙ্গে কাটাতে পারা যাবে তো?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়!' বলে উঠল নাতাশা, 'শনিবার সন্ধ্যেয় আপনার আশা করে রইলাম! অধীর হয়ে পথ চেয়ে থাকব!'

'আহ্, কী সৌভাগ্য আমার! ক্রমেই আরো ভালো করে আপনাকে জানবার সুযোগ পাব! কিন্তু... এখন যেতে হয়! যদিও আপনার সঙ্গে করমর্দন না করে আমার যাওয়া চলে না,' হঠাৎ আমার দিকে ফিরে উনি বললেন, 'মার্জনা করুন! আমরা সবাই এখন ভারি এলোমেলো করে কথা কইছি। নানা উপলক্ষে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, একবার আমাদের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেওয়াও হয়েছিল। আপনার সঙ্গে আমার আলাপ

ঝালিয়ে নিতে পারলে যে কী খুশি হব তা না বলে বিদায় নিতে পারছি না।'

ও'র হাতটা নিয়ে বললাম, 'আমাদের দেখা হয়েছে, সত্যি। তবে মাপ করবেন, পরিচয় হয়েছিল তা কিন্তু মনে নেই আমার।'

'গত বছর, প্রিন্স 'র'এর ওখানে।'

'মাফ করবেন, ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু এবার নিশ্চিন্ত থাকুন, আর ভুলব না। আজকের সন্ধ্যেটা আমার চিরকাল মনে থাকবে।'

'ঠিক বলেছেন। আমারও মনে থাকবে। অনেক দিন থেকেই জানি, নাতালিয়া নিকোলায়েভনা আর আমার ছেলের আপনি সত্যিকারের অকৃত্রিম বন্ধু। আশা করি এ ত্রয়ীর মধ্যে চতুর্থও গৃহীত হবে। তাই না?' জিজ্ঞেস করলেন নাতাশার দিকে চেয়ে।

'হ্যাঁ, উনি আমাদের সত্যিকার বন্ধু, সবাই আমরা একসঙ্গে থাকব!' গভীর আবেগে জবাব দিলে নাতাশা। বেচারী নাতাশা! প্রিন্স আমার কাছে আসতে ভোলেন নি দেখে ও একেবারে আনন্দে জ্বলজ্বল করে উঠল। কী ভালোই না ও আমায় বাসে!

প্রিন্স ভালকোভস্কি বলে চললেন, 'আপনার বহু গুণমুগ্ধের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আপনার দুজন সবচেয়ে বড়ো ভক্তকে আমি চিনি — আমার একান্ত বন্ধু কাউণ্টেস এবং তাঁর সৎমেয়ে কাতেরিনা ফিওদরোভনা ফিলিমনভা। আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় হলে ও'রা খুশি হবেন। আশা করি, এই মহিলাদের আপনার পরিচয় করিয়ে দেবার আনন্দে আপনি বাধ সাধবেন না?'

'ভয়ানক কৃতার্থ বোধ করছি যদিও আজকাল খুব কম লোকের সঙ্গেই আমি দেখা করতে যাই...'

'কিন্তু আপনার ঠিকানাটা আমায় দিন, দেবেন কি? কোথায় থাকেন? আমি নিজেই ভারি খুশি হয়ে আপনার...'

'আমার ওখানে অতিথি আমি আনতে পারি না প্রিন্স। অন্তত এখন নয়।'

'ব্যতিক্রম হবার যোগ্যতা যদিও আমার নেই, তবু... আমি...'

'বেশ! আপনার যখন অত ইচ্ছে, তখন ভারি খুশি হব আমি। আমি থাকি — গলিতে, ক্লুগেনের বাড়িতে।'

যেন অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন উনি, 'ক্লুগেনের বাড়িতে! সে কী। ওখানে কি আপনি... অনেকদিন আছেন?'

'না, বেশি দিন নয়।' আপনা থেকেই মন দিয়ে চেয়ে দেখলাম ও'র দিকে। '৪৪ নং ফ্ল্যাটে।'

'চুয়াল্লিশ? আপনি... একাই থাকেন?'

'একেবারে একা।'

'বটে! জিজ্ঞেস করছিলাম... কারণ বাড়িটা বোধ হয় আমি চিনি। তা বেশ... নিশ্চয় গিয়ে দেখা করব আপনার সঙ্গে। নিশ্চয়! আপনার সঙ্গে আমার অনেক কিছু আলোচনা করার আছে, আপনার ওপর অনেক আশা রাখি, অনেক ব্যাপারে আপনি আমায় ঋণী করতে পারবেন। ঐ দেখছেন তো, সাহায্য করুন বলেই সরাসরি শুরু করছি। কিন্তু বিদায়! আর একবার আপনার হাতখানা।'

আমার আর আলিওশার করমর্দন করলেন উনি, ফের চুমু খেলেন নাতাশার হাতে, তারপর আলিওশাকে সঙ্গে না ডেকেই বেরিয়ে গেলেন।

আমরা তিনজনেই ভারি বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম। ব্যাপারটা ঘটে গেল ভারি অপ্রত্যাশিত, ভারি আচমকা। সকলেরই মনে হল যেন এক মুহূর্তে সবকিছু বদলে গেছে, অজানা নতুন কিছু একটার শুরু হয়েছে।

নাতাশার পাশে নীরবে বসে আস্তে করে তার হাতে চুমু দিতে থাকল আলিওশা। থেকে থেকে ওর মুখের দিকে চাইছিল যেন দেখতে চায় কী বলবে নাতাশা।

শেষ পর্যন্ত নাতাশা বললে, 'আলিওশা, লক্ষ্মীটি, কাল গিয়ে কাতেরিনা ফিওদরোভনার সঙ্গে দেখা করে এসো।'

আলিওশা বললে, 'আমি নিজেও তাই ভাবছিলাম। নিশ্চয় যাব।'

'কিন্তু তোমায় দেখলে বোধ হয় ওর কষ্ট হবে... কী করা যায় বলো তো?'

'জানি না নাতাশা। সে কথাটাও ভাবছিলাম আমি। ভেবে দেখতে হবে... কী দাঁড়াবে... তারপর ঠিক করব। আচ্ছা নাতাশা, সবকিছুই তাহলে আমাদের বদলে গেল, তাই না?' আলিওশা না বলে পারল না।

হেসে আলিওশার দিকে নাতাশা চাইলে একটা দীর্ঘ কোমল দৃষ্টিতে।

'আর কী ভদ্র উনি! লক্ষ্য করেছিলেন তোমার বাসাটা কী রকম গরিব, কিন্তু একটি কথাও...'

'কী কথা?'

'মানে... এই তোমার বাসা বদল করা... বা কিছু সম্পর্কে...' আলিওশা জবাব দিলে লাল হয়ে।

'কী বলছ, আলিওশা! বলবেন কী অধিকারে?'

'আমিও তো ঠিক তাই বলছি, ভারি ভদ্র উনি। আর কী প্রশংসাই না করলেন তোমার! আগেই বলেছিলাম... বলি নি? বিবেচনা, অনুভূতি এসব আছে ও'র! কিন্তু আমার সম্পর্কে কথা কইলেন যেন আমি একটা শিশু; সবাই ওরা আমায় তাই ভাবে। তা হবেও বা, সত্যিও বোধ হয় আমি তাই।'

'তুমি শিশু, কিন্তু আমাদের সকলের চেয়ে দৃষ্টিমান। ভারি ভালো তুমি আলিওশা!'

'আর উনি বললেন যে আমার ভালোমানুষির জন্যেই আমার ক্ষতি হচ্ছে। সে আবার কী? বুঝলাম না। আচ্ছা নাতাশা, এখুনি ও'র কাছে আমারও চলে যাওয়া উচিত, নয় কি? কাল ভোর হতে না হতেই ফের তোমার কাছে চলে আসব।'

'সত্যি আলিওশা, তাই যাও। ভালো কথা মনে হয়েছে তোমার। আর গিয়ে ও'র সঙ্গে অবশ্য-অবশ্য দেখা করবে, শুনছ? আর কাল যত সকালে পারো এসো। এখন আর দিন পাঁচেকের মতো আমার কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে না তো?' নাতাশা জিজ্ঞেস করলে একটু দুষ্টুর মতো, দুচোখ ওর প্রীতিতে ভরা। সকলেই আমরা যেন এক শান্ত, অগাধ আনন্দের রাজ্যে পেশছে গিয়েছিলাম।

বেরিয়ে যেতে যেতে আলিওশা বললে, 'আপনিও আমার সঙ্গে আসছেন নাকি ভানিয়া?'

'না, ও একটু থাকবে। তোমার সঙ্গে আরো একটু কথা আছে ভানিয়া। মনে রেখো, কাল ভোর সকালে —'

'একেবারে সাত সকালে! চললাম মাভরা!'

মাভরা ভারি অস্থির হয়ে উঠেছিল। প্রিন্স যা বলেছেন মাভরা সবই শুনেছিল, সবই শুনেছে কান পেতে, কিন্তু অনেক কিছুই সে বোঝে নি। জানার, জিজ্ঞাসাবাদ করার একটা ইচ্ছা ছিল ওর। কিন্তু আপাতত ওকে দেখাচ্ছিল ভারি গুরুগম্ভীর, বলতে কি, খানিকটা গরবীর মতোই। ও-ও ধরতে পেরেছিল যে বেশ কিছু বদলে গেছে।

আমরা একা রইলাম। নাতাশা আমার হাতটা নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, যেন কী বলবে তাই ভাবছে।

ক্ষীণ গলায় অবশেষে বললে, 'বড়ো ক্লান্ত লাগছে। শোনো, কাল তো তুমি ও'দের ওখানে যাবে, না?'

'নিশ্চয়।'

'মাকে ব'লো, কিন্তু ও'কে যেন কিছু ব'লো না।'

'এমনিতেই তো তোমার কথা ওঁকে বলি না কখনো।'

'তা বটে, না বললেও উনি অবশ্য জানতেই পারবেন। তুমি কিন্তু দেখো উনি কী বলছেন, কী করে জিনিসটা উনি নিচ্ছেন। ভগবান! এ বিয়ের জন্যে উনি কি সত্যিই আমায় শাপ দেবেন ভানিয়া? না, না, সে হতে পারে না!'

তাড়াতাড়ি করে বললাম, 'সব ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে হবে প্রিন্সকে। তোমার বাবার সঙ্গে মিটমাট করে নিতে হবে ও'কে, তাহলে সবই ঠিক হয়ে যাবে।'

'ভগবান! তাই যেন হয়! তাই যেন হয়!' কাতর স্বরে বললে নাতাশা।

'কিছু ভেবো না নাতাশা, সব ঠিক হয়ে যাবে। সেই দিকেই গড়াচ্ছে।'

আমার দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে ও চাইলে।

'ভানিয়া, প্রিন্স সম্পর্কে তোমার কী মনে হয়?'

'যা বললেন সেটা যদি অকপটেই বলে থাকেন, তবে আমার মনে হয় উনি ভদ্রলোকই বটেন।'

'যদি অকপটেই বলে থাকেন? তার মানে কী? অকপটে না বলে উনি পারেন কি?'

বললাম, 'আমারও তাই ধারণা।' মনে মনে ভাবলাম, "তাহলে ওরও কিছু একটা ভাবনা শুরু হয়েছে। আশ্চর্য!"

'ও'র দিকে কেবলি তাকিয়ে ছিলে তুমি... একদৃষ্টে...'

'হ্যাঁ, একটু অদ্ভুতই লাগল ও'কে।'

'আমারও তাই মনে হল। এমনভাবে কথা কইতে লাগলেন উনি... উহ্, ভারি ক্লান্ত লাগছে। তুমিও বরং বাড়ি যাও। আর ও'দের সঙ্গে দেখা করে যত সকালে পারো কাল এসো। আচ্ছা, শোনো :ওই যে বললাম, ও'র সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করতে চাই, কথাটা কি রূঢ় হয়ে গিয়েছিল?'

'না... রূঢ় হবে কেন?'

'আর... একটু বোকার মতোও হয় নি? মানে, ও কথা বলার অর্থ তো এই যে এখনো আমি ও'কে ভালোবাসছি না।'

'বরং উল্টো। কথাটা সুন্দর, সরল এবং স্বতঃস্ফূর্ত। ওই মুহূর্তে এত চমৎকার দেখাচ্ছিল তোমায়। ও'র অভিজাত শিক্ষাদীক্ষা সত্ত্বেও যদি উনি তা বুঝতে না পেরে থাকেন, তবে উনিই নির্বোধ।'

'ওঁর ওপর তুমি যেন রেগে আছ, ভানিয়া, অথচ কী বিচ্ছিরি আমি নিজে, কী সন্দিগ্ধ, অহঙ্কারী! হেসো না, তোমার কাছ থেকে তো কিছুই আমি চেপে রাখি না। ওহ্ ভানিয়া, বন্ধু আমার, ফের যদি সুখ আমার যায়, যদি আবার দুঃখে পড়ি, তবে তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াবে সে জানি; হয়ত একা তুমিই আসবে! কী করে তোমার ঋণ শোধ দেব! আমায় কখনো অভিশাপ দিয়ো না ভানিয়া!..'

বাড়ি ফিরে সঙ্গে সঙ্গে পোশাক ছেড়ে শুতে গেলাম। তল-ভাঁড়ারের মতো ঘরখানা আমার স্যাঁতসেঁতে আর অন্ধকার। অদ্ভুত নানা চিন্তা আর অনুভূতি ভিড় করে এল মনে। বহুক্ষণ ঘুম এল না।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই আরামের শয্যায় ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে আর একটি লোক কী হাসিই না হেসেছিল আমাদের লক্ষ্য করে — যদি অবশ্য আদৌ উপহাসের যোগ্য বলে আমাদের জ্ঞান করে থাকে সে। সম্ভবত করে নি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরের দিন সকালে দশটার সময় তাড়াহুড়া করে বাসা থেকে যাব ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপে ইখমেনেভদের ওখানে, তারপর নাতাশার কাছে, এমন সময় দোরগোড়ায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল গতকালকার আগন্তুক, স্মিথের সেই নাতনীর সঙ্গে। আমার কাছেই ও আসছিল। জানি না কেন, কিন্তু মনে আছে ভারি খুশি হয়ে গিয়েছিলাম ওকে দেখে। আগের দিন ওর দিকে ভালো করে চেয়ে দেখারও সময় পাই নি, এখন দিনের আলোয় ওকে দেখে আরো অবাক হয়ে গেলাম। সত্যিই, অন্তত চেহারার দিক থেকে ওর চেয়ে অদ্ভুত, অদ্বিতীয় কাউকে পাওয়া কঠিন। ছোটোখাটো গড়ন, জ্বলজ্বলে কালো কালো চোখ — রুশী বলে যেন মনে হয় না, একমাথা এলোমেলো ঘন কালো চুল, আর স্থির রহস্যময় বোবা একটা চাউনি — রাস্তার অতি ব্যস্ত পথচারীও ওকে দেখে থমকে না গিয়ে পারে না। অভিভূত না হয়ে পারে না। সবচেয়ে অভিভূত করে ওর দৃষ্টি! তাতে কেমন একটা বুদ্ধির দীপ্তি, সেই সঙ্গে কেমন একটা অভিযোক্তাসুলভ অবিশ্বাস, প্রায় সন্দেহ। নোংরা জীর্ণ ফ্রক্টা দিনের আলোয় কালকের চেয়েও বেশি করে দেখাল ন্যাতাকানির মতন। মনে হল ও বোধ হয় কোনো একটা মন্থর দুর্বার বারোমেসে রোগে ভুগছে, অমোঘ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে ক্রমে ক্রমে। ফ্যাকাশে রোগা মুখখানায় একটা অস্বাভাবিক

ময়লাটে-হল্‌দ পিত্তি-পড়া আভা। কিন্তু সব মিলিয়ে — রোগ আর দারিদ্র্যের কদর্যতা সত্ত্বেও মোটের ওপর ও বেশ সুন্দরীই। তীক্ষ্ম ভুরু, সরু আর সুন্দর; কিন্তু সবচেয়ে মনোহর ওর চওড়া, নিচুপানা কপাল আর ঠোঁটদুটি — সে ঠোঁট কেমন একটা অহংকৃত নির্ভীক রেখায় চমৎকার সুগঠিত, তবে বিবর্ণ, রঙ তাতে সামান্য।

চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আরে ফের এসেছ দেখছি। তা, ভেবেছিলাম আসবে। ভেতরে এসো!'

ভেতরে এল ও ঠিক আগের দিনের মতোই ধীরে ধীরে দরজা পার হয়ে, চারদিকে তাকালে অবিশ্বাস নিয়ে। ঘরটাকে ও দেখতে লাগল মন দিয়ে, এই ঘরেই ওর দাদু ছিল। যেন দেখে নিলে, আর একজন অধিবাসী এসে সে ঘরখানা কতটা বদলিয়ে দিয়েছে। ভাবলাম, "সত্যি যেমন দাদু তেমনি নাতনী। পাগল-টাগল নাকি?" ও তখনো চুপ করে ছিল। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

চোখ নামিয়ে অবশেষে ও ফিসফিসিয়ে বললে, 'বইগুলো!'

'ও হ্যাঁ, তোমার বইগুলো, এই যে ধরো! তোমার জন্যেই ওগুলো আমি রেখে দিয়েছিলাম।'

আমার দিকে ও চাইলে কৌতূহলে। মুখখানা বেঁকে গেল অদ্ভুত ভঙ্গিতে, এক্ষুনি যেন এক অবিশ্বাসী হাসি হেসে উঠবে ও।

কিন্তু হাসির ঝোঁকটা সঙ্গে সঙ্গেই কেটে গিয়ে ফের দেখা দিল সেই কঠিন রহস্যময় ভাবটা।

আপাদমস্তক আমায় ব্যাঙ্গের দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কেন, দাদু কি আপনাকে আমার কথা বলেছিলেন?'

'না, বলেন নি, কিন্তু...'

'তাহলে কী করে জানলেন আমি আসব? কে বলেছে?' দ্রুত বাধা দিয়ে ও বললে।

'কেননা মনে হয়েছিল, তোমার দাদুর পক্ষে একলা, সবার কাছ ছাড়া হয়ে থাকা সম্ভব নয়। উনি ভারি বুড়ো এবং দুর্বল ছিলেন। তাই ভাবলাম, নিশ্চয় কেউ ওঁর দেখা শোনা করে... এই যে তোমার বই, ধরো। ওগুলো কি তোমার পড়ার বই?'

'না।'

'তাহলে কী করবে ওগুলো নিয়ে?'

'আমি যখন দাদুকে দেখতে আসতাম, তখন দাদু আমায় পড়াতেন...'

'তার পরে কি আসা বন্ধ করেছিলে?'

'পরে... আর আসি নি। অসুখে পড়েছিলাম।' ও বললে কৈফিয়ৎ দেবার মতো করে।

'কে আছে তোমার মা, বাবা?'

হঠাৎ ভুরু কুঁচকে আমার দিকে যেন খানিকটা ভয়ে ভয়েই তাকাল। তারপর চোখ নামিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে পাশ ফিরল, আগের দিন যা করেছিল ঠিক সেই রকম জবাব না দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অবাক হয়ে আমি চেয়ে রইলাম ওর দিকে। দোরগোড়ায় ও একটু থামল।

'কিসে মারা গেলেন?' জিজ্ঞেস করলে আচমকা। আগের দিন যেমন যেতে যেতে দরজার দিকে মুখ করে থেমে আজর্কার কথা জিজ্ঞেস করেছিল ঠিক তেমনি ভঙ্গিতে আমার দিকে ঈষৎ ঘুরে দাঁড়াল ও।

ওর কাছে গিয়ে তাড়াতাড়ি সব বলতে লাগলাম। নীরবে উদগ্রীব হয়ে ও শুনলে মাথাটা নুইয়ে, আমার দিকে পিছন ফিরে। এ কথাও বললাম, মরবার সময় বুড়ো ছয় নম্বর লাইনের কথা বলছিল।

বললাম, 'তা থেকে আন্দাজ করেছিলাম, নিশ্চয় আপনজন কেউ ওখানে ও'র থাকে। সেই জন্যেই ভাবছিলাম, কেউ ও'কে দেখতে আসবে। নিশ্চয় তোমায় উনি ভালোবাসতেন, কেননা শেষ মুহূর্তে তোমার কথাই মনে পাড়ছিল ওঁর।'

'না, ফিসফিস করে, যেন চাইছিল না তবু বলে ফেললে, 'আমায় উনি ভালোবাসতেন না।'

ভারি বিচলিত হয়ে পড়েছিল ও। কথা বলতে বলতে আমি নিচু হয়ে ওর মুখের দিকে চাইছিলাম। লক্ষ্য করেছিলাম, ভাবাবেগ চেপে রাখার জন্যে প্রচণ্ড চেষ্টা করছে ও, যেন আমি দেখলে ওর অহঙ্কারে লাগবে। ক্রমাগত ফ্যাকাশে হয়ে উঠছিল সে, নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরছিল। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছিল ওর বুকের অদ্ভুত ঢিপঢিপানি শুনে। ক্রমেই জোরে জোরে ঢিপঢিপ করতে শুরু করেছিল ওর বুক, দু'তিন পা দূরে থেকেও আমি তা শুনতে পাচ্ছিলাম, যেন ধমনীস্ফীতি হয়েছে। ভেবেছিলাম আগের দিন যা করেছিল, তেমনি হয়ত হঠাৎ কেঁদে ভাসাবে। কিন্তু নিজেকে ও সামলে নিলে।

'বেড়াটা কোথায়?'

'কিসের বেড়া?'

'যার নিচে উনি মারা গেছেন।'

'দেখিয়ে দেব... যখন বাইরে বেরুব। ভালো কথা, তোমার নামটা কী বলো তো।'

'দরকার নেই...'

'কী দরকার নেই?'

'না... কিছুই না... নাম নেই আমার।' বললে কেমন ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে, যেন ক্ষুব্ধ হয়ে। চলে যেতে গেল ও। আমি আটকালাম।

'আরে দাঁড়াও, অদ্ভুত মেয়ে তো তুমি! আমি তো ভালোই চাই। কাল সিঁড়ির কোণে তোমায় কাঁদতে দেখার পর থেকে ভারি দুঃখ হচ্ছে তোমার জন্যে। মনে হলেই অসহ্য লাগছে... তাছাড়া, তোমার দাদু তো আমার কোলেই মারা গেছেন। ছয় নম্বর লাইনের কথা বলবার সময় তোমার কথাই তিনি ভাবছিলেন নিশ্চয়। তার মানে, উনি তো তোমাকে প্রায় আমার হেফাজতেই দিয়ে গেছেন। স্বপ্নে তোমার দাদুকে দেখি আমি... এই যে বইগুলো তোমার জন্যে রেখে দিয়েছি, কিন্তু এমন বুনো তুমি, যেন ভয় পাচ্ছ আমায়। নিশ্চয় কেউ নেই তোমার, গরিব, বোধ হয় পরের ঘরে মানুষ হচ্ছ, তাই না?'

ওকে বোঝাবার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। নিজেও বোধ হয় বলতে পারব না, কেন আমায় ও অতটা আকর্ষণ করেছিল। ওর প্রতি আমার অনুভূতির মধ্যে করুণা ছাড়াও অন্য কিছু একটা ছিল। গোটা পরিস্থিতিটার রহস্যময়তা, আমার মনে স্মিথ যে ছাপ ফেলেছিল সেটা, নাকি আমার নিজেরই কল্পনাপ্রবণ মেজাজ — কী জন্যে জানি না, কিন্তু দুর্বার কী একটা যেন আমায় টানছিল ওর দিকে। আমার কথা বোধ হয় মনে ধরল ওর। আমার দিকে অদ্ভুত একটা দৃষ্টিতে ও চাইলে, সে দৃষ্টি এখন আর কঠোর নয়, কোমল এবং দীর্ঘ; তারপর ফের মাটির দিকে তাকালে, যেন কী ভাবছে।

তারপর হঠাৎ ফিসফিসিয়ে, ভারি শান্ত গলায় বললে, 'এলেনা।'

'তোমার নাম এলেনা?'

'হ্যাঁ...'

'বেশ, তাহলে এসে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবে তো?'

'তা পারব না... জানি না... আচ্ছা, আসব।' ফিসফিসিয়ে বললে ও, যেন ভেবেচিন্তে, নিজের সঙ্গেই লড়াই করে।

সেই মুহূর্তে কোথায় হঠাৎ একটা ঘড়ি বাজল। ও চমকে উঠল, তারপর বুক মোচড়ানো যন্ত্রণার একটা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললে, 'কটা বাজল?'

'নিশ্চয় সাড়ে দশটা।'

আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল ও।

'মাগো!' বলেই হঠাৎ ছুট মারল। কিন্তু ফের ওকে প্যাসেজের ওখানে আটকালাম।

বললাম, 'অমন করে যাওয়া চলবে না তোমার। ভয় পাচ্ছ কেন? দেরি হয়ে গেছে কি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি! যেতে দিন আমায়! আমায় মারবে!' হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে চেঁচিয়ে উঠল ও। স্পষ্টই বোঝা গেল কথাটা বলে ফেলেছে ও মুখ ফসকে।

'শোনো, শোনো, পালিয়ো না। ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপে যাবে তো তুমি? আমিও সেখানেই যাচ্ছি, তেরো নম্বর লাইনে। আমারও দেরি হয়ে গেছে, একটা গাড়ি নেব। আমার সঙ্গে আসবে? আমি পৌঁছে দেব। হাঁটার চেয়ে তাড়াতাড়ি হবে...'

আরো ভয় পেয়ে ও চেঁচিয়ে উঠল, 'না না, আপনার আসার দরকার নেই আমার সঙ্গে, দরকার নেই।' ও যেখানে থাকে সেখানে পাছে আমিও যাই এই ভয়ে বিকৃত হয়ে উঠেছিল ওর সারা মুখ।

'কিন্তু বলছি যে আমার নিজের কাজেই তেরো নম্বর লাইনে আমি যাচ্ছি। তোমার বাসায় আমি যাব না! তোমার পেছুও নেব না। গাড়ি করে পৌঁছে দেব তাড়াতাড়ি। চলো যাই!'

দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামলাম আমরা। প্রথম যা পেলাম সেই হতচ্ছাড়া গাড়িটাই নিলাম। বোঝা গেল, এলেনার খুবই তাড়া ছিল, কেননা আমার সঙ্গেই যেতে রাজী হল সে। আশ্চর্য এই যে ওকে বেশি প্রশ্ন করার সাহসও আমার হল না। যার এত ভয় ও পাচ্ছে সে কে, প্রশ্ন করা মাত্রই ও প্রায় গাড়ি থেকেই লাফ মারে আর কি। মনে মনে ভাবলাম, "ব্যাপারটা কী?"

গাড়িতে বসে থাকতে ওর খুবই অসুবিধে হচ্ছিল, প্রত্যেক বার ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে ও টাল সামলাবার জন্যে আমার ওভারকোট আঁকড়ে ধরেছিল তার ছোট্ট, নোংরা, ঠান্ডায় খড়খড়ে আর লাল হয়ে ওঠা বাঁ হাতটা দিয়ে, অন্য হাতে সজোরে চেপে রেখেছিল বইগুলো। বেশ বোঝা যাচ্ছিল বইগুলো ওর কাছে ভারি মূল্যবান। টাল সামলাবার সময় ওর পাটা চোখে পড়ছিল আমার। অবাক হয়ে দেখলাম সে পায়ে কোনো মোজা নেই — আছে শুধু ছেঁড়া

দু'পাটি জুতো। কিছু ওকে জিজ্ঞেস করব না ঠিক করে রাখলেও ফের প্রশ্ন না করে পারলাম না।

বললাম, 'সত্যিই কি তোমার মোজা নেই? এমন ভেজা আবহাওয়া আর এই ঠান্ডায় ন্যাড়া পায়ে কি হাঁটা যায়?'

ঝটকা মেরে বললে, 'নেই।'

'সে কী! ভগবান, কারো কাছে তো নিশ্চয় থাকো! বাইরে যখন বেরোও তখন এক জোড়া কারো কাছ থেকে চেয়ে নিতেও তো পারতে।'

'এই আমার ভালো...'

'কিন্তু অসুখ করবে যে। মারা পড়বে!'

'মরি মরব।'

বোঝা যাচ্ছিল জবাব দিতে ও চায় না, আমার প্রশ্নে রাগ হচ্ছে ওর।

'এই যে দ্যাখো। এইখানে মারা গিয়েছিলেন উনি।' বুড়ো যেখানে মারা গিয়েছিল সেই বাড়িটা দেখিয়ে বললাম।

একদৃষ্টে ও চেয়ে দেখলে, তারপর হঠাৎ অনুনয় করে আমায় বললে, 'ভগবানের দোহাই, আমার পেছু নেবেন না যেন। আমি আসব, নিশ্চয় আসব! সুযোগ পেলেই আসব!'

'তা বেশ, তোমায় তো আগেই বলেছি, তোমার পেছু পেছু যাব না। কিন্তু এত ভয় তোমার কিসে? নিশ্চয় দুঃখী তুমি। তোমার দিকে চাইতেও কষ্ট হয়...'

'কাউকে ভয় করি না আমি।' জবাব দিলে ও গলার স্বরে বিরক্তির ঝাঁঝ নিয়ে।

'কিন্তু এক্ষুনি যে বললে "ও আমায় মারবে"।'

'মারুক গে!' চোখদুটো ওর জ্বলে উঠল, 'মারুক! মারুক!' জ্বালা নিয়ে পুনরাবৃত্তি করলে ও, ওপরের ঠোঁটটা কেমন একটা ঘেন্নায় স্ফুরিত হয়ে কাঁপতে থাকল।

অবশেষে ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপে পৌঁছানো গেল। ছয় নম্বর লাইনের মোড়েই ও গাড়ি থামিয়ে লাফিয়ে নেমে উৎকণ্ঠায় তাকিয়ে দেখলে চারিদিক।

'চলে যান! আমি যাব, যাব!' ভয়ানক অস্বস্তিতে বললে ও, ওর পেছন পেছন যেতে মানা করে অনুনয় করলে, 'চলে যান, তাড়াতাড়ি করে চলে যান এখান থেকে!'

গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলাম আমি। কিন্তু বাঁধের ওপর কয়েক গজ গিয়েই গাড়িখানা ছেড়ে দিলাম, তারপর ছয় নম্বর লাইনে ফিরে এসে অপর দিকে দ্রুত ছুটলাম। দেখতে পেলাম ওকে: বেশি দূর ও তখনো যেতে পারে নি, যদিও হাঁটছিল জোরেই, আর বার বার ঘাড় ফিরিয়ে দেখছিল। দু'একবার থেমে ঘুরে দাঁড়িয়েও লক্ষ্য করলে আমি আসছি কিনা। সামনের একটা ফটকের ভেতর লুকিয়ে পড়েছিলাম আমি, আমায় দেখতে পায় নি। ও এগিয়ে চলল, রাস্তার অন্য দিক ধরে, আমিও চললাম পেছু পেছু।

ঔৎসুক্য আমার চরমে উঠেছিল। ঠিক করে রেখেছিলাম, ওর ওখানে যাব না, তবু ভয়ানক ইচ্ছে হল দেখিই না, কোন বাড়িতে ও ঢোকে। একটা অদ্ভুত পীড়াদায়ক অনুভূতি আমায় পেয়ে বসেছিল, মিষ্টিখানায় যখন আজর্কা মারা যায়, তখন ওই মেয়েটির দাদুকে দেখে আমার যা হয়েছিল অনেকটা সেই রকম...

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মালি স্ট্রিট পর্যন্ত অনেকটা পথ হাঁটতে হল। প্রায় দৌড়ে যাচ্ছিল মেয়েটা। শেষ পর্যন্ত ঢুকলে একটা ছোটো দোকানের মধ্যে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি। ভাবলাম, "দোকানটাতে ও নিশ্চয় থাকে না।"

এক মিনিট পরে ও বেরিয়ে এল সত্যিই, কিন্তু বইগুলো আর সঙ্গে নেই। বইয়ের বদলে একটা মাটির পাত্র হাতে।

আর একটু এগিয়ে যে বাড়িটার ফটকে ও ঢুকলে সেটা দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো নয়। বাড়িখানা বড়ো নয়, যদিও দালান-বাড়ি, দোতলা, পুরনো, ময়লাটে-হলদে রঙ। নিচের তলার তিনটি জানলার একটিতে দাঁড় করানো আছে ছোটো একটা লাল কফিন — নগণ্য কোনো কফিনওয়ালার বিজ্ঞাপন। ওপর তলার জানলাগুলো ভারি ক্ষুদে ক্ষুদে, দেখতে একেবারে চৌকো, ফাটল-ধরা মিটমিটে সবুজ শার্শি, তার মধ্যে দিয়ে চোখে পড়ল ফিকে গোলাপী রঙের পর্দার আভাস। রাস্তা পার হয়ে বাড়ি পর্যন্ত এলাম আমি। ফটকের ওপর লোহার পাতে লেখা: "শ্রীমতী বুবনভার বাড়ি"।

লেখাটা পড়া শেষ হতে না হতেই কানে এল মেয়েলী গলার একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার, তারপর গালাগালির আওয়াজ। ফটকের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। কাঠের বার-বারান্দায় সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটি মোটা মেয়ে, মাথায় মেয়েলী টুপি, কাঁধে সবুজ শাল। মুখের রঙটা জঘন্য রকমের লাল। ফুলো

ফুলো ক্ষুদে রক্তিম চোখদুটো জ্বলছে রাগে। বোঝা যাচ্ছিল মেয়েটি নেশা করেছে, যদিও বেলা তখনো গড়ায় নি। বেচারী এলেনার ওপর চেঁচাচ্ছিল মেয়েটা। হাতে পাত্রটা নিয়ে ওর সামনে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এলেনা। রাঙা-মুখো মাগীটার পেছনে সিঁড়িতে দেখা দিল আলুথালু একটি নারীমূর্তি, মুখে তার পাউডারে আর রুজে ল্যাপা। একটু পরে নিচেকার কুঠরিতে যাবার সিঁড়িতে দরজা খুলে উঠে এল দীন পোশাকের একটি মধ্য বয়সী মেয়ে। এল বোধ হয় চিৎকার শুনেই। চেহারাটা ওর সুশ্রী এবং নম্র। নিচের মহলের অন্য বাসিন্দা — অথর্ব একটা বুড়ো আর অল্পবয়সী একটি মেয়ে তাকিয়ে দেখছিল আধখোলা দরজা দিয়ে। আঙিনার মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক ঢ্যাঙা চেহারার ষণ্ডাগণ্ডা লোক, হাতে একটা ঝাঁটা, সম্ভবত জমাদার। আলস্যে তাকিয়ে দেখছে গোটা কাণ্ডটা।

'বটে রে হতচ্ছাড়ি, রক্তচোষা হারামজাদী!' এক নিঃশ্বাসে যত গাল সব উজাড় করে চ্যাঁচাল মাগীটা। সে চ্যাঁচানির মধ্যে কমা দাঁড়ি কিছু নেই, আছে শুধু কেমন একটা খাবি খাওয়ার ভাব, 'তোর জন্যে যা করছি এই তার শোধ দেবার নমুনা, মুখপুড়ি কোথাকার! পাঠিয়েছিলাম কিছু শসা আনবার জন্যে আর একেবারে উধাও! আমার মন ঠিক গাইছিল, বাইরে পাঠালেই ও সরে পড়বে। বুক আমার টনটন করছিল কেবল। কাল রাতেই এই দোষের জন্যেই বেশ একচোট দিয়েছি, আর দ্যাখো আজকেই ফের ছুট! যাস কোথায় তুই মরতে? কার কাছে যাস বুড়ী মুখপুড়ি, চেয়ে আছে কেমন রাক্ষসী, বিষপুঁটলি, কে সে? বল শিগ্‌গির, আস্তাকুঁড়ের এঁটো কোথাকার — নইলে এখুনি গলা টিপে শেষ করে দেব!'

ক্ষিপ্ত মাগীটা ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল বেচারি এলেনার ওপর। বারান্দার সিঁড়ির মেয়েটি ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে হঠাৎ থেমে গেল, কিন্তু আগের চেয়েও তীক্ষ্ম কণ্ঠে ওকেই বলতে লাগল হাত নাড়া দিয়ে, তার হতভাগ্য শিকার যে পৈশাচিক অপরাধ করেছে, যেন ওকেই তার সাক্ষী মানতে চায়।

'মাকে খেয়েছে ওটা! তোমরা তো সবই জানো গো, কেউ তো ওর নেই। দেখলাম, তোমাদেরই ঘাড়ে পড়েছে, নিজেরাই তোমরা গরিব লোক, নিজেদেরই খাবার জোটে না। ভাবলাম, সেণ্ট নিকোলাসকে স্মরণ করে একটু কষ্ট করি, অনাথা মেয়েটাকে পালি। নিলাম তো, কিন্তু কী হল? দু'মাস ধরে ওকে আমি খাওয়াচ্ছি পরাচ্ছি, অথচ আমার রক্ত চুষে চুষে একেবারে ঝাঁঝরা করে

দিলে ওই জোঁকটা, আমার নশ্বর দেহ কুরে কুরে খেলে। ওই কালনাগিনী, একগুঁয়ে শয়তানটা। মারো আর ধরো, একটা কথাও যদি বলে! এমন মুখ বুজে থাকবে যেন মুখভর্তি জল। কথার জবাব না দিয়ে আমায় একেবারে উত্ত্যক্ত করে দেয়। নিজেকে কী ভেবেছিস তুই, ভারি আমার নবাবনন্দিনী, সবুজমুখী বাঁদরী কোথাকার? আমি না থাকলে যে না খেয়ে রাস্তায় মরতে হত! আমার পা ধোয়া জল খাওয়া উচিত তোর রাক্ষসী, কালা ফরাসী কোথাকার। আমি নইলে যে মরতিস!'

'কিন্তু অত অস্থির হচ্ছেন কেন আন্না ত্রিফনোভনা? আজ আবার কী করলে ও?' তিরিক্ষি মাগীটাকে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞেস করলে মেয়েটি।

'সে কি বলার কথা বাছা, সে আর কী বলব! আমার কথা মানবে না ও সব আমার কাছে চলবে না। ভুল হোক ঠিক হোক — আমার মতে চলতে হবে, আমি অমনি ধারা লোকই বটি! আজ সকালে ছুঁড়ী আমায় একেবারে কবরে পাঠাচ্ছিল আর কি! কয়েকটা শসা আনার জন্যে দোকানে পাঠিয়েছিলাম আর এল এই এতক্ষণে — তিন ঘণ্টা বাদে! যখন পাঠাই তখনই আমার কেমন মনে হচ্ছিল, বুকটা আমার কেবলি জ্বালা পোড়া করেছে। কোথায় গেছলি, বলি গেছলি কোথায়? কাকে মুরুব্বী পেয়েছিস? অথচ কী না আমি করেছি ওর জন্যে। ওর খানকী মাটা তো আমার কাছে চোদ্দ রুবল ধারে, তা মাপ করে দিয়েছি, নিজে খরচা করে কবর দেবার ব্যবস্থা করেছি, আর ঐ বিচ্ছুটাকে নিয়েছি পালব বলে, — তোমরা তো সবই জানো বাছা, নিজেরাই জানো। ওর ওপর আমার একটা অধিকার তাহলে কেনই বা থাকবে না? ওর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, তা না চলেছে আমারই বিরুদ্ধে! কত না ভালো করতে গেছি ওর। চেয়েছিলাম মসলিনের একটা পোশাক পরুক! গস্তিনি দ্‌ভর থেকে এক জোড়া বুট কিনে দিয়ে ময়ূরের মতো করে সাজিয়ে দিয়েছিলাম ওকে। পরবের দিনে চেয়ে দেখবার মতো! কিন্তু কী দাঁড়াল বলো দেখি বাছারা? দুদিনের মধ্যে পোশাকটা একেবারে ছিঁড়ে-খুঁড়ে ন্যাতা করে ফেললে — ঐ ন্যাতা পরেই দ্যাখো ঘুরছে কেমন। আর জানো বাছা? ছিঁড়েছিল ইচ্ছে করেই — মিথ্যে বলব না — নিজের চোখে আমি দেখেছি, মসলিন ও পরবে না, ন্যাতাকানি পরেই ঘুরতে চায়! আমিও ছাড়ি নি! এমন এক চোট শিক্ষা দিয়ে ছেড়েছিলাম যে পরে আবার ডাক্তার ডাকতে হল, তার জন্যেও খরচা হয়ে গেল আমার। অথচ তোকে যদি তখন গলা টিপে মেরে ফেলতাম, রাক্ষসী কোথাকার, তাহলে এক হপ্তা দুধ না খেলেই চুকে যেত।

তোকে মেরে ফেললেও ওর বেশি আর প্রাচিত্তির আমায় করতে হত না। শাস্তি দিয়ে বললাম মেঝে ঘষতে। কী জানো, বাছা? মেঝে ঘষেই চলল ছুঁড়ী। দেখি আর রাগে ফুঁসি। এইবার ও পালাবে ঠিক, ভাবলাম। আর ভাবতে না ভাবতেই কাল দেখি পালিয়েছে! কাল কি মারই না মেরেছিলাম বাছা, তোমরা তো শুনেছিলে। হাত এখনো টাটাচ্ছে! জুতো-মোজাও কেড়ে রেখে দিয়েছিলাম, — ভাবলাম খালি পায়ে তো আর যেতে পারবে না। ও মা, আজও দেখি পালিয়েছে! কোথায় গিয়েছিলি তুই? বলবি না? কার কাছে গিয়ে আমার নামে নালিশ করে এসেছিস মুখপুড়ি? কার কান ভাঙাচ্ছিস তুই? মুখ খোল্ বেদেনী মেয়ে কোথাকার, মেলেচ্ছো, মুখ খোল!'

খেপে উঠে ও ছুটল আতঙ্কিত মেয়েটার দিকে, চুলের মুঠি ধরে উলটে ফেললে মাটিতে। শসার হাঁড়িটা ছিটকে পড়ে ভেঙে গেল। তাতে ঐ মাতাল রণচণ্ডীর রাগটা গেল আরো বেড়ে। বেচারীর মুখে মাথায় ঘুষি চালাতে লাগল ও। কিন্তু একগুঁয়ের মতো বোবা হয়ে রইল এলেনা। ঘুষি খেয়েও একটা শব্দ, একটু কান্না, একটা নালিশও বেরুল না তার মুখ থেকে।

ক্রোধে প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়ে আঙিনায় ঢুকে পড়ে সোজা ছুটে গেলাম মাতাল মাগীটার কাছে।

খাণ্ডারীর হাত চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এ কী করছেন? গরিব অনাথ মেয়ের ওপর এই ব্যবহার — কী স্পর্ধা আপনার?'

'এ আবার কী? কে বটো বাপু তুমি?' এলেনাকে ছেড়ে দিয়ে কোমরে হাত রেখে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা, 'আমার বাড়িতে কী চাই তোমার?'

'বলতে চাই যে আপনি একটি পাষণ্ড মেয়ে!' হেঁকে উঠলাম আমি, 'একটা বাচ্চার ওপর অমন তম্বি করেন কোন সাহসে? আপনার মেয়ে নয় ও। এক্ষুনি নিজের কানে শুনলাম, ওর কেউ নেই, আপনি ওকে পালতে নিয়েছেন...'

উগ্রচণ্ডী চেঁচিয়ে উঠল, 'কিন্তু তুমি কে বাপু নাক গলাতে এসেছ? ওর সঙ্গে এসেছ বুঝি? সোজা যাচ্ছি দাঁড়াও দারোগার কাছে! স্বয়ং আন্দ্রোন তিমফেয়িচ আমায় ভদ্র মহিলার মতো সম্মান করেন! তোমার কাছেই বুঝি ও যায় দেখা করতে? নিজেকে কী ভেবেছ তুমি? পুলিস, পুলিস, অন্যের বাড়ি ঢুকে হাঙ্গামা লাগিয়েছে লোকটা!'

ঘুষি বাগিয়ে ও ছুটে এল আমার দিকে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই কানে এল একটা অমানুষিক তীক্ষ্ণ চিৎকার। এতক্ষণ অচৈতন্যের মতো দাঁড়িয়েছিল এলেনা। তাকিয়ে দেখলাম, হঠাৎ একটা অদ্ভুত অস্বাভাবিক আর্তনাদ করে ও

মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে শুরু করেছে ভয়াবহ খিঁচুনিতে। মুখ বিকৃত হয়ে গেছে। মৃগীরোগের ফিট হয়েছে ওর। আলুথালু সেই মেয়েটা আর নিচ মহলের মহিলাটি ছুটে গেল ওর দিকে। তাড়াতাড়ি তুলে ধরাধরি করে নিয়ে গেল ওপরে।

'যা, যা, মর গে দম বন্ধ হয়ে!' মাগীটা চ্যাঁচাতে লাগল, 'এ মাসে এই নিয়ে তিনবার ফিট হল ওর... আর বেরোও তো তুমি, ব্যাটা দালাল!' ফের আমার দিকে তেড়ে এল ও।

'ওখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছ তুমি, জমাদার? তোমায় বেতন দিই কিসের জন্যে?'

'ভাগো হে, ভাগো! নইলে গাঁট্টা খাবে মাথায়।' ধীরেসুস্থে জলদগম্ভীর গলায় হাঁক পাড়লে জমাদার, যেন ওটা করতে হয়, 'দুইয়ে পাঠ, তিনে হট্টগোল। গুটিয়ে বাটিয়ে ভাগো এখন!'

গত্যন্তর ছিল না কিছু। আমার হস্তক্ষেপ নিষ্ফল বুঝে ফটকের দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু রাগে ফুলছিলাম। ফটকের উল্টো দিককার ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলাম ভেতরে। আমি বেরিয়ে আসা মাত্র উগ্রচণ্ডী মাগীটা উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে এবং কর্তব্য সমাধা হয়েছে দেখে জমাদারও অদৃশ্য হল কোথায়। এলেনাকে যে মেয়েটি ধরে নিয়ে গিয়েছিল, মিনিটখানেক পরে সে নিচ মহলে যাবার সিঁড়িতে নামতে যাচ্ছিল। কিন্তু আমায় দেখে সে স্থির হয়ে দাঁড়ালে, তাকালে ঔৎসুক্য নিয়ে। মেয়েটির শান্ত সদয় মুখ দেখে ভরসা হল। ফের আঙিনায় সোজা গিয়ে দাঁড়ালাম ওর কাছে।

বললাম, 'জিজ্ঞেস করতে পারি কি, মেয়েটি কে আর তাকে নিয়ে কী করছে ঐ বীভৎস মাগীটা? ভাববেন না যেন এ শুধু একটা অলস কৌতূহল, মেয়েটিকে আমি দেখেছি এবং বিশেষ একটা ঘটনার দরুন ওর সম্পর্কে আমার খুব একটা আগ্রহের কারণ ঘটেছে।'

'ওর সম্পর্কে যদি আপনার আগ্রহ থাকে, তবে এখানে রেখে ওর সর্বনাশ করার চেয়ে ওকে বাড়ি নিয়ে যান বা অন্য কোনো একটা জায়গা দেখুন!' যেন অনিচ্ছাসহকারে কথাটা বলে মেয়েটি চলে যাবার উপক্রম করলে।

'কিন্তু আপনি যদি আমায় কিছু না জানান, তাহলে আমি কী করতে পারি। মেয়েটি সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না। আর উনিই বোধ হয় বাড়িওয়ালী বুবনভা স্বয়ং?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু মেয়েটা ওর হাতে গিয়ে পড়ল কী করে? ওর মা কি এখানে মারা গেছেন?'

'ওই অমনি হাতে গিয়ে পড়েছে... ও সব কথায় আমরা নেই,' ফের যাবার উপক্রম করল মেয়েটি।

'কিন্তু একটু অনুগ্রহ করুন। আপনাকে বলেছি, ব্যাপারটায় আমার খুবই কৌতূহল। হয়ত কিছু করতেও পারি। মেয়েটি কে? ওর মা-ই বা কে ছিলেন? জানেন কিছু?'

'মাকে বিদেশী বলেই মনে হয়। নিচে আমাদের সঙ্গে থাকত; নতুন এসেছিল খুব অসুখ নিয়ে। মারা যায় ক্ষয় রোগে।'

'নিশ্চয় গরিব ছিলেন খুব, নইলে মাটির নিচের ঘরেও অমন শেয়ারে থাকে না কেউ?'

'মা গো! গরিব বলে গরিব! চোখে দেখা যায় না। আমরা নিজেরাই কায়ক্লেশে চালাচ্ছি, অথচ যে পাঁচ মাস ছিল, তার মধ্যে আমাদের কাছেই ধার করেছিল ছ রুবল। কবর দেবার ব্যবস্থাটাও আমরাই করি। কফিন তৈরি করে দিয়েছিলেন আমার স্বামী।'

'কিন্তু বুবনভা বললেন যে উনিই কবর দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন।'

'কবর দিয়েছে বুবনভা! তা বটে!'

'উপাধি কী ছিল ওর?'

'সে আমার উচ্চারণ হবে না বাপু। কঠিন খুব। বোধ হয় জার্মান।'

'স্মিথ কি?'

'না, স্মিথ নয়। তারপরে ঐ আন্না ত্রিফনোভনা মেয়েটার ভার নেয়, বলে মানুষ করবে। মানে মোটের ওপর ব্যাপারটা ভালো নয়।'

'কোনো একটা মতলব আছে কি ওর?'

'ওর ব্যাপার-স্যাপার মোটেই ভালো নয়,' মেয়েটি জবাব দিলে ভাবতে ভাবতে। মনে হল যেন একটু দ্বিধা করছিল বলবে কি না। তারপর জানালে, 'কিন্তু ওসব কথায় আমাদের কী। আমরা বাইরের লোক...'

পেছন থেকে কোনো পুরুষের গলা শোনা গেল, 'একটু মুখ সামলে চোলো গো।' লোকটি বয়স্ক, মেয়েটির স্বামী — পরনে ড্রেসিং গাউন, তার ওপর পুরোন কোট। দেখে মনে হয় কোনো একজন কারিগর।

আমার দিকে কটাক্ষে তাকিয়ে বললে, 'আপনার কাছে কোনো কথা ওর বলার নেই মশায়, ওটা আমাদের ব্যাপার নয়... আর তুমি ভেতরে যাও তো।

বিদায় মশায়, আমরা কফিন বানাই। যদি আপনার তেমন কিছু দরকার পড়ে তাহলে খুব খুশি হয়ে... তাছাড়া আর আমাদের কিছু বলবার নেই...'

গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে বেরিয়ে এলাম। ভারি উত্তেজিত বোধ করছিলাম। কিছু আমি করতে পারি না, কিন্তু ওই ভাবে ছেড়ে রেখে দেওয়াও আমার পক্ষে কষ্টকর। কফিন মিস্ত্রির বৌয়ের মুখ থেকে যে দুয়েকটা কথা বেরিয়ে এসেছিল, সেটাই বিচলিত করছিল বিশেষ করে। টের পাচ্ছিলাম ব্যাপার ভালো নয়।

ভাবতে ভাবতে মাথা নুইয়ে হাঁটছিলাম। হঠাৎ আমার উপাধি ধরে তীক্ষ্ম গলায় কে যেন ডাকলে। তাকিয়ে যাকে দেখলাম, সে স্পষ্টতই অপ্রকৃতিস্থ, প্রায় টলছে। পোশাকটা বেশ পরিচ্ছন্ন, কিন্তু ওভারকোটটা বিচ্ছিরি আর টুপিটা চর্বিমাখা। মুখটা খুবই চেনা চেনা লাগছিল। ভালো করে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। চোখ মটকে বাঁকা হেসে ও বললে, 'চিনতে পারছিস না?'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

'আরে তুই, মাসলবোয়েভ!' মফস্বল ইস্কুলের পুরনো সহপাঠীকে হঠাৎ চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কী আশ্চর্য!'

'আশ্চর্যই বটে! বছর ছয়েক পরে দেখা। মানে, দেখা হয়েছে অবিশ্যি, কিন্তু হুজুর দৃকপাত করার যোগ্য মনে করেন নি। আপনি যে জেনারেল, সাহিত্যিক জেনারেল।' ঠাট্টার হাসি হেসে বললে ও।

বাধা দিয়ে বললাম, 'থাম দোস্ত মাসলবোয়েভ, বাজে বকছিস। প্রথমত, জেনারেলদের, এমনকি সাহিত্যিক জেনারেলদেরও চেহারা আমার মতো হয় না, তাছাড়া, এটাও শুনে রাখ, রাস্তায় তোর সঙ্গে একবার-দুবার দেখা হয়েছে তা বটে, কিন্তু স্পষ্টতই তুই আমায় এড়িয়ে গেছিস। যদি দেখি কেউ আমায় এড়িয়ে যেতে চাইছে, তবে আমিই বা কেন সেধে যাব তার কাছে? আর বলব আমার কী ধারণা? রঙে না থাকলে এবারেও আমায় ডাকতিস না। সত্যি কি না বল। যাক, কেমন আছিস? পুরনো দোস্ত রে, ভারি ভালো লাগছে দেখা হয়ে।'

'সত্যি? আমার... "অসামাজিক" মূর্তিটায় তোর মান যাচ্ছে না তো? কিন্তু সে কথা জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, ওটা বড়ো কথা নয়। কী ভালো ছেলেই তুই ছিলি ভানিয়া, সব সময় ভাবি। মনে আছে, আমার জন্যে একবার পিটুনি

খেয়েছিলি? মুখ বুজে ছিলি তুই, আমার নাম করিস নি। অথচ তার জন্যে কৃতজ্ঞ না হয়ে আমি তোকে গোটা সপ্তাহ ধরে ঠাট্টা করে জ্বালিয়ে ছিলাম। নিষ্পাপ মন তোর! ভারি আনন্দ হচ্ছে দেখা হয়ে।' (পরস্পরকে চুম্বন করলাম আমরা।) 'কত বছর হয়ে গেল, নিজের রোজগারে নিজে চলছি, সকাল থেকে সন্ধ্যে, আঁধার থেকে ভোর। কিন্তু পুরনো দিনের কথা কিছুই ভুলি নি। ওসব কথা ভোলা যায় না। কিন্তু তোর কী হাল বল তো, কী করছিস?'

'আমি? কেন, আমিও তো লড়ে চলছি একা একা...'

দীর্ঘ দৃষ্টিপাত করলে ও, নেশায় অপ্রকৃতিস্থ লোকের প্রবল অনুভূতি নিয়ে। তবে লোকটা এমনিতেই ভারি ভালো।

করুণ সুরে ও অবশেষে জানালে, 'না ভানিয়া, তুই আমার মতো নোস। আমি পড়েছি রে... পড়েছি ভানিয়া, পড়েছি... যাক, শোন, তাহলে একটু দিলখোলা আলাপ করা যাক। তাড়া আছে তোর?'

'তাড়া আছে, একটা ব্যাপারে ভারি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। কিন্তু তার চেয়ে ভালো হয় যদি বলিস কোথায় থাকিস তুই?'

'তা বলছি বটে, কিন্তু সেটা ভালো হবে না। বলব, কী সবচেয়ে ভালো হবে?'

'কী?'

'শোন, ওই দ্যাখ,' যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে কয়েক পা দূরের একটা সাইনবোর্ড আমায় দেখালে, 'ওটা একটা মিষ্টিখানা, রেস্তোরাঁ। মানে খাবার জায়গা — কিন্তু জায়গাটা ভালো। খাসা জায়গা — আর ভোদকা যা পাওয়া যায়, সে কী বলব! কিয়েভ থেকে পায়ে হেঁটে আসে জিনিসটা। খেয়েছি আমি, বহুবার খেয়ে দেখেছি — ওরা আমায় বাজে মাল দিতে সাহস করে না। ফিলিপ ফিলিপিচকে ওরা চেনে। জানিস তো, লোকে আমাকে এখানে সম্মান করে বলে ফিলিপ ফিলিপিচ। অমন মুখ বিকৃত করে তাকাচ্ছিস কেন? দাঁড়া, আগে আমি যা বলবার বলে নিই। এখন সোয়া এগারোটা, এইমাত্র দেখলাম। বারোটা বাজতে ঠিক পঁচিশ মিনিটে তোকে ছেড়ে দেব। এবং ইতিমধ্যে টানা যাবে। পুরনো বন্ধুর জন্যে বিশ মিনিট। চলবে?'

'শুধু বিশ মিনিট যদি হয় ঠিক আছে, উঃ, সত্যিই কাজ আছে, ভাই...'

'চলবে যখন তখন চলুক। কিন্তু প্রথমে দুটো কথা? তোর চেহারা খুব খারাপ দেখাচ্ছে যেন কিছু একটা ব্যাপারে দমে আছিস, সত্যি?'

'সত্যি।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম। মুখ দেখে চরিত্র বলে দেবার বিদ্যেটা আমি

শিখতে শুরু করেছি, সেটাও একটা কাজ বৈকি। তাহলে চল যাই, একটু আড্ডা দেওয়া যাক। বিশ মিনিটের মধ্যে প্রথমত অমৃতের পেয়ালায় একটু চুমুক দেওয়া, বার্চ মদ গেলা, তারপর অরেঞ্জ বিটার্স, তারপর একটা "পারফেত্ আমুর", তারপরে অন্য কিছু — সবই সারা যাবে। টানি, ইয়ার, টানি! প্রকৃতিস্থ থাকি শুধু পরবের দিন, সকাল বেলাকার উপাসনার আগে। তুই যদি খেতে না চাস, খাবি না। আমার শুধু তোকেই দরকার। কিন্তু যদি একপাত্র টানিস, তাহলে সত্যিই তোর উদারতা দেখাতে পারবি। চল যাই! একটু বকবক করে ফের আবার দশবছরের মতো বিদায়। আমি তো তোর ঠিক যুগ্যি নই রে, ভানিয়া।'

'অত বকবক না করে চল যাই। তোর জন্যে শুধু বিশ মিনিট, তারপরে চলে যাব কিন্তু।'

রেস্তোরাঁয় পৌঁছতে আমাদের রাস্তা থেকে দোতালা পর্যন্ত দুটো কাঠের সিঁড়ি ভাঙতে হল। সিঁড়িতে হঠাৎ সামনে পড়ল ভয়ানক মাতাল দুটি ভদ্রসন্তান। আমাদের দেখে ওরা টলমল করে সরে দাঁড়াল।

ওদের একজনের বয়স খুব কম, কচি চেহারা, তাতে মুখের বোকা-বোকা ভাবটা খুবই বেড়ে উঠেছে, অল্প অল্প মোচের আভাস দেখা যায়, দাড়ি ওঠে নি এখনো। পোশাকে বাবুগিরি আছে খুব, কিন্তু কেমন যেন হাস্যকর। মনে হয় যেন অন্য কারো বেশভূষায় সেজে এসেছে। হাতে দামী আংটি, টাইয়ে দামী পিন, কিন্তু টেরি কেটে যে ঢেউটা তোলা হয়েছে সেটা ভারি বোকার মতো। কেবলি হেসেই চলেছে ছেলেটা, খিলখিল করছে। ওর সঙ্গী ভদ্রলোকটির বয়স পঞ্চাশের কোঠায়, স্থূলকায়, বৃকোদর, হেলাফেলা করে পোশাক-পরা, কিন্তু টাই-য়ে বিরাট পিনটি আছে ঠিক, চুল উঠে আসা টাক পড়া মাথা, দাগদাগালি-ভরা ফুলো ফুলো মাতাল মুখ, বোতামের মতো দেখতে নাকখানার ওপর একজোড়া চশমা। মুখের ভাবখানা কামাতুর এবং হিংস্র। কুতকুতে অপ্রীতিকর সন্দিগ্ধ চোখদুটো ওর চর্বির তলে চাপা পড়া, মনে হয় দুটো ছ্যাঁদার মধ্যে থেকে তাকাচ্ছে। মাসলবোয়েভকে ওরা দুজনেই চেনে বোঝা গেল। তবে আমাদের দেখে পেটমোটা লোকটার মুখে একটা বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল যদিও ক্ষণিক, আর অল্পবয়সী ছোঁড়াটার হাসি হয়ে উঠল বাধ্যবিনীত তোষামোদী ধরনের। মাথার টুপিটা পর্যন্ত নামিয়ে নিলে ও।

মিষ্টি করে তাকিয়ে বিড়বিড় করল, 'মাফ করুন, ফিলিপ ফিলিপিচ।'

'কী ব্যাপার?'

'ঘাট হয়েছে আমার... মানে ওই...' (কলারে টোকা দিতে লাগল ও।) 'মিত্রোশকা আছে ওখানে। দেখা যাচ্ছে, ও একটা আস্তো নচ্ছার ফিলিপ ফিলিপিচ।'

'কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

'মানে ঐ আর কী... গত সপ্তাহে একটা বিছছিরি জায়গায় ওর' (সঙ্গীর দিকে ইঙ্গিত করে মাথা নাড়লে ও) 'মুখে ক্রিম মাখিয়ে দিয়েছিল নেহাৎ ঐ মিত্রোশকা লোকটার জন্যে হি-হি-হি...' খিলখিল করে হেসে উঠল ছেলেটা।

সঙ্গী ওকে কনুইয়ের গুঁতো দিলে বিরক্তি ভরে।

'আর আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন-না ফিলিপ ফিলিপিচ? দ্যুসো-এর দোকানে আধ ডজন সাবাড় করা যাবে। আসছেন তো?'

'না হে, এখন হবে না,' মাসলবোয়েভ জবাব দিলে, 'কাজ আছে।'

'হি-হি-হি আমারও একটু কাজ আছে... আপনার সঙ্গে...' ফের কনুইয়ের খোঁচা দিলে সঙ্গী।

'পরে হবে। পরে হবে!'

বোঝা গেল ওদের দিকে কেন জানি তাকাতে চাইছিল না মাসলবোয়েভ। প্রথম ঘরখানা জুড়ে বেশ পরিপাটী একটা কাউণ্টার, তার ওপর সাজানো হরেক রকমের ঠান্ডা খাবার, পিঠে, মাছের সিঙাড়া, আর বিভিন্ন রঙের পানীয় ভর্তি নানা ডিকানটার। এখানে ঢুকেই মাসলবোয়েভ আমায় এক কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে বললে:

'ছেলেটা হল সিজব্রিউখভ, নামকরা আড়তদারের ছেলে। বাপ মারা যাবার পর পাঁচলাখ হাতে পেয়েছে, এখন উড়িয়ে চলেছে সেটা। প্যারিসে গিয়েছিল, দুহাতে টাকা উড়িয়েছে। সবটাই ওখানে ও শেষ করে দিত হয়ত, কিন্তু খুড়ো মারা যাওয়ায় ফের একটা সম্পত্তি পেয়ে গেল। প্যারিস থেকে ফিরে এসে এখন বাকিটা ওড়াচ্ছে। এক বছরের মধ্যে ভিক্ষে করতে হবে ওকে। হাঁসের মতো বোকা। সেরা সেরা রেস্তোরাঁয় আর শুঁড়িখানা আর মদের দোকানে ওর যাতায়াত, অভিনেত্রীদের নিয়ে চালাচ্ছে খুব — আবার চেষ্টা করছে ঘোড়সওয়ার বাহিনীতে ঢুকতে — হালে দরখাস্ত দিয়েছে। আর ঐ বয়স্ক লোকটা হল আর্খিপভ; ও-ও বোধ হয় একরকমের কারবারী কি ম্যানেজার; ঠিকাদারির জন্যেও ঘোরাঘুরি করেছে। লোকটা ছুঁচো, ধড়িবাজ, আপাতত সিজব্রিউখভের বন্ধু। একাধারে জুডাস আর ফলস্টাফ্। দুদুবার ও দেউলিয়া হয়েছে, অসহ্য রকমের কামুক জানোয়ার, নানা রকমে সেটা রসিয়ে

রসিয়ে। এই ব্যাপারে একটা ফৌজদারি মামলায় ও জড়িয়েছিল, আমি জানি, কিন্তু কেটে বেরিয়ে গেছে। ওকে এখানে দেখতে পেয়ে ভারি খুশি হয়েছি, তার বিশেষ একটা কারণ আছে। ওর অপেক্ষায় ছিলাম... এখন ও সির্জাব্রিউখভের মাথায় হাত বুলোচ্ছে। যত রকমের অস্থান-কুস্থান ওর জানা আছে, ওই ধরনের চ্যাঙ্গড়াদের কাছে ওর দাম সেই জন্যেই। অনেকদিন থেকে ওর জন্যে দাঁত শানাচ্ছি। মিত্রোশকাও দাঁত শানাচ্ছে — ওই যে বেপরোয়া মতো যে লোকটা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, বেদেদের মতো মুখ, পরনে দামী পোশাক। ঘোড়ার ব্যবসা আছে ওর, এখানকার সব ঘোড়সওয়ার সৈনিকই ওকে চেনে। অসম্ভব ফেরেববাজ, বলছি শোন, তোর সামনেই একটা জাল ব্যাঙ্ক-নোট তৈরি করে দেবে, কিন্তু তৈরি করেছে দেখলেও তুই সে নোটের ভাঙানি দিবি ওকে। ও পরে একটা চাপকান, যদিও জিনিসটা ভেলভেটের, আর দেখায় যেন একজন সনাতনী, (ওকে জিনিসটা মানায়ও বেশ)। কিন্তু বেশ খাসা ফিট-করা ফ্রক কোট-টোট পরিয়ে ওকে নিয়ে যা অভিজাতদের ক্লাবে, বলিস ইনি জাঁদরেল কাউণ্ট বারাবানভ, দেখবি দু'ঘণ্টা ধরে সবাই ওকে কাউণ্ট বলে খাতির করবে, ওয়ইস্ট্ খেলবেও, কথা কইবে কাউণ্টের চালে, কেউ টেরও পাবে না, সক্কলকে বোকা বানিয়ে দেবে। পরিণামে বিপদে পড়বে ও। তা, ওই পেটমোটাটার ওপর মিত্রোশকার ভারি রাগ — কেননা ঠিক এই মুহূর্তে মিত্রোশকার খুব টানাটানি চলছে। ওর সঙ্গে আগে খুব দহরম-মহরম ছিল সির্জাব্রিউখভের, কিন্তু ভালো করে মাথায় হাত বুলোবার আগেই ঐ পেটমোটাটা ওকে ভাগিয়ে নিয়েছে। এখানে যদি ওরা এখন জুটে থাকে, তাহলে কিছু একটা ব্যাপার আছে। সেটা কী, তাও আমি জানি, আন্দাজ করছি। আর কেউ নয়, মিত্রোশকাই আমায় জানিয়েছে যে আর্খিপভ আর সির্জাব্রিউখভ এখানে আসবে, কোনো একটা জঘন্য ব্যাপার নিয়ে ঘুরঘুর করবে এই এলাকাতেই। আর্খিপভের ওপর মিত্রোশকার যে রাগ, তার সুযোগ নেব আমি, আমারও একটা কারণ আছে, এখানে আমি এসেছিও প্রধানত সেই জন্যেই। মিত্রোশকাকে আমি সেটা দেখাতে চাই না, তুইও অমন করে চেয়ে থাকিস না। কিন্তু আমরা বেরিয়ে যেতে গেলেই ও ঠিক এসে যা জানতে চাই তা জানিয়ে দেবে... নে, এখন চল ভানিয়া, ওই দিকের ওই ঘরটাতে। স্তেপান!' ওয়েটারকে ও ডাকলে, 'কী চাই জানো তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আনছ তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে নিয়ে এসো। বস ভানিয়া। অমন করে আমার দিকে চেয়ে কী দেখছিস? দেখছি, কেবলি তাকাচ্ছিস আমার দিকে। অবাক লাগছে? অবাকের কী আছে। মানুষের ভাগ্যে কত কিছুই তো ঘটতে পারে, স্বপ্নেও যা ভাবি নি... বিশেষ করে যখন... মানে, যখন আমরা একসঙ্গে বসে কর্নেলিয়াস নেপস্ মুখস্থ করতাম। কিন্তু ভানিয়া, একটা জিনিসে নিশ্চিত থাক — মাসলবোয়েভ বিপথে গেলেও দিলটা তার বদলায় নি, বদলেছে শুধু বাইরের অবস্থাটা। কালিমাখা যতই হই, কারুর চেয়ে খারাপ নই। ভর্তি হয়েছিলাম ডাক্তারির ক্লাসে, রুশ সাহিত্যের শিক্ষকতায়, গোগলের ওপর একখানা প্রবন্ধও লিখেছিলাম, ভেবেছিলাম সোনার খনির ব্যাপারটাই আয়ত্ত করি, বিয়েরও তোড়জোড় করে ফেলেছিলাম আর কি। জ্যান্ত মানুষ তো একটু ভালোমন্দের পিয়াসী — মেয়েটাও রাজী হয়ে গিয়েছিল, যদিও ঘরটা এতই বাজে যে একটা বেড়ালকেও লোভানি দেওয়া যায় না। বিয়ে হবে-হবে, এক জোড়া ভালো জুতো ধার করতেও চেয়েছিলাম — কেননা দেড় বছর ধরে আমার নিজের জোড়াটা ছেঁড়া... কিন্তু বিয়ে হল না। ও বিয়ে করলে এক শিক্ষককে, আর আমি গিয়ে ঢুকলাম এক আপিসের চাকরিতে, মানে — সওদাগরী আপিস নয়, নেহাত মামুলী একটা আপিস। তখন গানে লাগল ভিন্ন সুর। সময় কেটে গেল — এখন চাকরি করি না বটে, কিন্তু টাকা কামাই ভালোই। ঘুষও নিই, আবার ন্যায়ের পক্ষেও দাঁড়াই। বরের ঘরের পিসি, কনের ঘরের মাসি। নীতি একটা ঠিক করেছি নিজের: জানি যে একা একা লড়া যায় না, তাই নিজের কাজ করে যাচ্ছি। আর কাজটা হল প্রধানত গোপন ব্যাপার নিয়ে... বুঝলি?'

'গোয়েন্দা-টোয়েন্দা নোস তো?'

'না, ঠিক গোয়েন্দা নই, কিন্তু সেরকম কাজ কিছু নিই, খানিকটা পেশা হিসাবে আর খানিকটা নিজের নেশায়। এই তো ভানিয়া, ভোদকা খাচ্ছি। কিন্তু বুদ্ধিটা কখনো খেয়ে বসি নি, তাই জানি আমার ভবিষ্যৎ। আমার দিন গেছে। কয়লা ধুলেও ময়লা ছাড়বে না। একটা জিনিস শুধু বলি, মানুষ হিসেবে যদি একেবারেই মরে গিয়ে থাকতাম, তাহলে আজ তোর কাছে যেতাম না। ঠিকই বলেছিলি, আগেও তোকে দেখেছি, সাক্ষাৎ হয়েছে, বহুবার চেয়েছি কথা বলি, কিন্তু সাহস হয় নি, কেবলি মুলতুবি রেখেছি। আমি তোর সমান তো নই। এটাও ঠিক বলেছিস ভাই, মাতাল বলেই শুধু আজ তোর কাছে

গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তবে এ সব একেবারেই ছাইভস্ম, আমার কথা থাক। বরং তোর কথা বলি। পড়েছি রে, তোর বইটা আমিও পড়েছি। তোর প্রথম বইখানার কথা বলছি দোস্ত। পড়েই একেবারে ভদ্রলোক হয়ে যাই আর কি, কিন্তু পরে ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম অভদ্র হয়েই থাকা যাক। এই হল গে ব্যাপার...'

আরো অনেক কথা বললে ও। ক্রমেই মাতাল হয়ে উঠতে লাগল, ভাবাকুলতায় চোখে প্রায় জল এসে গেল ওর। চমৎকার ছেলে ছিল মাসলবোয়েভ, কিন্তু সেয়ানা আর এঁচড়ে পাকা। ইস্কুলে পড়ার সময় থেকেই ও ভারি চালাক, তুখোড়, ফাঁকিবাজ, প্যাঁচালো, তবে মূলত হৃদয়হীন নয়; ভবিষ্যৎটি ওর ঝরঝরে। রুশেদের মধ্যে এমন লোক অনেক। প্রায়ই তাদের মধ্যে রীতিমতো সামর্থ্য থাকে, কিন্তু সবকিছুই কেমন তালগোল পাকিয়ে যায় এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্বলতার বশে জেনে শুনেই তারা নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে বসে এবং অনিবার্য সর্বনাশের দিকে যায় শুধু নয়, আগে থেকেই তা জানাও থাকে ওদের। যেমন মাসলবোয়েভ ডুবেছে মদে।

'আর একটি কথা দোস্ত,' বলে চলল ও, 'তোর খ্যাতি প্রথমটা কীরকম নিনাদিত হয়ে উঠেছিল, তা আমারও কানে গেছে। পরেকার সমালোচনাগুলোও পড়েছি (সত্যিই পড়েছি রে, ভাবছিস বুঝি আমি এখন কিছুই পড়ি না)। তার পরে দেখলাম, ছেঁড়া জুতোয় বিনা গালোশে হাঁটছিস কাদার মধ্যে, মাথায় দলামোচড়া টুপি। দেখে আঁচ করলাম কিছুটা। এখানে ওখানে প্রবন্ধ লিখে কোনোরকমে চালাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ, মাসলবোয়েভ।'

'ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া?'

'তাই তো দাঁড়াচ্ছে।'

'তাহলে একটা কথা বলি তোকে শোন: মদ খাওয়া এর চেয়ে অনেক ভালো। যেমন ধর, আমি যখন মদ খাই, তখন সোফার ওপর শুয়ে (চমৎকার একখানা সোফা আছে রে আমার, স্প্রিং-দেওয়া) ভাবি আমি একজন হোমার, কি দান্তে, কি কোনো এক ফ্রেডারিক বারবারোসা — যা খুশি নিজেকে বানাতে পারি। কিন্তু তুই নিজেকে দান্তে কি ফ্রেডারিক বারবারোসা বলে ভাবতে পারবি না কেননা প্রথমত, তুই তুই-ই হয়ে উঠতে চাস, এবং দ্বিতীয়ত, কোনো রকম ইচ্ছে-টিচ্ছে তোর বারণ, কেননা তুই ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া; আমার আছে কল্পনা, তোর শুধু বাস্তবতা। খোলাখুলি সোজাসুজি, ভাইয়ের মতো করে

বলছি শোন, (নয়ত দশ বছরের মতো আমায় অপমানিত রেখে যাবি), টাকা কি চাই না? আমার তো টাকা আছে। না, মুখ কোঁচকাস না বাপু। টাকা নে, প্রকাশকদের যা দেবার শোধ করে জোয়াল ছুড়ে ফেল ঘাড় থেকে। তারপর এক বছরের মতো দিন গুজরানের ব্যবস্থা করে লেগে যা তোর সাধ মেটাতে, বড়ো একটা কিছু লিখে ফ্যাল, হ্যাঁ? কী বলিস?'

'শোন মাসলবোয়েভ, তোর এই ভাইয়ের মতো প্রস্তাবটার জন্যে কৃতজ্ঞ, কিন্তু উপস্থিত কিছু বলতে পারছি না। কেন, সে এক মস্ত কাহিনী। কতকগুলো ব্যাপার আছে। কিন্তু কথা দিচ্ছি, তোকে পরে সব বলব, ভাইয়ের মতো। তোর প্রস্তাবের জন্যে ধন্যবাদ, কথা দিচ্ছি তোর কাছে আসব, প্রায়ই আসব। কিন্তু তোকে শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। তুই আমার কাছে মন খুলে বলেছিস, তাই ঠিক করেছি তোর পরামর্শ নিই, বিশেষ করে এ ব্যাপারগুলোয় তুই খুব ওস্তাদ।'

সেই মিষ্টিখানার ঘটনাটা থেকে শুরু করে স্মিথ আর তার নাতনীর পুরো কাহিনীটা ওকে শোনালাম। আশ্চর্য ব্যাপার, গল্পটা বলতে বলতে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে যেন মনে হল ও ব্যাপারটার খানিকটা জানে।

জিজ্ঞেস করতে ও উত্তর দিলে, 'না, না, ঠিক তা নয়, তবে স্মিথ সম্পর্কে কিছুটা শুনেছিলাম — কোনো এক বুড়ো মিষ্টিখানার মধ্যে নাকি মারা গেছে। কিন্তু শ্রীমতী বুবনভা সম্পর্কে আমি সত্যিই খানিকটা জানি। মাস দুই আগে আমি ঐ মহিলাটির কাছ থেকেই কিছু ঘুষ আদায় করেছি। Je prends mon bien, où je le trouve,* এবং একমাত্র এই দিক থেকেই আমি মলিয়েরের মতো। মেয়েটার হাত মুচড়ে তখন একশ রুবল বাগিয়েছিলাম বটে, কিন্তু শপথ করেছিলাম, একশ নয়, পাঁচশটি মুদ্রা ওর আমি খসাব। পাজী মেয়েমানুষ ওটা। অবৈধ কারবার চালায়। তাতে কিছু এসে যেত না, কিন্তু মাঝে মাঝে বড্ডো বেশি খারাপ করে। দোহাই তোর, ভাবিস না যেন আমি এক ডন কুইকজোট। ব্যাপারটা হল এই যে, আমি এ থেকে বেশ খানিকটা গুছিয়ে নিতে পারব। তাই আধ ঘণ্টা আগে সিজব্রিউখভের সঙ্গে দেখা হয়ে ভারি খুশি হয়েছি। বোঝাই যায় যে তাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং এনেছিল ঐ পেটমোটাটা। পেটমোটাটার কাজ কারবার কী তা তো আমি জানি,

---

* 'যেখানে পাই সেখানে থেকেই আমার ফয়দা ওঠাই' — মলিয়েরের প্রিয় প্রবাদ (ফরাসী ভাষায়)। — সম্পাঃ

তাই ঠিক করলাম... যাক গে ওকে এক চোট নেব! খুব খুশি হলাম তোর কাছ থেকে ঐ মেয়েটার কাহিনী শুনে। আমার কাছে এ হল আর একটা সূত্র। নানা রকমের ব্যক্তিগত কাজও তো আমি নিই, কত লোককে যে জানি! জনৈক প্রিন্সের জন্যে একটা ছোট্ট ব্যাপারের তদন্ত করে দিয়েছিলাম আমি কিছুদিন আগে, এমন একটা ব্যাপার যে ঐ প্রিন্সের দ্বারা তা সম্ভব আশাই করা যায় না। নাকি বিবাহিতা একটি মেয়ের গল্প শুনবি? এসে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে যাস দোস্ত, এমন সব প্লট আছে আমার যে তুই যদি লিখিস তো লোকে বিশ্বাসই করবে না...'

'আচ্ছা, কী নাম ছিল ঐ প্রিন্সের?' উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'কেন বল তো? আচ্ছা তোকে বলাই যাক, ভালকোভস্কি।'

'পিওতর?'

'হ্যাঁ, চিনিস নাকি?'

'চিনি কিন্তু খুব বেশি না। আচ্ছা মাসলবোয়েভ, ঐ ভদ্রলোক সম্পর্কে তোর কাছে জানতে আসব, একাধিকবার।' উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'ভারি কৌতূহল লাগছে।'

'দেখছিস তো দোস্ত, যতবার খুশি আসিস। গল্প আমি শোনাতে পারি, কিন্তু কিছুটা সীমা রেখে, বুঝেছিস তো? নইলে, আমার সুনাম প্রতিপত্তি সব যাবে, মানে আমার ব্যবসার দিক থেকে আর কি।'

'তাই সই, তোর সুনাম বাঁচিয়ে যতটা পারিস বলিস।'

আমি সত্যিই বিচলিত হয়ে উঠেছিলাম। ওর লক্ষ্যে পড়ছিল তা।

'কিন্তু, যে গল্পটা আমি শোনালাম সেটা সম্পর্কে কী বলছিস? ভেবেছিস কিছু?'

'তোর গল্প? আচ্ছা দাঁড়া একটু। পয়সাটা মিটিয়ে দিয়ে আসি।'

কাউণ্টারে গেল ও এবং সেখানে যেন এমনি হঠাৎ এসে দাঁড়াল সেই চাপকান-পরা যুবকটির পাশে, যাকে অমন ঘরোয়া ভাবে ডাকা হয়েছিল মিত্রোশকা বলে। মাসলবোয়েভ আমার কাছে যতটা স্বীকার করেছিল মনে হল তার চেয়েও বেশি ওদের জানাশোনা। অন্তত এটা স্পষ্ট বোঝা গেল এই ওদের প্রথম সাক্ষাৎকার নয়।

মিত্রোশকার চেহারার মধ্যে খানিকটা মৌলিকতা আছে। তার চাপকানের সঙ্গে লাল সিল্কের কামিজ, আর চোখা কিন্তু সুন্দর চেহারা, এখনো তা বেশ জোয়ান, গাঢ় রঙ, জ্বলজ্বলে সাহসী চোখ — এ সবের ফলে কেমন কৌতূহল

এবং আকর্ষণ জাগছিল। ভাবখানা তার খানিকটা লোকদেখানো গোছের বেপরোয়া, কিন্তু সেই সঙ্গে স্পষ্টতই ও এখন নিজেকে সংযত করে নিয়ে কাজের লোকের মতো ভারিক্কি ভাব করছে।

মাসলবোয়েভ আমার কাছে ফিরে এসে বললে, 'শোন ভানিয়া, আজ সন্ধ্যেয় সাতটায় আমার কাছে আসিস, হয়ত কিছু বলতে পারব তোকে। আমার নিজের তো বিশেষ কোনো মূল্যই নেই দেখছিস, আগে খানিকটা ছিল, কিন্তু এখন আমি শুধু একটা মাতাল, কাজকর্মের বাইরে। কিন্তু পুরনো সম্পর্ক-টম্পর্ক সব রয়ে গেছে; কিছু একটা বার করতে পারব, নানা ধরনের সেয়ানা লোকেদের গন্ধ শুঁকে বেড়াই। ওই করেই তো আমার চলে। অবিশ্যি অবসর সময়ে, মানে, যখন প্রকৃতিস্থ থাকি তখন নিজের কাজ খানিকটা করি, সেও বন্ধুদের মারফতই... প্রধানত তদন্তের কাজই বটে... যাক, ঢের হল... এই নে আমার ঠিকানা, শেস্তিলাভোচনায়া স্ট্রিট। তাহলে আসি দোস্ত। সত্যি, একটু বেশি হয়ে গেছে। আর একটা গেলাস — তারপর বাড়ি। শুয়ে পড়ব। যদি আসিস আলেক্সান্দ্রা সেমিওনভনার সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দেব। সময় থাকলে কবিতা চর্চাও করা যাবে।'

'বেশ, আর ওই ব্যাপারটা সম্পর্কেও?'

'হ্যাঁ, ওটাও সম্ভবত।'

'তা আসব, নিশ্চয় আসব...'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অনেকক্ষণ ধরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা। নাতাশার চিরকুট সম্পর্কে আগের দিন যা বলেছিলাম তাতে ও'র ভারি ঔৎসুক্য জেগেছিল। আরো অনেক সকালেই আমার আশা করছিলেন, অন্তত দশটার মধ্যে। বেলা একটার পরে আমি যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন বেচারীর প্রতীক্ষার যন্ত্রণা সহ্যশক্তির শেষ সীমায় পৌঁছেছে। তাছাড়া আগের দিন তাঁর মনে যেসব নতুন আশা জেগেছে সেসব কথা বলবার ভারি ইচ্ছে ছিল তাঁর, ইচ্ছে ছিল নিকোলাই সের্গেয়িচের কথা বলবেন, উনি কাল থেকে অসুস্থ, গোমড়া হয়ে উঠেছেন অথচ ও'র প্রতি কেমন যেন বিশেষ রকমের কোমল। আমি যখন গিয়ে দাঁড়ালাম, তখন মুখে একটা অসন্তুষ্ট, নিরুত্তাপ ভাব নিয়ে আন্না আন্দ্রেয়েভনা আমায় গ্রহণ করলেন, মুখ প্রায় খুললেনই না, কোনো

কৌতূহল দেখালেন না; যেন বলতে চান, "কেন এলে বাপু, রোজ ঘুর ঘুর করতে এত ভালোও লাগে?" দেরি করে এসেছি বলে রাগ হয়েছে ওঁর। কিন্তু আমার তাড়া ছিল, তাই ভনিতা না করে নাতাশার ওখানে আগের দিন সন্ধ্যেয় যা যা হয়েছে তা সব বললাম। রাজাবাহাদুরের আবির্ভাব এবং তাঁর গুরুগম্ভীর প্রস্তাবের কথা বলা মাত্রই কিন্তু ওঁর কপট তিক্ততা একেবারে উবে গেল। কী রকম খুশি যে হয়ে উঠেছিলেন তা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। মনে হল একেবারে আত্মহারা হয়ে গেছেন — ক্রুশ-চিহ্ন করলেন নিজের ওপর, কাঁদলেন, আইকনের সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলেন, জড়িয়ে ধরলেন আমায়, নিকোলাই সের্গেয়িচকে তাঁর আনন্দের কথা জানাবার জন্যে ছুটে যান আর কি।

'জানো তো বাপু, এই সব অপমান আর হেনস্তার জ্বালাতেই উনি অমন বদমেজাজী। যেই শুনবেন নাতাশা যোগ্য মর্যাদা পেয়েছে, অমনি ওসব কথা উনি নিমেষে ভুলে যাবেন।'

কোনোক্রমে ফেরালাম ওঁকে। স্বামীর সঙ্গে পঁচিশ বছর বাস করলেন ভদ্রমহিলা অথচ ওঁকে এখনো ভালো করে চিনতে পারেন নি। আমার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ নাতাশার কাছে যাবার জন্যেও উনি ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমি বোঝালাম ওঁকে, নিকোলাই সের্গেয়িচই যে শুধু কাজটা অপছন্দ করবেন তাই নয়, সমস্ত ব্যাপারটাই হয়ত তাতে ভেস্তে যাবে। জোর করেই তাঁর মত বদলানো গেল, কিন্তু উনি আমায় আরো আধ ঘণ্টা আটকে রাখলেন, নিজেই কথা কয়ে চললেন সব সময়। বললেন, 'কার সঙ্গে এখন থাকি, বুকের মধ্যে এমন আনন্দ নিয়ে চার দেয়ালের মধ্যে একলা বসে থাকব করে?' অনেক করে আমায় ছেড়ে দিতে রাজী করানো গেল, বললাম আমার অপেক্ষায় নাতাশা অধৈর্য হয়ে আছে। আমার শুভযাত্রার জন্যে একাধিকবার উনি ক্রুশের চিহ্ন দিলেন আমার ওপরে, নাতাশার জন্যে জানালেন তাঁর বিশেষ আশীর্বাদ, এবং নাতাশার কিছু বিশেষ ঘটনা না ঘটলে ঐ সন্ধ্যেয় ফের আসতে যখন আমি কিছুতেই রাজী হলাম না, তখন প্রায় কেঁদে ফেললেন। এবার নিকোলাই সের্গেয়িচের সঙ্গে দেখা হল না; সারা রাত ঘুমোতে পারেন নি উনি, বলছিলেন নাকি ঠান্ডা লেগেছে, মাথা ধরেছে, এখন তাঁর কাজের ঘরে ঘুমিয়ে আছেন।

নাতাশাও সারা সকাল আমার অপেক্ষা করেছিল। ভেতরে যখন গেলাম, তখন সচরাচর সে যাই করে, পায়চারি করছিল ঘরময়, দুহাত জড়ো করা, কী যেন ভাবছে। এখনো ওর কথা ভাবলেই ভেসে ওঠে হতশ্রী একখানা ঘরে

ওর নিঃসঙ্গ এই মূর্তিটা — ভাবনায় নিঝুম, পরিত্যক্ত এবং প্রতীক্ষমাণ, দুই হাত জড়ো করে মেঝের দিকে তাকিয়ে নিরুদ্দেশ এলোমেলো পায়চারি করে ফিরছে।

পায়চারি করতে করতেই ও নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলে কেন এত দেরি হল। আমার অভিজ্ঞতার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাখিল করলাম ওর কাছে, কিন্তু কানে ওর প্রায় কিছুই যায় নি। টের পাচ্ছিলাম, কী একটা ব্যাপারে ভারি উদ্বিগ্ন হয়ে আছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'নতুন কিছু ঘটেছে?'

বললে, 'না, তেমন কিছু নয়।' কিন্তু ওর মুখ দেখেই টের পেলাম নতুন কিছু একটা হয়েছে এবং সেই নতুনটার কথা বলবে বলেই ও আমার আশা করছিল, কিন্তু সেটা এখন, প্রতিবারের মতো বলবে ঠিক বিদায়কালে। ওই হল ওর স্বভাব। এ ব্যাপারটা আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল, প্রতীক্ষা করতে থাকলাম।

বলাই বাহুল্য, আগের সন্ধ্যের কথা তুলেই শুরু করা গেল। অবাক লাগল যে প্রিন্সের সম্পর্কে আমাদের দুজনের ধারণা বেশ মিলে যাচ্ছে: নিশ্চিতরূপেই তাঁর সম্পর্কে নাতাশার বিরূপতা দেখা গেল, আগের দিনের চেয়ে অনেক বেশি। ওঁর গতকালের আবির্ভাবের ব্যাপারটা যখন আমরা তন্নতন্ন করে বিশ্লেষণ করছিলাম, তখন হঠাৎ নাতাশা বলে উঠল,

'শোনো, ভানিয়া, চিরকালই তো ওই হয়। প্রথম যদি কাউকে খারাপ লাগে, তবে নির্ঘাৎ সেটা তাকে পরে ভালো লাগার লক্ষণ। অন্তত আমার বেলায় প্রত্যেকবার তাই হয়ে এসেছে।'

'আশা করি তাই যেন হয়। এবং এই আমার মত, নাতাশা, চূড়ান্ত মত: ভালো করে সব ভেবে দেখেছি এবং মনে হয়েছে, প্রিন্স সম্ভবত খুব ধুরন্ধর লোক হলেও তোমার বিয়েতে ওঁর সম্মতিটা অকপট এবং খাঁটি।'

ঘরের মাঝখানটায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নাতাশা কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলে। মুখের চেহারা ওর একেবারে বদলে গেছে, ঠোঁটদুটোও শিউরে উঠল।

অহঙ্কৃত বিমূঢ়তায় জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু এইরকমের একটা ব্যাপারে প্রবঞ্চনা আর... মিথ্যে উনি শুরু করবেন কেন?'

তাড়াতাড়ি করে বললাম, 'বটেই তো, বটেই তো!'

'বোঝাই যাচ্ছে, মিছে কথা তিনি বলেন নি। আমার ধারণা ও নিয়ে ভাববারও কিছু নেই। কোনোরকম ধূর্ততার অজুহাতই তো মেলা ভার।

তাছাড়া ও'র চোখে আমি এমন একটা কী যে আমায় নিয়ে অমন তামাশা করবেন? তেমন অপমান করা কী কোনো লোকের পক্ষে সম্ভব?'

'নিশ্চয় না, নিশ্চয় না।' সায় দিলাম আমি, যদিও মনে মনে ভাবলাম, "পায়চারি করতে করতে তুমি শুধু ওই কথাই ভাবছ বেচারি নাতাশা, আর সন্দেহটা তোমার হয়ত আমার চেয়েও বেশি।"

নাতাশা বললে, 'আহ্ উনি যদি আরো তাড়াতাড়ি ফিরে আসতেন! গোটা সন্ধ্যেটা উনি আমার সঙ্গে কাটাবেন বলেছেন, তাহলে... এসব ফেলে রেখে যখন ও'কে চলে যেতে হল তখন কাজটা নিশ্চয় খুব জরুরী। কী কাজ জানো নাকি ভানিয়া? কিছু শোনো নি?'

'সে শুধু ঈশ্বরই জানেন। সব সময় তো টাকার ধান্ধায় উনি ফেরেন। শুনেছি পিটার্সবুর্গের কোনো একটা ঠিকার কাজে শেয়ার কিনেছেন। ব্যবসার ব্যাপার-স্যাপার আমাদের কিছুই জানা নেই নাতাশা।'

'তা তো জানা নেই-ই। কাল কী একটা চিঠির কথা বলছিল আলিওশা...'

'কোনো একটা খবর হয়ত। আলিওশা এসেছিল আজ?'

'হ্যাঁ।'

'সকাল সকাল?'

'বেলা বারোটায়। ও তো দেরি করে ওঠে। কিছুক্ষণ ছিল এখানে, আমি পাঠিয়ে দিয়েছি কাতেরিনা ফিওদরোভনার কাছে, নইলে অনুচিত হত ভানিয়া।'

'কেন, ও কি নিজে থেকে যেতে চাইছিল না?'

'হ্যাঁ, নিজেই যেতে চাইছিল...'

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল নাতাশা, কিন্তু চুপ করে গেল। ওর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি। মুখখানা ওর বিষণ্ণ। আমি প্রশ্ন করতে পারতাম, কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ মাঝে মাঝে ভারি অপছন্দ করে ও।

'অদ্ভুত ছেলে।' নাতাশা বললে অবশেষে, একটু বেঁকে গেল ওর মুখটা, আমার দিকে যেন তাকাতে চাইছিল না।

'কেন? কিছু হয়েছে নাকি?'

'না, কিছু না। এমনি... তবে ভারি মিষ্টি ব্যবহার করলে আমার সঙ্গে, শুধু...'

বললাম, 'এখন তো ওর দুঃখকষ্ট ঝামেলার পালা সব শেষ।'

স্থির তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে নাতাশা তাকালে আমার দিকে। বোধ হয় চাইছিল

জবাব দেবে, "আগেও তো ওর দুঃখকষ্ট ঝামেলা বিশেষ ছিল না।" কিন্তু ওর মনে হল আমার কথার মধ্যেও তেমনি একটা ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। তাতে রাগ হচ্ছিল ওর।

তবে, ওর হৃদ্য প্রীতির ভাবটা ফিরে এল সঙ্গে সঙ্গেই। সেদিন সে ছিল অসাধারণ নরম। একঘণ্টারও বেশি ছিলাম ওর কাছে। ভারি অস্বস্তি বোধ করছিল নাতাশা। প্রিন্স ওকে ভয় পাইয়ে দিয়ে গেছেন। ওর কয়েকটা প্রশ্ন থেকে টের পেয়েছিলাম, ওকে প্রিন্সের কেমন লেগেছে তা নিশ্চয় করে জানার জন্যে খুব ব্যাকুল। নাতাশার আচরণ কি উপযুক্ত হয়েছিল? আনন্দটা ওর কি একটু বেশি খোলাখুলিই প্রকাশ পেয়ে গেছে? খুব গুমরে ভাব দেখিয়েছে কি? নাকি উল্টো, মাত্রাতিরিক্ত রকমের প্রশ্রয় দিয়েছে? ওর সম্পর্কে প্রিন্স কোনো একটা ধারণা করে বসেছেন কি? ওকে নিয়ে মনে মনে হেসেছেন? ঘেন্না করেছেন? কথাটা ভাবতেই গালদুটো ওর আগুন হয়ে উঠেছিল।

আমি বললাম, 'একটা খারাপ লোক কিছু একটা ভেবে বসবে কিনা, আতে অমন অস্থির হয়ে ওঠা কি চলে? ভাবুক না যা খুশি।'

'কিন্তু খারাপ লোক কেন বলছ?' ও জিজ্ঞেস করলে।

নাতাশা সন্দেহপরায়ণ, কিন্তু মনটা তার সিধে এবং নিষ্পাপ। ওর সন্দিগ্ধতা আসছে নির্মল একটা উৎস থেকে। গর্বিত সে, কিন্তু সেটা তার উঁচু গর্ব, ও যেটাকে সবচেয়ে বড়ো করে দেখছে সেটা তার সামনেই একটা পরিহাসের ব্যাপারে পরিণত হবে, তা ওর অসহ্য। নীচের ঘৃণাকে সে অবশ্য ঘৃণা দিয়েই জবাব দিতে পারে, কিন্তু তাহলেও পরিহাস যেই করুক না কেন, যেটা সে পবিত্র জ্ঞান করেছে তার প্রতি পরিহাসে ওর বুক ব্যথায় মোচড়াবে। সেটা তার দৃঢ়তার কোনো অভাবের জন্যে নয়। অংশত তার কারণ, দুনিয়া সম্পর্কে ওর জ্ঞান বড়ো কম, লোকজনে অভ্যস্ত নয়, নিজের ছোট্ট কোটরটিতেই আবদ্ধ থেকেছে। সারা জীবনই ওর কেটেছে নিজের কোণটিতেই, তার বাইরে ও বিশেষ পা দেয় নি। আর শেষত, সম্ভবত বাপের কাছ থেকে পাওয়া অতি ভালোমানুষ লোকেদের স্বভাব— লোকের প্রশংসা করা, সে সত্যি যা, তার চেয়ে অনেক ভালো লোক ভেবে গোঁ ধরে থাকা, তার ভালো দিকগুলোকে সোৎসাহে অতিরঞ্জিত করে তোলা — এসব তার মধ্যে অত্যন্ত বিকশিত। পরে যখন মোহভঙ্গ হয় তখন ভারি কষ্ট হয় এই ধরনের লোকের, কষ্টটা হয় সব চাইতে বেশি যখন তারা দেখে যে দোষটা নিজেদেরই। প্রাপ্যের চেয়ে কেন বেশি আশা করা? আর এমনি মোহভঙ্গ এদের কপালে মুহুর্মুহু। দুনিয়ার হাটে

না গিয়ে নিজেদের কোণটিতে শান্তভাবে দিন কাটানোই এদের মঙ্গল। বস্তুত, আমি লক্ষ্য করেছি যে, নিজেদের সেই কোণটিকে তারা সত্যি করেই এত ভালোবাসে যে তার ভেতরে থেকে বুনো-বুনোই হয়ে ওঠে। তবে বহু দুর্ভাগ্য, বহু হীনতার মধ্যে দিয়ে গেছে নাতাশা। আহত প্রাণী সে, তাই দোষ তাকে দেওয়া যায় না, যদি অবশ্য আমার কথায় কোনো অনুযোগ থেকে থাকে।

কিন্তু তাড়া ছিল আমার, উঠলাম যাবার জন্যে। আমায় যেতে দেখে ও স্তম্ভিত হয়ে প্রায় কাঁদে আর কি, যদিও যতক্ষণ ছিলাম তার মধ্যে আমার প্রতি ওর কোনো একটা বিশেষ দরদ দেখা যায় নি, বরং, সচরাচরের চেয়ে যেন নিস্পৃহই লেগেছিল ওকে। আবেগভরে আমায় চুমু দিয়ে ও কেমন যেন দীর্ঘ দৃষ্টিপাতে চেয়ে রইল আমার চোখের দিকে।

বললে, 'জানো, আজ আলিওশাকে ভারি মজার মনে হচ্ছিল, অবাকই হয়ে গেছি। ভারি মিষ্টি ব্যবহার, দেখে মনে হল ভারি সুখী, উড়ে এল ঠিক এক প্রজাপতির মতো, একেবারে ফুল বাবু, কেবলি ঘুরঘুর করলে আয়নার সামনে। ভদ্রতার বালাই ওর এখন কমে গেছে... থাকলেও না বেশিক্ষণ। জানো, আমার জন্যে মিষ্টি নিয়ে এসেছিল।'

'মিষ্টি? সে তো বেশ দিলখোলা ভালোমানুষি। আহ্, কী যে হয়েছ তোমরা দুজনে। এবার শুরু করেছ পরস্পরের ওপর নজর রাখতে, গোয়েন্দাগিরি করতে, মনের গোপন ভাবনা মুখ দেখে ধরতে (যদিও আসলে ধরতে পারছ না কিছুই!)। ওকে নয় বোঝা যায়, ফুর্তিবাজ, আগের মতোই নেহাৎ এক ইস্কুলের ছেলে। কিন্তু তুমি! তুমি, নাতাশা!'

নাতাশা যখনই তার সুর পালটে আমার কাছে আসত আলিওশার নামে কোনো নালিশ নিয়ে, অথবা কোনো প্যাঁচালো সমস্যার মীমাংসা জানতে, কিংবা আমায় কোনো গোপন ব্যাপার বলতে, আর আশা করত সে মুখ খুলতে না খুলতেই আমি সব বুঝে যাব, মনে আছে, ততবারই সে আমার দিকে তাকাত একটু হাসি নিয়ে, যেন অনুনয় ফুটে উঠত, যেন অবশ্য অবশ্যই এমন একটা সমাধান দিই যাতে তক্ষুনি ওর মন হালকা হয়ে ওঠে। এও মনে আছে, আমিও এই রকম ক্ষেত্রে প্রত্যেকবারই এমন একটা রূঢ় কঠোর ভাব করতাম, যেন কাউকে বকুনি দিচ্ছি। ব্যাপারটা ঘটত খুবই অজ্ঞাতসারে, কিন্তু বেশ কাজই দিত। আমার রূঢ়তা আর গাম্ভীর্য খাপ খেয়ে যেত বেশ, কর্তৃত্বের ভাব ফুটে উঠত তাতে। লোকে তো মাঝে মাঝে একটা অদম্য চাহিদা বোধ করে,

কেউ তাকে বকুনি দিক। অন্তত, তাতে মাঝে মাঝে ভারি সান্ত্বনা পেত নাতাশা।

'না ভানিয়া, শোনো,' একটি হাত আমার কাঁধে এবং অন্য হাতে আমার হাতটায় চাপ দিতে দিতে অনুনয়ের দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ও বলতে লাগল, 'কেমন যেন মনে হয় ওর মনে যথেষ্ট দাগ কাটে নি... ইতিমধ্যেই এমন mari* বলে মনে হচ্ছিল ওকে, যেন দশবছর বিয়ে হয়ে গেছে ওর, তবু ভদ্রতা করছে স্ত্রীর সঙ্গে। একটু বেশি তাড়াতাড়ি হচ্ছে না?.. হাসলে, ঘুরঘুর করলে, কিন্তু এমন ভাবে যেন ওটা ওই অমনি, আমার সঙ্গে তার যোগ যেন অল্পই, আগেকার মতো নয়... কাতেরিনা ফিওদরোভনার সঙ্গে দেখা করবার খুব তাড়া দেখলাম ওর। আমি কথা কইছি, তা হয় কানে যাচ্ছিল না ওর, নয়ত অন্য কিছু একটা বলতে শুরু করছিল, সেই বিচ্ছিরি বড়োলোকি অভ্যেসটা আর কি, আমরা দুজনে যেটা ওর ছাড়াবার চেষ্টা করেছি। মোট কথা... কেমন যেন উদাসীনই... কিন্তু আমি কী, দ্যাখো দিকি! ফের আবার সেই শুরু করেছি। সবাই আমরা কী দাবিদার ভানিয়া, কী খামখেয়ালী স্বৈরাচারী! এখন টের পাচ্ছি। মানুষের মুখভাবে একটা তুচ্ছ বদলও আমরা সইতে পারি না, আর ভগবানই জানেন কেন ওর মুখের ভাবে বদল হয়েছে! আমায় বকুনি দিয়ে ঠিক করেছ ভানিয়া! একা আমারই দোষ। নিজেদের দুর্ভাগ্য আমরা নিজেরাই বানিয়ে তুলে আবার তা নিয়ে নালিশ জানাতে শুরু করি... তোমায় ধন্যবাদ ভানিয়া, তোমার কাছে খুব একটা সান্ত্বনা পেলাম। শুধু ও যদি আজ একবার আসে! দূর! সকালে যা ঘটল তার জন্যে হয়ত রাগ করেই থাকবে ও।'

অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ইতিমধ্যেই ঝগড়া-ঝাঁটি করে বসেছ নাকি!'

'না, আমি কিছু টের পেতে দিই নি! একটু মন খারাপ হয়ে ছিল এই-মাত্র। আর খুব হাসিখুশি থেকে হঠাৎ ও কেমন চিন্তিত হয়ে ওঠে। বিদায় সম্ভাষণটায় কেমন যেন প্রাণ ছিল না বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু ওকে ডেকে পাঠাব... তুমিও সন্ধ্যেয় এসো ভানিয়া।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয় আসব, যদি একটা ব্যাপারে আটকে না পড়ি।'

'কেন, কিসের ব্যাপার?'

'ও কিছু না, নিজেই ঘাড় পেতে নিয়েছি। যাই হোক, আসব নিশ্চয়।'

---

* স্বামী। (ফরাসী ভাষায়)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঠিক সাতটায় গিয়ে হাজির হলাম মাসলবোয়েভের ওখানে। শেস্‌তিলাভচ্‌নায়া স্ট্রিটের একটা ছোটো বাড়ির একাংশে থাকত ও। তিনখানি ঘরের বাসাটা যথেষ্ট অপরিচ্ছন্ন, কিন্তু আসবাবপত্র নেহাৎ কম নয়। খানিকটা সচ্ছলতারই ভাব আছে একটা, তবে ব্যবস্থাপনার একান্ত অভাব। দরজা খুলে দিলে বছর উনিশের একটি ভারি সুন্দরী মেয়ে, সাধারণ পোশাকেই সাজ করেছে চমৎকার, খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, অতি হাসিখুশি মমতা-ভরা চোখ। মুহূর্তে অনুমান করলাম, এই সেই আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা, সকালে যার কথা মাসলবোয়েভ বলেছিল প্রসঙ্গক্রমে, আমাকে ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার লোভ দেখিয়েছিল। মেয়েটি জিজ্ঞেস করলে আমি কে। আমার নাম শুনেই বললে, মাসলবোয়েভ আমার অপেক্ষা করছিল, এখন ঘুমিয়ে আছে নিজের ঘরে। সেই ঘরেই আমায় ও নিয়ে গেল। ভারি চমৎকার একটি সোফার ওপর মাসলবোয়েভ ঘুমিয়ে, গায়ের ওপর তার নোংরা ওভারকোটটা, মাথার নিচে চামড়ার জীর্ণ বালিশ। পাতলা ঘুম। আমরা ঢুকতেই ও আমার নাম ধরে ডাকলে।

'আরে তুই নাকি? তোরই অপেক্ষা করছিলাম। এইমাত্র স্বপ্ন দেখছিলাম, তুই এসে আমায় জাগিয়ে তুলছিস। সময় হয়ে গেছে দেখছি চল যাই।'

'কোথায় যাবি?'

'একজন মহিলার কাছে।'

'কোন মহিলা, কেন?'

'শ্রীমতী বুবনভা; যাই ওঁর প্রাপ্যটা মিটিয়ে দিয়ে আসি। আহা, সে যে কী সুন্দরী!' আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনার দিকে চেয়ে ও বললে টেনে টেনে। শ্রীমতী বুবনভার কথা ভেবে চুমুও খেলে আঙুলের ডগায়।

'এই আবার শুরু হয়েছে যত পাগলামি!' আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনার মনে হল একটু রাগ দেখানো তার অবশ্যকর্তব্য।

'পরিচয় নেই তো? তা পরিচয় করে নে ভায়া। ইনি আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা, জনৈক সাহিত্যিক জেনারেলের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই: বিনা পয়সায় এঁদের দর্শন মেলে শুধু বছরে একবার, অন্য সময় পয়সা লাগে।'

'খুব হয়েছে, বোকা পেয়েছ আমায়। ওর কথায় কান দেবেন না যেন, সব সময় কেবল আমায় নিয়ে ঠাট্টা। জেনারেল আবার কারা!'

'ঠিক সেই কথাটিই তো বলছি গো। এক বিশেষ ধরনের জেনারেল। আর তুই তো হুজুর ভাবিস যে আমরা বোকাসোকা লোক; প্রথম দেখে যা মনে হয়, তার চেয়ে কিন্তু আমরা অনেক বুদ্ধিমান।'

'ওর কথা শুনবেন না। ভদ্রলোকদের সামনে ঐ নির্লজ্জটা কেবলি আমায় অপ্রস্তুত করে তোলে। তার চেয়ে আমায় থিয়েটার নিয়ে গেলে বরং কাজ করত।'

'আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা, ভালোবাসতে শিখুন... কী ভালোবাসতে হবে, ভুলে যান নি নিশ্চয়, তাই না? সেই ছোট্ট কথাটা? যা শিখিয়ে দিয়েছিলাম?'

'মোটেই ভুলি নি! নিশ্চয় ছাইভস্ম কিছু একটা হবে।'

'তাহলে বলুন দেখি, কী কথা?'

'বাইরের ভদ্রলোকের সামনে লজ্জায় পড়তে চাই না বাপু। কথাটা নিশ্চয় ভারি লজ্জার। জিভ খসে পড়লেও বলব না!'

'তার মানে আপনি ভুলে গেছেন।'

'মোটেই ভুলি নি: বাস্তু দেবতা! বাস্তু দেবতাদের ভালোবাসো... দেখেছেন তো কী উপদেশ! বাস্তু দেবতা বলে হয়ত কিছুই নেই। আর ভালোবাসতে হবেই বা কেন? সব সময় অমনি আজেবাজে বকে!'

'কিন্তু শ্রীমতী বুবনভা...'

'ধুৎতারি তোমার বুবনভা!' আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা সরোষে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'যাবার সময় হয়ে গেছে। চললাম আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা!'

আমরা বেরিয়ে গেলাম।

'শোন ভানিয়া, আগে এই গাড়িটা নেওয়া যাক। আর দ্বিতীয়ত, সকালে তোর কাছ থেকে যাবার পর একটা জিনিস বের করেছি, অনুমান নয় — একেবারে নিশ্চিত। ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপে পুরো আরো এক ঘণ্টা কাটিয়েছি। ওই পেটমোটাটা একেবারে জঘন্য শুয়োর, বিদঘুটে নোংরা জানোয়ার একখান, যত রকম বিকৃতি আর কুরুচির আধার। ঐ একই লাইনে বুবনভারও বেশ অনেক দিনের নাম ডাক আছে। ভদ্র পরিবারের একটি অল্পবয়সী মেয়ের ব্যাপারে ও সেদিন প্রায় ধরাই পড়ে গিয়েছিল। অনাথ মেয়েটাকে মসলিনের ড্রেসে সাজানোর ব্যাপারটা (সকালে যা বললি) শুনে শান্তি পাচ্ছিলাম

না, কেননা কিছু কিছু আমার আগেই কানে এসেছিল। আজ সকালে আরো একটা খোঁজ পেয়েছি, দৈবাতই বটে, কিন্তু ভরসা করা যায়। কত বয়স মেয়েটির?'

'মুখ দেখে মনে হয় তেরো।'

'কিন্তু মাথায় খাটো। ঠিকই, তাই তো ও করবেই। দরকার পড়লে কখনো বলবে, এগারো, কখনো পনেরো। বেচারী মেয়েটিকে যেহেতু রক্ষা করার মতো মা-বাপ কেউ নেই, তাই বুবনভা...'

'কী বলছিস তুই।'

'আর তুই কী ভেবেছিলি? নেহাৎ করুণার বশে শ্রীমতী বুবনভা কোনো অনাথ মেয়েকে পালতে নেবে না। আর ওই পেটমোটাটা যখন জুটেছে, তখন নিঃসন্দেহে যে ব্যাপারটা ওই-ই। আজ সকালে পেটমোটাটা এসে দেখা করে গেছে বুবনভার সঙ্গে। ঐ গবেট সিজব্রিউখভকে বলেছে একটি সুন্দরী দেওয়া হবে, বিবাহিত মেয়ে, অফিসার নন্দিনী, সম্ভ্রান্ত মহিলা। লম্পট এই শেঠ পুত্রদের ভারি ঝোঁক ওই দিকে, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে তাদের চাই। মনে আছে, সেই লাতিন ব্যাকরণের সূত্রটার মতো: বিভক্তির চেয়ে অর্থের গুরুত্ব বেশি; কিন্তু আমার বোধ হয় সকাল বেলাকার নেশাটা এখনো কাটে নি। কিন্তু এসব ব্যাপারে বুবনভা যেন না জড়ায়। পুলিসকেও ঠকাতে চায় ও। কিন্তু পার পাবে না! এমন একখান ভয় দেখাব, ও তো জানে... ওই পুরনো হিসেবটা আর কি, এইসব ব্যাপার, বুঝেছিস তো?'

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম আমি। এসব খবর শুনে শুনে খুব উত্তেজিত লাগছিল। ভয় হচ্ছিল বুঝি দেরি হয়ে গেল। কেবলি তাড়া দিচ্ছিলাম গাড়োয়ানকে।

মাসলবোয়েভ বললে, 'ভাবনা নেই, ব্যবস্থা করে রেখেছি। মিত্রোশকা আছে ওখানে। সিজব্রিউখভ পার পাবে টাকা দিয়ে, আর হারামজাদা পেটমোটাটাকে দিয়ে যেতে হবে গায়ের চামড়া। আজ সকালে এই ঠিক হয়েছে। আর বুবনভা রইল আমার ভাগে... তাই আস্পর্ধা যেন না করে...'

সেই ভোজনালয়টিতে আমরা গেলাম। কিন্তু মিত্রোশকা নামধেয় ব্যক্তিটি সেখানে ছিল না। ভোজনালয়ের সিঁড়ির কাছে গাড়োয়ানকে অপেক্ষা করতে বলে আমরা গেলাম বুবনভার বাড়িতে। ফটকের কাছে মিত্রোশকা অপেক্ষা করছিল আমাদের। জানলায় ঝলমল করছে জোরালো আলো। সিজব্রিউখভের মাতাল হাসির হররা কানে আসছিল।

মিত্রোশকা ঘোষণা করলে, 'মিনিট পনেরো হল ওরা সকলেই এসে এখানে জুটেছে। এই সময়।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু ভেতরে যাব কী করে?'

'খরিদ্দার হিসেবে,' জবাব দিলে মাসলবোয়েভ। 'আমায় ও চেনে, মিত্রোশকাকেও চেনে। তালাচাবি বন্ধ বটে, কিন্তু আমাদের জন্যে নয়।'

ফটকে নরম টোকা দিলে ও। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। দরজাটা খুললে জমাদার, তারপর মিত্রোশকার সঙ্গে চোখ ঠারাঠারি করলে। নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকলাম আমরা, বাড়ির কারো কানে গেল না আমাদের আওয়াজ। সিঁড়ি বেয়ে আমাদের নিয়ে এসে জমাদার দরজায় ধাক্কা দিলে। ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করলে কে আমরা। জমাদার বললে, সে একা, কাজে এসেছে। দরজা খুলে যেতেই আমরা একসঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। জমাদার অদৃশ্য হয়ে গেল।

সংকীর্ণ ছোটো বারান্দাটায় আলুথালু মাতাল অবস্থায় হাতে একটি বাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বুবনভা। আমাদের দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কী, কে তোমরা?'

'কে?' চটপট জবাব দিলে মাসলবোয়েভ, 'সে কী, মানী অতিথিদেরও চিনতে পারছেন না আন্না ত্রিফনোভনা? আমরা ছাড়া কে আবার... ফিলিপ ফিলিপিচ।'

'আহ, ফিলিপ ফিলিপিচ! আপনি!.. আসুন, আসুন। কিন্তু আপনি কেমন করে... আমি যে... কিছুই না... আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন।'

একেবারে থতমত খেয়ে গিয়েছিল বুবনভা।

'ভেতর কোথায়? এখানে তো কেবল একটা পার্টিশন... উঁহু, ভালো একটু অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করুন। এক ঢোক শ্যামপেন খেতে হবে। ডাঁশা মালটাল কিছু নেই?'

অমনি চাঙ্গা হয়ে উঠল বাড়িউলী।

'বাহ্, এমন মানী অতিথি সব। মাটি খুঁড়ে বার করতে হলেও নিয়ে আসব, চীন দেশে লোক পাঠাব খুঁজে আনতে।'

'দুটো কথা, আন্না ত্রিফনোভনা, আদরিণী আমার; সিজব্রিউখভ আছে এখানে?'

'হ্-হ্যাঁ।'

'ওকেই চাইছিলাম। কী আস্পর্ধা, আমায় ফেলে রেখে বদমায়েসটা মজা লুটতে এসেছে?'

'না গো আপনাকে ভোলে নি। কার যেন অপেক্ষা করছিল সবসময়, বোধ হয় আপনারই।'

দরজা ঠেলে ঢুকলে মাসলবোয়েভ। যে ছোটো ঘরটিতে গিয়ে পড়লাম তার দুটি জানলায় গাঁদা ফুল, বেতের চেয়ার কয়েকটা, আর একটা বিদঘুটে পিয়ানো — ঠিক যেমনটি আশা করা যায়। কিন্তু ভেতরে ঢোকবার আগেই যখন বারান্দায় আমরা কথা কইছিলাম, তখনই মিত্রোশকা উধাও হয়ে গেল। পরে জেনেছিলাম, সে ভেতরেই ঢোকে নি, দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিল। পরে দরজা খুলে দেবার মতো লোক একজন ওর ছিল। সেই যে রঙ-করা আলুথালু একটি মেয়েকে আমি সেদিন সকালে বুবনভার পেছন থেকে উঁকি দিতে দেখেছিলাম — সেটি ছিল মিত্রোশকার পাতানো কুটুম।

নকল মেহগনির একটা হালকা ছোট্ট সোফায় বসে ছিল সিজব্রিউখভ, সামনে একটা গোল টেবিল, টেবিল ক্লথে ঢাকা। তার ওপর দু'বোতল ঈষদুষ্ণ শ্যামপেন আর একবোতল পচা রাম, মিষ্টি, বিস্কুট আর তিন রকম বাদামের প্লেট কয়েকটা। টেবিলের ওপাশে সিজব্রিউখভের সামনাসামনি বসে ছিল জঘন্য চেহারার একটি জীব, মুখে গর্ত গর্ত দাগ, বয়স প্রায় চল্লিশ, পরনে একটা কালো তাফেতা পোশাক, ব্রোঞ্জের ব্রোচ আর ব্রেসলেট। ইনিই হলেন 'অফিসার নন্দিনী' — জাল যে তা বোঝাই যায়। সিজব্রিউখভ ভারি খুশি আর মাতাল। পেটমোটা সঙ্গীটিকে ওর কাছে দেখা গেল না।

গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মাসলবোয়েভ, 'বা, তোফা! দুসো-র ওখানে নেমন্তন্ন করার পরে এই কান্ড!'

'ফিলিপ ফিলিপিচ, আমার সৌভাগ্য যে!..' আহ্লাদের আমেজে আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করলে সিজব্রিউখভ।

'মদ খাচ্ছ তো?'

'মাপ করুন ভাই, খাচ্ছি।'

'মাপ-টাপ না চেয়ে বরং তোমার অতিথিদের ডেকে বসাও। এসেছি তোমার সঙ্গে জমাব বলে। এই যে আমার এক বন্ধুকেও সঙ্গে এনেছি।' মাসলবোয়েভ আমার দিকে দেখালে।

'ভারি আনন্দ হল, মানে, আমার সৌভাগ্য... হি-হি,' খিলখিল করে হাসলে সিজব্রিউখভ।

'ফুঃ, একে আবার বলে শ্যামপেন? একেবারে টকে-যাওয়া কপির ঝোলের মতো।'

'কী বলছেন!'

'থাক, দুসো-র দোকানে ঢোকারই হিম্মৎ নেই, আবার আমায় নেমন্তন্নও করা হচ্ছিল সেখানে!'

অফিসার নন্দিনী বললে, 'এইমাত্র বলছিল যে নাকি প্যারিসে গিয়েছিল। চাল মারছিল আর কি!'

'ফেদোসিয়া তিতিশনা, অপমান করবেন না কিন্তু। গিয়েছিলাম প্যারিসে, সত্যি গিয়েছিলাম।'

'ওর মতো এক মরদ কিনা গেছল প্যারিসে!'

'গিয়েছিলাম বৈকি! হ্যাঁ, গিয়েছিলাম আমরা! আমি আর কার্প ভাসিলিচ — দেখিয়ে দিয়েছি! কার্প ভাসিলিচকে জানেন?'

'কী দায় পড়েছে আমার কার্প ভাসিলিচকে জানতে।'

'এমনি... রাজনীতির দিক থেকে। প্যারিস নামে একটি জায়গায় মাদাম জুব্যের-এর ঘরে একটা বিলিতী আর্শি ভেঙেছিলাম আমরা।'

'কী ভেঙেছিলে?'

'আর্শি। গোটা দেয়াল জুড়ে ছিল একটা আয়না, একেবারে সিলিং পর্যন্ত। কার্প ভাসিলিচ এমন মাতাল হয়ে পড়েছিল যে মাদাম জুব্যের-এর সঙ্গে রুশ কথা কইতে শুরু করে দিলে। সেই আর্শির কাছে ও দাঁড়িয়েছিল কনুইয়ে ভর দিয়ে। জুব্যের তার ফরাসী ভাষায় চেঁচাতে লাগল আর্শিটার দাম সাতশ ফ্রাঁ (মানে, আমাদের সিকির হিশেবে), জিনিসটা যে ভেঙে যাবে! ও হেসে তাকালে আমার দিকে। আমি বসেছিলাম সামনের একটা সোফায়, পাশে যা একখান সুন্দরী — এই চন্দ্রবদনটির মতো মাগী নয়, বলতে হয় একেবারে মোক্ষম। কার্প ভাসিলিচ হেঁকে বললে, "স্তেপান তেরেন্তিচ, ওহে স্তেপান তেরেন্তিচ! আধাআধি, চলবে?" বললাম, "চলবে!" আয়নাটার ওপরে ঘুষি চালালে ও, ঝনঝন! একেবারে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল আয়নাটা। আর্তনাদ করে জুব্যের একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর "কী লাগিয়েছ তুমি, এসেছ কোথায়, ডাকু কোথাবার?" মানে, বললে ওদের নিজেদের ভাষাতেই। কার্প ভাসিলিচ বললে, "মাদাম জুব্যের, এই নাও টাকা, কিন্তু আমার মেজাজে বাগড়া দিতে এসো না।" আর সঙ্গে সঙ্গে ছয় শ' পঞ্চাশ ফ্রাঁ ঢেলে দিলে ও। বাকি পঞ্চাশ আমরা দরাদরি করে দিই নি...'

আমরা যে ঘরটায় ছিলাম, তার পরেকার দু'তিনটে ঘরের কয়েকটা দরজার পেছনে একটা সাংঘাতিক তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভেসে এল হঠাৎ। শিউরে উঠে আমিও চেঁচিয়ে উঠলাম। আর্তনাদটা চিনতে পেরেছিলাম আমি: এলেনার কণ্ঠস্বর। করুণ আর্তনাদটার পরেই শোনা গেল অন্যান্য সব চিৎকার, গালাগালি, ধস্তাধস্তির শব্দ এবং পরিশেষে কারো মুখে সজোরে চড় মারার পরিষ্কার আওয়াজ। নিশ্চয় মিত্রোশকা, তার নিজের এলাকাটায় একহাত নিচ্ছে। হঠাৎ সজোরে খুলে গেল দরজাটা। ঘরের মধ্যে ছুটে এল এলেনা, মুখ তার বিবর্ণ, চোখদুটো বিমূঢ়, পরনে একটা শাদা মসলিনের পোশাক, কিন্তু একেবারে দলামোচড়া এবং ছেঁড়া, পরিপাটি করে গোছানো চুল বুঝি ধস্তাধস্তির ফলে এলোমেলো। দরজার সামনে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, ও সোজা আমার দিকে এসে জড়িয়ে ধরলে আমায়। সভয়ে লাফিয়ে উঠল সকলেই। ও ঘরে ঢুকতে, চিল্লানি আর চিৎকার শোনা গেল। তার পরেই দরজায় দেখা দিল মিত্রোশকা, চুল ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছিল তার সেই পেটমোটা দুষমনকে। লোকটা একেবারে নেতিয়ে পড়েছিল। দরজা পর্যন্ত টানতে টানতে নিয়ে এসে মিত্রোশকা ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে ঘরের মধ্যে।

পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে মিত্রোশকা ঘোষণা করলে, 'এই নাও, ধরো ওকে!'

শান্তভাবে আমার কাছে উঠে এল মাসলবোয়েভ। কাঁধে টোকা দিয়ে বললে, 'শোন, মেয়েটাকে নিয়ে আমাদের গাড়িটায় বাড়ি চলে যা। এখানে তোর আর করার কিছু নেই। বাকিটার ব্যবস্থা হবে কালকে।'

দু'বার আর বলতে হল না আমাকে। এলেনার হাত ধরে ওকে ওই পাপালয় থেকে বার করে নিয়ে এলাম। জানি না, ওখানকার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল কী করে। কেউ আমাদের আটকালে না। বাড়িউলী কাঠ হয়ে ছিল ভয়ে। এত ঝটপট সব ঘটে গেল যে হস্তক্ষেপ করা আর তার হয়ে ওঠে নি। গাড়িটা অপেক্ষা করছিল আমাদের। বিশ মিনিটের মধ্যেই আমার বাসায় পেঁছে গেলাম।

এলেনা হয়ে গিয়েছিল আধ মড়ার মতো। পোশাকের আংটাগুলো খুলে জলের ছিটে দিয়ে শুইয়ে দিলাম সোফার ওপর। জ্বর-বিকার শুরু হয়েছিল ওর। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম ওর বিবর্ণ ছোট্ট মুখখানা, ফ্যাকাশে ঠোঁট জোড়া, কালো চুল প্রথমটা বেশ আঁচড়িয়ে কলপ দিয়ে পাট করা হলেও এখন সব ঝুলে পড়েছে একদিকে, দেখলাম ওর গোটা সাজখানা, পোশাকের

ওপর এখানে-সেখানে এখনো রয়ে গেছে গোলাপী বো'গুলো। জঘন্য ব্যাপারটার তাৎপর্য পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল আমার কাছে। আহা বেচারী! অবস্থা ওর ক্রমেই খারাপ হয়ে উঠছিল। ওকে ছেড়ে যেতে পারলাম না। ঠিক করলাম সন্ধ্যেয় আর নাতাশার কাছে যাব না। দীর্ঘ পল্লব তুলে এলেনা মাঝে মাঝে চাইছিল আমার দিকে, বহুক্ষণ ধরে চেয়ে থাকছিল একদৃষ্টিতে, আমায় যেন ও চেনবার চেষ্টা করছিল। অবশেষে যখন ও ঘুমোলে, তখন রাত দু'পহর।

আমিও শুয়ে পড়লাম ওর কাছেই, মেঝের ওপর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সকাল সকাল উঠে পড়লাম ঘুম থেকে। সারা রাত প্রায় আধ ঘণ্টা অন্তর উঠে উঠে আমার বেচারী অতিথিটিকে দেখেছি। মেয়েটার জ্বর এসেছিল, ভুল বকছিল সামান্য। কিন্তু ভোরের দিকে গাঢ় ঘুম এল। মনে হল সেটা ভালো লক্ষণ। তবু সকালে ঘুম থেকে উঠে ঠিক করলাম, বেচারী ঘুমিয়ে থাকতে থাকতেই তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে যাব। আমার চেনা ডাক্তার ছিলেন একজন, ভালোমানুষ ধরনের অবিবাহিত এক বৃদ্ধ, অনাদি কাল থেকে আছেন ভ্লাদিমিস্কায়া স্কুয়ারের কাছে, সংসারের দেখাশোনা করে একটি জার্মান মহিলা। তাঁর কাছেই গেলাম। বললেন দশটার সময় আসবেন। যখন গিয়েছিলাম, তখন আটটা। ভয়ানক ইচ্ছে হয়েছিল পথে একবার মাসলবোয়েভের সঙ্গে দেখা করে যাই, কিন্তু ভেবেচিন্তে তা বাদ দিলাম। গত রাত্রের পর ও নিশ্চয় এখনো ঘুমিয়ে আছে, তাছাড়া এলেনা হয়ত জেগে উঠে আমার ঘরে একলা আছে দেখে ভয় পেয়ে যাবে। জ্বরের ঘোরে হয়ত ওর মনেই নেই, কখন কেমন করে সে ওখানে এসেছে।

ঘরে ঢুকছি, সেই মুহূর্তে ও জেগে উঠল। কাছে গিয়ে সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করলাম কেমন লাগছে এখন। উত্তর না দিয়ে তার কালো ব্যঞ্জনাভরা চোখদুটো দিয়ে একদৃষ্টে বহুক্ষণ চেয়ে রইল আমার দিকে। চোখ দেখে মনে হল, পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে এসেছে ওর, সবই বুঝতে পারছে। আমায় যে জবাব দিলে না, তা বোধ হয় ওর ওই স্বভাব। আগের দিন, তারও আগে ও যখন আমার এখানে এসেছিল, দুবারই সে আমার কোনো কোনো প্রশ্নের একটা জবাবও না দিয়ে হঠাৎ আমার চোখে চোখে তাকিয়ে থেকেছে শুধু

সেই দীর্ঘ একাগ্র দৃষ্টিতে, যার মধ্যে হতবুদ্ধিতা এবং বুনো বুনো একটা কৌতূহল ছাড়াও ছিল কেমন একটা অদ্ভুত ধরনের অহংকার। এবার চোখে পড়ল একটা কাঠিন্য, এমনকি অবিশ্বাসও বলা যায়। তখনো জ্বর আছে কিনা দেখবার জন্যে ওর কপালে হাত দিতে গিয়েছিলাম। ওর ছোটো হাতখানা দিয়ে আমার সে হাত ও আস্তে নিঃশব্দে সরিয়ে দিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে পাশ ফিরল। ওকে বিরক্ত না করে আমি সরে এলাম।

ঢাউস একটা পেতলের কেটলি ছিল আমার। বহুদিন থেকে সামোভারের বদলে ওইটেই ব্যবহার করতাম আমি, তাতেই জল গরম করতাম। জ্বালানি কাঠ ছিল অনেক, জমাদার যা এনে দিত তাতে দিন পাঁচেক খুব চলে যেত। চুল্লী ধরিয়ে জল বসিয়ে দিলাম কেটলিতে। চায়ের জিনিসগুলো রাখলাম টেবিলের ওপরে। এলেনা আমার দিকে ফিরে সবকিছু দেখছিল উৎসুক হয়ে। জিজ্ঞেস করলাম, ও কিছু খাবে কিনা। কিন্তু ফের ও আমার দিক থেকে পাশ ফিরল।

ভাবলাম, "আমার ওপর চটে আছে কেন, আশ্চর্য মেয়ে তো!"

কথামতো আমার বৃদ্ধ ডাক্তার এলেন দশটার সময়। জার্মানদের মতো আগাগোড়া সব পরীক্ষা করে দেখলেন রোগীকে এবং আমায় খুশি করে দিয়ে জানালেন, জ্বরজ্বর ভাব থাকলেও বিশেষ কোনো ভয় নেই। বললেন, হয়ত ওর অন্য আর একটা কিছু পুরনো অসুখ আছে, হার্টের ক্রিয়ায় কিছুটা গোলমাল। 'তবে তার জন্যে বিশেষ পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন, আপাতত ওর বিপদ নেই।' দরকার আছে বলে নয়, রেওয়াজ হিসেবে তিনি একটা মিক্সচার আর কিছু পাউডারের প্রেসক্রিপশন দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করতে বসলেন কী করে মেয়েটা এল আমার কাছে। সেই সঙ্গে আমার ঘরের দিকেও অবাক হয়ে উনি চেয়ে দেখলেন। ভারি বকতে পারে বুড়োটা।

এলেনার ব্যবহারে তিনি বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তার যখন নাড়ি দেখতে গেলেন, ও তখন তার হাতটা টেনে নিলে, কিছুতেই জিভ দেখালে না। ডাক্তার যা যা জিজ্ঞেস করলেন তার একটারও উত্তর দিলে না, শুধু ডাক্তারের গলায় যে বিপুলায়তন স্তানিস্লাভ অর্ডারটি ঝুলছিল তার দিকে চেয়ে রইল স্থির দৃষ্টিতে।

বৃদ্ধ বললেন, 'বোধ হয় ওর ভয়ানক মাথা ধরেছে, কিন্তু চাইছে কেমন করে দেখুন!'

এলেনার ব্যাপারটা সব ওঁকে বলা উচিত হবে না মনে হল। তাই এড়িয়ে গিয়ে বললাম, সে এক দীর্ঘ কাহিনী।

যাবার সময় বলে গেলেন, 'দরকার পড়লে আমায় ডাকবেন, কিন্তু আপাতত কোনো ভয় নেই।'

ঠিক করলাম, সেদিন সারাটা সময় এলেনার কাছে থাকব, একেবারে ভালো না হয়ে ওঠা পর্যন্ত যথাসম্ভব ওকে একলা ফেলে রেখে যাব না। জানতাম আমার আশায় আশায় থেকে নাতাশা আর আন্না আন্দ্রেয়েভনা দুশ্চিন্তায় মুষড়ে পড়বে। তাই ঠিক করলাম, ডাকে চিঠি দিয়ে নাতাশাকে জানিয়ে দেব, আজ অন্তত যেতে পারব না। আন্না আন্দ্রেয়েভনার কাছে অবশ্য চিঠি লেখা চলবে না। নাতাশার অসুখের খবর জানিয়ে একবার একটা চিরকুট পাঠানোর পরে উনি নিজেই আমায় ফের কখনো চিঠি লিখতে মানা করে দিয়েছেন। বলেছিলেন, 'তোমার কাছ থেকে চিঠি এলে উনি ভারি ভুরু কুঁচকে তাকান। চিঠিতে কী আছে জানার জন্যে ভারি লোভ হয়, কিন্তু জিজ্ঞেস তো করতে পারেন না, ফলে সারাদিন একেবারে অস্থির হয়ে থাকেন। তাছাড়া বাপু, চিঠিতে তুমি আমার জ্বালাই বাড়িয়ে দাও। কয়েক ছত্রে কী হয়। ইচ্ছে হয় খুঁটিনাটি জেনে নিই, কিন্তু তুমি তো আর কাছে থাকছ না।' তাই শুধু নাতাশাকেই লিখলাম। ওষুধের দোকানে প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে যাবার সময় ডাকে দিয়ে এলাম চিঠিটাও।

ইতিমধ্যে এলেনা আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের মধ্যে আস্তে করে ককাচ্ছিল ও, চমকে চমকে উঠছিল। ডাক্তার ধরেছিল ঠিকই, মাথায় তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছিল ওর। থেকে থেকে ককিয়ে জেগে উঠছিল আর আমার দিকে তাকাচ্ছিল সত্যি করেই রাগতভাবে। আমার মনোযোগে যেন ভারি বিরক্তি লাগছিল ওর। স্বীকার করছি, ওর এ আচরণে ভারি আঘাত পেয়েছিলাম মনে।

এগারোটার সময় এসে হাজির হল মাসলবোয়েভ। কী যেন ভাবছিল সে, কেমন যেন অন্যমনস্ক। এক মিনিটের জন্যে এসেই ফের যাব যাব করতে লাগল।

চারদিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলে, 'ভেবেছিলাম তুই কষ্টে-সৃষ্টে আছিস, কিন্তু সত্যি, এমন একটা সিন্দুকের মধ্যে তোকে দেখব তা আশা করি নি, ভাই। বাসা নয় রে, আস্ত একটা যে সিন্দুক। কিন্তু ধরা যাক সেটা বিশেষ কিছু নয়, প্রধান কথা হল, এই সব বাইরের লোকের দুশ্চিন্তায় তোর নিজের

কাজটা যে পড়ে থাকছে। বুবেনভার ওখানে গাড়ি করে যাবার সময় কাল তাই ভাবছিলাম। জানিস তো দোস্ত, আমার যা স্বভাব আর সামাজিক মর্যাদা, তাতে আমি হলাম সেই ধরনের লোক, যারা নিজেরা কিছু কাজের মতো কাজ না করলেও অন্যকে তা করার জন্যে উপদেশ দিতে ছাড়ে না। যাক গে, শোন: কাল কি পরশু আমি তোর কাছে একবার আসব, আর রবিবার সকালে আমার ওখানে কিন্তু অবশ্য অবশ্য যাবি। আশা করি, তার মধ্যে এই মেয়েটির ব্যাপারটা পুরো মিটে যাবে। তখন সবিশেষ গুরুত্ব সহকারে আমরা আলোচনা করতে পারব, কেননা তোকে সত্যিই চালাবার মতো লোক দরকার। এমন করে তুই চলবি সে হয় না। কাল শুধু একটু আভাস দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন ন্যায়শাস্ত্র মতে বলছি, একবার আমার কাছ থেকে কিছু দিনের জন্যে টাকা নিলে তোর মর্যাদা যাবে? ঠিক করে একটা শেষ জবাব দিয়ে দে!'

বাধা দিয়ে বললাম, 'হয়েছে, ঝগড়া করতে হবে না। বরং বল, কাল কী করে সব শেষ হল?'

'আরে ও আর কী, অতি সন্তোষজনক পরিসমাপ্তি হয়েছে সবকিছুরই, উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে, বুঝেছিস? কিন্তু এখন আমার সময় নেই। এক মিনিটের জন্যে তোকে বলতে এসেছিলাম যে খুব ব্যস্ত, তোর জন্যে সময় হবে না, আর প্রসঙ্গত জানতে চাই, এ মেয়েটিকে কোথাও পাঠাচ্ছিস, নাকি নিজের কাছেই রেখে দিবি? কেননা ব্যাপারটা ভেবে ঠিক করে ফেলা দরকার।'

'আমি এখনো নিশ্চিত করে জানি না, সত্যি বলতে তোর পরামর্শের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। নিজের কাছে আমি ওকে কী হিসেবেই বা রাখি?'

'এহ্, সে আর কী, অন্তত চাকরানি হিসেবেও।'

'আস্তে ভাই। অসুস্থ হলেও ওর বেশ জ্ঞান আছে, লক্ষ্য করেছিলাম, তোকে দেখে যেন চমকে উঠেছিল। তার মানে, কালকের ঘটনা মনে পড়েছে ওর...'

ওর ভাবগতিক, যা যা আমার চোখে পড়েছে সব ওকে বললাম। শুনে মাসলবোয়েভের ঔৎসুক্য দেখা গেল। বললাম, আমার পরিচিত একটা পরিবারেই বোধ হয় ওকে রাখা ভালো, — বুড়োবুড়িদের কথা সামান্য জানালাম ওকে। আশ্চর্য লাগল যে নাতাশাদের কাহিনী ও আগেই খানিকটা জানত। কোত্থেকে জানল জিজ্ঞেস করায় বললে:

'ও, একটা কাজের ব্যাপারে অনেকদিন আগে খানিকটা কানে এসেছিল।

আগেই তো তোকে বলেছি, প্রিন্স ভালকোভস্কিকে আমি চিনি। ওই বুড়োবুড়িদের কাছে মেয়েটাকে পাঠাতে চাস, সেটা ভালোই। এখানে থাকলে তোর অসুবিধাই হবে শুধু। তাছাড়া আর একটা কথা। কিছু একটা পাসপোর্ট ওর দরকার। চিন্তা নেই, সেটা আমি দেখব। এখন আসি। মাঝে মাঝে যাস আমার কাছে। ও কি এখন ঘুমিয়ে পড়েছে?'

বললাম, 'তাই মনে হয়।'

কিন্তু ও চলে যেতেই এলেনা আমায় ডাকলে।

জিজ্ঞেস করলে, 'কে ও?' গলাটা ওর কাঁপছিল, কিন্তু তাকালে সেই একই রকম স্থির এবং কিছুটা অহংকারের দৃষ্টিতে, অন্য কোনো কথায় সে দৃষ্টি আমি বোঝাতে পারছি না।

মাসলবোয়েভের নাম বললাম ওকে, বললাম, ওর জন্যেই বুবনভার কবল থেকে ওকে নিয়ে আসতে পেরেছি, বুবনভা ভারি ভয় পায় ওকে। হঠাৎ গালদুটো ওর একেবারে আগুনে লাল হয়ে উঠল, সেটা যে অতীত কথা মনে হয়েই তাতে সন্দেহ নেই।

'এখন আর বুবনভা এখানে কখনো আসবে না?' সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে জিজ্ঞেস করলে এলেনা।

তাড়াতাড়ি আশ্বস্ত করলাম ওকে। চুপ করে গিয়ে ও আমার হাতটা টেনে নিতে গিয়েছিল ওর তপ্ত আঙুলগুলোর মধ্যে, কিন্তু হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দিলে। মনে হল, আমার প্রতি সত্যিই ওর এত বিতৃষ্ণা থাকার কথা নয়। হয়ত ওই ওর স্বভাব কিংবা... হয়ত বেচারী এত দুঃখ পেয়েছে যে দুনিয়ায় আর কাউকেই ও এখন বিশ্বাস করতে পারছে না।

নির্ধারিত সময়ে ওষুধ আনতে গেলাম এবং সেই সঙ্গে একটি রেস্তোরাঁতেও ঢুকলাম — মাঝে মাঝে খেতাম ওখানে, আমায় ওরা চিনত, ধারেও দিত। একটা টিফিন-কেরিয়ার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম, তাতে করে কিছু মুরগীর সুপ নিয়ে এলাম এলেনার জন্যে। এলেনা কিন্তু খেতে চাইল না, সুপটা আপাতত চুল্লীতেই রইল।

ওকে ওষুধ খাইয়ে কাজে বসলাম। ভেবেছিলাম ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু হঠাৎ মুখ ফেরাতেই দেখি, মাথা তুলে ও একদৃষ্টিতে আমার লেখা দেখছে। ভান করলাম যেন ওকে দেখি নি।

অবশেষে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল ও। বাঁচা গেল যে আর ভুল বকলে না, গোঙালে না, ঘুমোলে বেশ শান্তভাবে। এলোমেলো ভাবনার মধ্যে ডুবে গেলাম

আমি। কী ব্যাপার ঘটেছে নাতাশা জানে না, গেলাম না বলে রাগ করতে পারে শুধু তাই নয়, যখন আমায় তার বোধ হয় সবচেয়ে বেশি দরকার, ঠিক তখনই আমার অবহেলায় নিশ্চয় আহতই হবে ও। হয়ত এই মুহূর্তে কোনো একটা ঝামেলা দেখা দিয়েছে ওর, আমায় কোনো একটা কাজের ভার দিতে চায়, অথচ ইচ্ছে করেই যেন আমি নেই।

আর আন্না আন্দ্রেয়েভ্না — ওঁর কাছে পরদিন কী করে কৈফিয়ত দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ঠিক করে ফেললাম, ওঁদের কাছ থেকেই একবার ঘুরে আসি। তাতে শুধু ঘণ্টা দুয়েক অনুপস্থিত থাকলেই চলবে। এলেনা তো ঘুমিয়ে আছে, আমার বেরিয়ে যাবার আওয়াজ পাবে না। লাফিয়ে উঠে কোট-টুপি পরে বেরুব, এমন সময় এলেনা আমায় ডাকলে। অবাক লাগল। সত্যিই ঘুমের ভান করে ছিল নাকি ও?

প্রসঙ্গত বলি, এলেনা আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না এই ভান করলেও প্রায় ঘন ঘন এই ধরনের ডাক, কোনো একটা জিনিস বুঝতে না পারলে আমায় জিজ্ঞেস করার এই গরজটা থেকে উল্টোটাই প্রমাণ হচ্ছিল এবং স্বীকার করছি, তাতে সত্যিই ভালো লাগছিল আমার।

কাছে যেতে জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় আমায় পাঠাতে চাইছেন?' সাধারণভাবেই ও প্রশ্ন করত সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে হঠাৎ করে। প্রথমটা ওর প্রশ্নের মানেই ধরতে পারি নি আমি।

'এক্ষুনি আপনার বন্ধুকে বলছিলেন যে আমায় কারো বাড়িতে আপনি দিয়ে দিতে চান। কোথাও যেতে চাই না আমি।'

ঝুঁকে এলাম ওর দিকে। গা পুড়ে যাচ্ছে ওর, আবার জ্বর এসেছে।

ওকে সান্ত্বনা দিয়ে আশ্বস্ত করতে লাগলাম। বললাম আমার সঙ্গে ও যদি থাকতে চায় তবে কোথাও পাঠাব না। এই বলে কোট-টুপি খুলে ফেললাম। এই অবস্থায় একলা ওকে ফেলে যেতে আর পারলাম না।

ও বুঝলে যে আমি থেকে যাচ্ছি। বললে, 'না, না আপনি ঘুরে আসুন। আমার ঘুম পাচ্ছে। শিগ্‌গিরই ঘুমিয়ে পড়ব।'

'কিন্তু একেবারে একলা থাকবে কী করে?..' জিজ্ঞেস করলাম অনিশ্চিতের মতো, 'আমি অবশ্য দুঘণ্টার মধ্যেই ফিরব...'

'তাহলে যান-না। আমি যদি গোটা বছর ধরেই অসুখে পড়ে থাকি, আপনি তো আর গোটা বছরই ঘরে বসে থাকতে পারবেন না।' হাসতে চাইলে ও, আমার দিকে চাইলে বিচিত্রভাবে, যেন হৃদয়ের মধ্যে আলোড়িত

হয়ে ওঠা নরম কতকগুলো অনুভূতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলছে। আহা বেচারী, বুনো স্বভাব আর লোক-দেখানো রুক্ষতা সত্ত্বেও ওর কোমল সুকুমার হৃদয়খানা প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছিল।

প্রথমে ছুটলাম আন্না আন্দ্রেয়েভনার কাছে। ব্যগ্র অধীরতায় উনি অপেক্ষা করছিলেন আমার। ভর্ৎসনা নিয়ে দেখা করলেন। সাংঘাতিক বিচলিত হয়ে ছিলেন তিনি। খাবার পরই নিকোলাই সের্গেয়িচ বেরিয়ে গেছেন, কোথায় উনি জানেন না। আমার কেমন মনে হল, ওঁকে সবকিছু না জানিয়ে বোধ হয় বুড়ি থাকতে পারেন নি, অবশ্যই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আভাসে ইঙ্গিতে। তবে উনি নিজেই তা প্রায় স্বীকার করে বসলেন। বললেন, এমন আনন্দের খবর ওঁকে না শুনিয়ে পারেন নি, কিন্তু নিকোলাই সের্গেয়িচ একেবারে, তাঁর উক্তিমতো, 'মেঘের চেয়ে কালো থম্থমে' হয়ে উঠে একটা কথাও বলেন নি। 'কেবলি চুপ করে রইলেন, যা জিজ্ঞেস করি জবাব দিলেন না, তারপর হঠাৎ খাবারের পর উঠে বেরিয়ে গেলেন।' কথা বলতে বলতে আন্না আন্দ্রেয়েভনা প্রায় ভয়ে কাঁপছিলেন, অনুরোধ করলেন, নিকোলাই সের্গেয়িচ না ফেরা পর্যন্ত যেন থেকে যাই। আপত্তি জানিয়ে প্রায় সিধেসিধি বলতে হল, পরের দিনও আমি হয়ত আসতে পারব না, তাড়াতাড়ি করে আজ এসেছি শুধু এই কথাটিই বলে যাবার জন্যে। আমাদের মধ্যে সেদিন প্রায় ঝগড়া বেধে গিয়েছিল। উনি কাঁদতে লাগলেন, কঠোর স্বরে তিরস্কার করতে লাগলেন আমায়, তারপর দরজা পর্যন্ত যেই গিয়েছি, অমনি উনি হঠাৎ আমার পিঠের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, ওঁর মতো 'এক নিঃসঙ্গী' নারীর ওপর যেন রাগ না করি, যা বলেছেন তাতে যেন কিছুই মনে না করি।

যা আশা করেছিলাম, ঠিক তার উল্টো। দেখলাম ফের নাতাশা একলা। এবং আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, আমায় দেখে গত কাল বা অন্যান্য বার যেমন ঘটেছে, মোটেই তেমন খুশি লাগল না ওকে। আমি যেন ওর কিছু একটায় বাধা দিয়েছি কিংবা যে কোনো কারণেই হোক, ওর বিরক্তি ঘটিয়েছি। আলিওশা সেদিন এসেছিল কিনা জিজ্ঞেস করায় ও জাবাব দিলে:

'এসেছিল বৈকি, তবে বেশিক্ষণ থাকে নি। কথা দিয়ে গেছে সন্ধ্যেয় আসবে।' বললে যেন ইতস্তত করে।

'গত রাতে এসেছিল?'

'নু-না আটকে পড়েছিল,' তারপর দ্রুত স্বরে যোগ করলে, 'কিন্তু তোমার কী রকম চলছে ভানিয়া?'

বুঝলাম, কেন জানি আলাপটাকে ও এড়াবার জন্যে প্রসঙ্গ বদলাতে চাইছে। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে নজর করে দেখলাম ওকে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ও বিচলিত। কিন্তু যেই দেখলে আমি ওকে একদৃষ্টে নজর করে দেখছি, অমনি হঠাৎ ও এমন এক ক্ষিপ্র রাগত দৃষ্টিতে চাইলে যেন চোখ দিয়ে আমায় পুড়িয়ে মারবে। মনে হল, ফের ওর অবস্থা শোচনীয়, শুধু আমায় সে কথা বলতে চায় না।

ওর প্রশ্নের জবাবে এলেনার পুরো কাহিনীটা ওকে জানালাম বিশদ করে। গল্পটা শুনে ও ভারি কৌতূহলী এমনকি আশ্চর্য হয়ে উঠল।

চেঁচিয়ে উঠল, 'মা গো! অসুখের মধ্যে ওকে একলা ফেলে এলে!'

বললাম, মোটেই বেরুব না ভেবেছিলাম, কিন্তু মনে হল, নাতাশা হয়ত রাগ করবে, হয়ত আমাকে তার কোনো দরকার হবে।

'দরকার,' ও বললে যেন নিজের মনে কী একটা ভেবে নিয়ে, 'তা দরকার তো আছেই ভানিয়া, কিন্তু সে আজ নয়, পরে। তুমি কি আমাদের ওখানে গিয়েছিলে?'

বললাম ওকে।

'সত্যি; নতুন এই খবরগুলো বাবা এখন কেমন করে নেবেন ভগবানই জানেন। তবে নেবারই বা কী আছে আর...'

আমি বললাম, 'নেবার কী আছে মানে? এমন একটা ওলটপালটেরও পর?'

'ও এমনি... ফের কোথায় গেলেন উনি? আগের বার তো তোমরা ভেবেছিলে উনি আমায় দেখতে আসছিলেন। শোনো ভানিয়া, পারলে কাল এসো। হয়ত কিছু কথা বলব... তোমায় কষ্ট দিচ্ছি বলে ভারি লজ্জা লাগে। কিন্তু এখন তুমি বরং বাড়ি ফিরে যাও তোমার অতিথিটির কাছে। তুমি বাড়ি থেকে বেরুবার পর দু'ঘণ্টা হয়ে গেছে নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, দু'ঘণ্টা হয়ে গেছে। আসি নাতাশা। তা আলিওশা তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করল আজকে?'

'ওঃ আলিওশা? ভালোই... সত্যিই অবাক লাগছে তোমার কৌতূহল দেখে।'

'আসি এখন তাহলে, নাতাশা।'

'এসো।'

নিজের হাতখানা ও আমায় দিলে খানিকটা তাচ্ছিল্যভরে, চোখ ফিরিয়ে নিলে আমার শেষ বিদায়-দৃষ্টি থেকে। খানিকটা হতভম্ব হয়েই বেরিয়ে এলাম। ভাবলাম, "অথচ নিজের ভাবনা তো ওর কিছু আছে। মোটেই তুচ্ছ নয় ব্যাপারটা। কাল আবার নিজেই ও আগু বেড়ে আমায় সব বলবে।"

যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন মনটা খারাপ হয়েই ছিল। ভেতরে ঢুকতেই সাংঘাতিক স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। ঠাহর করলাম, এলেনা বসে আছে সোফার ওপর, মাথাটা বুকের ওপর নোয়ানো, যেন একটা গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। আমার দিকে তাকালেও না। মনে হল বাহ্যজ্ঞান ওর বুঝি নেই। কাছে গেলাম। নিজের মনে কী যেন বিড়বিড় করছিল। মনে হল, "ভুল বকছে নাকি?"

কাছে বসে বাহুবেষ্টন করে জিজ্ঞেস করলাম, 'এলেনা, কী হয়েছে?'

'আমি চলে যেতে চাই... ওর কাছে ফিরে যাওয়াই ভালো।' আমার দিকে মাথা না তুলে ও বললে।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কার কাছে, কোথায়?'

'ওর কাছে, বুবনভার কাছে। সব সময় বলে, ওর কাছে নাকি একগাদা টাকা আমি ধারি, খরচা দিয়ে নাকি ও মার কবর দেবার ব্যবস্থা করেছিল... মার সম্পর্কে ও যা-তা বলবে, তা চাই না... ওর কাছে কাজ করতে চাই আমি, খেটে সব শোধ দেব... তারপর নিজেই চলে যাব আমি, কিন্তু এখন ফের আমি যাব ওর কাছে।'

বললাম, 'শান্ত হও এলেনা, ওর কাছে যাওয়া চলে না। তোমার ওপর অত্যাচার করবে ও, তোমার সর্বনাশ করবে...'

'করুক সর্বনাশ, করুক অত্যাচার,' উত্তেজিত হয়ে ও লুফে নিলে কথাটা, 'আমি তো আর প্রথম নই; আমার চেয়ে যারা অনেক ভালো তাদের ওপরেও অত্যাচার চলেছে। রাস্তায় একটা ভিখিরি মেয়ে সে কথা বলেছে আমাকে। আমি গরিব, গরিবই থাকতে চাই। সারা জীবনই আমি গরিব হয়ে থাকব, মরবার সময় মা আমায় তাই বলে গেছেন। কাজ করব আমি... এ পোশাক আমি পরতে চাই না...'

'কালই তোমায় আমি কিনে দেব অন্য পোশাক। বইও এনে দেব তোমায়, আমার কাছে থাকবে তুমি। তুমি নিজে না চাইলে তোমায় কাউকে দেব না। নাও, শান্ত হও...'

'আমি ঝি-এর কাজ করব।'

'তা বেশ, বেশ তো, শুধু শান্ত হও, শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে নাও।'

কিন্তু বেচারীর চোখ ভরে উঠল জলে। চোখের জল থেকে আস্তে আস্তে শুরু হল ফোঁপানি। কী যে করি ওকে নিয়ে ভেবে পেলাম না। জল এনে দিলাম ওকে, মাথা আর কপালের রগদুটো ভিজিয়ে দিলাম একটু। একেবারে ক্লান্ত হয়ে ও শেষকালে সোফায় শুয়ে পড়ল, ফের জ্বরের ঘোরে কাঁপুনি শুরু হল। যা পেলাম তাই দিয়ে ঢেকে ঢুকে দিলাম ওকে, ঘুমিয়ে পড়ল ও, কিন্তু শান্তিতে নয়, থেকে থেকে ক্রমাগত চমকে জেগে উঠছিল। সেদিন হাঁটাহাঁটি কম হলেও ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, নিজেও যত তাড়াতাড়ি পারি শোব বলে ঠিক করলাম। মাথার মধ্যে দুশ্চিন্তা ভিড় করে এল। বেশ টের পাচ্ছিলাম, মেয়েটাকে নিয়ে আমার ঝামেলা হবে অনেক। কিন্তু প্রধান দুশ্চিন্তাটা আমার ছিল নাতাশা আর তার সমস্যা নিয়ে। মোটের ওপর, এখন মনে পড়ে, সেদিনকার সেই দুঃখের রাতে ঘুমোবার সময় মন যে রকম ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল তেমন খুব কমই হয়েছে।

নবম পরিচ্ছেদ

সকালে উঠলাম দেরি করে, গোটা দশেকের সময়, বেশ অসুস্থ লাগছিল। মাথা ঘুরছিল, ব্যথাও করছিল। এলেনার বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, শয্যা শূন্য। সেই মুহূর্তে আমার ছোটো ডান দিকের ঘর থেকে একটা শব্দ কানে এল, কেউ যেন ঝাড়ু দিয়ে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। গেলাম দেখতে। এলেনার হাতে একটি ঝাঁটা, অন্য হাতে সেদিনকার সেই ফ্রকটি ও উঁচু করে তুলে মেঝে পরিষ্কার করছে। সেই সন্ধ্যা থেকে আজ পর্যন্ত ফ্রকটি সে ছাড়ে নি। চুল্লির কাঠগুলো গুছিয়ে রাখা হয়েছে কোণে, টেবিলটা মোছা, কেটলিটা মাজা। মোট কথা, গেরস্তালি শুরু করে দিয়েছে এলেনা।

চেঁচিয়ে উঠলাম, 'শোনো এলেনা, কে তোমায় ঘর ঝাঁট দিতে বলেছে? এ আমি চাই না, তুমি অসুস্থ; তুমি কি এখানে এসেছ আমার ঝিয়ের কাজ করবে বলে?'

সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে সোজা তাকিয়ে ও বললে, 'আর মেঝেটা তাহলে পরিষ্কার করবে কে? এখন আমার জ্বর নেই।'

'কিন্তু তোমাকে দিয়ে কাজ করাব বলে তোমায় এখানে আনি নি এলেনা। কিছু না করে আমার এখানে থাকলে বুবনভার মতো আমিও তোমায় বকব বলে ভয় পাচ্ছ নাকি? আর ঐ বিদঘুটে ঝাঁটাটাই বা কোথা থেকে জোগাড় করলে? আমার তো কোনো ঝাঁটা ছিল না।' অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম।

'আমার ঝাঁটা, আমি নিজেই নিয়ে এসেছিলাম এখানে। দাদুর জন্যেও এখানে এসে ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে যেতাম আমি। সেই সময় থেকে ঝাঁটাটা চুল্লির নিচে পড়েই ছিল।'

ঘরখানায় ফিরে এলাম ভাবতে ভাবতে। হয়ত অন্যায় ভাবছি, কিন্তু ঠিক এই কথাই মনে হল, আমার আতিথেয়তায় ও যেন পীড়া বোধ করছে; যেমন করে পারে দেখাতে চায় যে আমার এখানে বিনা পয়সায় থাকে না। মনে মনে ভাবলাম, তাই যদি হয়, তাহলে কী তিতিবিরক্ত চরিত্র। মিনিট দুয়েক পরে ও-ও ফিরে এসে বিনা বাক্যে সোফার ওপর সেই কালকের জায়গাটিতেই বসল এবং উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। ইতিমধ্যে আমি কেটলি চাপিয়ে দিয়েছিলাম। চা করে একটুকরো শাদা রুটি সমেত ওকে এক কাপ এগিয়ে দিলাম। নীরবে আপত্তি না করে ও গ্রহণ করলে তা। গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ও প্রায় কিছুই মুখে তোলে নি।

ওর স্কার্টের ঝুলের ওপর একটা নোংরা দাগ দেখে বললাম, 'দেখেছ তো, ঝাঁটাতে তোমার সুন্দর পোশাকখানা নোংরা করে ফেলেছ।'

তাকিয়ে দেখলে ও, তারপর আমায় ভয়ানক অবাক করে দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল এবং বেশ ধীরস্থিরভাবেই স্কার্টের মসলিনী ঝুলটা দুই হাতে ধরে এক ঝটকায় আগাগোড়া ছিঁড়ে ফেললে। তারপর একগুঁয়ে ঝকঝকে চোখজোড়া আমার দিকে ফেরালে নীরবে। মুখখানা ওর বিবর্ণ।

'করছ কী এলেনা?' চেঁচিয়ে উঠলাম। আমার সন্দেহ ছিল না যে সামনে একটা পাগলকে দেখছি।

উত্তেজনায় প্রায় রুদ্ধশ্বাসে ও বললে, 'বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি পোশাক এটা। কেন বললেন সুন্দর? আমি পরব না এ পোশাক!' হঠাৎ লাফিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ও, 'ছিঁড়ে ফেলব এটাকে। পোশাক পরিয়ে সাজাতে তো আমি ওকে বলি নি। ও নিজেই করেছে, জোর করে। একটা পোশাক আমি আগেই ছিঁড়েছি, এটাও ছিঁড়ে ফেলব! ছিঁড়ব, ছিঁড়ব, ছিঁড়ব...'

হতভাগ্য পোশাকটার ওপর আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। মুহূর্তের মধ্যে ওটাকে ছিঁড়ে প্রায় কুটি কুটি করে ফেললে। ছিঁড়ে যখন শেষ করলে তখন ও এত বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল যে দাঁড়িয়ে থাকতেও প্রায় পারছিল না। এমন ধারা রাগ দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম আমি। ও কিন্তু আমার দিকে তাকালে কেমন একটা উদ্ধত দৃষ্টিতে, যেন আমিও কোনো কিছুর জন্যে তার কাছে অপরাধী। জানতাম, অতঃপর কী আমার করণীয়।

ঠিক করলাম আর দেরি না করে ওই সকালেই ওর জন্যে একটা নতুন পোশাক কিনে আনতে হবে। নিষ্ঠুর হয়ে ওঠা বুনো এই জীবটিকে বশ করতে হবে দরদ দিয়ে। ভালো লোক যেন কখনো চোখেও দেখে নি এমনি তার দৃষ্টি। কঠিন শাস্তি পেয়েও যদি ও তার প্রথম, অমনি একটা পোশাক আগেই কুটি কুটি করে থাকে, তাহলে ভয়াবহ সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর স্মৃতিবিজড়িত পরের এই পোশাকটিকেও ওর কী হিংস্র চোখেই না দেখার কথা।

সেকেন্ড হ্যান্ড্ দোকানে আটপৌরে সুন্দর গোছের পোশাক কিনতে পাওয়া যায় শস্তায়। মুশকিল হল, তখন আমার কাছে প্রায় কোনো টাকাই ছিল না। গত রাত্রে শুতে যাবার সময়েই ঠিক করে রেখেছিলাম, এক জায়গায় যাব, টাকা পাওয়ার আশা আছে সেখানে, পড়বেও বাজারে যাওয়ার পথে। টুপিটা মাথায় দিলাম। স্থির দৃষ্টিতে এলেনা নজর করছিল আমায়, যেন কীসের অপেক্ষা করছিল।

কাল পরশু যা করেছি, সেইভাবে ঘরটা বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে যাবার জন্যে চাবিটা নিতেই ও জিজ্ঞেস করলে, 'ফের আমায় তালাবন্ধ করে রেখে যাবেন?'

ওর কাছে গিয়ে বললাম, 'রাগ ক'রো না লক্ষ্মীটি, তালাবন্ধ করছি কারণ কেউ এসে পড়তে পাবে। তোমার যে অসুখ, ভয় পেয়ে যাবে হয়ত। কে যে এসে পড়বে ভগবান জানেন? হয়ত বুবনভাই আসার কথা ভাবতে পারে...'

কথাটা বললাম ইচ্ছে করেই। তালাবন্ধ করে যেতাম কারণ ওকে ভরসা ছিল না আমার। আমার মনে হয়েছিল, হঠাৎ হয়ত ওর মাথায় ঢুকবে আমার কাছ থেকে পালাবে। কিছুদিন সাবধানে থাকব বলে স্থির করে রেখেছিলাম। এলেনা চুপ করে রইল। এবারেও তালাবন্ধ করে গেলাম ওকে।

জনৈক প্রকাশকের সঙ্গে জানা ছিল আমার, এই তৃতীয় বছর যাবৎ বহুখণ্ডে সে একটা বই প্রকাশ করে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি কিছু উপার্জনের দরকার হলে

ওর কাছ থেকে প্রায়ই কাজ নিতাম আমি। পয়সা ও মিটিয়ে দিত নিয়মিতভাবে। ওর উদ্দেশ্যেই রওনা দিলাম। অগ্রিম পাওয়া গেল পঁচিশ রুবল। কথা রইল সপ্তাহের মধ্যে একটা সংকলনের প্রবন্ধ দিতে হবে। তবে আশা ছিল, নভেলের জন্যে সময় খরচা কমানো যাবে। একান্ত প্রয়োজন হলে এটা আমি প্রায়ই করতাম।

টাকাটা পেয়ে গেলাম বাজারে। চেনা এক বুড়ির কাছে হাজির হলাম, নানা ধরনের পুরনো পোশাক ও বেচে। এলেনা মোটামুটি কতটা লম্বা তা বললাম, তৎক্ষণাৎ ও একটা হালকা রঙের সুতী পোশাক বার করলে। দাম অসাধারণ শস্তা, খুব মজবুত, একবারের বেশি ধোয়া পড়ে নি। ওটা নিতে গিয়ে একটা গলার রুমালও কিনলাম। দাম মিটিয়ে দিতে গিয়ে মনে হল, ওভারকোট বা ম্যান্টেল গোছের কিছু একটাও এলেনার দরকার। আবহাওয়াটা ঠান্ডা, অথচ কিছুই নেই ওর। কিন্তু ওটা পরের বারের জন্যে মুলতবি রাখা গেল। এলেনার অপমানজ্ঞান গর্ববোধ ভারি টনটনে। ভগবান জানেন এই পোশাকটাই বা ও কীভাবে নেবে, যদিও ইচ্ছে করেই আমি সবচেয়ে মামুলী একটা পোশাক নিয়েছি, যথাসম্ভব সাদাসিধে, আটপৌরে। তবে যাই ঘটুক একজোড়া গরম আর দুজোড়া সুতী মোজাও কিনলাম। এগুলো ওকে দেওয়া যায় এই বলে যে ঘরটা ঠান্ডা, ওর অসুখ করেছে। অন্তর্বাসও ওর দরকার। কিন্তু সেসব ওকে আরো ভালো করে না জানা পর্যন্ত স্থগিত রাখা গেল। তবে বিছানাটার জন্যে পুরনো পর্দা কিনলাম। জিনিসটা দরকার, এলেনা এতে ভারি খুশি হতে পারে।

এইসব নিয়ে বাড়ি ফিরলাম যখন তখন বেলা একটা বেজে গিয়েছিল। তালা খুলেছিলাম প্রায় নিঃশব্দে। এলেনা শুনতে পায় নি যে আমি ফিরেছি। দেখলাম, টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে ও আমার কাগজপত্র, বই উল্টিয়ে দেখছে। আমার শব্দ পেয়ে যে বইটা পড়ছিল সেটা তাড়াতাড়ি সশব্দে বন্ধ করে সরে গেল টেবিল থেকে, একেবারে লাল হয়ে।

বইটার দিকে তাকালাম। পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশিত ওটা আমার প্রথম উপন্যাস, নামপত্রে আমার নাম ছাপা।

'আপনি যখন বাইরে গিয়েছিলেন, তখন কে একজন কড়া নাড়ছিল।' যে সুরে ও বললে, মনে হল তালাবন্ধ করে গিয়েছিলাম বলে খোঁচা দিতে চায়।

বললাম, 'ডাক্তার নয় তো, তুমি ডাকো নি তাকে এলেনা?'

'না।'

জবাব না দিয়ে আমি মোড়ক খুলে কেনা পোশাকটি বার করলাম।

ওর কাছে গিয়ে বললাম, 'এই নাও এলেনা, লক্ষ্মীটি। যা ন্যাতাকানি পরে আছ, তা পরে তো বেরুনো যায় না। তাই তোমার জন্যে একটা পোশাক কিনলাম, আটপৌরে পোশাক, শস্তাও, তাই তোমার ভাবনার কারণ নেই। এক রুবল কুড়ি কোপেক মাত্র দাম। নাও, খুশি মনে পরো।'

ওর পাশে রেখে দিলাম পোশাকটা। লাল হয়ে উঠে ও কিছুক্ষণ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

ভারি অবাক হয়ে গিয়েছিল ও আর তারই সঙ্গে কী জন্যে যেন সাংঘাতিক লজ্জা পাচ্ছে বলেও মনে হল। কিন্তু স্নিগ্ধ কোমল একটা আলোও দেখা গেল ওর চোখে। চুপ করে আছে দেখে আমি সরে গেলাম টেবিলের কাছে। বোঝা গেল আমার আচরণে অভিভূত হয়েছে ও, কিন্তু চেষ্টা করে ও নিজেকে সংযত করলে, বসে রইল মাটির দিকে চোখ নামিয়ে।

মাথা আমার ক্রমেই বেশি করে ঘুরছিল, ব্যথা করছিল। তাজা হাওয়াটায় কোনো উপকারই হল না। এদিকে নাতাশার কাছেও যাওয়া উচিত। গতকাল থেকে ওর সম্পর্কে আমার উদ্বেগ কালকের চেয়ে কমে নি, বরং বেড়েই উঠছে। হঠাৎ মনে হল এলেনা আমায় ডাকছে। ওর দিকে ফিরলাম।

ও অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে নিলে। সোফার কোনাটা এমন ভাবে খুঁটতে লাগল যেন তাতেই ও ডুবে আছে। বললে, 'বাইরে যাবার সময় তালাবন্ধ করে যাবেন না আমায়। আমি আপনার কাছ থেকে অন্য কোথাও চলে যাব না।'

'বেশ এলেনা, আমি রাজী। কিন্তু ধরো যদি অচেনা কেউ এসে হাজির হয়? কে আসবে বলা তো যায় না!'

'তাহলে চাবিটা আমায় দিয়ে যাবেন। আমি নিজেই ভেতর থেকে বন্ধ করে রাখব। কেউ দরজায় টোকা দিলে বলব, বাড়ি নেই।'

আমার দিকে ও চাইলে সেয়ানার দৃষ্টিতে, যেন বলতে চায়, "দেখছেন তো কী সহজ ব্যাপারটা।"

আমি ওকে কিছু একটা উত্তর দেবার আগেই হঠাৎ ও জিজ্ঞেস করলে, 'আপনার ধোয়া-কাচার কাজ করে কে?'

'একটা মেয়ে, এই বাড়িরই।'

'আমি কাপড় কাচতে পারি। কাল খাবার এনেছিলেন কোত্থেকে?'

'একটা রেস্তোরাঁ থেকে।'

'আমি রান্নাও করতে পারি। আপনার জন্যে রেঁধে দেব।'

'হয়েছে, হয়েছে এলেনা। রান্নার কী জানো তুমি? এসব কোনো কাজের কথা নয়...'

চুপ করে গিয়ে চোখ নামালে এলেনা। বোঝা গেল, আমার মন্তব্যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে ও। অন্তত মিনিট দশেক কেটে গেল। দুজনেই চুপ করে রইলাম আমরা।

'সুপ!' মাথা না তুলেই হঠাৎ বলে উঠল ও।

'সুপ মানে? কীসের সুপ?' জিজ্ঞেস করলাম অবাক হয়ে।

'আমি সুপ রাঁধতে পারি। মার অসুখের সময় মার জন্যে রান্না করতাম। বাজার করেও আনতাম আমি।'

ওর কাছে গিয়ে পাশে বসলাম সোফার ওপর। বললাম, 'দেখছ তো এলেনা, দেখছ, কীরকম তুমি অহংকারী। আমার মন যা বলেছে তেমনি ব্যবহার করেছি তোমার সঙ্গে। তুমি একলা, আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, দুঃখী। তোমায় একটু সাহায্য করতে চাই। আমি কষ্টে পড়লে তুমিও এমনি করে আমায় সাহায্য করতে পারতে। কিন্তু সেভাবে তুমি দেখছ না, আমার সাধারণ একটা উপহার নিতেও তোমার কাছে খারাপ লাগছে। সঙ্গে সঙ্গে তুমি তার দাম মিটিয়ে দিতে চাও, খেটে শোধ দিতে চাও যেন আমিও এক বুবনভা, খোঁটা দেব তোমায়। তাই যদি ভেবে থাকো, তাহলে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত এলেনা।'

কোনো উত্তর দিলে না ও। ঠোঁটদুটো থরথর করল। মনে হল কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু আত্মসংবরণ করে চুপ করে রইল। নাতাশার কাছে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম আমি। এবার চাবিটা রেখে গেলাম এলেনার কাছে। বলে গেলাম, কেউ যদি এসে কড়া নাড়ে তাহলে যেন ও ডেকে জিজ্ঞেস করে কে। আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে খুবই খারাপ কোনো বিপদ ঘটেছে নাতাশার। আগে একাধিকবার যা হয়েছে তেমনি করে আপাতত ব্যাপারটা ও আমার কাছ থেকে চেপে রাখছে। যাই হোক, ঠিক করলাম, শুধু এক মুহূর্তের জন্যে যাব, নইলে আমার ঔদ্ধত্যে ও হয়ত চটবে।

ঘটলও তাই; ফের আমায় সে গ্রহণ করলে অসন্তুষ্ট রূঢ় দৃষ্টিতে। তক্ষুনি ওর কাছ থেকে চলে আসা আমার উচিত ছিল, কিন্তু পায়ে আর খাড়া থাকতে পারছিলাম না।

বললাম, 'এক মিনিটের জন্যে এলাম নাতাশা, আমার অতিথিটিকে নিয়ে কী করব, সেই পরামর্শ নিতে।' এলেনা সম্পর্কে দ্রুত ওকে জানালাম সবকিছু। নীরবে শুনে গেল নাতাশা।

বললে, 'জানি না, কী পরামর্শ দেব ভানিয়া। সবকিছু দেখে বোঝা যাচ্ছে মেয়েটা ভারি অদ্ভুত রকমের। হয়ত ভারি আঘাত পেয়েছে, খুবই আতঙ্কের মধ্যে ছিল। অন্তত ওকে সেরে উঠতে দাও। আমাদের ওখানে ওকে রাখতে চাও নাকি?'

'ও কেবলি বলছে, আমার কাছ থেকে অন্য কোথাও সে যাবে না। ওঁরাও যে ওকে কীভাবে নেবেন ঈশ্বর জানেন। তাই কিছুই বুঝতে পারছি না। যাক, বলো তুমি কেমন আছ। কাল তো কেমন যেন অসুস্থ ছিলে,' বললাম ভয়ে ভয়ে।

অন্যমনস্কের মতো জবাব দিলে, 'হ্যাঁ... আজকেও মাথাটা যেন ধরে আছে। ওঁদের কারো সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'না। কাল যাব। কাল তো শনিবার...'

'শনিবার তো কী?'

'প্রিন্স তো সন্ধ্যেয় আসবেন...'

'তাতে কী হল, আমি ভুলি নি।'

'না, মানে, আমি এমনিই...'

ও দাঁড়িয়েছিল ঠিক আমার মুখোমুখি। অনেকখন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার চোখের দিকে। সে দৃষ্টিতে কী একটা সংকল্প, একগুঁয়েমি, ক্ষিপ্ত, অতি উত্তেজিত কিছু একটা।

বললে, 'শোনো ভানিয়া, দয়া করে চলে যাও আমার কাছ থেকে। তুমি আমার ভারি অসুবিধা করছ...'

কেদারা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অবর্ণনীয় বিস্ময়ে তাকালাম ওর দিকে।

আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'নাতাশা, লক্ষ্মী আমার। কী ব্যাপার, কী হয়েছে তোমার বলো তো?'

'কিছুই হয় নি। কাল সব, সবই জানতে পারবে। কিন্তু এখন আমি একলা থাকতে চাই। শুনছ ভানিয়া, এক্ষুনি চলে যাও। আমি পারছি না, তোমার দিকে তাকাতে আমি পারছি না।'

'কিন্তু অন্তত এইটুকু বলো...'

'সব, সবই জানতে পারবে কাল। মা গো! তুমি কি যাবে না?'

বেরিয়ে এলাম আমি। এমন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম যে, বলতে গেলে কোনো সম্বিত ছিল না। মাভরা বারান্দায় ছুটে এল আমার পিছু পিছু।

জিজ্ঞেস করলে, 'কী, রেগে আছে? ওর কাছে যেতেও ভয় হচ্ছে আমার।'

'কিন্তু কী হয়েছে ওর?'

'কী আবার, আমাদের উনি যে আজ তিন দিন ধরে টিকিটিও দেখিয়ে যান নি।'

'তিন দিন মানে?' জিজ্ঞেস করলাম অবাক হয়ে, 'কেন, ও যে নিজেই কাল বললে যে কাল সকালে এসেছিল, সন্ধ্যেতেও ফের আসতে চাইছিল।'

'সন্ধ্যে না হাতি! সকালেও আসে নি! বলছি শোনো, আজ তিনদিন হল ওর দর্শনই নেই। ও নিজে বলেছে, সকালে এসেছিল?'

'হ্যাঁ, নিজেই বলেছে বৈকি।'

'তার মানে,' মাভরা বললে চিন্তিতভাবে, 'তোমার কাছেও যখন স্বীকার করছে না, তখন মনে খুবই ঘা লেগেছে ওর। বাঃ, বেশ!'

চেঁচিয়ে উঠলাম, 'তার মানে কী?'

'তার মানে, দিদিমণিকে নিয়ে কী করব, কিছুই বুঝতে পারছি না।' মাভরা বললে হতাশার ভঙ্গি করে, 'কাল আমায় পাঠাতে চেয়েছিল, কিন্তু দু'দুবার রাস্তা থেকে আমায় ফেরালে। আজ তো আমার সঙ্গে কথাটি পর্যন্ত কইছে না। তুমি অন্তত গিয়ে একবার ছোটোবাবুর সঙ্গে দেখা করে এসো-না। দিদিমণিকে ছেড়ে যেতে আমার ভরসা হচ্ছে না।'

আত্মহারা হয়ে ছুটলাম সিঁড়ি ভাঙতে।

পেছন থেকে মাভরা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'সন্ধ্যে বেলায় আসছ কি?'

ছুটতে ছুটতেই বললাম, 'সে পরে দেখা যাবে। হয়ত কেবল তোমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করে যাব ব্যাপার-স্যাপার। অবিশ্যি যদি আমি নিজে ততক্ষণ বেঁচে থাকি।'

সত্যিই মনে হচ্ছিল, একেবারে হৃৎপিণ্ডে যেন একটা ঘা খেয়েছি।

দশম পরিচ্ছেদ

সোজা গেলাম আলিওশার কাছে। বাপের সঙ্গে ও থাকত মালায়া মস্‌কোয়াতে। প্রিন্স ভালকোভস্কির বাসাখানা ছিল রীতিমতো বড়ো, যদিও থাকতেন তিনি একা। তাতে চমৎকার দু'খানা ঘর ছিল আলিওশার। ওর

কাছে আমি এখানে এসেছি কদাচিৎ, এর আগে মনে হচ্ছে মাত্র একবারই। আমার কাছেই বরং ও আসত বেশি ঘন ঘন, বিশেষ করে আগে, নাতাশার সঙ্গে ওর সম্পর্কের প্রথম দিকটাতে।

বাড়ি ছিল না আলিওশা। সোজা ওর ঘরের ভেতর ঢুকে এই চিরকুটটা লিখে এলাম:

'আলিওশা, আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যেয় আপনার পিতা স্বয়ং নাতাশাকে আপনার স্ত্রী হবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে গেছেন, আপনিও তাতে খুশি হয়েছিলেন, আমি তার সাক্ষী, এসবের পর আপনার বর্তমান আচরণ যে কিছুটা অদ্ভুত হচ্ছে, সে কথা আপনারও স্বীকার করা উচিত। নাতাশাকে নিয়ে কী করছেন তা খেয়াল আছে? যাই হোক, এই চিরকুটটা অন্তত আপনাকে মনে করিয়ে দেবে যে আপনার ভাবী স্ত্রীর প্রতি আপনার আচরণ অতি দায়িত্বহীন ও গর্হিত। আপনাকে উপদেশ দেবার কোনো অধিকার আমার নেই তা আমি ভালো করেই জানি, কিন্তু সে কথা মান্য করা আদৌ সম্ভব হল না।

পুঃ — এ চিঠির বিষয়ে নাতাশা কিছুই জানে না, এমনকি আপনার ব্যাপারটাও আমি শুনেছি ওর কাছ থেকে নয়।'

চিরকুটের মুখ এঁটে টেবিলে রেখে দিলাম। আমার প্রশ্নের জবাবে চাকরটি বলল যে আলেক্সেই পেত্রোভিচ বাড়িতে প্রায় থাকেনই না; এখন রাতে ভোর হবার আগে উনি ফিরবেন না।

কোনোক্রমে বাড়ি ফেরা গেল। মাথা ঘুরছিল, পাদুটো দুর্বল লাগছিল, কাঁপছিল। আমার ঘরের দরজা খোলা। নিকোলাই সের্গেয়িচ ইখমেনেভ অপেক্ষা করছিলেন আমার জন্যে। টেবিলের কাছে বসে উনি সবিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন এলেনাকে। এলেনাও সমান আশ্চর্য হয়ে ওঁকে লক্ষ্য করছিল, যদিও চুপ করে ছিল একগুঁয়ের মতো। ভাবলাম, মেয়েটিকে নিশ্চয় অদ্ভুত লাগছে ওঁর।

'এই যে, পাকা এক ঘণ্টা ধরে তোমার অপেক্ষা করছি হে, আশা করি নি... তোমায় এই অবস্থায় দেখব...' ঘরের চারদিকে তাকাতে তাকাতে এলেনার দিকে প্রায় অলক্ষ্যে চোখের ইঙ্গিত করে বললেন উনি। চোখে ওঁর বিস্ময় ফুটে উঠেছিল। কিন্তু আরো খুঁটিয়ে দেখে লক্ষ্য করলাম তাতে বিষাদ আর উদ্বেগ। মুখখানা স্বাভাবিকের চেয়ে বিবর্ণ।

'বসো, বসো,' উনি বলে চললেন একটু চিন্তিতভাবে, ব্যস্তসমস্ত হয়ে, 'তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম, কাজ আছে। কিন্তু তোমার হয়েছে কী, এ কী চেহারা?'

'শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না। সারা দিন ধরে মাথা ঘুরছে।'

'দেখো বাপু, ওটা অবহেলা করা ঠিক নয় হে। ঠাণ্ডা লেগেছে নাকি?'

'না, স্রেফ একটা স্নায়বিক দৌর্বল্য। মাঝে মাঝে এ রকম আমার হয়। কিন্তু আপনি ভালো আছেন তো?'

'আমি ঠিক আছি হে, ঠিক আছি, ওটা একটু উত্তেজনার জন্যে। কাজ আছে, বসো।'

একটা চেয়ার টেনে এনে বসলাম টেবিলের কাছে, ওঁর দিকে মুখ করে। বৃদ্ধ আমার দিকে সামান্য নুয়ে অর্ধস্ফুট স্বরে বললেন:

'শোনো, ওই মেয়েটির দিকে তাকিও না। ভান করো যেন আমরা অন্য কথা বলছি। তোমার এখানে এটি কেমন ধারা অতিথি?'

'পরে আপনাকে সব বলব নিকোলাই সের্গেয়িচ। বেচারী মেয়েটির দুনিয়ায় কেউ নেই। সেই যে স্মিথ এই ঘরে থাকত, মিষ্টিখানায় মারা গেছে, তারই নাতনী।'

'ওর এক নাতনীও ছিল তাহলে, বটে! কিন্তু ও যে ক্ষেপাটে হে। কেমন করে তাকায়, কী তাকানি। সত্যি বলছি, তুমি যদি আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে না আসতে তাহলে আর এখানে বসে থাকতে পারতাম না। দরজা খোলানোই দায়, তারপর এই সারাটা সময় যদি একটা কথাও বলে! স্রেফ ভয়ই করে ওর সঙ্গে থাকতে, একেবারেই মানুষের মতো নয় মেয়েটা। তা এল কেমন করে? ও বুঝেছি, দাদুকে দেখতে এসেছিল বুঝি, জানত না মারা গেছে?'

'হ্যাঁ, ভারি দুঃখী মেয়েটা। বুড়ো মারা যাবার সময়েও ওর কথাই ভাবছিল।'

'হুঁ, যেমন দাদু তেমনি নাতনী। পরে তোমার কাছ থেকে সব শুনব। হয়ত ওকে কোনোরকম কিছু সাহায্যও করা যাবে, কিছু একটা সাহায্য আর কি, অমন দুঃখী যখন... কিন্তু এখন ওকে একটু যেতে বলতে পারো না হে, তোমার সঙ্গে গুরুতর একটা কথা আছে।'

'কিন্তু ওর যে যাবার জায়গা নেই কোথাও, এখানেই থাকে।'

অল্প কথায় যথাসাধ্য বৃদ্ধকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম। বললাম, ওর সামনেই উনি কথা কইতে পারেন, ও নিতান্ত ছেলেমানুষ।

'তা বটে... ছেলেমানুষ বৈকি। কিন্তু তুমি আমায় অবাক করলে হে। তোমার কাছেই থাকছে! কী কাণ্ড!'

অবাক হয়ে বৃদ্ধ ফের ওর দিকে তাকালেন।

এলেনা টের পেয়েছিল আমরা ওর সম্পর্কেই কথা কইছি, তাই সোফার কোনাটা খুঁটতে খুঁটতে মাথা নিচু করে বসে রইল নীরবে। নতুন পোশাকটা সে পরেছে ইতিমধ্যেই, একেবারে মাপসই হয়েছে।

চুল আঁচড়েছে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু যত্ন করেই, বোধ হয় নতুন পোশাকটির জন্যে। মোটের ওপর, যদি দৃষ্টিতে ঐ অদ্ভুত বন্যতাটা না থাকত, তাহলে সুন্দরই লাগত ওকে।

বৃদ্ধ ফের শুরু করলেন, 'সংক্ষেপে স্পষ্টাস্পষ্টি বলা যাক কী ব্যাপার। সে এক সাত-কাণ্ড ব্যাপার, জরুরী ব্যাপার...'

গম্ভীর চিন্তিত ভাব নিয়ে উনি বসে রইলেন নিচের দিকে তাকিয়ে। ওঁর নিজের ব্যস্ততা, এবং 'সংক্ষেপে স্পষ্টাস্পষ্টি' বলতে চাওয়া সত্ত্বেও শুরু করার মতো কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অবাক হয়ে ভাবলাম, কী ব্যাপার।

'শোনো ভানিয়া, তোমার কাছে এসেছি একটা মস্তো অনুরোধ নিয়ে। কিন্তু তার আগে... এখন যা বুঝতে পারছি তোমায় কয়েকটা ব্যাপার বুঝিয়ে বলা দরকার... খুব সাবধানতার ব্যাপার...'

গলা খাঁকারি দিয়ে নিয়ে উনি চোরা দৃষ্টিতে চাইলেন আমার দিকে, চেয়েই লাল হয়ে উঠলেন আর নিজের আনাড়িপনায় চটে উঠলেন নিজের ওপর। আর চটে উঠতেই মন স্থির করে ফেললেন।

'মানে, বুঝিয়ে বলার আর কী আছে! নিজেই বুঝতে পারছ! স্রেফ প্রিন্সকে ডুয়েলে ডাকব আর তোমায় অনুরোধ — ব্যাপারটার বন্দোবস্ত করো আর ডুয়েলে আমার সেকেণ্ড হিসেবে থাকবে।'

চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে স্তম্ভিতের মতো তাকিয়ে রইলাম ওঁর দিকে।

'আরে, তাকিয়ে দেখছ কী? আমার তো আর মাথা খারাপ হয় নি।'

'কিন্তু মাপ করবেন নিকোলাই সের্গেয়িচ, ডুয়েল লড়বেন কী অজুহাতে, কী উদ্দেশ্যে? তাছাড়া, আসলে তা কী করেই বা সম্ভব...'

'অজুহাত, উদ্দেশ্য!' চেঁচিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ, 'সাবাস!..'

'আচ্ছা, আচ্ছা, সে নয় হল। কী বলবেন আমি জানি। কিন্তু এ কাজ করে কী উপকার হবে আপনার? ডুয়েল লড়ে কী লাভ হবে? সত্যিই কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।'

'বুঝবে না তা আগেই জানতাম। শোনো, আমাদের মোকদ্দমা শেষ হয়ে গেছে, মানে, আর কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। নেহাৎ কিছু বাজে আনুষ্ঠানিক ব্যাপার বাকি আছে। মোকদ্দমায় আমি হেরেছি। দশ হাজারের মতো দিতে হবে আমাকে, আদালতের তাই রায়। ইখমেনেভ্‌কা তার জমানত। সুতরাং এখন এই নচ্ছারটার টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল! আর আমি ইখমেনেভ্‌কা ছেড়ে দেওয়ায় ওর পাওনা শোধ হয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকে যাচ্ছে। এইবার আমি মাথা উঁচু করে বলব, হুজুর, আমায় গত দু'বছর ধরে অপমান করে এসেছেন, আমার নাম, আমার পরিবারের মর্যাদায় কালি দিয়েছেন। সে সবই আমায় সহ্য করতে হয়েছে। তখন ডুয়েল ডাকা সম্ভব ছিল না। কেননা তখন আপনি সোজাসুজিই বলে দিতেন, "বটে রে ধূর্ত! বেশ টের পাচ্ছিস কিনা যে আজ হোক কাল হোক আমায় টাকা শোধ করে দেবার রায় হবে। তাই আমায় মেরে টাকাটা ফাঁকি দিতে চাস। সেটি হবে না, আগে মোকদ্দমার ফয়সালা হোক, তারপর ডুয়েল লড়িস।" এখন মহামান্য রাজাবাহাদুর, মামলার ফয়সালা হয়ে গেছে, আপনার টাকা পাবার ব্যবস্থা হয়েছে, সুতরাং অন্য কোনো অসুবিধা আর নেই, তাই এবার ডুয়েল লড়ার আজ্ঞা হবে কি? এই হল ব্যাপার। কী মনে হয় তোমার, নিজের জন্যে, এই সমস্ত কিছু, এই সবকিছুর জন্যে শেষ পর্যন্ত একটা প্রতিশোধ নেবার অধিকার কি আমার নেই!'

চোখ জ্বলছিল ওঁর। কথা না বলে বহুক্ষণ চেয়ে রইলাম ওঁর দিকে। ওঁর গোপন ভাবনাটা ধরতে চাইছিলাম।

অবশেষে ঠিক করলাম আসল যে কথাটা ছাড়া আমরা কেউ কাউকে বুঝতে পারব না, সেইটিই বলতে হবে। বললাম, 'শুনুন, নিকোলাই সের্গেয়িচ, আমার সঙ্গে কি একেবারে খোলাখুলি কথা কইতে পারবেন?'

'পারব,' জবাব দিলেন উনি দৃঢ়ভাবে।

'সোজাসুজি বলুন, ওঁকে চ্যালেঞ্জ করতে প্রবৃত্ত হচ্ছেন সে কি শুধুই প্রতিশোধ কামনার জন্যে, নাকি অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে আপনার?'

উনি বললেন, 'ভানিয়া, তুমি জানো আমার সঙ্গে কথাবার্তায় কতকগুলো প্রসঙ্গ আমি কাউকেই তুলতে দিই না। কিন্তু এইবারের মতো তার ব্যতিক্রম করব। কেননা, তুমি তোমার পরিষ্কার অন্তর্দৃষ্টি থেকে মুহূর্তেই ধরতে পেরেছ যে সে কথাটা এড়ানো চলবে না। ঠিকই, আমার আর একটা লক্ষ্য আছে। সে লক্ষ্য হল আমার মরতে-বসা মেয়েটিকে বাঁচানো, সাম্প্রতিক

ঘটনাচক্রের চাপে ও যে সর্বনাশের পথে চলেছে, তা থেকে ওকে উদ্ধার করা।'

'কিন্তু প্রশ্ন হল, ডুয়েল লড়ে ওকে বাঁচাবেন কী করে?'

'ওরা যেসব ব্যাপার এখন পাকিয়ে তুলছে, তাতে বাধা দিয়ে। শোনো, ভেবো না কোনো পিতৃস্নেহ বা ওই ধরনের দুর্বলতায় আমি চালিত। ও সব বাজে কথা। আমার মনের অন্তঃস্থল আমি মেলে ধরি না কারো কাছে। তুমিও তা জানো না। মেয়ে আমায় ছেড়ে গেছে, গৃহত্যাগ করে গেছে তার প্রেমিকের কাছে, তাই আমার হৃদয় থেকে তাকে আমি উপড়ে ফেলে দিয়েছি, সেই সন্ধ্যে থেকেই উপড়ে ফেলেছি চিরকালের মতো, মনে আছে তো? ওর ছবিটা নিয়ে আমায় কাঁদতে দেখেছিলে তুমি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমি ওকে ক্ষমা করতে চাই। তখনও তাকে ক্ষমা করি নি। কেঁদেছিলাম আমার হারানো সুখ, আমার বৃথা স্বপ্নের কথা ভেবে, এখন ও যা সেই ওর জন্যে নয়। হয়ত প্রায়ই কাঁদি তা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই, যেমন লজ্জা নেই যদি বলি, আগে আমি আমার মেয়েটিকে ভালোবাসতাম দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি। মনে হতে পারে আমার বর্তমান আচরণটা এর সঙ্গে মেলে না। তুমি বলতে পারো, তাই যদি হয়, যাকে আপনি আর আপনার মেয়ে বলে গণ্য না করেন তার ভবিষ্যত সম্পর্কে যদি আপনি সত্যিই উদাসীন, তাহলে ওখানে যা পাকানো হচ্ছে তাতে আপনি বাধা দিতে চান কেন? আমার জবাব, প্রথমত, নীচ কুটিল লোকটাকে জিতিয়ে দিতে চাই না, দ্বিতীয়ত, একান্ত সাধারণ মানবতাবোধের জন্যে। আমার মেয়ে ও আর নয় বটে, তাহলেও ও অসহায়, দুর্বল, প্রবঞ্চিত একটি প্রাণী, ওকে একেবারে ধ্বংস করে দেবার জন্যে প্রবঞ্চনা করা হচ্ছে আরো বেশি করে। সরাসরি এতে হস্তক্ষেপ করা আমার সম্ভব নয়, কিন্তু পরোক্ষে করতে পারি ডুয়েল লড়ে। আমি যদি মরি, কিংবা যদি রক্তপাত হয় আমার, তাহলে কি আর আমাদের বধ্যভূমি বা আমার মৃতদেহ মাড়িয়ে ও আমারই হত্যাকারীর পুত্রের সঙ্গে বেদীর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে সেই রাজকন্যার মতো, যে তার বাপের মৃতদেহের ওপর দিয়ে রথ চালিয়ে গিয়েছিল (মনে আছে, সেই বইটা, যেটা থেকে তুমি পড়তে শিখেছিলে?)। তাছাড়া, ডুয়েল পর্যন্ত গড়ালে প্রিন্সেরা নিজেরাই আর বিয়েটা চাইবে না। মোটের ওপর, এ বিয়ে হোক আমি চাই না, যথাসাধ্য তাতে বাধা দেব। এবার বুঝতে পারছ?'

'না, পারছি না। আপনি যদি নাতাশার মঙ্গলই চান, তাহলে তার বিয়েতে বাধ সাধতে চাইছেন কেন, একমাত্র এই বিয়ের ফলেই তো তার সুনাম ফিরতে পারে। সারা জীবন ওর পড়ে রয়েছে, সুনাম ওর তো দরকার।'

'বয়ে গেল উ'চু সমাজের যতকিছু মতামতে — এই কথা ওর ভাবা উচিত। ওর বোঝা উচিত যে ওর চরম লজ্জা এই বিয়েটাই, জঘন্য মানুষগুলোর সঙ্গে, এই তুচ্ছ সমাজটার সঙ্গে সম্পর্ক। একটা মহনীয় গর্ব — সেই হওয়া উচিত সমাজের প্রতি ওর জবাব। তাহলে আমিও হয়ত হাত বাড়িয়ে দেব ওর দিকে, দেখা যাবে, কার এত সাহস যে আমার মেয়েকে অপমান করে।'

এমন একটা মরীয়া আদর্শবাদে অবাক লাগল আমার। কিন্তু তখনই আন্দাজ করলাম, উনি আত্মস্থ নন, বলছেন উত্তেজনার বশে।

জবাব দিলাম, 'কথাটা খুবই আদর্শবাদীর মতো, তাই নিষ্ঠুর। ওর কাছ থেকে আপনি যতটা শক্তির দাবি করছেন সেটা সম্ভবত জন্ম থেকেই ও আপনার কাছে পায় নি। তাছাড়া, রাজবধূ হবে বলেই কি আর ও বিয়েতে সায় দিচ্ছে? ও যে ভালোবাসে, এ যে হৃদয়াবেগ, নিয়তি। শেষ কথা, সামাজিক মতামতের প্রতি ও ঘৃণা দেখাক, এই আপনি চাইছেন, কিন্তু আপনি নিজেই তো তার কাছে মাথা নোয়াচ্ছেন। রাজাবাহাদুর আপনাকে অপমান করেছে, তাঁর রাজবাড়ির সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করার একটা হীন চক্রান্ত করেছিলেন বলে জনসমক্ষে আপনার অপবাদ দিয়েছে, আর আপনিও ভাবছেন, ওদের পক্ষ থেকে বিয়ের এই আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবের পর ও যদি বিয়ে করতে অস্বীকার করে, তাহলে নাকি সেই আগের কুৎসাটার পুরোপুরি ও সুস্পষ্ট খণ্ডন হয়ে যায়। তাই তো আপনি চাইছেন। স্বয়ং প্রিন্সের মতামতটার কাছে আপনি মাথা নোয়াচ্ছেন, উনি নিজেই নিজের ভুল স্বীকার করুন, এই আপনার চেষ্টা। আপনার ঝোঁক, ও'কে বিদ্রুপের পাত্র করা, আপনি চান ও'র ওপর প্রতিশোধ নিতে, আর সেজন্যে আপনি বিসর্জন দিচ্ছেন মেয়ের সুখ। এটা স্বার্থপরতা নয়?'

ভুরু কুঞ্চিত করে বৃদ্ধ বসে রইলেন বিমর্ষ হয়ে। বহুক্ষণ কোনো কথা কইলেন না।

অবশেষে বললেন, 'আমার ওপর অবিচার করছ ভানিয়া,' চোখের পাতায় এক ফোঁটা জল চিকচিক করছিল তাঁর, 'দিব্যি দিয়ে বলছি, অবিচার করছ তুমি। কিন্তু ও কথা থাক! তোমার কাছে আমার বুকের ভেতরটা সব খুলে ধরতে তো পারি না।' উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটা নিতে নিতে বললেন, 'একটা

কথা শুধু বলব, তুমি আমার মেয়ের সুখের কথা তুললে। সে সুখে আমার একেবারে, আক্ষরিক অর্থে কোনো বিশ্বাস নেই। তাছাড়া, আমি হস্তক্ষেপ করি আর না করি, ও বিয়ে কখনো হবে না।'

'সে কী! কেন তা ভাবছেন? হয়ত-বা জানেন কিছু?' চেঁচিয়ে উঠলাম কৌতূহলে।

'না, বিশেষ কিছু একটা জানি তা নয়। কিন্তু ওই মুখপোড়া শেয়ালটা কখনো এমন কাণ্ড করতে রাজী হতে পারে না। যত বাজে কথা সব, শুধুই ফেরেববাজি। এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই, আর দেখে নিয়ো, শেষ পর্যন্ত তাই-ই হবে। আর দ্বিতীয়ত, এ বিয়ে যদি হয়ই, তাহলে সেটা হতে পারে শুধু যদি ঐ পাষণ্ডটার কোনো একটা বিশেষ, গোপন, স্বার্থ সাধন হয় তাতে, — সে স্বার্থটা যে কী তা আমি আদৌ বুঝতে পারছি না, কিন্তু নিজেই ভেবে দ্যাখো, নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো, সে বিয়েতে ও সুখী হবে কি? অনুযোগ আর অপমান, নিতান্ত একটা বালকের বান্ধবী, ইতিমধ্যেই তো ওর প্রেম তার কাছে বোঝা বলে মনে হচ্ছে, বিয়ে করা মাত্রই ওকে আর সম্মান করবে না, অপমান-হেনস্থা করতে শুরু করবে; নাতাশার প্রেমের আবেগ যত বাড়বে তত ওর কমবে; ঈর্ষা, যন্ত্রণা, নরক, বিবাহবিচ্ছেদ, এমন কি পাপকর্ম পর্যন্ত হয়ত গড়াবে... না, ভানিয়া, তোমরা যদি এরই আয়োজনে লেগে থাকো, তুমি আবার এতে সাহায্য করছ, তাহলে সাবধান করে দিচ্ছি, ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করবে, কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাবে তখন। চললাম।'

ওঁকে থামালাম আমি।

'শুনুন নিকোলাই সের্গেয়িচ, একটু না হয় অপেক্ষা করে দেখা যাক। নিশ্চিন্ত থাকুন, শুধু যে একজোড়া চোখ ব্যাপারটায় নজর রাখছে তা নয়। হয়ত আপনা থেকেই এর সবচেয়ে ভালো একটা মীমাংসা হয়ে যাবে, এই ডুয়েলটার মতো কোনো জোর-জবরদস্তি বা কৃত্রিম সমাধানের প্রয়োজন হবে না। সময়েই সব মীমাংসা হয়ে যায়। আর শেষ কথা, আপনাকে বলাই উচিত যে, আপনার সমস্ত পরিকল্পনাটাই একান্ত অবাস্তব। মুহূর্তের জন্যেও কি ভাবতে পারেন, প্রিন্স ভালকোভস্কি আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে?'

'গ্রহণ করবে না মানে? বলছ কী, চৈতন্য রেখে কথা বলো!'

'আমি একেবারে শপথ করে বলছি, গ্রহণ করবে না। বিশ্বাস করুন, খুবই সন্তোষজনক ওজর খুঁজে নেবেই। আর তা করবে ভারি একটা পণ্ডিতী গাম্ভীর্যের সঙ্গে আর ওদিকে আপনি শুধু উপহাসের পাত্র হয়ে দাঁড়াবেন...'

'মাপ করো, ভায়া, মাপ করো, তুমি আমায় একেবারে থ করে দিলে হে! সত্যি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে না মানে? না, ভানিয়া, তুমি নেহাৎই এক কবি; একেবারে খাঁটি কবি! আমার সঙ্গে ডুয়েল লড়া ওর পক্ষে অশোভন, তাই ভাবছ কি? আমি ওর চেয়ে কিসে কম? বৃদ্ধ আমি, অপমানিত পিতা। তুমিও একজন রুশ সাহিত্যিক সুতরাং সম্মানীয় ব্যক্তি — তুমি সেকেন্ড হচ্ছ... এবং... এবং... আমি বুঝতে পারছি না আর কী তুমি চাও?..'

'আপনি দেখে নেবেন। এমন সব অজুহাত ও হাজির করবে যে আপনিই প্রথমে বুঝবেন, ওর সঙ্গে লড়া আপনার পক্ষে একান্ত অসম্ভব।'

'হুম্... বেশ ভায়া, তোমার কথাই থাক। আমি অপেক্ষা করেই দেখব অবিশ্যি কিছু কাল পর্যন্ত। দেখা যাক, সময়ে কী কাজ দেয়। কিন্তু একটা কথা দাও ভায়া, আমাদের এ আলাপের কথা তুমি ওখানে কি আন্না আন্দ্রেয়েভনার কাছে বলবে না।'

'কথা দিচ্ছি।'

'আর একটা কথা ভানিয়া, এ নিয়ে আর কখনো আমার সঙ্গে কোনো কথা তুলবে না, এইটুকু কৃপা করো।'

'বেশ, কথা দিচ্ছি।'

'আর শেষ অনুরোধ, আমাদের ওখানে তোমার হয়ত একঘেয়ে লাগে জানি, তবু বাপু, পারলে আরো ঘন ঘন এসো। বেচারী আন্না আন্দ্রেয়েভনা তোমায় খুব পছন্দ করেন... আর... আর... মানে, তুমি না থাকলে ওঁর ভারি খারাপ লাগে... বুঝতে পারছ তো?'

উনি সজোরে চাপ দিলেন আমার হাতে। সর্বান্তঃকরণে প্রতিশ্রুতি দিলাম আমি।

'এবার শেষ কথা ভানিয়া, বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। তোমার কি টাকা আছে?'

'টাকা?' জিজ্ঞেস করলাম অবাক হয়ে।

'হ্যাঁ।' (বৃদ্ধ লাল হয়ে চোখ নামালেন।) 'তোমার বাসাখানার দিকে... তোমার অবস্থাটা দেখছিলাম হে... ভাবছিলাম তোমার ওপর কিছু একটা আচমকা খরচা এসে চাপতে পারে, (ঠিক এখনই হয়ত তা ঘটতে পারে)... তাই এই নাও হে, এই দেড়শ'টা রুবল, প্রথম কিস্তি হিশেবে...'

'দেড়শ', তাও প্রথম কিস্তি হিশেবে, যখন নিজেই, আপনি মোকদ্দমাটায় হেরেছেন!'

'ভানিয়া, দেখছি তুমি আমায় মোটেই বোঝো নি! হঠাৎ কিছু একটা জরুরী প্রয়োজন হতে পারে তো। একটু ভেবে দেখো। টাকা থাকলে মাঝে মাঝে একটু স্বাধীন হয়ে দাঁড়ানো যায়, স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। হয়ত এখন তোমার দরকার নেই, কিন্তু ভবিষ্যতে লাগবে না কি? মোটের ওপর টাকাটা আমি রেখেই যাচ্ছি। এর বেশি আর জোগাড় করতে পারলাম না। খরচ না করলে আমায় না হয় ফেরত দিয়ে দেবে। এখন আসি। ঈস্, কী রকম ফ্যাকাশে হয়ে গেছ তুমি! রীতিমতো অসুস্থই...'

আপত্তি না করে টাকাটা আমি নিলাম। কী উদ্দেশ্যে ওটা দিয়ে গেলেন, তা খুব পরিষ্কার।

বললাম, 'দাঁড়িয়ে থাকতেও ঠিক পারছি না।'

'এসব তাচ্ছিল্য করো না হে ভানিয়া, তাচ্ছিল্য করো না। আজ আর বেরিও না কোথাও। আন্না আন্দ্রেয়েভনাকে বলব তোমার শরীরের অবস্থার কথা। ডাক্তার ডাকব নাকি? কাল এসে দেখে যাব কেমন থাকো। অন্তত, পাজোড়া যদি চালু থাকে, তাহলে যথাসাধ্য চেষ্টা করব আসতে। এখন তুমি বরং শুয়ে পড়ো... আচ্ছা, তাহলে আসি। আসি খুকি; দ্যাখো, আবার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে মেয়েটা। শোনো ভানিয়া, আরো পাঁচ রুবল দিচ্ছি, ঐ মেয়েটির জন্যে। আমি দিয়েছি বলবে না কিন্তু। ওর জন্যে খরচ করবে আর কি... মানে, জুতো কি অন্তর্বাস... কত কী দরকার হয় বলা তো যায় না। তাহলে আসি ভায়া...'

ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম ওঁকে। জমাদারকে বলতে হল কিছু খাবার কিনে আনার জন্যে। এলেনার তখনো খাওয়া হয় নি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ফিরে আসতেই কিন্তু ভীষণ মাথা ঘুরতে লাগল, পড়ে গেলাম ঘরের মাঝখানটাতে। এলেনার চিৎকারটা কেবল মনে আছে। দু'হাত বাড়িয়ে ও ছুটে এসেছিল আমায় ধরতে। এই শেষ মুহূর্তটাই স্মৃতিতে রয়ে গেছে।

যখন জ্ঞান হল দেখলাম বিছানায় শুয়ে আছি। পরে এলেনা বলে যে, জমাদার আমাদের খাবার নিয়ে এসেছিল, তার সাহায্যে ধরাধরি করে আমায় সোফায় নিয়ে আসে। কয়েকবার জেগে জেগে উঠছিলাম। প্রত্যেকবার দেখেছি

এলেনার মমতাভরা উদ্বিগ্ন ছোট্ট মুখখানি আমার ওপর ঝুঁকে আছে। কিন্তু মনে পড়ে যেন তা স্বপ্ন, যেন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখেছি; বেচারী মেয়েটার মিষ্টি মুখখানা আমার অচৈতন্যের মধ্যে থেকে থেকে ঝলক দিয়েছে যেন একটা ছায়া, একটা ছবির মতো। ও আমায় পান করতে দিচ্ছিল, বিছানাটা ঠিকঠাক করে দিচ্ছিল, অথবা বিষণ্ণ সশঙ্ক দৃষ্টি মেলে বসে থাকছিল আমার সামনে, চুলে আঙুল বুলাচ্ছিল। মুখের ওপর একবার ওর একটা নরম চুমুর কথাও মনে পড়ে। আর একবার রাত্রে হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে সোফার কাছে টেনে আনা টেবিলের ওপর যে ধোঁয়ানো মোমবাতিটা রাখা হয়েছিল তার আলোয় দেখি তপ্ত গালে রাত রেখে ভীরুর মতো ঘুমুচ্ছে এলেনা, মাথাটা আমার বালিশের ওপর, বিবর্ণ ঠোঁটদুটো একটু স্ফুরিত। তবে ভালো জ্ঞান হল কেবল পরদিন ভোরে। বাতিটা পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। ভোরের উজ্জ্বল গোলাপী কিরণের খেলা শুরু হয়েছে দেয়ালের ওপর। এলেনা টেবিলের কাছে চেয়ারে বসে অঘোরে ঘুমুচ্ছে, টেবিলে বাঁ হাতের ওপর রেখেছে ক্লান্ত মাথাটা। মনে আছে বহুক্ষণ ধরে ওর ছেলেমানুষী মুখখানার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, ঘুমের মধ্যেও সে মুখ একটা বিষাদে ভরা যা কেমন যেন ছেলেমানুষের মতো নয়, কেমন একটা অদ্ভুত রুগ্ন সৌন্দর্য তাতে। বিবর্ণ মুখ, শীর্ণ গালের ওপর নেমে এসেছে দীর্ঘ আঁখিপল্লব, মুখ ঘিরে আলকাতরার মতো কালো চুল, হেলাফেলায় বাঁধা ঘন খোঁপা ভারি হয়ে ঢলে পড়েছে একপাশে। অন্য হাতখানা আমার বালিশের ওপর। ছোট্ট রোগা হাতখানায় একটি চুমু দিলাম আস্তে করে। ওতে কিন্তু বেচারীর ঘুম ভাঙল না, শুধু একটা অস্পষ্ট হাসি যেন ছুঁয়ে গেল ওর বিবর্ণ ঠোঁটদুটো। ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আস্তে করে ঢলে পড়লাম আরোগ্যের একটা শান্ত ঘুমে। এবার ঘুমোলাম প্রায় দুপুর পর্যন্ত। জেগে প্রায় সুস্থই বোধ হল। সারা গায়ে খানিকটা দুর্বলতা আর ভার-ভার অনুভূতিই কেবল সাম্প্রতিক অসুখটার সাক্ষ্য হয়ে রইল। আগেও এমন ক্ষিপ্র স্নায়বিক প্রকোপ আমার হয়েছে। জিনিসটা ভালোই চিনি। সাধারণত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অসুখটা একেবারে কেটে যেত, কিন্তু এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তার তীব্র কঠোর প্রকোপে বাধা হত না।

তখন প্রায় দুপুর। প্রথমেই যা চোখে পড়ল, সেটা আগের দিনে কেনা পর্দাটা, কোণের দিকে একটা দড়ি দিয়ে টাঙানো। ঘরখানার মধ্যে এলেনা নিজের জন্যে একটা আলাদা কোণ বানিয়ে নিয়েছে। চুল্লির সামনে বসে বসে

ও কেটলিতে জল গরম করছে। আমি জেগেছি দেখে ও খুশি হয়ে হেসে তক্ষুনি এসে দাঁড়াল আমার কাছে।

ওর হাতখানা নিয়ে বললাম, 'লক্ষ্মী মেয়ে তুমি, সারাটা রাত আমার দেখাশোনা করেছ, ভাবি নি তোমার এত দয়া-মায়া।'

'কেমন করে জানলেন আমি দেখাশোনা করেছি? সারা রাতই হয়ত ঘুমিয়েছি।' ও বললে সহৃদয় সলজ্জ চাতুরীর সঙ্গে তাকিয়ে, এবং বলেই নিজের কথাতেই লাল হয়ে উঠল সংকোচে।

'কয়েকবার ঘুম ভেঙে সব দেখেছি যে। ঘুমিয়ে পড়েছিলে শুধু ভোরের দিকে...'

বাধা দিয়ে ও বললে, 'চা খাবেন একটু?' এ আলাপ চালানো যেন কঠিন হয়ে পড়ছিল ওর, আত্মপ্রশংসা শুনলে কঠোর নিষ্ঠাবান সততাশ্রয়ী লোকেদের যা হয়।

বললাম, 'খাব, কিন্তু কাল দুপুরে তুমি খেয়েছিলে কিছু?'

'দুপুরে খাওয়া খাই নি, রাতে খেয়েছি। জমাদার নিয়ে এসেছিল। আপনি কিন্তু কথা কইবেন না। চুপ করে শুয়ে থাকুন। এখনো সুস্থ হয়ে ওঠেন নি আপনি।' বলে আমার জন্যে চা এনে দিয়ে আমার বিছানার ওপর ও বসল।

'কোথায় শুয়ে থাকা! অবিশ্যি শুয়ে থাকব সন্ধ্যে পর্যন্ত, তারপর বেরুতে হবে। বেরুতেই হবে এলেনা, লক্ষ্মী মেয়ে।'

'ঈস্, বেরুতেই হবে ও'কে? কোথায় যাবেন শুনি? কাল যে ভদ্রলোক এসেছিলেন ওঁর কাছে নয় তো?'

'না, ওঁর কাছে নয়।'

'বাঁচলাম। উনিই তো কালকে আপনার অসুখ বাধিয়ে দিয়ে গেছেন। তাহলে ওঁর মেয়ের কাছে?'

'ওঁর মেয়ের কথা তুমি কী করে জানলে?'

'কাল সবই আমি শুনেছি।' মাথা নিচু করে ও বললে। মুখখানা আঁধার হয়ে এসেছে। ভুরু কোঁচকানো।

পরে বললে, 'উনি খারাপ লোক।'

'তুমি ওঁকে চেন নাকি? আসলে ভারি ভালো লোক উনি।'

'না, না, উনি খারাপ লোক, আমি শুনেছি।' ও বললে উদ্দীপ্ত হয়ে।

'কেন, কী শুনেছ তুমি?'

'ওঁর মেয়েকে উনি ক্ষমা করতে চান না...'

'তবু ভালোবাসেন মেয়েকে। মেয়ে অন্যায় করেছে ওঁর ওপরে, উনি কিন্তু মেয়ের জন্যে দুশ্চিন্তা করছেন, কষ্ট পাচ্ছেন।'

'তাহলে ক্ষমা করছেন না কেন? এখন ক্ষমা করতে এলে মেয়ে যদি আর বাপের কাছে না ফেরে তবেই ঠিক হয়।'

'সে কী? কেন?'

'কারণ উনি মেয়ের ভালোবাসার যোগ্য নন।' ও বললে উত্তেজিতভাবে, 'চিরকালের জন্যে মেয়েটা ওঁকে ছেড়ে চলে যাক, বরং ভিক্ষে করে চালাক, বাপ দেখুক মেয়ে ভিক্ষে করছে, কষ্ট পাচ্ছে।'

চোখ ওর জ্বলছিল, গরম হয়ে উঠেছিল গালদুটো। মনে মনে ভাবলাম, এ কথাগুলো ও নিশ্চয় খামোকা বলছে না।

একটু থেমে ও আবার জিজ্ঞেস করলে, 'ওঁরই বাড়িতে আপনি আমায় পাঠাতে চেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, এলেনা।'

'না, আমি বরং চাকরানীর কাজ নেব।'

'কী যে বিচ্ছিরি সব কথা বলছ এলেনা। বাজে বকছ! কে তোমায় চাকরানী রাখবে?'

'যে কোনো চাষার ঘরে।' অধৈর্যভাবে ও বললে, আরো নিচু করে রইল মাথা। ভারি উগ্র মেজাজ ওর।

মুচকি হেসে বললাম, 'তোমার মতো এক চাকরানীর কোনো দরকার নেই চাষার।'

'বাবুদের বাড়িতে তাহলে।'

'তোমার মেজাজ নিয়ে বাবুদের বাড়িতে?'

'হ্যাঁ, আমার মতো মেজাজেই।' যতই ও চটছিল, ততই ওর জবাব হচ্ছিল দমকা মারা।

'তুমি সইতে পারবে না।'

'পারব। ওরা বকাঝকা করবে, আমি ইচ্ছে করে মুখ বুজে থাকব। ওরা মারবে, কিন্তু আমি মুখ বুঝেই থাকব। মুখ বুজে থাকব। যতই মারুক — কিছুতেই কাঁদব না। কাঁদছি না দেখে আক্রোশে ওরাই জ্বলে মরবে।'

'কী বলছ এলেনা। এত জ্বলুনি তোমার, এত অহঙ্কার। তার মানে কত কষ্টই না পেয়েছ তুমি...'

উঠে গেলাম আমার বড়ো টেবিলটার কাছে। এলেনা বসেই রইল সোফার ওপর, মেঝের দিকে চিন্তিতের মতো তাকিয়ে সোফার কোনা খ্ুঁটছিল।

চুপ করে ছিল ও। ভাবলাম, আমার কথায় রাগ করল নাকি?

টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে যন্ত্রের মতো বইটা খ্ুললাম। আগের দিন এটা নিয়ে এসেছিলাম সংকলনের জন্যে, তারপর ধীরে ধীরে পড়ার মধ্যে ডুবে গেলাম। প্রায়ই আমার এই হয়। কিছ্ু একটা দেখবার জন্যে কোনো বই হয়ত খ্ুলেছি, তারপর এমনভাবে পড়তে শ্ুর্ু করে দিই যে সবকিছ্ু ভুলে যাই।

আস্তে করে টেবিলের কাছে এসে ভীর্ু হেসে এলেনা জিজ্ঞেস করলে 'কী লেখেন সব সময়?'

'নানা জিনিস, এলেনা, লিখে টাকা পাই।'

'দরখাস্ত লেখেন?'

'না, দরখাস্ত নয়।'

যা পারলাম ওকে ব্ুঝিয়ে বললাম যে নানা লোকজন সম্পর্কে নানা রকম কাহিনী লিখি। তা নিয়ে হয় বই, তাকে বলে উপন্যাস। ভারি কৌত্ূহল নিয়ে ও শ্ুনলে।

'সব সত্যি কথা লেখেন?'

'না, মন থেকে বানাই।'

'যা সত্যি নয় তা লেখেন কেন তাহলে?'

'পড়ে দেখলেই ব্ুঝবে, যেমন এই যে বইখানা, তুমি তো আগেই এটা দেখেছ, পড়তে পারো তো?'

'পারি।'

'তাহলে পড়ে দ্যাখো। বইটা আমার লেখা।'

'আপনার? হ্যাঁ, পড়ব...'

আমায় কী একটা ও বলতে চাইছিল খ্ুব, কিন্তু বোঝা গেল তা বলা কঠিন হচ্ছে ওর পক্ষে। ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ও। ওর প্রশ্নের পেছনে কিছ্ু একটা যেন ল্ুকিয়ে ছিল।

অবশেষে বললে, 'অনেক টাকা দেয় এর জন্যে?'

'মানে যখন যেমন। কখনো অনেক, কখনো কিছ্ুই না, কেননা লেখাটা এগোয় না তখন। কাজটা কঠিন এলেনা।'

'আপনি তাহলে বড়োলোক নন?'

'উ'হ্ু, বড়োলোক নই।'

'তাহলে আমি কাজ করে আপনার সাহায্য করব...'

ত্বরিত দৃষ্টি হেনে ও লাল হয়ে উঠল, চোখ নামিয়ে নিলে। তারপর আমার দিকে দু'পা এগিয়ে এসে হঠাৎ দুহাতে আমায় জড়িয়ে ধরে মুখ গুঁজলে আমার বুকের মধ্যে।

অবাক হয়ে তাকালাম ওর দিকে।

বললে, 'আমি আপনাকে ভালোবাসি... অহঙ্কারী মেয়ে আমি নই। কাল বলছিলেন আমি অহঙ্কারী। না, না... মোটেই তা নই... আপনাকে ভালোবাসি আমি। একলা আপনিই আমায় ভালোবাসেন...'

চোখের জলে কথা আটকে গেল ওর। পরমুহূর্তেই ঠিক আগের দিনের মতো তীব্র বেগে বেরিয়ে এল তা।

আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ও চুমু খেতে লাগল আমার হাতে পায়ে...

বারবার করে বলতে লাগল, 'আপনি আমায় ভালোবাসেন!.. শুধু আপনি, শুধু আপনিই!..'

দমকে দমকে ও হাত দিয়ে চেপে ধরছিল আমার হাঁটু। এতক্ষণ ধরে যে হৃদয়াবেগটা ও আটকে রেখেছিল হঠাৎ তা বেরিয়ে এল বাঁধ ভেঙে। বুঝতে পারলাম, তার হৃদয়ের এই জেদটাকে, শুচিতার সঙ্গে একটা সময় পর্যন্ত নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছে প্রাণপণে, আর যত বেড়েছে নিজেকে উজাড় করার, আত্মপ্রকাশের তাগিদ, সে জেদও হয়ে উঠছে তত কঠোর, তত একরোখা, কিন্তু সবই সেই অনিবার্য বিদারণ পর্যন্ত যখন সহসা আত্মবিস্মৃত হয়ে প্রেম আর কৃতজ্ঞতার চাহিদার কাছে, সোহাগ আর অশ্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করে গোটা সত্তাটা।

প্রচণ্ড ফোঁপাতে লাগল ও, হয়ে উঠল হিস্টিরিয়ার মতো। জোর করে ওর বাহুবন্ধন খসাতে হল আমাকে। তুলে ধরে ওকে নিয়ে গেলাম সোফায়। অনেকক্ষণ ধরে ও ফুঁপিয়েই চলল, মুখ গুঁজে রইল বালিশে, যেন লজ্জা হচ্ছিল আমার দিকে চাইতে। কিন্তু নিজের ছোট্ট হাত দিয়ে আমার হাতখানা ও সজোরে আঁকড়েই রইল, চেপে ধরে রাখলে ওর বুকের কাছে।

একটু একটু করে শান্ত হয়ে এল ও, কিন্তু তখনো মুখ তুললে না আমার দিকে। বার দুয়েক ওর চকিত দৃষ্টি এসে পড়েছিল আমার মুখের ওপর। ভারি একটা কোমলতা সে দৃষ্টিতে, কেমন একটা ভীরুভীরু, ফের লুকিয়ে পড়া হৃদয়াবেগ। অবশেষে লাল হয়ে উঠে ও হাসল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'একটু ভালো লাগছে এখন? ভারি ভাবাকুল তুমি এলেনা, ছোট্ট পাগলী আমার।'

'না না, এলেনা নয়...' ও বললে ফিসফিস করে, মুখটা তখনো লুকিয়ে রেখেছে আমার কাছ থেকে।

'এলেনা নয় মানে?'

'নেল্লী।'

'নেল্লী? ঠিক, নেল্লীই বা নয় কেন? তা এটি বেশ সুন্দর নাম। তোমার যখন ইচ্ছে তখন ওই নামেই ডাকব।'

'মা আমায় নেল্লী বলেই ডাকত... ও ছাড়া আর কেউ আমায় ও নামে কখনো ডাকে নি... মা ছাড়া আর কেউ এ নামে ডাকুক তা আমি নিজেই চাই নি। কিন্তু আপনি ডাকুন, আমি চাই আপনি ডাকবেন... চিরকাল আপনাকে আমি ভালোবাসব, চিরকাল...'

ভাবলাম, আহা কী স্নেহাতুর গরবী একটি মন; আমার কাছেও সে... নেল্লী হয়ে উঠবে, তার জন্যে আমায় কী প্রতীক্ষাই না করতে হয়েছে। কিন্তু এখন জেনে গেছি যে ওর হৃদয় মন আমার অনুরাগী হয়ে রইল চিরকাল।

ও একটু শান্ত হয়ে আসতেই বললাম, 'শোনো নেল্লী, বলছিলে মা ছাড়া আর কেউ তোমায় ভালোবাসে নি। কিন্তু তোমার দাদুও কি তোমায় সত্যিই ভালোবাসতেন না?'

'না, ভালোবাসতেন না...'

'কিন্তু তুমি তো কেঁদেছিলে ওঁর জন্যে। মনে আছে, এইখানে, ওই সিঁড়ির ওপর?'

একটু ভাবল ও।

'না, আমায় ভালোবাসতেন না... খারাপ লোক ছিলেন দাদু।' প্রায় ব্যথার মতো একটা আবেগ জেগে উঠল ওর মুখে।

'ওঁকে যে দায়ী করাই চলে না, নেল্লী। বুদ্ধিশুদ্ধি ওঁর প্রায় কিছু ছিল না আর। মরলেনও প্রায় পাগলের মতোই। তোমায় তো বলেছি কী করে মারা গিয়েছিলেন, তাই না?'

'বলেছেন। কিন্তু অমন ভুলো মন ওঁর হয়েছিল শুধু শেষের মাসটায়। সারা দিন এখানে বসে থাকতেন, আমি যদি না আসতাম তাহলে না খেয়ে দেয়ে অমনি করেই বসে থাকতেন দু'তিন দিন ধরে। আগে অনেক সুস্থ ছিলেন।'

'আগে কখন?'

'মা যখন মারা যান নি।'

'তাহলে তুমিই ওঁর খাবার নিয়ে আসতে নেল্লী?'

'আমিও আনতাম।'

'কোত্থেকে আনতে? বুবনভার কাছ থেকে?'

'না, বুবনভার কাছ থেকে আমি কখনো কিছু নিই নি,' ও বললে জেদের সঙ্গে, কেমন কাঁপা কাঁপা গলায়।

'তাহলে কোত্থেকে আনতে? তোমার তো কিছুই ছিল না।'

সাংঘাতিক বিবর্ণ হয়ে গিয়ে কোনো জবাব দিলে না নেল্লী। তারপর অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইল আমার দিকে।

'রাস্তায় গিয়ে ভিক্ষে করতাম... পাঁচ কোপেকের মতো হলেই ওঁর জন্যে নস্যি আর রুটি কিনে আনতাম...'

'ভিক্ষে করতে দিতেন তোমায় নেল্লী, কী বলছ!'

'প্রথম প্রথম ওঁকে না বলেই করতাম। উনি যখন জানতে পারলেন তখন নিজেই আমায় পাঠাতেন ভিক্ষে করার জন্যে। সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে আমি রাস্তার লোকেদের কাছে ভিক্ষে করতাম, আর উনি সাঁকোর কাছে পায়চারি করতেন; আমায় কেউ কিছু দিয়েছে দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে কেড়ে নিতেন, আমি যেন ওঁরই জন্যে ভিক্ষে করছি না, বুঝি আমি লুকিয়ে রাখব।'

এ কথা বলার সময় কেমন একটা তিক্ত জ্বালাভরা হাসি ফুটল ওর মুখে।

'এ রকম হয়েছিল মা মারা যাবার পরে। তখন ওঁর প্রায় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

'তোমার মাকে তবে উনি খুবই ভালোবাসতেন। কিন্তু একসঙ্গে থাকতেন না কেন তাহলে?'

'না, ভালোবাসতেন না... খারাপ লোক ছিলেন উনি, মাকে ক্ষমা করেন নি... কালকের ওই বুড়োটার মতো।' ও বললে আস্তে করে, প্রায় ফিসফিসিয়ে, ক্রমাগত ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছিল সে।

আমি চমকে উঠলাম। পুরো একটা উপন্যাস যেন আমার কল্পনায় ভেসে উঠল: কফিনওয়ালার তল-কুঠরিতে হতভাগিনী ওই নারীর মৃত্যু, তার অনাথিনী মেয়ে মাঝে মাঝে আসছে দাদুর কাছে — মাকে যে অভিশাপ দিয়েছে; তারপর কুকুরটি মারা যাবার পর অদ্ভুত পাগলাটে সেই বৃদ্ধের মরণ এক মিষ্টিখানায়!..

কী একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় হেসে হঠাৎ নেল্লী বললে, 'আজর্কা কিন্তু মায়ের কুকুর। আগে দাদু মাকে খুব ভালোবাসতেন; মা যখন ওঁর কাছ থেকে চলে যায় তখন আজর্কা থেকে যায় ওঁর কাছে। সেই জন্যেই উনি অত ভালোবাসতেন আজর্কাকে... মাকে ক্ষমা করেন নি, অথচ কুকুরটা মারা যেতেই নিজেও মরে গেলেন।' নেল্লী বললে কঠোর স্বরে, মুখের সে হাসিটা মিলিয়ে গিয়েছিল।

একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম, 'আগে কী করতেন উনি নেল্লী?'

নেল্লী বললে, 'বড়ো লোক ছিলেন আগে... জানি না কী করতেন, কিসের যেন কারখানা ছিল ও'র... মা তাই বলত। প্রথম প্রথম আমায় ছোটো মনে করে সব কথা জানাত না। কেবলি চুমু খেয়ে বলত, "সবই জানতে পারবি, সময় হলে সবই শুনবি রে দুঃখী অভাগা মেয়ে আমার।" সব সময়েই আমায় মা বলত অভাগা দুঃখী। মাঝে মাঝে রাত্রে — ভাবত বুঝি আমি ঘুমিয়ে আছি, কিন্তু ইচ্ছে করেই আমি ঘুমের ভান করে থাকতাম, তখন আমায় দেখে দেখে কেবলি কাঁদত, চুমু খেয়ে খেয়ে বলত, "দুঃখী অভাগা মেয়ে রে!"'

'মা তোমার মারা গেলেন কিসে?'

'ক্ষয় রোগে, ছয় সপ্তাহ আগে।'

'তোমার দাদু যখন ধনী ছিলেন তখনকার কথা মনে পড়ে তোমার?'

'তখন তো আমি জন্মাই নি। আমার জন্মের আগেই মা দাদুর কাছ থেকে চলে গিয়েছিল।'

'কার সঙ্গে গিয়েছিলেন?'

যেন নিজের মনে ভাবতে ভাবতে আস্তে করে নেল্লী বললে, 'জানি না, বিদেশে চলে গিয়েছিল মা, আমি জন্মেছি বিদেশেই।'

'বিদেশে? কোথায়?'

'সুইজারল্যান্ডে। সব জায়গাতেই আমি গেছি। ইতালি আর প্যারিসেও আমি ছিলাম।'

অবাক লাগল।

'সে সব কথা মনে আছে তোমার, নেল্লী?'

'অনেকখানিই মনে আছে।'

'কিন্তু এত ভালো রুশ জানলে কী করে, নেল্লী?'

'সেখানেই যে মা আমায় রুশ শিখিয়েছিল। মা ছিল রুশী, কেননা দিদিমাও

ছিলেন রুশী। দাদু ছিলেন ইংরেজ, কিন্তু দাদুও ঠিক রুশীর মতোই হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর দেড় বছর আগে ফিরে আসার পর ভালো করে শিখেছি। মার তখনি অসুখ। ক্রমেই গরিব হয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। অনবরত মা কাঁদত। প্রথমে মা এই পিটার্সবুর্গে অনেক খোঁজ করে দাদুর, সব সময় কেবলি কাঁদত আর বলত, দাদুর ওপর সে বড়ো অন্যায় করেছে... কী সাংঘাতিক না কাঁদত! পরে যখন শুনল, দাদু গরিব হয়ে গেছেন, তখন আরো বেশি করে কাঁদতে লাগল। প্রায়ই চিঠি লিখত ওঁকে, কিন্তু কখনো দাদু উত্তর দিতেন না।'

'তোমার মা এখানে ফিরে এলেন কেন? বাবাকে দেখার জন্যেই শুধু?'

'জানি না। কিন্তু বিদেশে ভারি ভালো ছিলাম আমরা।' নেল্লীর চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল, 'আমায় নিয়ে মা থাকত একলা। একজন বন্ধু ছিলেন মায়ের — আপনার মতো ভালোমানুষ... মাকে উনি এখানে থাকতেই চিনতেন। কিন্তু উনি ওখানেই মারা গেলেন, মা-ও ফিরে এল...'

'তার মানে ওঁর সঙ্গেই তোমার মা চলে গিয়েছিলেন তোমার দাদুকে ছেড়ে?'

'না, ওঁর সঙ্গে নয়। মা গিয়েছিল অন্য একজনের সঙ্গে, সে মাকে ছেড়ে চলে যায়...'

'কে সে, নেল্লী?'

নেল্লী আমার দিকে তাকালে, কিন্তু জবাব দিলে না। বোঝা যায় ও জানে কার সঙ্গে চলে গিয়েছিল এবং সম্ভবত কে ওর বাবা, কিন্তু এমনকি আমার কাছেও তার নাম করতে ওর কষ্ট হচ্ছিল...

প্রশ্ন করে ওকে ব্যথা দিতে চাইলাম না আমি। অদ্ভুত এক স্বভাব ওর, বেসামাল, আবেগপ্রবণ অথচ মনের দমকটা চেপে রাখতে চায়, দরদী, কিন্তু অহংকার আর অনধিগম্যতায় আত্মবদ্ধ। আমায় সে ভালোবাসে সমস্ত হৃদয় দিয়ে উজ্জ্বল অনাবিল ভালোবাসায়, প্রায় ওর মৃত মায়ের মতো, যার কথা স্মরণ করতেও যন্ত্রণা হয়, তাহলেও, যতটা সময় ওকে আমি চিনি, তার মধ্যে কদাচিৎ ও আমার কাছে মন খুলে ধরেছে, এবং এই দিনটি ছাড়া আমার কাছে তার অতীতের কথা বলার আকুলতা অনুভব করেছে কদাচিৎ। বরং উল্টো, আমার কাছ থেকে কঠোরভাবে নিজেকে লুকিয়ে রাখত। সেদিন কিন্তু কষ্ট আর ফোঁপানির দমকে দমকে, — কাহিনীতে বাধা হচ্ছিল তাতে, — কয়েক ঘণ্টা ধরে ও আমায় সে সবই বললে, যা যা ওর স্মৃতির মধ্যে সবচেয়ে

ওকে আলোড়িত করেছে, যন্ত্রণা দিয়েছে। ভয়াবহ সে কাহিনী আমি কখনো ভুলব না। কিন্তু তার প্রধান ইতিহাসটা এখনো ভবিষ্যতের গর্ভে...

সত্যিই এটা ভয়াবহ কাহিনী। এ এক পরিত্যক্তা নারীর কাহিনী, সুখ যার বিগত; রুগ্না, যন্ত্রণাতুর, সকলেই তাকে ছেড়ে গেছে, যে শেষ আপন মানুষটির ওপর তার ভরসা, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সেই পিতাও — মেয়ের কাছ থেকে এককালে আঘাত পেয়ে অসহ্য দুঃখে অপমানে সে পিতা উন্মাদ। এ এক হতাশ নারীর কাহিনী পিটার্সবুর্গের ঠাণ্ডা কর্দমাক্ত রাস্তায় রাস্তায় যে ঘুরে মরেছে, যাকে সে শিশু বলে গণ্য করে, ভিক্ষে করে ফিরেছে সেই ছোটো মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে। তারপর মাসের পর মাস সে নারী মৃত্যু শয্যায় পড়ে থেকেছে এক স্যাঁতসেঁতে ভূগর্ভের কুঠরিতে, আর তার বাপ তার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত মেয়েকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করার পর হঠাৎ সেই শেষ মুহূর্তে সচেতন হয়ে ছুটে এসেছে মেয়েকে ক্ষমা করবার জন্যে, আর যাকে সে দুনিয়ায় সব চাইতে ভালোবাসত, তার কাছে এসে দেখেছে শুধু এক শীতল শবদেহ। এ হল মানসিক বিকারগ্রস্ত ওই বৃদ্ধের সঙ্গে তার ছোটো নাতনীটির রহস্যময় প্রায় দুর্বোধ্য এক সম্পর্কের কাহিনী — ছেলেমানুষ হলেও সে মেয়ে তখনই তাকে বুঝতে পারছে, বুঝতে পারছে এমন অনেক জিনিস যা নিশ্চিন্ত মসৃণ জীবনের দীর্ঘ কালেও অনেকে শেখে না। এ এক বিষণ্ন কাহিনী, সেইসব বিষণ্ন, যন্ত্রণাকর কাহিনীর একটি যা ঘন ঘন, অলক্ষ্যে, প্রায় রহস্যে আবৃত হয়ে রূপ নেয় পিটার্সবুর্গের ভারাক্রান্ত আকাশের নিচে, বিরাট নগরীর অন্ধকার গোপন আনাচে-কানাচে জীবনের উত্তাল তরঙ্গ, — ভোঁতা অহমিকা, স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত, অন্ধকার ব্যভিচার, গোপন অপরাধের মধ্যে, অর্থহীন অস্বাভাবিক এক জীবনের এই গোটা নরকটার মাঝখানে...

কিন্তু সে কাহিনী বলা যাবে পরে...

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

গোধূলি ঘনিয়েছিল অনেকক্ষণ, সন্ধ্যে শুরু হল। কেবল তখনই বিষণ্ণ দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে বর্তমানের কথা মনে পড়ল।

বললাম, 'নেল্লী, তুমি অসুস্থ, ভারি বিচলিত হয়ে আছ এখন, কিন্তু এই অস্থিরতা আর চোখের জলের মধ্যেই তোমায় একলা রেখে যেতে হচ্ছে আমায়। লক্ষ্মী আমার, মাপ করো, শুধু জেনে রেখো, আরো একজন আছে, ভালোবাসার পাত্রী কিন্তু ক্ষমা পায় নি, অসুখী, অপমানিত সে, পরিত্যক্ত। আমার অপেক্ষা করছে সে। তাছাড়া তোমার কাহিনীর পর আমারও নিজেরই এমন মন কেমন করছে যে এক্ষুনি, এই মুহূর্তে ওকে না দেখলে সইতে পারব না...'

যা বলেছিলাম, জানি না সব ও বুঝেছিল কিনা। ওর কাহিনী আর আমার সাম্প্রতিক অসুখ, দুয়ের ফলেই আমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। তবু ছুটলাম নাতাশার ওখানে। দেরি হয়ে গিয়েছিল বেশ, যখন পৌঁছলাম তখন আটটা বেজে গেছে।

রাস্তা থেকে চোখে পড়েছিল নাতাশাদের বাড়ির ফটকটার কাছে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, মনে হল প্রিন্সের গাড়ি। ঢুকতে হয় আঙিনার দিক থেকে। সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করেই কানে এল এক তলা ওপরে কেউ যেন সন্তর্পণে হাতড়ে হাতড়ে উঠছে, স্পষ্টতই জায়গাটা তার ভালো চেনা নেই। মনে হল, নিশ্চয় প্রিন্স, কিন্তু অচিরেই সন্দেহ দেখা দিল। অচেনা ব্যক্তিটি সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে গজগজ করছে, গাল পাড়ছে সিঁড়িটাকে, যত ওপরে উঠছে ততই জোরে জোরে। সিঁড়িটা অবিশ্যি সংকীর্ণ, নোংরা, খাড়াই — কখনো আলো জ্বলে না সেখানে। কিন্তু তিনতলা থেকে যে গালাগালি শুরু হল সেটা কোনোক্রমেই প্রিন্সের বলে মনে করতে পারলাম না, ভদ্রলোক খিস্তি করছিলেন গাড়োয়ানের মতো। কিন্তু তিনতলায় আলো শুরু হল, নাতাশার দরজায়

জ্বলছে ছোট্ট একটি বাতি। অচেনা লোকটির নাগাল ধরলাম একেবারে দরজার কাছে গিয়ে, এবং কী অবাকই না হয়ে গেলাম যখন দেখলাম তিনি স্বয়ং প্রিন্স ভালকোভস্কি! আচমকা আমার সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে যাওয়ায় উনি ভারি বিরক্ত হয়েছেন বলে মনে হল। প্রথমটা আমায় চিনতে পারেন নি। কিন্তু হঠাৎ ওঁর মুখখানা সব বদলে গেল। আমার প্রতি আক্রোশ আর বিদ্বেষের প্রথম দৃষ্টিটা হঠাৎ পালটে গিয়ে হয়ে উঠল, অমায়িক, হাসিখুশি — অপরিসীম আনন্দে দুই হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে।

'আরে আপনি যে! আর একটু হলেই হাঁটু গেড়ে বসে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা শুরু করে দিতাম আর কি। কী রকম গাল পাড়ছিলাম শুনেছেন তো?'

হো-হো করে হাসলেন দিলখোলার মতো। কিন্তু হঠাৎ ওঁর মুখখানায় ফুটে উঠল একটা গুরুগম্ভীর উদ্বেগের ভাব।

মাথা নেড়ে বললেন, 'এমন একখানা জায়গায় নাতালিয়া নিকোলায়েভনাকে আলিওশা রেখেছে কী বলে? এই সব যাকে বলা হয় ছোটোখাটো জিনিস তা থেকেই লোককে বোঝা যায়। আলিওশার জন্যে ভয় হয় আমার। দয়ামায়া আছে, মনটা উঁচু, কিন্তু এই তো দেখুন! প্রেমে পাগল, কিন্তু যাকে ভালোবাসে তাকে রেখেছে কিনা এই খোঁয়াড়ে। শুনেছি নাকি, মাঝে মাঝে রুটিও জোটে না।' কথাটা বললেন ফিসফিস করে, ঘণ্টির হাতল খুঁজতে খুঁজতে, 'ছেলেটার ভবিষ্যত কী হবে, তার চেয়েও বড়ো কথা ওর স্ত্রী হলে আন্না নিকোলায়েভনার ভবিষ্যত কী হবে ভাবতে গেলে মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে আমার...'

নামটা উনি ভুল বললেন, কিন্তু দরজার ঘণ্টি খুঁজে না পেয়ে স্পষ্টতই যা বিরক্ত হয়ে ওঠায় এটা খেয়াল হয় নি ওঁর। তবে ঘণ্টি ছিলই না। দরজার হাতলটা টানলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিয়ে খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল মাভরা। ছোটো বারান্দাটা থেকে একটা পার্টিশন দিয়ে রান্নাঘরটা আলাদা করা। তার খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, কিছু কিছু তোড়জোড়ও চলেছে সেখানে — সবকিছুই দৈনন্দিনের চেয়ে একটু অন্যরকম, মেজে ঘষে সব পরিষ্কার করা; চুল্লি জ্বলছে, টেবিলের ওপর কী সব নতুন বাসন। বোঝা গেল, আমাদের জন্যে ওরা অপেক্ষা করছে। ব্যস্ত হয়ে মাভরা ওভারকোট খুলতে সাহায্য করলে আমাদের।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আলিওশা আছে এখানে?'

কেমন একটা গোপনীয়তার ভাব করে ফিসফিসিয়ে বললে, 'না, আসে নি।'

নাতাশার কাছে গেলাম আমরা। বিশেষ কিছু একটা আয়োজনের চিহ্ন নেই তার ঘরে। সবই আগের মতোই। তবে এমনিতেই ঘরখানা ওর সর্বদাই এত পরিষ্কার, আর মনোরম যে ঝাড়পুঁছের প্রয়োজন হয় নি। দরজায় দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলে নাতাশা। মুখের রুগ্ন শীর্ণতা আর অসম্ভব বিবর্ণতায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম আমি যদিও ওর মড়ার মতো গালে একটা ক্ষণিক বর্ণোচ্ছ্বাস দেখা গেল। চোখদুটো অসুস্থের মতো। নীরবে তাড়াতাড়ি করে ও হাত বাড়িয়ে দিলে প্রিন্সের দিকে, বোঝা গেল ব্যতিব্যস্ত এবং বিহ্বল হয়ে উঠেছে। আমার দিকে তাকালেও না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি।

বন্ধুর মতো হাসিখুশি হয়ে প্রিন্স বললেন, 'এই তো এসে গেলাম! ফিরেছি মাত্র ঘণ্টা কয়েক আগে। এ ক'দিন কেবলি আপনাকে মনে পড়েছে' (সস্নেহে চুমু খেলেন ওর হাতে), 'কত যে ভেবেছি আপনার কথা। আপনাকে বলবার জানাবার জন্যে কত কথা ভেবেছি... যাক মন খুলে কথা বলা যাবে এবার! প্রথম কথা, আমার ওই লঘুচিত্ত পুত্রটি, যে দেখছি এখনো আসে নি...'

লাল হয়ে উঠে বিব্রতভাবে বাধা দিলে নাতাশা, 'একটু মাপ করুন প্রিন্স, ইভান পেত্রোভিচের সঙ্গে একটা কথা আছে। এসো ভানিয়া... একটা কথা...'

আমার হাত ধরে নাতাশা নিয়ে গেল পর্দার পেছনে।

একেবারে সবচেয়ে অন্ধকার কোণটিতে টেনে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললে, 'ভানিয়া, ক্ষমা করবে আমায়?'

'নাতাশা বলছ কী, ঢের হয়েছে?'

'না-না, ভানিয়া তুমি আমায় বড়ো বেশি ঘন ঘন, বড়ো বেশি বারবার ক্ষমা করেছ, কিন্তু ধৈর্যের তো সীমা আছে। আমার ওপর তোমার ভালোবাসা কখনো যাবে না জানি, কিন্তু অকৃতজ্ঞ বলবে যে, — কাল আর পরশু আমি তোমার সঙ্গে অকৃতজ্ঞের মতো ব্যবহার করেছি, স্বার্থপর নিষ্ঠুরের মতো...'

হঠাৎ কেঁদে ফেলে আমার কাঁধে মুখ গুঁজল নাতাশা।

ব্যস্ত হয়ে বোঝাতে লাগলাম ওকে, 'হয়েছে নাতাশা, হয়েছে। কাল সারা রাত যে ভারি অসুখ গেছে আমার, এখনো প্রায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না, তাই কাল কি আজ দিনের বেলা আসতে পারি নি। আর তুমি ভাবছ আমি

রাগ করেছি... নাতাশা, লক্ষ্মীটি আমার, তোমার মনের মধ্যে এখন কী চলেছে তা কি আর আমি জানি না?'

'বেশ, ঠিক আছে। বরাবরের মতো এবারেও তাহলে ক্ষমা করলে আমায়,' চোখের জলের মধ্যে দিয়ে হেসে বললে ও, আমার হাতখানা ব্যথা করে উঠল ওর হাতের চাপে, 'বাকি কথা পরে হবে। অনেককিছু বলার আছে তোমায়, ভানিয়া। কিন্তু এখন চলি, ওঁর কাছে যাই...'

'তাড়াতাড়ি নাতাশা, অমন হঠাৎ করে ওঁকে ফেলে রেখে আমরা চলে এসেছি...'

তাড়াতাড়ি করে ফিসফিসিয়ে ও বললে, 'দেখবে তুমি, দেখবে এবার কী হয়। সব এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমি। সব টের পেয়েছি। এ সবই ওঁর কীর্তি। আজ সন্ধ্যায় অনেককিছুই ফয়সালা হয়ে যাবে। চলো যাই!'

ব্যাপারটা বুঝলাম না, কিন্তু জিজ্ঞেস করার সময় ছিল না। প্রিন্সের কাছে নাতাশা এসে দাঁড়াল উজ্জ্বল মুখে। হাতে টুপি নিয়ে প্রিন্স তখনো দাঁড়িয়েছিলেন। উচ্ছল গলায় ক্ষমা চাইলে নাতাশা, হাত থেকে টুপিটা নিয়ে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলে; ওর ছোট্ট টেবিলখানা ঘিরে আমরা তিনজনেই বসলাম।

প্রিন্স বলে চললেন, 'আমার ওই লঘুচিত্তটির কথা যা বলছিলাম। আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে শুধু এক মুহূর্তের জন্যে, তাও রাস্তায় — কাউণ্টেস জিনাইদা ফিওদরোভনার কাছে যাবার জন্যে যখন গাড়িতে উঠেছে। ভয়ানক তাড়া ছিল ওর, বিশ্বাস করুন, চার দিন পরে দেখা হচ্ছে অথচ গাড়ি থেকে নেমে আমার সঙ্গে ঘরে পর্যন্ত এল না। ও নেই আর আমরা আগেই এসে পড়েছি এর জন্যে আমিই দোষী নাতালিয়া নিকোলায়েভনা। কেননা, ও যাচ্ছে দেখে ওকে একটা কাজের ভার দিয়েছি। নিজে তো আর আজ আমি কাউণ্টেসের কাছে যেতে পারব না। তবে এক্ষুনি ও এসে পড়বে।'

একান্ত সারল্যের দৃষ্টিতে প্রিন্সের দিকে তাকিয়ে নাতাশা জিজ্ঞেস করলে, 'আজ আসবে সে কথা ও আপনাকে বলেছে নিশ্চয়?'

'হায় রে কপাল, আসবে না আবার; কী বলছেন আপনি!' নাতাশার দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে বলে উঠলেন প্রিন্স, 'তবে বুঝতে পারছি — ওর ওপরে রাগ করেছেন। সত্যি সবার শেষে আসাটা ওর পক্ষে অন্যায়। কিন্তু

ফের বলি, দোষটা আমারই। ওর ওপরে রাগ করবেন না। ও একটু অগভীর, চপল। ওর পক্ষ টেনে কিছু বলছি না, কিন্তু বিশেষ কতকগুলো ঘটনাচক্রে দরকার হয়ে পড়েছে যে কাউণ্টেস এবং অন্য কয়েকজনের সঙ্গে সম্পর্ক বর্তমানে ছেড়ে না দিয়ে বরং যত পারা যায় তত ঘন ঘন দেখাসাক্ষাৎ করা ওর উচিত। আর ও যেহেতু আপনার কাছটি ছেড়ে নড়ে না এবং দুনিয়ায় সবকিছু ভুলে বসে আছে বলে আমার বিশ্বাস, তাই বেশি নয় ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে যদি ওকে মাঝে মাঝে আমার কাজের জন্যে টেনে নিয়ে যাই তাহলে রাগ করবেন না কিন্তু। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেই সন্ধ্যের পর থেকে ও নিশ্চয় প্রিন্সেস 'ক'এর কাছে একবারও যায় নি। এখনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়ে উঠল না বলে ভারি খারাপই লাগছে আমার...'

নাতাশার দিকে চাইলাম আমি। আধা বিদ্রূপের লঘু হাসি নিয়ে ও প্রিন্সের কথা শুনে যাচ্ছিল। প্রিন্স কিন্তু কথা বলছিলেন ভারি সোজাসুজি, ভারি স্বাভাবিক সুরে। মনে হল, ওঁর বিরুদ্ধে কোনো কিছু সন্দেহ করার উপায় নেই।

'আপনি সত্যিই জানতেন না যে ও এ ক'দিন আমার কাছে একবারও আসে নি?' মৃদু শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলে নাতাশা, যেন এমন একটা বিষয়ে কথা হচ্ছে যা ওর কাছে নিতান্ত মামুলী।

'সে কী! একবারও আসে নি? মাপ করবেন, কী বলছেন আপনি!' প্রিন্স বললেন দৃশ্যত ভয়ানক অবাক হয়ে।

'গত মঙ্গলবার বেশ রাত করে আপনি এসেছিলেন। পরদিন সকালে ও আমার কাছে এসেছিল আধ ঘণ্টার জন্যে। তারপর থেকে ওকে আর দেখি নি।'

'কিন্তু এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য!' (ক্রমেই বিস্ময় বাড়ছিল ওঁর।) 'আমি ঠিক এই কথাই ভেবেছিলাম যে, আপনার কাছ ছেড়ে ও নড়ে না। মাপ করবেন, এ যে ভারি আশ্চর্য... একেবারেই অবিশ্বাস্য।'

'তবু কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি, আর কী দুঃখের কথা, আমি ওদিকে আপনার পথ চেয়ে চেয়ে ভাবছিলাম আপনার কাছ থেকেই জেনে নেব, কোথায় ও আছে।'

'হায় ভগবান! ও যে এক্ষুনি আসবে এখানে। কিন্তু আপনি যা বললেন তাতে এমন অবাক লাগছে যে... ওর পক্ষে সবই সম্ভব মানি, কিন্তু সত্যি বলছি এই ব্যাপারটা... এইটে!'

'আপনি অবাক হচ্ছেন মানে! অথচ আমি ভাবছিলাম, আপনি অবাক তো হবেনই না, বরং আগে থেকেই জানতেন এই ঘটবে।'

'জানতাম? আমি? নিশ্চয় করে বলছি নাতালিয়া নিকোলায়েভনা, আজ ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে শুধু এক মুহূর্তের জন্যে, ওর সম্বন্ধে কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করি নি। আপনি আমায় যেন বিশ্বাস করছেন না দেখে ভারি অদ্ভুত লাগছে।' আমাদের দুজনকে নিরীক্ষণ করতে করতে বললেন উনি।

কথার খেই ধরে নাতাশা বলে উঠল, 'ভগবান না করুন। আপনি যে সত্যি বলছেন তাতে একটুও সন্দেহ নেই আমার।'

বলে ফের হাসল নাতাশা, একেবারে প্রিন্সের চোখাচোখি, এমনভাবে যে ওঁর মুখ কেঁপে উঠল।

থতমত খেয়ে বললেন, 'একটু খোলসা করে বলুন।'

'খোলসা করে বলার কিছুই তো নেই, খুবই সোজা কথা। আপনি তো জানেনই ও কেমন উড়ু-উড়ু, ভুলো। আর এখন যেই পুরো স্বাধীনতা পেয়েছে, অমনি ভেসে যেতে শুরু করেছে।'

'কিন্তু অমন করে ভেসে যাওয়া যে অসম্ভব, নিশ্চয় এর পেছনে কিছু একটা ব্যাপার আছে। ও এলেই সবটা খুলে বলতে ওকে আমি বাধ্য করব। কিন্তু সবচেয়ে অবাক লাগছে এই দেখে যে আমাকেও আপনি কেমন যেন দোষী বানাচ্ছেন, অথচ আমি এখানে ছিলামও না। তবে বুঝতে পারছি নাতালিয়া নিকোলায়েভনা, ওর ওপরে আপনার খুব রাগ হয়েছে — সেটা বোঝা যায়। রাগ করার যথেষ্ট কারণ আছে বৈকি, এবং... এবং বলাই বাহুল্য, আমিই আগে এসে হাজির হলাম শুধু এইটুকুর জন্যেই দোষটা অবশ্যই আমার ওপরেই প্রথম পড়বে, তাই না?' আমার দিকে তাকিয়ে একটা জ্বালা-জ্বালা বিদ্রূপের হাসি ছেড়ে উনি বললেন।

লাল হয়ে উঠল নাতাশা।

বেশ আত্মসম্ভ্রমের সঙ্গে বলে চললেন উনি, 'মাপ করবেন, নাতালিয়া নিকোলায়েভনা, স্বীকার করছি আমারই দোষ, তবে শুধু এই জন্যে যে আপনার সঙ্গে পরিচয়ের পরের দিনই আমি চলে গিয়েছিলাম। তাই যা দেখছি, স্বভাবটা আপনার খানিকটা সন্দেহবাতিক বলে আমার সম্পর্কে মতটা আপনার এর মধ্যেই বদলে নিতে পেরেছেন, বিশেষ করে অবস্থাচক্রও তাতে সাহায্য করেছে কিছু। চলে যদি না যেতাম তাহলে আমায় আপনি একটু

ভালো করে চিনতেন, আমি চোখ রাখলে আলিওশাও এমন দায়িত্বহীন হতে পারত না। নিজের কানেই শুনবেন আজ সন্ধ্যায় কী বলি ওকে।'

'অর্থাৎ, এমন করবেন যাতে আমাকে ও একটা বোঝা বলে গণ্য করতে শুরু করে। তাতে যে আমার কিছু কাজ হবে এ কথা আপনার মতো বুদ্ধিমান লোক সত্যিই ভাববে সে অসম্ভব।'

'আপনি কি এই ইঙ্গিতই করছেন না যে আমি ইচ্ছে করেই এমন কাণ্ড করতে চাই যাতে ও আপনাকে বোঝা জ্ঞান করতে শুরু করে? অত্যন্ত আঘাত পেলাম নাতালিয়া নিকোলায়েভনা।'

নাতাশা বললে, 'যার সঙ্গেই কথা বলি না কেন, ইঙ্গিতের আশ্রয় নেবার চেষ্টা করি আমি যথাসম্ভব কমই। বরং যথাসাধ্য সোজাসুজি বলাই আমার অভ্যেস। সম্ভবত আজ সন্ধ্যেই আপনি সে সম্পর্কে নিঃসন্দে হবেন। আপনাকে আঘাত দেবার ইচ্ছে আমার নেই, তার কোনো মানেও হয় না, অন্তত কেবল এইজন্যে যে আমি যাই বলি তাতে আপনি আহত বোধ করবেন না। সে বিষয়ে আমার কোনোই সন্দেহ নেই — কেননা আপনার সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক সেটা আমি খুবই বুঝি; সেটায় তো আপনি গুরুত্ব দিতে পারেন না, তাই না? তবু সত্যিই যদি আপনাকে আমি আঘাত দিয়ে থাকি, তাহলে... আতিথেয়তার সমস্ত কর্তব্য পালন করার জন্যে ক্ষমা চাইতে আমি রাজী।'

ঠোঁটে হাসি নিয়ে লঘু এমনকি পরিহাসের সুরে কথাগুলো বললেও এত তিক্ত নাতাশাকে আমি কখনো দেখি নি। এ তিন দিনে তার মানসিক যন্ত্রণাটা যে কতখানি গভীর হয়ে উঠেছিল তা টের পেলাম এতক্ষণে। সবকিছু ও এত দিনে জেনে ফেলেছে, সবই বুঝতে পারছে, ওর এই হেঁয়ালিভরা কথাটায় ভয় লাগল আমার — ব্যাপারটা সরাসরি প্রিন্সকে নিয়েই। প্রিন্স সম্পর্কে মত ওর পালটে গেছে, এখন তাকে ও গণ্য করছে শত্রু বলে, তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। আলিওশাকে নিয়ে ওর যত বিফলতা স্পষ্টতই তার সমস্ত কারণ বলে ও প্রিন্সের প্রভাবকেই দায়ী করছে, আর হয়ত তার কোনো তথ্যও তার হাতে ছিল। ভয় হচ্ছিল এই বুঝি ওদের দু'জনের মধ্যে হঠাৎ একটা কাণ্ড বেধে যায়। ওর পরিহাসের সুরটা খুবই প্রকাশ্য, খুবই উদ্‌ঘাটিত। প্রিন্স তাদের মধ্যেকার সম্পর্কটাকে গুরুত্ব দিতে পারেন না, এই মর্মে প্রিন্সের প্রতি ওর শেষ কথাটা, আতিথেয়তার কর্তব্য পালন প্রসঙ্গে ওর মাপ চাওয়া, ও যে সিধে কথা বলতে পারে তা এই সন্ধ্যেতেই দেখিয়ে দেবে বলে ওর প্রায় শাসানির মতো ঐ প্রতিশ্রুতি — এ সবকিছুই এত বিষাক্ত, এত

অনাবৃত যে প্রিন্স তা না বুঝে পারেন না। দেখলাম, মুখের ভাব ওঁর বদলে যাচ্ছে, তাহলেও নিজেকে সামলে রাখতে উনি পারেন। তক্ষুনি ভাব করলেন যেন এসব কথা তিনি খেয়াল করেন নি, তার আসল অর্থ ধরতে পারেন নি, এবং বলাই বাহুল্য, এড়িয়ে গেলেন হাসিঠাট্টা করে।

হাসতে হাসতে বললেন, 'ভগবান করুন যেন ক্ষমা চাওয়ার দাবি করতে না হয়। মোটেই আমি তা চাই নি, তাছাড়া নারীকে ক্ষমা চাইতে বলা আমার রীতির বাইরে। প্রথম যখন আমাদের দেখা হয়, তখন আপনাকে সাবধান করে বলেছিলাম আমি মানুষটা কী রকম। তাই আমার একটা কথায় নিশ্চয় আপনি রাগ করবেন না, বিশেষ করে কথাটা আবার সব মেয়ে সম্পর্কেই প্রযোজ্য কিনা। আপনিও নিশ্চয় তাতে সায় দেবেন,' বললেন সসৌজন্যে আমার দিকে ফিরে, 'কথাটা এই: আমি দেখেছি যে নারী চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্যই হল এই যে তার যদি কখনো দোষ হয়, তাহলে পরে বরং হাজার রকমের আদর দিয়ে সে দোষ স্খালন করতে সে রাজী থাকবে তবু তাকে ধরিয়ে দিলে সেই মুহূর্তে সে দোষ স্বীকার করে কখনো মাপ চাইবে না। সুতরাং, যদি ধরেও নিই যে আপনি আমার মনে আঘাত দিয়েছেন তাহলেও এখন, এই মুহূর্তে ইচ্ছে করেই আপনার কাছ থেকে মার্জনা-ভিক্ষা দাবি করতে আমি চাই না; পরবর্তীটাতেই আমার লাভ হবে বেশি, যখন আপনার ভুল বুঝতে পেরে তা মিটিয়ে নিতে চাইবেন... হাজারো আদরে। তাছাড়া আপনি এত ভালো, এত নিষ্পাপ আর অম্লান, এত খোলামেলা যে বেশ দেখতে পাচ্ছি আপনার অনুতাপের সে মুহূর্তটি হবে ভারি মনোহর। তাই ক্ষমা চাওয়ার বদলে আপনি বরং বলুন, আপনার ধারণার চেয়ে অনেক অকপট এবং অনেক খোলাখুলি আচরণ আমি যে করছি তা প্রমাণের জন্যে এই সন্ধ্যেতেই আমি কিছু করে দেখাতে পারি কিনা।'

নাতাশা লাল হয়ে উঠল। আমারও মনে হল প্রিন্সের জবাবে কেমন একটা লঘু, এমনকি অবহেলার সুর শোনা গেল, কেমন একটা অশোভন রঙ্গপ্রিয়তা।

স্পর্ধিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে নাতাশা জিজ্ঞেস করলে, 'প্রমাণ করতে চান যে আমার প্রতি আপনার আচরণ সরল, মন খোলা?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে, একটা অনুরোধ রাখুন।'

'আগেই কথা দিয়ে রাখছি।'

'অনুরোধটা এই: কোনো ইঙ্গিত, কোনো কথাতেই আলিওশাকে আমার জন্যে উদ্বিগ্ন করে তুলবেন না, আজও না, কালও না। আমাকে ভুলে গেছে বলে কোনো তিরস্কার, কোনো উপদেশ নয়। ওর সঙ্গে আমি এমন ব্যবহার করতে চাই যেন কিছুই হয় নি, আমাদের মধ্যে কিছুই যেন ও টের না পায়। এটা আমার দরকার। কথা দিচ্ছেন?'

'সানন্দে,' জবাব দিলেন প্রিন্স, 'এবং সর্বান্তঃকরণে এ কথা না বলে পারছি না যে, এরকম ব্যাপারে এর চেয়ে বিচক্ষণতা আর দূরদৃষ্টির পরিচয় আমি খুব কম পেয়েছি... কিন্তু ওই বোধ হয় আলিওশা।'

সত্যিই বারান্দায় একটা শব্দ শোনা গিয়েছিল। নাতাশা চকিত হয়ে উঠে কিছু একটার জন্যে যেন নিজেকে তৈরি করে নিলে। গম্ভীর মুখ করে প্রিন্স ভালকোভস্কি বসে রইলেন কী হয় দেখবার জন্যে, নাতাশাকে উনি একদৃষ্টে লক্ষ্য করছিলেন। দরজা খুলে গেল, যেন উড়ে এল আলিওশা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একেবারে উড়েই এল ও, উদ্ভাসিত মুখ, উৎফুল্ল, হাসিখুশি। বোঝা যাচ্ছিল, এ চার দিন ও আনন্দে ফুর্তিতেই কাটিয়েছে। ওর মুখে লেখা যেন আমাদের কিছু একটা বলতে চায়।

সারা ঘর ফাটিয়ে ও ঘোষণা করলে, 'এসে গেলাম — সেই আমি, যার এখানে আসা উচিত ছিল সকলের আগেই। কিন্তু সব জানতে পারবে এখুনি, সব, সবকিছু! তখন তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলাও হয়ে ওঠে নি বাবা, অথচ অনেক কথা বলার ছিল তোমায়। শুধু যখন উনি ভালো মেজাজে থাকেন তখনই আমায় "তুমি" বলতে দেন,' আমায় উদ্দেশ করে ও নিজের কথাতেই বাধা দিয়ে বললে, 'অন্য সময় কিন্তু এ একেবারেই বারণ। কী কায়দা করেন জানেন, উনি নিজেই কথা বলতে শুরু করেন আমায় "আপনি" বলে। কিন্তু আজ থেকে চাই, কেবলি যেন ভালো মেজাজ থাকে ওঁর, আর সেই ব্যবস্থাই করব! গত চার দিনে আমি একেবারে বদলে গেছি, একেবারে, একেবারে বদলে গেছি। সব তোমাদের বলব। কিন্তু পরে। উপস্থিত সবচেয়ে বড়ো কথা হল নাতাশা, এই তো! নাতাশা আমার সামনে! ফের! নাতাশা, রাণী আমার, কেমন আছ লক্ষ্মীটি!' নাতাশার পাশে বসে তৃষিতের মতো হাতে চুমু খেয়ে ও বললে, 'এ ক'দিন তোমার জন্যে খুবই মন কেমন করেছে।

কিন্তু যা ভাববে ভেবো, উপায় ছিল না। কিছুতেই আসতে পারলাম না। নাতাশা, লক্ষ্মীটি আমার তোমায় যেন একটু রোগা দেখাচ্ছে, ফ্যাকাশে হয়ে গেছ তুমি...'

উল্লাসে চুমোয় চুমোয় হাতখানা ও ভরে দিলে, নিজের সুন্দর চোখ জোড়া তুলে নাতাশার দিকে এমন তৃষিতের মতো চেয়ে রইল যেন চেয়ে চেয়ে ওর আশ মিটছে না। নাতাশার দিকে তাকালাম। ওর মুখ দেখে আন্দাজ করলাম একই কথাই আমরা ভাবছি: আলিওশা একান্ত নিরপরাধ। সত্যিই, এমন নিরপরাধ অপরাধী হতে পারে কী করে, কখন? নাতাশার বিবর্ণ গালের ওপর একটা টকটকে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ল হঠাৎ, যেন ওর বুকে জমে ওঠা সমস্ত রক্ত হঠাৎ ছলকে উঠেছে মাথায়। চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল ওর, সগর্বে তাকাল প্রিন্সের দিকে।

'কিন্তু কোথায়... এত দিন... ছিলে?' সংযত, থামা থামা গলায় জিজ্ঞেস করলে নাতাশা। ওর নিঃশ্বাস ভারি ভারি, অনিয়মিত। ঈশ্বর, কী ভালোই না ও বাসে!

'সেই তো আসল কথা, আমি যেন সত্যিই তোমার কাছে দোষী, আর যেন আবার কী! অবশ্যই দোষী, নিজেই তা জানি, তা জেনেই এসেছি। কালকে আর আজকেও কাতিয়া বলছিল, এরকম অবহেলা কোনো মেয়ে ক্ষমা করতে পারে না। (মঙ্গলবার এখানে যা হয়েছিল ও সবই জানে তো, আমি পরের দিনই বলেছিলাম।) আমি ওর সঙ্গে তর্ক করেছিলাম, প্রমাণ করে দিয়েছিলাম, এ মেয়ের নাম নাতাশা, এবং দুনিয়ায় তার সমকক্ষ বোধ হয় আর একজন মেয়েই আছে — সে কাতিয়া। এখানে আমি অবশ্য এ জেনেই এসেছি তর্কে আমি জিতেছি। তোমার মতো একজন দেবী কি কখনো ক্ষমা না করে পারে? "আসে নি যখন, তাহলে নিশ্চয় কিছু একটা বাধা ঘটেছে, এ জন্যে নয় যে আমার প্রতি ভালোবাসা শেষ হয়ে গেছে।" এই কথাই ভাববে আমার নাতাশা। সত্যি তোমার জন্যে ভালোবাসা ফুরিয়ে যাবে সে কি হয়? তাই কি সম্ভব? বুকখানা কেবল টনটন করেছে তোমার জন্যে। অবিশ্যি তা সত্ত্বেও আমার দোষ। কিন্তু সবটা জানলে তুমিই সবার আগে আমার পক্ষ নেবে। এক্ষুনি সব বলছি — তোমাদের সকলের কাছেই বুকটা উজাড় করে দেওয়া আমার দরকার — সেই জন্যেই এসেছি। ভেবেছিলাম আজই একবার ছুটে এসে তোমায় এক মুহূর্তের চুমু দিয়ে যাব (আধ মিনিট মাত্র সময় ছিল হাতে), কিন্তু হয়ে উঠল না। জরুরী একটা ব্যাপারে

কাতিয়া ডেকে পাঠাল অবিলম্বে। গাড়িতে আমায় যখন তুমি বসে থাকতে দেখেছিলে বাবা, এটা তার আগেই। তখন কাতিয়ার কাছে আমি যাচ্ছিলাম দ্বিতীয় বারের জন্যে, ওর দ্বিতীয় চিরকুট পাবার পর। আজকাল তো সারাদিন চিরকুট নিয়ে পেয়াদারা এ-বাড়ি ও-বাড়ি ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। আপনার চিঠিটা আমি পড়ে উঠতে পেরেছি মাত্র গত রাত্রে ইভান পেত্রোভিচ, যা লিখেছেন খুবই ঠিক কথা। কিন্তু কী করা যাবে! দৈহিক ভাবেই একেবারে অসম্ভব! তাই ভাবলাম, কাল সন্ধ্যেতেই সব বুঝিয়ে দোষ কাটানো যাবে, কেননা আজ সন্ধ্যেয় তোমার কাছে না আসা তো আমার পক্ষে অসম্ভব, নাতাশা।'

'কী চিঠি?' নাতাশা জিজ্ঞেস করলে।

'উনি আমার ঘরে গিয়েছিলেন। স্বভাবতই আমার দেখা পান নি; চিঠি লিখে রেখে যান। তোমার কাছে যাচ্ছি না বলে বেশ বকুনি দিয়েছেন চিঠিতে। ঠিকই বলেছেন উনি। ব্যাপারটা গতকালকের।'

নাতাশা দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে আমার দিকে।

প্রিন্স ভালকোভস্কি শুরু করলেন, 'কিন্তু কাতেরিনা ফিওদরোভনার সঙ্গে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কাটাবার সময় যদি তোমার হয়ে থাকে...'

বাধা দিয়ে আলিওশা বললে, 'জানি, জানি, কী বলবে। "কাতিয়ার কাছে যেতে পারলে এখানে আসা তোমার দ্বিগুণ উচিত ছিল।" তোমার সঙ্গে আমি একমত এবং নিজেই আরো বলব: শুধু দ্বিগুণ নয়, লক্ষগুণ উচিত! কিন্তু প্রথম কথা, জীবনে অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত এমন সব ব্যাপার ঘটে যাতে সবকিছুই এলোমেলো উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। ঠিক এমনি সব ব্যাপারেই পড়তে হয়েছিল আমায়। বলছিই তো, কয়দিনে আমি একেবারে ভিন্ন মানুষ হয়ে গেছি — আপাদমস্তক তফাত। তার মানে ঘটনাগুলো জরুরীই।'

আলিওশার উত্তেজনায় হেসে ফেলে নাতাশা বললে, 'মা গো! কিন্তু হয়েছিল কী? অমন দন্ধে মেরো না, দোহাই!'

সত্যিই খানিকটা হাস্যকর লাগছিল ওকে। তাড়াহুড়ো করছিল ও, কথার খই ফুটছিল দ্রুত, ঘন ঘন, এলোমেলো, কেমন যেন খটখটিয়ে। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল কেবলি বলতে, কথা কয়ে যেতে। কিন্তু কথা কইতে কইতেও নাতাশার হাতখানা ও ছাড়ে নি। অনবরত টেনে তুলছিল ঠোঁটের কাছে, যেন চুমু খেয়ে ওর তৃপ্তি হবে না কখনো।

'সেই তো ব্যাপার, কী হয়েছিল আমার,' বলে চলল আলিওশা, 'আরে ভাই, কত যে দেখলাম, কত কী যে করলাম, কেমন সব লোকের সঙ্গেই যে জানা-শোনা হল! যেমন প্রথমত, কাতিয়া! নিখুঁত মেয়ে একটি! এর আগে পর্যন্ত ওর কিছুই মোটেই জানতাম না আমি, একটুও না! এমনকি সেদিন, ওই মঙ্গলবার যখন এমনি উৎসাহেই ওর কথা তোমায় বলেছিলাম নাতাশা, মনে আছে? তখনো ওকে প্রায় জানতাম না বললেই হয়। এই মুহূর্ত পর্যন্ত ও নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল আমার কাছ থেকে। কিন্তু এখন আমরা দু'জন দু'জনকে পুরোপুরি জেনেছি। আমরা দু'জন দু'জনকে "তুমি" বলে ডাকি। কিন্তু গোড়া থেকে শুরু করি। প্রথমত পরদিন অর্থাৎ বুধবার, আমাদের এখানে কী কী হয়েছে যখন ওকে বললাম, তখন ও যেসব কথা আমায় বলেছিল নাতাশা, তা যদি শুনতে... ভালো কথা, বুধবার সকালে তোমার এখানে যখন এসেছিলাম, তখন কী বেকুবের মতো করেছি, মনে পড়ছে এখন! উৎসাহ করে তুমি আমায় স্বাগত করলে, আমাদের নতুন পরিস্থিতির কথায় মন তোমার ভরপুর, আমার সঙ্গে তাই নিয়ে সব আলাপ করতে চাইছ; মনটা তোমার একটু বিষণ্ণ, তবু সেই সঙ্গেই আমার সঙ্গে দুষ্টুমি, খুনশুটি করার ইচ্ছে। আর আমি খুব একটা গুরুগম্ভীর ভাব করছি। ওহ্ কী আহাম্মক! আহাম্মক! জানো তো, আমার ইচ্ছা হচ্ছিল একটু চাল মারি, জাঁক করি যে আমিও শিগ্গিরই স্বামী হতে চলেছি, দায়িত্বশীল লোক হচ্ছি, কিন্তু জাঁক সে কিনা তোমার কাছে! ওহ্ আমায় দেখে তোমার কী হাসিই না হাসার কথা, কী উপহাসের পাত্রই না হয়েছিলাম!'

আলিওশার দিকে একটা ব্যঙ্গের বিজয়ী হাসি নিয়ে তাকিয়ে নীরবে বসেছিলেন প্রিন্স। ছেলে যে নিজেকে অমন লঘুচিত্ত, এমনকি হাস্যকর করে তুলছে তাতে উনি খুশিই হয়েছেন বলে মনে হল। সেদিন সারা সন্ধ্যে আমি ওঁকে মন দিয়ে নজর করে দেখেছি এবং একেবারে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে, ওঁর পিতৃস্নেহের বড়ো বেশি আধিক্য সম্পর্কে নানা কথা শোনা গেলেও ছেলের প্রতি ওঁর মোটেই ভালোবাসা নেই।

আলিওশা বকেই চলল, 'তোমার এখান থেকে গিয়েছিলাম কাতিয়ার কাছে। আগেই বলেছি, ওই সকালেই কেবল আমরা দু'জন দু'জনকে পুরোপুরি চিনলাম। ব্যাপারটা যেভাবে ঘটল ভারি অদ্ভুত... ঠিক মনে করতে পর্যন্ত পারছি না... আবেগভরা কিছু কথা, সোজাসুজি বলা কিছু অনুভূতি, ভাবনা, তারপর চিরকালের মতো আপন হয়ে গেলাম

আমরা। ওর সঙ্গে তোমার আলাপ হওয়া উচিত নাতাশা, সত্যি ওকে জানা উচিত! এমন করে ও তোমার কথা বললে, এমন করে ও আমায় বুঝিয়ে দিলে তোমাকে। তুমি যে আমার কী রত্ন তা সে ভারি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলে। আস্তে আস্তে ও তার সমস্ত আদর্শ বুঝিয়ে বললে আমার কাছে, জীবন সম্পর্কে ওর সব মতামত। কী গুরুত্ববোধ ওর, কী উঁচু মন! বললে আমাদের দায়িত্বের কথা, আমাদের জীবনের ব্রতের কথা, আমাদের সকলের উচিত মানবের সেবা করা, আর গোটা পাঁচ-ছয় ঘণ্টা আলাপের মধ্যেই আমরা দু'জনেই একেবারে একমত হয়ে গেলাম, তাই চিরন্তন বন্ধুত্বের শপথ নিলাম দু'জনে, স্থির করলাম, সারা জীবন আমরা একসঙ্গে কাজ করে যাব!'

'কী ধরনের কাজ?' প্রিন্স জিজ্ঞেস করলেন অবাক হয়ে।

'আমি বাবা, এত বদলে গেছি যে এতে তোমার নিশ্চয় অবাক হবারই কথা। তোমার যা আপত্তি তা আমি আগেই টের পাচ্ছি।' বিজয় গর্বে জবাব দিলে আলিওশা, 'সবাই তোমরা খুব সাংসারিক লোক, গুরুগম্ভীর, কড়া কড়া কত সব সেকেলে নীতি তোমাদের। যা কিছু নতুন, যা কিছু তরুণ আর তাজা তাকে তোমরা দেখো অবিশ্বাস, শত্রুতা, বিদ্রূপের চোখে। কিন্তু কয়েকদিন আগে আমায় যা দেখেছ, আমি আর সে মানুষটি নই। আমি একেবারে ভিন্ন লোক! জগতের সবকিছু এবং সমস্ত লোকের দিকে আমি তাকাই সোজাসুজি। আমি যদি জানি, আমার যা বিশ্বাস সেটা ন্যায্য, তাহলে চরম সীমা পর্যন্ত তা আমি অনুসরণ করে যাব, আমার পথ থেকে বিচ্যুত না হলেই আমি সৎ। এই আমার সব কথা। তাতে তোমরা যা খুশি বলতে পারো, কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ।'

বিদ্রূপ করে প্রিন্স বললেন, 'বটে!'

নাতাশা অস্থির হয়ে তাকাল আমাদের দিকে। আলিওশার জন্যে ভয় হচ্ছিল ওর। কথায় মেতে গিয়ে ও প্রায়ই নিজের খুবই অসুবিধা ঘটাত, নাতাশা তা জানত। ও চাইছিল না যাতে আমাদের সামনে, বিশেষ করে বাপের সামনে আলিওশা নিজেকে হাস্যকর করে তোলে।

বললে, 'কী বলছ আলিওশা? এ যে কী সব দর্শন। কেউ শিখিয়েছে নিশ্চয়... তার চেয়ে বরং ব্যাপারটা বলো।'

'তাই তো বলছি।' চেঁচিয়ে উঠল আলিওশা, 'মানে, কাতিয়ার দু'জন আত্মীয়, কী সব দূরসম্পর্কের দুই ভাই আছে, লেভিন্‌কা আর বোরিন্‌কা।

একজন উচ্চশিক্ষার্থী, আর একজন স্রেফ তরুণ। ওদের সঙ্গে মেলামেশা আছে কাতিয়ার, একেবারে অসাধারণ লোক ওরা। কাউণ্টেসের বাড়ি ওরা প্রায় যায় না, এই ওদের নীতি। মানুষের কর্তব্য, জীবনের ব্রত ইত্যাদি কথা নিয়ে যখন কাতিয়ার সঙ্গে আলাপ করছিলাম, তখন কাতিয়া ওদের কথা বলে, আর সঙ্গে সঙ্গে ওদের কাছে একটা চিরকুট লিখে দেয় আমায়। ওদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে তক্ষুনি ছুটে গেলাম। সেই সন্ধ্যেতেই আমাদের ভীষণ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। জন বারো লোক ছিল সেখানে: ছাত্র, অফিসার, শিল্পী, একজন ছিল লেখক... ওরা সবাই আপনাকে চেনে ইভান পেত্রোভিচ, মানে, আপনার বই পড়েছে আর কি, আপনার কাছ থেকে ভবিষ্যতে অনেককিছুর আশা রাখে। নিজেরাই ওরা সে কথা আমায় বললে। বললাম যে আমি আপনাকে চিনি, আপনার সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দেব কথা দিলাম। সকলেই ওরা আমায় দু'হাত বাড়িয়ে কোলাকুলি করে ভাইয়ের মতো আপন করে নিলে। প্রথমেই ওদের বলে দিয়েছিলাম যে আমি শিগ্‌গিরই বিয়ে করছি, ওরা তাই আমায় বিবাহিত লোক হিসেবেই নিলে। থাকে ওরা পাঁচ তলায়, চালার ঠিক নিচে। ঘন ঘনই বৈঠক বসে ওদের, কিন্তু বেশির ভাগ বুধবারে, লেভিন্‌কা আর বোরিন্‌কার ঘরে। সকলেই ওরা তাজা তরুণ দল, মানবিক সবকিছুর জন্যেই তাদের উদ্দীপ্ত ভালোবাসা। আমাদের বর্তমান, ভবিষ্যত, বিজ্ঞান, সাহিত্য, এসব নিয়ে সকলেই আমরা আলাপ করলাম, আর সে আলাপ হল ভারি চমৎকার, ভারি সহজ, খোলাখুলি... হাইস্কুলের একটি ছাত্রও সেখানে আসে। নিজেদের মধ্যে কী চমৎকার ওদের ব্যবহার, কী উঁচু মন! অমন মানুষ আমি আগে কখনো দেখি নি। এতদিন পর্যন্ত কোথায় আমি থেকেছি? কী বা দেখেছি? কীভাবেই যে বেড়ে উঠেছি? এরকম ধরনের কথা আমায় বলেছ শুধু তুমি, নাতাশা। আহ্ নাতাশা, ওদের সঙ্গে তোমার আলাপ করতেই হবে, কাতিয়া তো আগে থেকেই ওদের চেনে। কাতিয়া বলতে ওরা প্রায় অজ্ঞান। লেভিন্‌কা আর বোরিন্‌কাকে কাতিয়া তো বলেই রেখেছে, সম্পত্তির অধিকার পাওয়া মাত্রই ও সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কাজে দশ লক্ষ দেবেই দেবে।'

'আর সে দশ লক্ষের বিলি ব্যবস্থা করবে নিশ্চয় লেভিন্‌কা বোরিন্‌কা ইত্যাদির সেই দঙ্গলটা?' জিজ্ঞেস করলেন প্রিন্স।

'না, না, মোটেই না। ওরকম করে কথা বলতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত বাবা!' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল আলিওশা, 'তুমি কী ভাবছ জানি।

ওই দশ লক্ষের কথা নিয়ে সত্যিই কথা হয়েছে আমাদের, কী করে তা খরচ করা উচিত তা নিয়ে বহুক্ষণ আলোচনা করেছি। শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছি, খরচ করতে হবে সবার আগে জনশিক্ষার জন্যে...'

'কাতেরিনা ফিওদরোভনাকে আমি এতদিন সত্যিই চিনতে পারি নি।' প্রিন্স বললেন যেন আপন মনে, মুখে সেই ব্যঙ্গের হাসিটি লেগেই আছে, 'অনেককিছুই ও করতে পারে জানতাম, কিন্তু এমন কান্ড...'

'কিসের কান্ড,' বাধা দিয়ে বলে উঠল আলিওশা, 'এত অদ্ভুত লাগছে কেন তোমার? তোমাদের রীতিনীতির খানিকটা বাইরে চলে যাচ্ছে বলে কি? আগে কেউ দশ লক্ষ বিসর্জন দেয় নি অথচ ও দিচ্ছে, এই জন্যে কি? তাই কি? কিন্তু ও যদি অন্যের ঘাড় ভেঙে থাকতে না চায় — ওই দশ লক্ষের ওপর বাঁচা মানে অন্যের ঘাড় ভেঙে দিন কাটানো (এটা আমি সবে বুঝতে পেরেছি), তাহলে? ও চায় স্বদেশের এবং সবার কাজে লাগতে, সাধারণ উপকারের জন্যে ওর যেটুকু দেবার তা দিতে। যেটুকু দেবার এ কথাটা আমরা পাঠ্য পুস্তকে পড়ে এসেছি, কিন্তু ওই যেটুকু দেওয়াটায় যখন দশ লক্ষের গন্ধ ছাড়ে তখন সে একেবারে অন্য ব্যাপার? তাহলে কিসের ওপর টিকে থাকছে এই বাহবা-পাওয়া বিচার-বিবেচনা — যার ওপর অমন বিশ্বাস ছিল আমার? আমার দিকে অমন করে চাইছ কেন বাবা? যেন একটা ভাঁড়, একটা বেকুবকে দেখছ! বেকুবই যদি হই তো কী এসে যায়? কাতিয়া এ সম্পর্কে যা বলেছিল তা তুমি শুনলে পারতে নাতাশা। "বড়ো কথাটা মস্তিষ্ক নয়, সে মস্তিষ্ককে যা চালায় সেই হল বড়ো কথা — চরিত্র, হৃদয়, উদার গুণাবলী, বিকাশ।" তবে এ ব্যাপারে বেজমিগিনের কথাটা প্রতিভাধরের মতো। বেজমিগিন হল লেভিন্‌কা আর বোরিন্‌কার পরিচিত, নিজেদের মধ্যে বলে বলছি, মাথা আছে লোকটার, খাঁটি প্রতিভা। কালকেই আলাপের মধ্যে ও বলছিল, "বোকা যখন স্বীকার করে যে সে বোকা, তখন আর সে বোকা থাকে না।" কী সত্যি কথা! এই ধরনের কথা ওর মিনিটে মিনিটে। সত্য ও বিলিয়ে বেড়ায়।'

'সত্যিই প্রতিভার লক্ষণ।' মন্তব্য করলেন রাজাবাহাদুর।

'কেবলি তুমি হাসছ, কিন্তু তোমার কাছ থেকে অমন কোনো কথা আমি কখনো শুনি নি, তোমাদের গোটা সমাজটার কারো কাছ থেকেও নয়। তোমাদের মহলে বরং এসব তোমরা লুকিয়েই রাখো, মাটির তলে চাপা দাও যেন কী একটা মাপকাঠিতে, কী একটা নিয়মে লম্বায় আর ভারে সবাইকে অবশ্য-অবশ্যই মিলে যেতে হবে; যেন তা সম্ভব! আমরা যা ভাবছি, বলছি,

তার চেয়ে যেন তা হাজারো গুণ অসম্ভব নয়। আবার আমাদের কিনা ওরা বলে আকাশচারী! কাল ওরা আমায় যা বলেছিল তা তুমি যদি শুনতে...'

'কিন্তু কী কথা নিয়ে তোমরা ভাবো, আলাপ করো, একটু বলো না আমাদের আলিওশা, এখনো পর্যন্ত ঠিক বুঝতে পারছি না।' নাতাশা বললে।

'প্রগতির দিকে, মানবতার দিকে, প্রেমের দিকে যা যায়, সাধারণভাবে এমন সবকিছু কথা, এসবই বলা হয় সাম্প্রতিক সমস্যা নিয়ে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বলি, আসন্ন সংস্কারগুলোর কথা, মানবপ্রেমের কথা, বর্তমানের জননায়কদের কথা। তাদের রচনা আমরা বিচার করি, পড়ি। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা, আমরা কথা দিয়েছি, পরস্পরের মধ্যে আমাদের কিছু রাখা-ঢাকা চলবে না, নিজেদের সম্পর্কে সব কথা আমরা অসঙ্কোচে খোলাখুলি বলব। কেবল পষ্টাপষ্টি সিধে আচরণেই আমাদের লক্ষ্য অর্জন করা যাবে। বেজমিগিন তারই জন্যে খুব চেষ্টা করছে। কাতিয়াকে আমি সে কথা বলেছিলাম, সে বেজমিগিনের সঙ্গে পুরোপুরি একমত। তাই বেজমিগিনের নেতৃত্বে আমরা সবাই শপথ নিয়েছি, সারা জীবন আমরা সৎ, সিধে পথে চলব, লোকে আমাদের সম্পর্কে যাই বলুক, যে রায়ই দিক কিছুতেই বিব্রত হব না, আমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনায়, ভুলভ্রান্তিতে লজ্জা বোধ করব না, সোজা এগিয়ে যাব। অন্যের কাছ থেকে সম্মান পেতে হলে প্রথম এবং প্রধান কথা নিজেকে সম্মান করা। একমাত্র তাতেই, শুধু আত্মসম্মানের জোরেই অন্যের কাছ থেকেও মর্যাদা আদায় করা সম্ভব। এই হল বেজমিগিনের কথা, কাতিয়াও তার সঙ্গে পুরোপুরি একমত। এখন আমরা সাধারণভাবে আমাদের বিশ্বাসগুলো মিলিয়ে নিচ্ছি, ঠিক করেছি আলাদা আলাদাভাবে নিজেদের বিশ্লেষণ করে যাব, আর একত্রে পরস্পরকে বোঝাব...'

'কী যত রাজ্যের ছাইভস্ম!' অস্থির হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন রাজাবাহাদুর, 'আর এই বেজমিগিনটাই বা কে? না, ব্যাপারটাকে তো এমন ছেড়ে দেওয়া চলবে না...'

'কী ছেড়ে দেওয়া চলবে না?' কথাটা লুফে নিলে আলিওশা, 'শোনো বাবা, কেন এসব কথা এখন বলছি আর তোমার সামনে? কারণ আমি চাই, আমার আশা, তোমাকেও আমাদের চক্রে নিয়ে আসব। তোমার হয়ে আমি ওদের কথাও দিয়েছি। হাসছ, তা জানতামই হাসবে! কিন্তু সবটা শোনো। তুমি সহৃদয়, উদার, তুমি বুঝবে। এসব লোককে তুমি তো চেনো না, দেখো নি

কখনো, — নিজে তাদের কথা শোনো নি। ধরে নিচ্ছি, এসব কথা তোমার শোনা, সবই তুমি বিচার করে দেখেছ, ভয়ানক পড়াশুনো আছে তোমার। কিন্তু ওদের তো দেখো নি, ওদের ওখানেও যাও নি। তাহলে কী করে ওদের সম্পর্কে সঠিক বিচার করতে পারো? তোমার শুধু ধারণা যে, তুমি ওদের জানো। কিন্তু ওদের কাছে একবার এসো, ওদের কথা শোনো একবার, — তাহলে আমি বলে রাখছি, তাহলে আমাদের একজন না হয়ে তুমি পারবে না। সবচেয়ে বড়ো কথা, যে মহলের সঙ্গে তুমি নিজেকে জড়িয়েছ তার সর্বনাশ থেকে, তোমার বিশ্বাসগুলো থেকে তোমাকে বাঁচাবার জন্যে আমি যথাসাধ্য করতে চাই।'

বাঁকা বিদ্রূপ নিয়ে নীরবে এই ভাষণ শুনে গেলেন রাজাবাহাদুর, মুখে ফুটে উঠেছিল বিদ্বেষ। অনাবৃত বিরূপতায় নাতাশা লক্ষ্য করে যাচ্ছিল ওঁকে। উনি তা দেখেছিলেন, কিন্তু ভাব করছিলেন যেন তা নজরে পড়ে নি। আলিওশার কথা শেষ হতেই উনি হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলেন; আর পারছেন না এই ভাব করে চেয়ারের পিঠেও এলিয়ে পড়লেন। হাসিটা কিন্তু একেবারে কৃত্রিম। পরিষ্কার দেখা গেল হাসছেন শুধু ছেলেটাকে যথাসাধ্য চরম আঘাত দিয়ে অপদস্থ করতে। এবং সত্যিই ক্ষুণ্ণ হল আলিওশা। সারা মুখে ওর নিদারুণ ক্ষোভ ফুটে উঠল। তাহলেও বাপের ফুর্তি শেষ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে রইল ও।

তারপর সখেদে বললে, 'আমার কথায় কেন হাসছ বলো তো বাবা? আমি খোলাখুলি অকপটে তোমাকে বলছিলাম। তোমার যদি মনে হয় বাজে বকছি, তাহলে বুঝিয়ে চৈতন্যোদয় করো, কিন্তু আমায় নিয়ে হেসো না। হাসির কী আছে এতে? আমি এখন যেগুলোকে পবিত্র ও উদার বলে মনে করছি তাতে? কিন্তু ধরো, আমি গুলিয়ে বসেছি, ধরো, এসবই বেঠিক, ভুল, আমি নিতান্ত বোকাই — সে তো তুমি বহুবারই বলেছ, কিন্তু ভুল যদি করে থাকি তো তা করছি সততার সঙ্গে, অকপটে। নিজের মর্যাদা আমি বিসর্জন দিই নি। বড়ো বড়ো আদর্শের আমি ভক্ত। তা ভুল হতে পারে, কিন্তু তার ভিত্তিটা পবিত্র। আমি তো তোমাকে বলেইছি, তুমি বা তোমাদের কেউ আমায় কখনো এমন কিছু বলো নি, যা আমায় পথ দেখাতে পারে, আমায় টানবে। এসব কথা খণ্ডন করো, ওদের চেয়েও ভালো কিছু বলো, আমি তাহলে তোমার পেছনেই যাব, কিন্তু আমায় নিয়ে হেসো না, সেটা ভারি মনে লাগে আমার।'

কথাগুলো আলিওশা বললে অসাধারণ একটা উন্নত সুরে, কেমন একটা কঠিন মর্যাদা নিয়ে। সহানুভূতির সঙ্গে নাতাশা লক্ষ্য করছিল ওকে। অবাক হয়ে প্রিন্স ছেলের কথা শুনলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই সুর পালটে নিলেন।

বললেন, 'তোমায় অপমান করার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিল না, বরং দুঃখই হচ্ছে তোমার জন্যে, জীবনে এমন একটা পদক্ষেপের জন্যে তৈরি হচ্ছ যাতে তোমার আর অমন একটা তরলমতি বালক হয়ে থাকা চলে না। এই কথাই ভাবছিলাম। হেসেছি নেহাৎ এমনি। তোমায় অপমান করার কোনো ইচ্ছে ছিল না আমার।'

একটু জ্বালা নিয়েই আলিওশা বলে চলল, 'আমার ওটা মনে হল কেন তাহলে? অনেক দিন থেকেই কেন মনে হচ্ছে যে তুমি আমায় বিদ্বেষের চোখে দেখছ, একটা নিষ্প্রাণ উপহাসের ভাব নিয়ে, ছেলের দিকে বাপ কখনো অমন করে চায় না। কেন আমার মনে হচ্ছে যে আমি হলে কখনো তোমার মতো অমন অপমান করে ছেলেকে নিয়ে হাসাহাসি করতাম না। শোনো, এখন শেষ বারের মতো একবার খোলাখুলি কথা হয়ে যাক আমাদের মধ্যে, পরে যেন আর ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে। এবং... আমি সত্যি কথাটাই বলি... ঘরে ঢুকেই কেমন মনে হয়েছিল, এখানেও কিছু একটা ভুল বোঝাবুঝি আছে। তোমাদের সকলকে ঠিক এমন একসঙ্গে দেখব, কেমন যেন আশা করি নি। ঠিক কি না? তা যদি হয়, তাহলে আমাদের প্রত্যেকের যে যার মনোভাব খোলাখুলি প্রকাশ করে বলাই ভালো হবে নাকি? খোলাখুলি হতে পারলে কত অকল্যাণই না দূর হয়!'

প্রিন্স বললেন, 'বলে যাও আলিওশা! তোমার প্রস্তাবটা খুবই বুদ্ধিমানের মতো। হয়ত, এইটা থেকেই শুরু করা উচিত ছিল আমাদের।' বললেন নাতাশার দিকে দৃষ্টিপাত করে।

'তাহলে আমার একেবারে খোলাখুলি কথায় রাগ করো না,' শুরু করলে আলিওশা, 'তুমি নিজেই তা চাইছ, নিজেই প্রস্তাব করেছ। শোনো, নাতাশার সঙ্গে আমার বিয়েতে তুমি সায় দিয়েছ। এ সুখ তুমি আমাদের মঞ্জুর করেছ আর তার জন্যে তুমি নিজেই নিজেকে জয় করেছ। তুমি মহানুভবতা দেখিয়েছ আর তোমার এ আচরণের কদর করেছি আমরা সকলেই। তাহলে কেন তুমি এখন অনবরত কেমন যেন খুশি হয়ে ইঙ্গিত করে চলেছ যে আমি এখনো নিতান্ত হাস্যকর ছেলেমানুষ, স্বামী হবার যোগ্য নই। শুধু তাই নয়, তুমি যেন আমায় নিয়ে হাসাহাসি করতে, অপদস্থ করতে, নাতাশার চোখে আমায়

এমনকি কলঙ্কিত করে তুলতে চাইছ? আমাকে কোনো একটা দিক থেকে হাস্যকর করে দেখাতে পারলে তুমি সর্বদাই ভারি খুশি হয়ে ওঠো! শুধু এখনই নয়, অনেকদিন থেকেই এটা লক্ষ্য করেছি। কেন জানি তুমি যেন আমাদের দেখাতে চাইছ যে আমাদের বিয়েটা হাস্যকর, উদ্ভট, আমরা পরস্পরের যোগ্য নই। সত্যি, তুমিই যা ব্যবস্থা করছ তুমি নিজেই যেন তাতে বিশ্বাস করো না। যেন এ সবটাই তোমার কাছে একটা ঠাট্টা, একটা মজাদার খেয়াল, একটা হাস্যকর রঙ্গ প্রহসন... তোমার কেবল আজকের কথাবার্তা থেকেই তো এটা আমি বলছি না। সেই সন্ধ্যেতেই, সেই মঙ্গলবারেই, এখান থেকে যখন আমি তোমার কাছে ফিরি তখন তোমার মুখে এমন অদ্ভুত কতকগুলো কথা শুনেছি, যাতে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, এমনকি ক্ষুব্ধই হয়েছিলাম। তারপর বুধবারেও চলে যাবার সময় তুমি আমাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কী সব কয়েকটা ইঙ্গিত করেছিলে, নাতাশার কথাও বলেছিলে, অপমানের সুরে নয়, বরং উল্টো, তবু তোমার কাছ থেকে যা শুনতে চাইছিলাম, কেমন যেন তেমন নয়, যেন বড়ো বেশি লঘু, যেন নাতাশা সম্পর্কে স্নেহ কি শ্রদ্ধা ছিল না তাতে... ঠিক করে বলা কঠিন, কিন্তু সুরটা ছিল পরিষ্কার, মনটা তা টের পাচ্ছে... বলো না আমি ভুল করছি; বুঝিয়ে আমার মত ফেরাও, খুশি করে দাও আমায়... আর নাতাশাকেও, কারণ ওকেও তুমি দুঃখ দিয়েছ। এখানে ঢুকে প্রথম দৃষ্টিপাতেই তা আন্দাজ করতে পেরেছি...'

কথাগুলো আলিওশা বললে বেশ তেজের সঙ্গে, দৃঢ়তা দেখিয়ে। কেমন একটা বিজয়ের ভাব নিয়ে নাতাশা শুনছিল, উত্তেজনায় জ্বলজ্বলে মুখে বার দুয়েক আপন মনে বলেওছিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই!' বিব্রত হয়ে উঠলেন প্রিন্স।

জবাবে বললেন, 'কী বলেছিলাম আলিওশা, সব অবশ্য আমার মনে নেই, কিন্তু আমার কথাগুলো তুমি যদি এইভাবে নিয়ে থাকো তাহলে সেটা ভারি আশ্চর্য। যথাসাধ্য তোমায় নিশ্চিন্ত করে আশ্বাস দিতে আমি রাজি। আর এখন যে হেসেছিলাম, সেটাও বোঝা কঠিন নয়। তোমায় বলি, ও হাসি দিয়ে আমার তিক্ততাটা ঢাকতে চেয়েছিলাম। যখন ভাবি, তুমি স্বামী হতে চলেছ, তখন জিনিসটা আমার কাছে একান্ত অবাস্তব, বিদঘুটে এবং মাপ করো, এমনকি হাস্যকর বলেই ঠেকছে। হেসেছি বলে তুমি অনুযোগ করছ। কিন্তু বলছি তোমায়, সেটা তোমার জন্যে। আমারও দোষ আছে অবিশ্যি, হয়ত ইদানীং তোমার উপর যথেষ্ট নজর রাখি নি, তাই শুধু এখন, এই সন্ধ্যেতেই টের পেলাম, কীরকম তোমার মুরদ। নাতালিয়া নিকোলায়েভনার

সঙ্গে তোমার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে আমার ভয়ই হচ্ছে। আমি একটু তাড়াহুড়োই করেছি, দেখছি তোমাদের দুজনের মধ্যে মিল প্রায় নেই। যেকোনো প্রেমই চলে যায়, কিন্তু অমিলগুলো থেকে যায় চিরকাল। আমি শুধু তোমার ভবিষ্যতের কথাই এক্ষেত্রে বলছি না। কিন্তু তোমার যদি সাধু সংকল্প থাকে তাহলে ভেবে দ্যাখো যে তোমার সঙ্গে সঙ্গে নাতালিয়া নিকোলায়েভনারও তুমি সর্বনাশ ঘটাবে, একেবারে তাঁর সর্বনাশ করবে! একঘণ্টা ধরে তুমি এখানে মানবপ্রেম আর বড়ো বড়ো বিশ্বাস আর তোমার পরিচিত সব উদারচেতা লোকেদের কথা শোনালে, কিন্তু ইভান পেত্রোভিচকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো, কিছু আগে এখানকার ওই জঘন্য সিঁড়ি ভেঙে চারতলায় ওঠার পরে প্রাণটা আর পা দু'খানা টিকে আছে দেখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলাম, তখন কী বলেছিলাম। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কী কথা মনে এসেছিল আমার জানো? নাতালিয়া নিকোলায়েভনার প্রতি তোমার এতটা ভালোবাসা সত্ত্বেও এমন একটা ফ্ল্যাটে উনি রয়েছেন তা তুমি কী করে সইছ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তোমার যদি সঙ্গতি না থাকে, দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা না থাকে, তাহলে স্বামী হবার, কোনো দায়িত্ব নেবার অধিকার যে তোমার নেই এটা তুমি কী করে না ভেবে পারো। শুধু প্রেম থাকলেই হয় না, প্রেম দেখানো হয় কাজ দিয়ে। কিন্তু তোমার ধারণা, "আমার সঙ্গে থেকে কষ্ট সইতে হলেও আমার সঙ্গেই থাকো।" এটা মানবিক নয়, মহনীয় নয়। সর্বজনীন প্রেমের কথা বলা, সর্বমানবিক সমস্যা নিয়ে উচ্ছ্বসিত হওয়া, অথচ খেয়াল নেই যে অপরাধ করছ প্রেমের কাছেই — এ আমার দুর্বোধ্য! বাধা দেবেন না নাতালিয়া নিকোলায়েভনা, শেষ করতে দিন। বড়ো বেশি তিক্ত ঠেকছে আমার, তাই খুলে বলতেই হবে। তুমি আলিওশা, আমাদের বললে যে গত কয়দিনে মহনীয়, অপরূপ, সাধু সব বিষয়ে তুমি আকৃষ্ট হয়েছ, আমার তিরস্কার করে বলেছ, আমাদের সমাজে তেমন কোনো আকর্ষণ নেই, আছে কেবল শুকনো সাংসারিক বুদ্ধি। তাহলে একবার ভেবে দ্যাখো: উন্নত আর অপরূপে তুমি আকৃষ্ট হচ্ছ অথচ মঙ্গলবার এখানে যা ঘটল তারপরে চার চার দিন এমন একজনকে তাচ্ছিল্য করে চলেছ যার মূল্য তোমার কাছে দুনিয়ায় সব থেকে বেশি হবার কথা। তুমি এমনকি স্বীকার করছ যে কাতেরিনা ফিওদরোভনার সঙ্গে তর্ক করেছ, নাতালিয়া নিকোলায়েভনা তোমায় এতই ভালোবাসে, এতই সে উন্নতমনা যে তোমার আচরণ মার্জনা করবেন। কিন্তু এ মার্জনার ওপর ভরসা করার, তা নিয়ে বাজি ধরার কী অধিকার আছে

তোমার? আর এই সারাটা সময় নাতালিয়া নিকোলায়েভনার মনে কতটা কষ্ট দিয়েছ, কী পরিমাণ দুশ্চিন্তা, সন্দেহ, দ্বিধা চাপিয়েছ তার মনে, সে কথা কি একবারও তোমার মনে হয় নি? তুমি কি ভাবো যে কতকগুলো কী সব নতুন আইডিয়ায় তুমি মুগ্ধ হয়েছ বলেই প্রাথমিক কর্তব্যেও অবহেলা করার অধিকার আছে তোমার? মার্জনা করবেন নাতালিয়া নিকোলায়েভনা, কথা রাখতে পারছি না। কিন্তু উপস্থিত অবস্থাটা কথা রাখার চেয়েও অতি গুরুত্বপূর্ণ, আপনি নিজেই তা বুঝতে পারবেন... এ কথা কি জানো আলিওশা যে, এমন মনঃকষ্টের মধ্যে আমি নাতালিয়া নিকোলায়েভনাকে দেখলাম যে পরিষ্কার বোঝা গেল, এ চার দিন ওঁর জন্যে তুমি কী নরক করে তুলেছিলে, অথচ এ চার দিনই হওয়া উচিত ছিল ওঁর জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন। একদিকে এমনি ধারা আচরণ আর অন্যদিকে শুধু কথা, কথা আর কথা... ঠিক বলছি? নিজেই তুমি আমায় অভিযোগ করতে পারো কি যখন নিজেই তুমি পুরোপুরি দোষী?'

প্রিন্স ভালকোভস্কি তাঁর কথা শেষ করলেন। নিজের বাগ্মিতায় উনি নিজেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, জয়ের ভাবটা আমাদের কাছ থেকেও আর চেপে রাখতে পারলেন না। নাতাশার কষ্টের কথা শুনে আলিওশা পীড়িত দৃষ্টিতে তাকালে নাতাশার দিকে, কিন্তু ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত করে নিয়েছে নাতাশা।

বললে, 'না, না, আলিওশা, দুঃখ ক'রো না, তোমার চেয়ে অন্যদের দোষ বেশি। বসো, শোনো তোমার বাবাকে আমার কী বলবার আছে। সব চুকিয়ে দেবার সময় এসেছে।'

প্রিন্স চেঁচিয়ে উঠলেন, 'খুলে বলুন নাতালিয়া নিকোলায়েভনা, একান্ত অনুরোধ আমার! গত দু'ঘণ্টা ধরে এইরকম ধাঁধার কথা শুনছি। একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে। বলতে বাধ্য যে এরকম অভ্যর্থনা এখানে আমি আশা করি নি।'

'তা বোধ হয় ঠিক; ভেবেছিলেন কথা দিয়ে আমাদের এমন মুগ্ধ করে দেবেন যে আপনার গোপন অভিসন্ধি আমরা টের পাব না। কিন্তু আপনার কাছে খুলে বলবার কী আছে? সবই তো আপনি জানেন, সবই বুঝছেন। আলিওশা ঠিকই বলেছে। আপনার সর্বাগ্রে ইচ্ছা আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো। আগে থেকেই আপনি প্রায় অক্ষরে অক্ষরে জানতেন, গত মঙ্গলবারের পর কী কী এখানে ঘটবে, সব একেবারে গুণে গেঁথে রেখেছিলেন। আগেই আপনাকে আমি বলেছি, আমার ওপর, বিয়ের যে প্রস্তাব আপনি করেছিলেন

তার ওপর আপনি কোনো গুরুত্ব দেন নি। আমাদের নিয়ে মজা করছেন আপনি, খেলা খেলেছেন আর একটা মতলব আছে আপনার যা আপনিই জানেন। এ খেলা আপনার ভারি পাকা। এ সবকিছুই আপনি একটা প্রহসন রূপে দেখছেন বলে আলিওশা যে অনুযোগ করেছে, সেটা ঠিকই করেছে। আলিওশাকে তিরস্কার না করে আপনার বরং আনন্দ করাই উচিত ছিল, কেননা ওর কাছ থেকে আপনি যা আশা করেছিলেন কিছু না জেনেই আলিওশা তা সবই করেছে, হয়ত একটু বেশিই করেছে।'

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম আমি। এটা জানতামই যে কিছু একটা বিপর্যয় ঘটবে সে সন্ধ্যায়। কিন্তু নাতাশার বড়ো বেশি তীক্ষ্ম সিধে কথা আর অনাবৃত ঘেন্নার সুর আমায় একেবারে বিমূঢ় করে দিয়েছিল। মনে হল, নিশ্চয় তাহলে ও কিছু জানে, তাই সম্পর্কচ্ছেদের জন্যে ও একেবারে পণ করে বসেছে। মুখের ওপরেই সবকিছু বলবার জন্যেই হয়ত-বা অধীর হয়েই ও প্রিন্সের অপেক্ষা করছিল। একটু বিবর্ণ হয়ে গেলেন প্রিন্স। আলিওশার মুখে ফুটে উঠল সরল একটা আশংকা আর মর্মভেদী প্রতীক্ষা।

প্রিন্স চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমায় কী দোষ দিলেন তা একটু মনে করুন, যা বলছেন একটু ভেবে দেখুন অন্তত... আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

নাতাশা বললে, 'ও, দুটো কথায় বুঝতে চান না তাহলে। এমনকি ও, এমনকি আলিওশা পর্যন্ত আপনাকে ঠিক আমার মতোই ধরতে পেরেছে, যদিও সে সম্পর্কে একটা কথাও হয় নি আমাদের, দেখাই হয় নি! ওরও মনে হয়েছে, আপনি আমাদের সঙ্গে একটা হেয় অপমানকর খেলা খেলছেন, অথচ ও আপনাকে ভালোবাসে, দেবতার মতো বিশ্বাস করে। ওর সঙ্গে যে আর একটু সতর্ক, আর একটু ধূর্ত হবার প্রয়োজন ছিল তা আপনার মনে হয় নি, ভেবেছিলেন ও আপনার চাল ধরতে পারবে না। কিন্তু মনটা ওর নরম, স্পর্শাতুর, অনুভূতিপ্রবণ — আপনার কথা, ও যা বলল, আপনার বলার 'সুরটাতে'ই আঘাত লেগেছে ওর মনে...'

'একটা কথাও বুঝতে পারছি না, একটা কথাও না,' ফের বললেন প্রিন্স একান্ত বিমূঢ়তার এক ভাব নিয়ে, আমার দিকে ফিরে, যেন সাক্ষী মানতে চান আমাকে। বিরক্ত এবং উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন উনি। নাতাশাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আপনি সন্দিগ্ধ, ভয় হয়েছে আপনার। কাতেরিনা ফিওদরোভনা সম্পর্কে স্রেফ ঈর্ষা হয়েছে আপনার, তাই দুনিয়ার সককলকার

দোষ ধরতে চাইছেন, সবার আগে আমার এবং... মাপ করবেন, কথাটা বলেই ফেলি: আপনার স্বভাব সম্পর্কে একটা অদ্ভুত ধারণা হওয়াই সম্ভব... এমন কাণ্ডে আমি অভ্যস্ত নই। আমার ছেলের স্বার্থ জড়িত না থাকলে আর এক মুহূর্ত আমি এখানে থাকতাম না... এখনো অপেক্ষা করে আছি, কৃপা করে আপনি সবটা বুঝিয়ে বলবেন কি?'

'তাহলে এখনো আপনি জেদ ধরে আছেন, হুবহু সব জানলেও আমার দুটো কথা থেকে আপনি সব বুঝতে রাজী নন। অবশ্য-অবশ্যই আপনি চাইছেন যে সব খোলাখুলি বলব?'

'শুধু সেইটুকুই আমার প্রার্থনা।'

'বেশ, তাহলে শুনুন।' চেঁচিয়ে উঠল নাতাশা, রাগে চোখ জ্বলছিল ওর, 'সব সবকিছুই তাহলে বলি।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উঠে দাঁড়াল ও, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলতে শুরু করলে, উত্তেজনায় সেটা ওর খেয়াল হয় নি। কিছুক্ষণ শোনার পর প্রিন্সও উঠে দাঁড়ালেন। গোটা দৃশ্যটা হয়ে উঠল বড়ো বেশি গুরুতর।

নাতাশা বললে, 'মঙ্গলবার আপনি নিজ মুখে যা বলেছিলেন মনে করে দেখুন। বলেছিলেন আপনি চান টাকা, মসৃণ পথ, সমাজে প্রতিপত্তি, মনে আছে?'

'মনে আছে।'

'মঙ্গলবারে আপনি এখানে এসেছিলেন সেই টাকার জন্যে, যা যা আপনার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে সেই সব প্রতিষ্ঠা ফিরে পাবার আশায়, এবং এই বিয়ের ব্যাপারটি আপনার মাথায় খেলল, ভেবেছিলেন যা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে এই তামাশাটায় তা ফিরে পেতে আপনার সাহায্য হবে।'

'নাতাশা!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'একটু ভেবে কথা ব'লো!'

ভয়ানক একটা মর্যাদা হানির ভাব করে পুনরাবৃত্তি করলেন প্রিন্স, 'তামাশা! মতলব!'

মর্মাহত হয়ে ফ্যালফ্যাল চেয়ে রইল আলিওশা, মাথায় কিছুই প্রায় ঢুকছিল না।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমায় থামাবেন না।' রুষ্ট হয়ে বলে চলল নাতাশা, 'শপথ নিয়েছি সব বলবই। আপনি নিজেই মনে করে দেখুন: আলিওশা আপনার কথা শুনছিল না। পুরো ছ'মাস ধরে আপনি ওকে ভজিয়েছেন আমার কাছ থেকে সরে যাবার জন্যে। আপনার ও কথা মানে নি। হঠাৎ সেই মুহূর্ত এল যা আর নষ্ট করার অবকাশ রইল না। সেটা ফসকে গেলেই কনে, টাকাকড়ি — সবচেয়ে বড়ো কথা টাকা, যৌতুকের তিরিশ লাখ আপনার হাতছাড়া হয়ে যায়। একটাই পথ ছিল আপনার — যে মেয়েটিকে আপনি কনে ঠিক করেছেন তার সঙ্গে আলিওশার প্রেম ঘটানো। ভেবেছিলেন, ওর সঙ্গে যদি প্রেমে পড়ে যায়, তাহলে হয়ত আলিওশা আমায় ছেড়ে যাবে।'

'নাতাশা, নাতাশা! কী বলছ তুমি!' যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল আলিওশা।

আলিওশার চিৎকারে কান না দিয়ে নাতাশা বলে গেল, 'আপনি ঠিক তাই করলেন, কিন্তু আবার সেই একই গেরো। সবই ঠিকঠাক হয়ে যেত, কিন্তু ফের কাঁটা হয়ে দাঁড়ালাম আমি। শুধু একটা জিনিসেই আপনার ভরসা ছিল, আপনি অভিজ্ঞ, ধূর্ত, তখনই হয়ত লক্ষ্য করেছিলেন যে মাঝে মাঝে আলিওশা তার পুরনো আসক্তিতে পীড়িত বোধ করছে। নিশ্চয় এটা লক্ষ্য না করে আপনি পারেন নি যে আমায় ও অবহেলা করতে শুরু করেছে, একঘেয়ে লাগছিল ওর, একনাগাড়ে পাঁচ দিন ধরে আমার কাছে ও আসছে না। নিশ্চয়, একেবারেই ব্যাজার ধরে যাবে, ছেড়ে যাবে আমায়, কিন্তু হঠাৎ মঙ্গলবার আলিওশার দৃঢ় আচরণে আপনি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যান। কী তখন করার থাকে আপনার!..'

প্রিন্স বলে উঠলেন, 'বরং উল্টো, ও ঘটনাটায়...'

নাতাশা দৃঢ়ভাবে বাধা দিলে, 'আমি বলছি শুনুন, সেদিন সন্ধ্যেয় আপনি নিজেকে শুধিয়েছিলেন, "কী এখন করা যায়?" এবং ঠিক করলেন: আমার সঙ্গে ওর বিয়ে মঞ্জুর করা যাক, সত্যি সত্যি নয়, শুধু এমনি, মুখের কথায়, নিতান্তই ওকে শান্ত করার জন্যে। ভেবেছিলেন, বিয়ের দিন তো যত খুশি পিছিয়ে দেওয়া যায়, ইতিমধ্যে ওই নতুন প্রেমটা শুরু হল, আপনি সেটা লক্ষ্য করেছিলেন। এবং এই নতুন প্রেমের সূত্রপাতটার ওপরেই ভরসা করে রইলেন আপনি।'

'নভেলিপনা! নভেলিপনা!' অস্ফুটস্বরে মন্তব্য করলেন প্রিন্স, যেন নিজের মনেই বলছেন, 'একাকীত্ব, স্বপ্নাতুরতা আর নভেল পাঠ!'

'হ্যাঁ, এই নতুন প্রেমের ওপরেই সবকিছু ভরসা করে ছিলেন আপনি,' পুনরাবৃত্তি করলে নাতাশা, প্রিন্সের মন্তব্য ওর কানেও গেল না, নজরও করলে না, ক্ষিপ্ত উত্তেজনায় ক্রমেই ভেসে যেতে লাগল ও, 'আর নতুন এই প্রেমের সম্ভাবনা ছিল কত! সেটা তো শুরু হয় মেয়েটির সবখানি গুণ জানার আগেই। সেদিন সন্ধ্যেয় ও যখন প্রকাশ করে বললে যে, ওকে ও ভালোবাসতে পারবে না, কেননা আর একটি প্রেম এবং কর্তব্যজ্ঞানের ফলে তা অসম্ভব, তখন মেয়েটি হঠাৎ এমন এক মহত্ত্বের পরিচয় দিল, ওর এবং প্রতিদ্বন্দ্বিনীর প্রতি এমন সহানুভূতি দেখাল, এমন আন্তরিকভাবে ক্ষমা করল যে মেয়েটির সৌন্দর্যে ওর বিশ্বাস থাকলেও এই মুহূর্তের আগে সে কখনো ভাবে নি যে মেয়েটি এত অপূর্ব। আমার কাছেও তখন এসে কেবল ওর কথাই বলেছে; অত্যন্ত অভিভূত হয়ে গিয়েছিল ও। নিশ্চয় পরদিনই এই অপরূপ মেয়েটিকে অন্তত কৃতজ্ঞতার বশে হলেও ফের আর একবার দেখবার দুর্নিবার তাগিদ বোধ না করে ও পারে না। আর কেনই বা ও যাবে না? পুরনো সে মেয়েটির তো আর কষ্ট নেই, তার ভবিষ্যত স্থির হয়ে গেছে, ওর সারা জীবনই তো তার জন্যে, আর এর জন্যে তো শুধু এক মিনিট... এই এক মিনিটের জন্যেই যদি তার নাতাশা ঈর্ষা বোধ করে, তবে সেটা কী অকৃতজ্ঞতাই না হবে। অজান্তেই ও নাতাশার কাছ থেকে কেড়ে নিলে শুধু এক মিনিট নয়, একদিন, দুই দিন, তিন দিন... এবং ইতিমধ্যে মেয়েটির এক নতুন অপ্রত্যাশিত রূপ ধরা পড়ল ওর চোখে — অতি উঁচু মন তার, অতি উৎসাহী, অথচ সেই সঙ্গেই ভারি সরল ছেলেমানুষ, আর এ দিক থেকে স্বভাবে একেবারে ওরই মতো। বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের শপথ নেয় ওরা, কামনা করে সারা জীবন যেন ছাড়াছাড়ি না হয়। "মাত্র পাঁচ-ছয় ঘণ্টা আলাপের মধ্যেই" ওর মন ভরে ওঠে নতুন নতুন অনুভূতিতে, গোটা হৃদয় দিয়ে দেয়... আপনি ভাবছেন, শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় একটা সময় আসবে যখন ও তার পুরনো প্রেমের সঙ্গে তুলনা করবে এই তাজা নতুন অনুভূতিগুলোর। পুরনো সে প্রেমের ওখানে সবই ভারি পরিচিত, বরাবরের মতো, ওখানে সবই খুব গুরুগম্ভীর, বাধ্যবাধকতা, ওখানে ওর প্রতি ঈর্ষা আর তিরস্কার, চোখের জল... ওর সঙ্গে খুনশুটি বা লীলা-খেলা করলেও সেটা করা হয় যেন শিশুর সঙ্গে, সমানে সমানে নয়... আর বড়ো কথা, ওখানে সবই খুব আগের মতো জানা-শোনা...'

চোখের জলে, তিক্ততার দমকে গলা বুজে এল নাতাশার, কিন্তু আরো এক মিনিট সে সংযত করে রাখলে নিজেকে।

'আর তারপর? তারপর তো সময় আছেই। নাতাশার সঙ্গে বিয়ে তো আর এখনই হচ্ছে না, অনেক সময় পড়ে আছে, সবই বদলে যাবে... এবং আছে আপনার কথা, আভাস-ইঙ্গিত, ব্যাখ্যা, বাগ্মিতা... বিরক্তিকর ওই নাতাশার বিরুদ্ধে মিথ্যা একটা অপবাদও দেওয়া যায়; খারাপ বলে ওকে দেখানো যেতে পারে... কী করে যে তা শেষ হবে তা না জানলেও জয় আপনার অবধারিত! আলিওশা, আমায় দোষ দিয়ো না, লক্ষ্মীটি। এ কথা ব'লো না যে তোমার ভালোবাসা সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই, তার কদর করি না। আমি যে জানি তুমি এখনো আমায় ভালোবাসো, হয়ত এই মুহূর্তে আমার অভিযোগ তুমি বুঝতে পারবে না। এখন এসব কথা বলে আমি অতি, অতি অন্যায় করেছি জানি। কিন্তু কী যে করি, যখন এসবই আমি বুঝতে পারছি, তোমায় ভালোবাসছি কেবলি বেশি করে, একেবারে... পাগলা হয়ে!'

হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ও ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে ফোঁপাতে লাগল ছেলেমানুষের মতো। চেঁচিয়ে উঠে আলিওশা ছুটে গেল ওর দিকে। নাতাশাকে কাঁদতে দেখলে ও কখনো অশ্রুহীন থাকতে পারে না।

নাতাশার এই কান্নায় বোধ হয় প্রিন্সের বেশ সুবিধা হয়ে গেল: সুদীর্ঘ এই কৈফিয়তের মধ্যে নাতাশা যেভাবে মেতে উঠেছিল, আক্রমণের যে তীব্রতা ফুটে উঠেছিল তাতে অন্তত সৌজন্যের খাতিরেও প্রিন্সকে আহত বোধ করতে হত, সে সবই এমন ঈর্ষার একটা উন্মাদ দমক, একটা আহত প্রেম, এমনকি অসুস্থতা বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে। এমনকি সহানুভূতি প্রকাশই করা উচিত।

প্রিন্স সান্ত্বনা দিলেন, 'শান্ত হন নাতালিয়া নিকোলায়েভনা, প্রবোধ মানুন। এসব ক্ষিপ্ততা, কল্পনা, একাকীত্ব... ওর লঘুচিত্ত আচরণে আপনি ভারি বিরক্ত হয়ে উঠেছেন... কিন্তু ওর পক্ষে এটা মাত্র লঘুচিত্ততা। সবচেয়ে বড়ো কথা, যেটা বিশেষ করে বলেছেন, মঙ্গলবারের সেই ঘটনা থেকেই তো আপনার প্রতি ওর ভালোবাসার গভীরতাটাই প্রমাণ হওয়া উচিত, অথচ আপনি কল্পনা করেছেন...'

তিক্ত কান্নায় বাধা দিলে নাতাশা, 'দোহাই, কিছু বলবেন না আমায়, অন্তত এখন আর আমায় যন্ত্রণা দেবেন না। মন আমায় সবই বলেছে। বলেছে বহু দিন আগেই! ওর পুরনো প্রেম যে কেটে গেছে সে কথা আমি সত্যিই বুঝি নি ভাবছেন... এখানে, এই ঘরে একা একা... ও আমায় ছেড়ে গেল, ভুলে গেল যখন... সবকিছু সয়েছি আমি... সবকিছু ভেবে দেখেছি...

আর কী করার ছিল আমার? তোমায় দোষ দিচ্ছি না আলিওশা... কিন্তু আমায় আর প্রতারণা করবেন কি? নিজেকে প্রতারণার চেষ্টা আমিও কি করি নি ভেবেছেন... ওহ্ কতবার, কতবার! ওর গলার স্বরের প্রত্যেকটি মীড় কি আমি শুনি নি? ওর মুখের, ওর চোখের ভাব কি আমি বুঝি নি!.. সব, সব শেষ হয়ে গেছে একেবারে, সব চুকে গেছে!.. হতভাগিনী আমি!'

ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আলিওশা কাঁদছিল।

ফোঁপানির দমকে দমকে বলতে লাগল, 'সত্যি আমার দোষ, এ সবই আমার অপরাধ!'

'না, না, নিজের ওপর দোষ টেনে নিয়ো না, আলিওশা... দোষ অন্যদের... আমাদের শত্রুদের। তাদেরই কাজ এটা... তাদেরই কাজ!'

অবশেষে কিছুটা অধৈর্য নিয়েই প্রিন্স শুরু করলেন, 'শেষ পর্যন্ত, অন্তত বলুন, কী কারণ পেলেন যাতে এই সমস্ত... অপরাধ আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন? সেটা তো আপনার একটা অনুমান। প্রমাণ নেই কিছু...'

আরাম কেদারা থেকে ত্বরিতে উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল নাতাশা, 'প্রমাণ! আপনাকে প্রমাণ দেখাতে হবে! কুটিল লোক আপনি। প্রস্তাবটা নিয়ে এখানে যখন এসেছিলেন, তখন এ ছাড়া আর কিছু আপনি করতে পারতেন না। ছেলেকে শান্ত করার দরকার পড়েছিল আপনার, দরকার ছিল ওর বিবেক দংশনকে ঘুম পাড়ানো, যাতে অবাধে, সহজ মনে ও আত্মনিবেদন করতে পারে কাতিয়ার কাছে। তা না হলে সব সময়ই আমার কথা ওর মনে পড়ত, আপনার কথা ও শুনত না, ওদিকে অপেক্ষা করে করে আপনার বিরক্তি ধরে যেত। বলুন, সত্যি নয়?'

ব্যঙ্গের হাসি হেসে প্রিন্স বললেন, 'আপনাকে প্রতারণা করতে চাইলে ওরকম একটা পরিকল্পনা আমার থাকতে পারত, তা মানছি। আপনি অতি... খরবুদ্ধি, কিন্তু এমন ভর্ৎসনা দিয়ে মানুষকে অপমান করার আগে আপনার প্রমাণ দাখিল করা উচিত ছিল...'

'প্রমাণ! আগে যখন ওকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন, তখন আপনার এই আচরণটা? জাগতিক লাভের জন্যে, টাকার জন্যে যে ছেলেকে এ ধরনের কর্তব্যে অবহেলা করতে, তা নিয়ে খেলা করতে শেখায়, সে তাকে অধঃপতিত করে! কিছু আগে সিঁড়িটার কথা, বিচ্ছিরি বাসাটার কথা কী বলছিলেন? কিন্তু ওকে আগে যা দিতেন সে ভাতা

বন্ধ করে দিয়ে, অভাব-অনটন খিদের জ্বালায় ফেলে আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে চেয়েছিল কে, আপনি না? এ বাসা আর এ সিঁড়ি আপনারই দোষে, আর এখন আপনিই ওকে সেজন্যে বকতে লেগেছেন, দুর্মুখো মানুষ আপনি! আর তখন, সেই সন্ধেয় আপনার মধ্যে অমন ভাবাবেগ, অমন অভিনব, আপনার পক্ষে অস্বাভাবিক একটা প্রত্যয় দেখা গেল কোত্থেকে? আমায় আপনার অত দরকার পড়ল কেন? এ চার দিন আমি ঘরময় পায়চারি করে করে সবকিছু ভেবে দেখেছি; খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করেছি আপনার প্রতিটি কথা, আপনার মুখের প্রতিটি ভাব এবং স্থিরনিশ্চয় হয়েছি যে, সবটাই একটা ছলনা, তামাশা, অপমানকর, নীচ, অশোভন একটা প্রহসন... আপনাকে যে আমি চিনি, অনেক দিন থেকে চিনি। আপনার কাছ থেকে আলিওশা যখন এখানে আসত, প্রতিবার ওর মুখ দেখেই আমি টের পেতাম কী ওকে বলেছেন, কী বোঝাতে চেয়েছেন। ওর ওপর আপনার প্রভাব লক্ষ্য করে দেখেছি। না, আমায় ধোঁকা দিতে পারবেন না! হয়ত আরো কিছু অভিসন্ধি আপনার আছে, হয়ত আসল কথাটাই আমি এখনো বলতে পারি নি, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আমায় আপনি ঠকিয়ে এসেছেন — সেই হল সবচেয়ে বড়ো কথা। সেই কথাটাই আপনার মুখের ওপর বলার দরকার ছিল!..'

'বাস, শুধু এই? এইটুকুই আপনার যা কিছু প্রমাণ? কিন্তু ক্ষিপ্তা নারী, ভেবে দেখুন, আমার মঙ্গলবারের প্রস্তাবটাকে আপনি যা বলছেন সেই চাল মেরে আমি বড়ো বেশি হাত-পা বাঁধা হয়ে গেছি। আমার পক্ষে সেটা হত খুবই অবিবেচনা।'

'হাত-পা বাঁধা হলেন কিসে, কী করে? প্রতারণা করতে আপনার কী? কোনো একটা মেয়ের মনে ঘা দিলেন তাতে কী এসে যায় আপনার? সে মেয়ে তো এক গৃহত্যাগী হতভাগিনী, আপন বাপই তাকে ত্যাগ করেছে, অসহায়, কলঙ্কিনী, চরিত্রহীনা! এ তামাশায় যদি কিছু, এমনকি এতটুকুনও লাভ হয়, তাহলে কী দরকার ওর জন্যে ভদ্রতা করে?'

'কিন্তু নিজেকে যে অবস্থায় ফেলছেন, তা একটু ভেবে দেখুন নাতালিয়া নিকোলায়েভনা! আপনি একান্ত জোর দিয়ে কেবলি বলছেন, আমি আপনাকে অপমান করেছি। কিন্তু সে অপমানটা এত গুরুত্বপূর্ণ, এত হীন যে সে কথায় জোর দেওয়া তো দূরস্থান, কী করে ভাবা সম্ভব তাই বুঝছি না। একথা বলছি বলে ক্ষমা করুন, এত সহজে ওটা ধরে নিতে হলে সাত ঘাটের জল খাওয়া

দরকার। আপনাকে তিরস্কার করার অধিকার আছে আমার, কেননা আমার ছেলেকে আপনি আমারই বিরুদ্ধে লাগাচ্ছেন। আপনার পক্ষ নিয়ে ও এখনো আমার বিরুদ্ধে না দাঁড়ালেও মনটা ওর বিরূপ হয়ে আছে আমার ওপর...'

'না বাবা, না!' চেঁচিয়ে উঠল আলিওশা, 'তোমার বিরুদ্ধতা যে করছি না, তার কারণ আমার বিশ্বাস, ওরকম অপমান তুমি করতে পারো না, এরকম অপমান করা সম্ভব বলেই আমার মনে হয় না!'

প্রিন্স চেঁচিয়ে উঠলেন, 'শুনলেন?'

'নাতাশা, এসবই আমার ত্রুটি, ওঁকে দোষ দিয়ো না। সে ভারি অন্যায়, অসহ্য।'

'শুনলে তো ভানিয়া। এর মধ্যেই ও আমার বিপক্ষে চলে গেছে।' চেঁচিয়ে উঠল নাতাশা।

প্রিন্স বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে। দুঃসহ এ দৃশ্যটার যবনিকা টানা দরকার। ঈর্ষার অন্ধ বন্য এই মাত্রাছাড়া বিস্ফোরণ থেকে একেবারেই অন্য রূপে ফুটে উঠছে আপনার চরিত্র। হুঁশিয়ার হওয়া গেল। বেশি তাড়াহুড়ো করেছি, সত্যিই তাড়াহুড়ো। কী পরিমাণ আপনি আমায় অপমান করলেন সেটা খেয়ালেও নেই আপনার, তাতে আপনার কিছুই এসে যায় না। হ্যাঁ, তাড়াহুড়ো করেছি, তাড়াহুড়োই করেছি... আমার কথার খেলাপ করা অবশ্যই উচিত নয়... কিন্তু আমি তো বাপ, ছেলের সুখ আমায় দেখতে হবে...'

দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে নাতাশা চেঁচিয়ে উঠল, 'কথা ফেরত নিচ্ছেন আপনি! সুযোগ পেয়ে খুশি হয়ে উঠেছেন! কিন্তু আপনাকে বলি শুনুন, দুই দিন আগে এইখানে একা একাই আমি স্থির করে ফেলেছিলাম, প্রতিশ্রুতি থেকে ওকে আমি মুক্তি দেব, এবং সেটা এখন সকলের সামনেই আমি বলছি, ওকে বিয়ে করতে আমি চাই না।'

'অর্থাৎ, ওর মধ্যে আপনি ফের হয়ত ওর সেই পুরনো উদ্বেগবোধটাকে জাগিয়ে তুলতে চান, জাগাতে চান ওর কর্তব্য, নিজের দায়িত্ব নিয়ে ওর সমস্ত মন-পোড়ানি (আপনি নিজেই এখুনি যা বললেন) যাতে ফের ও আপনার সঙ্গে আগের মতো বাঁধা পড়ে। এটা তো দাঁড়াচ্ছে আপনার নিজেরই থিয়োরি অনুসারে: সেই জন্যেই আমি একথা বলছি। কিন্তু থাক, যথেষ্ট হয়েছে, সময়েই মীমাংসা হবে সবকিছুর। অনেক শান্ত একটা মুহূর্তের অপেক্ষায় থাকব, তখন আমার বক্তব্য বলব। আশা করি, আমাদের সম্পর্ক একেবারেই চুকে যাচ্ছে না। এটাও আশা রইল, আমায় আপনি আরো একটু ভালোভাবে

কদর করতে শিখবেন। আজকেই ভেবেছিলাম, আপনাদের পরিবার সম্পর্কে আমার পরিকল্পনাটা আপনাকে জানাব, তাতে আপনি দেখতে পেতেন... কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে! ইভান পেত্রোভিচ!' আমার কাছে এসে উনি বললেন, 'এ আমার দীর্ঘ দিনের ইচ্ছা তো বটেই, কিন্তু বিশেষ করে এখন তো আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত হতে পারাটা আমার কাছে খুবই মূল্যবান হয়ে উঠবে। আশা করি, আপনি আমায় বুঝতে পারবেন। দু'এক দিনের মধ্যেই আপনার ওখানে যাব, অনুমতি দিচ্ছেন?'

আমি মাথা নোয়ালাম। আমার নিজেরই মনে হল, এখন আর ওঁর সঙ্গে আলাপ আমার এড়ানো আর সম্ভব নয়। আমার করমর্দন করলেন প্রিন্স, নীরবে অভিবাদন জানালেন নাতাশাকে, তারপর আহত মর্যাদার ভাব করে বেরিয়ে গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কয়েক মিনিট কেউ কোনো কথা কইলাম না। চিন্তিত বিষাদমগ্ন পর্যুদস্ত হয়ে বসে রইল নাতাশা। ওর সমস্ত উদ্যোগ যেন ওকে ছেড়ে গেছে। সোজা সামনে তাকিয়ে ছিল ও, কিন্তু কিছুই দেখছিল না, আলিওশার হাতটা হাতে ধরা, যেন সবকিছু ভুলে গেছে ও। চোখের জল ঝরিয়ে ঝরিয়ে আলিওশা তার দুঃখ প্রশমন করছিল নীরবে, থেকে থেকে ভীরু ঔৎসুক্যে তাকিয়ে দেখছিল নাতাশার দিকে।

শেষ পর্যন্ত ভয়ে ভয়ে ও শুরু করলে ওকে সান্ত্বনা দিতে, মিনতি করলে রাগ না করতে, নিজেকে দোষ দিলে। বোঝা যাচ্ছিল বাপের দোষ স্খালন করবার জন্যে ওর ভারি ইচ্ছে, এবং বিশেষ করে সেইটেই ওর মনে চেপে রয়েছে। কয়েকবার কথাটা ও পেড়েছিল, কিন্তু ফের নাতাশা উত্তেজিত হয়ে উঠবে, রেগে উঠবে, এই ভয়ে সেটা পরিষ্কার করে বলে ফেলার সাহস পায় নি। চিরন্তন অটল প্রেমের শপথ নিলে ও এবং কাতিয়ার প্রতি অনুরাগের সমর্থন করলে উত্তেজিতভাবে। বার বার করে বললে, কাতিয়াকে ও ভালোবাসে কেবল বোনের মতো, মিষ্টি, সহৃদয় একজন বোনের মতো, তাকে সে একেবারে পরিত্যাগ করতে পারে না। সে কাজ তার পক্ষে ভারি বিছছিরি এবং নিষ্ঠুরই হবে। বার বার করে এইটে বোঝালে, কাতিয়ার সঙ্গে নাতাশার জানাশোনা হলেই তক্ষুনি ওরা খুব বন্ধু হয়ে যাবে, এবং এতই বন্ধুত্ব হবে যে কখনো

ওরা কেউ কাউকে ছেড়ে যাবে না, ভুল বোঝাবুঝির অবকাশই আর হবে না কখনো। এই আইডিয়াটা ভারি মনে ধরেছিল ওর। বেচারী সত্যিই মিথ্যা বলে নি। নাতাশার আশঙ্কা ও বুঝে উঠতে পারছিল না, বাবার কাছে নাতাশা কিছুক্ষণ আগে যা বললে, তাও ভালো করে একেবারেই বোঝে নি। শুধু এইটুকু বুঝেছিল যে, ওদের মধ্যে একটা ঝগড়া হয়ে গেল, এবং এইটেই বোঝার মতো চেপে রইল ওর মনের ওপর।

নাতাশা জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার বাবার প্রতি আমার আচরণে দোষ দিচ্ছ আমায়?'

সখেদে ও বললে, 'আমিই যেক্ষেত্রে সবকিছুর কারণ, সবকিছুর জন্যে দোষী যখন, তখন তোমায় দূষব কী করে? আমিই তোমায় অমন রাগিয়ে তুলেছি, রাগের বশে তুমি ওঁকে দোষ দিয়েছ কেননা আমার দোষ তুমি কাটাতে চাইছিলে। সবসময়েই তুমি আমার পক্ষ নাও, অথচ আমি তার যোগ্য নই। দোষীকে খুঁজে পেতে হত আর তুমিও ভেবে বসলে উনি দোষী। কিন্তু সত্যিই, সত্যিই ওঁর দোষ নেই।' উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল আলিওশা, 'এখানে উনি এসেছিলেন, সে কি ওই কথা ভেবে? এই কি তিনি আশা করেছিলেন?'

কিন্তু যেই দেখল নাতাশা ওর দিকে বিষণ্ণ ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অমনি ও মুহূর্তেই নিভে এল।

বললে, 'মাপ করো; আর বলব না। এসবই আমার দোষ।'

কষ্টের সুরে নাতাশা বলে চলল, 'হ্যাঁ আলিওশা, উনি এবার এসে দাঁড়িয়েছেন আমাদের মাঝখানে, সারা জীবনের জন্যে আমাদের মধ্যেকার শান্তি নষ্ট করে দিয়ে গেলেন। চিরকাল তুমি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করে এসেছ আমাকেই, এবার তোমার মনে আমার সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়ে গেলেন উনি, অবিশ্বাস। তুমি দোষ দিচ্ছ আমায়, তোমার হৃদয়ের আধখানা উনি কেড়ে নিয়ে গেলেন আমার কাছ থেকে। দু'জনের মাঝখান দিয়ে ছুটে গেছে একটা কালো বেড়াল।'

'অমনভাবে ব'লো না নাতাশা। "কালো বেড়াল" বলছ কেন?' কথাটায় মনে ঘা লেগেছিল ওর।

নাতাশা বলে গেল, 'উনি তাঁর কপট দয়ায়, মিথ্যা উদারতায় তোমায় নিজের দিকে টেনে নিয়েছেন। এখন থেকে ক্রমেই বেশি করে তোমায় আমার বিরুদ্ধে লাগাবেন।'

আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল আলিওশা। চেঁচিয়ে উঠল, 'দিব্যি দিয়ে বলছি, মোটেই নয়! "তাড়াহুড়ো করেছি" কথাটা বলেছিলেন চটে গিয়ে। দেখে নিয়ো, কালকেই, দু'এক দিনের মধ্যেই ওঁর টনক নড়বে। আর যদি ওঁর এতই রাগ হয়ে থাকে যে সত্যিই আমাদের বিয়ে চাইছেন না, তাহলে, শপথ করছি ওঁর কথা আমি মানব না। তেমন জোর বোধ হয় আমার আছে... আর জানো, কে আমাদের সাহায্য করবে?' নিজের কল্পনায় হঠাৎ উল্লসিত হয়ে ও চেঁচিয়ে উঠল, 'কাতিয়া সাহায্য করবে আমাদের! দেখে নিয়ো তুমি, দেখে নিয়ো, কী অপূর্ব মেয়ে ও! দেখে নিয়ো, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হয়ে ও আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাতে চায় কিনা! বিয়ের পরদিন থেকেই যাদের ভালোবাসা চলে যায়, আমি তাদেরই মতো, একথা ঐ যে বললে, সে তোমার ভারি অন্যায়! কথাটা শুনে ভারি কষ্ট লাগল আমার! মোটেই আমি অমন নই, কাতিয়ার কাছে যদি ঘন ঘন গিয়ে থাকি, তবে...'

'ওহ্ আলিওশা, যখন খুশি যাও না কাতিয়ার কাছে। সে কথা আমি মোটেই বলি নি। মোটেই বোঝে নি আমার কথা। যার কাছে সুখী হবে, তার কাছেই যেয়ো। তোমার হৃদয়ের যতটা আমায় দিতে পারো তার বেশি তো আর আমি চাইতে পারি না...'

মাভরা এসে ঢুকল।

'চা'টা আনব নাকি? দু'ঘণ্টা ধরে সামোভারে জল ফুটছে, তামাশা নয়। এগারোটা বাজে।'

কথা বললে ও রূঢ়ভাবে, রাগত মুখে। বোঝা যাচ্ছিল যে মেজাজ বিগড়েছে ওর, নাতাশার ওপর চটেছে। আসলে দিদিমণির বিয়ে হবে শুনে (তাকে ভারি ভালোবাসত), ও মঙ্গলবারের পর থেকে এতই খুশি হয়ে উঠেছিল যে সেকথা বাড়িময়, পাড়াময়, দোকানে, জমাদারের কাছে, সর্বত্র রাষ্ট্র করে বেড়িয়েছে। তা নিয়ে বড়াই করে সগর্বে বলেছে যে উনি একজন রাজাবাহাদুর, কেউকেটা গোছের এক ব্যক্তি, জেনারেল এবং অসম্ভব ধনী, তিনি নিজে এসে তরুণী দিদিমণির কাছে সম্মতি ভিক্ষা করে গেছেন, আর মাভরা তা শুনেছে নিজের কানে; অথচ এখন কিনা হঠাৎ এ সবকিছু শূন্যে মিলিয়ে গেল। প্রিন্স চলে গেলেন রেগে, চা পর্যন্ত তাঁকে দেওয়া হল না। এবং বলাই বাহুল্য এসবই দিদিমণির দোষ। প্রিন্সের প্রতি কীরকম অসম্মান করে দিদিমণি কথা বলেছে, সে তো শুনেছে মাভরা।

নাতাশা জবাব দিলে, 'তা বেশ... নিয়ে এসো।'

'আর খাবার, দেব কি?'

'হ্যাঁ, খাবারও।' থতমত খেয়ে বললে নাতাশা।

মাভরা গজগজ করতে লাগল, 'কত রান্না-বাড়ি, তোড়জোড় — কাল থেকে ছুটে ছুটে পা দু'খানা গেছে আমার। নেভস্কি পর্যন্ত দৌড়ে গেলাম মদের জন্যে আর এখন...' সক্রোধে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল মাভরা।

লাল হয়ে উঠে নাতাশা কেমন অদ্ভুত করে তাকাল আমার দিকে। ইতিমধ্যে চা দেওয়া হল, খাবারও — পাখির মাংস, কী একটা মাছ, ইয়েলিসেয়েভের দোকান থেকে দু'বোতল চমৎকার মদ। ভাবছিলাম এত আয়োজন কিসের জন্যে।

'আমি কেমন লোক দেখছ তো ভানিয়া,' নাতাশা বললে টেবিলের কাছে গিয়ে। আমার সামনেও তার বিব্রত লাগছিল, 'হুবহু যা ঘটল তাই যে ঘটবে আগে থেকেই জানা ছিল আমার। তবু ভেবেছিলাম হয়ত অন্যরকমই হবে। আলিওশা এসে মেটাবার চেষ্টা করবে, ফের মিলমিশ হয়ে যাবে আমাদের। আমার সমস্ত সন্দেহই অন্যায় বলে প্রমাণিত হবে, নিশ্চিন্ত হব আমি... অন্তত যদি দরকার হয় সেই জন্যে খাবার তৈরি করে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম হয়ত বহুক্ষণ ধরে বসে বসে আলাপ করব আমরা...'

বেচারী নাতাশা! একথা বলতে গিয়ে একেবারে লাল হয়ে উঠল সে। আলিওশা একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল।

বললে, 'তবেই দ্যাখো নাতাশা! তুমি নিজেই বিশ্বাস করো নি। দু'ঘণ্টা আগেও তোমার সন্দেহে তোমার নিজেরই বিশ্বাস ছিল না। উঁহু, এসবই শুধরে নিতে হবে। আমার দোষ, আমিই সবকিছুর কারণ, আমিই তা সব শুধরে নেব। নাতাশা, এখনই আমায় বাবার কাছে যেতে দাও। উনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, আহত বোধ করছেন, ওঁকে শান্ত করা দরকার। সবকিছুই ওঁকে বলব, শুধু আমার নিজের দিক থেকে, তোমায় জড়াব না। সবই আমি ঠিকঠাক করে নিচ্ছি, দাঁড়াও... তোমায় ফেলে রেখে ওঁর কাছে এক্ষুনি যেতে চাইছি বলে রাগ করো না কিন্তু। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়: ওঁর জন্যে দুঃখ হচ্ছে আমার। দেখে নিয়ো, ওঁর যে দোষ নেই, তা উনি তোমার কাছে প্রমাণ করে দেবেন... কাল রাত ফরসা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার কাছে চলে আসব। সারাদিন তোমার কাছে থাকব, কাতিয়ার ওখানে যাব না...'

নাতাশা ওকে আটকালে না। এমনকি নিজেই যাবার পরামর্শ দিলে। ভারি আতঙ্ক হয়েছিল ওর যে আলিওশা এবার ইচ্ছে করে জোর করেই সারা

দিন ওর কাছে থাকবে এবং তাতে করে নাতাশা সম্পর্কে ক্লান্তই বোধ করবে শেষ পর্যন্ত। ও শুধু এই অনুরোধ জানালে যেন নাতাশার নাম করে আলিওশা কিছু না বলে; বিদায়ের খুশি ফুটিয়ে হাসারও চেষ্টা করলে। চলে যেতে গিয়ে আলিওশা হঠাৎ নাতাশার কাছে ফিরে দুইহাতে ওর হাতখানি নিয়ে পাশে বসল। তাকালে অবর্ণনীয় একটা কোমলতা নিয়ে।

'নাতাশা, দেবী আমার, লক্ষ্মীটি, আমার ওপর রাগ ক'রো না, আমাদের মধ্যে কখনো যেন ঝগড়া না হয়। কথা দাও, চিরকাল সব ব্যাপারে আমায় বিশ্বাস করবে, আমিও তোমাকে। তাহলে শোনো তোমায় বলি: একবার ঝগড়া হয়েছিল আমাদের — কী নিয়ে মনে নেই, দোষটা ছিল আমার। কথা বলা বন্ধ রইল আমাদের। ইচ্ছে ছিল না, আগে আমি ক্ষমা চাইব। কিন্তু ভারি খারাপ লাগছিল। সারা শহর আমি ঘুরে বেড়িয়েছিলাম, সব জায়গায় ঢুঁ মেরে বেড়ালাম, দেখা করতে গেলাম বন্ধুদের সঙ্গে, কিন্তু মনটা একেবারে ভার, অত্যন্ত ভার হয়ে ছিল... তারপর হঠাৎ মনে হল, তুমি যদি অকস্মাৎ কিছু একটা অসুখে পড়ে মারা যাও! কথাটা কল্পনায় আসতেই এমন হতাশ লাগল যেন সত্যিই তোমায় চিরকালের জন্যে হারিয়েছি। কেবলি কষ্টকর, ভয়ঙ্কর সব চিন্তা আসতে লাগল। শেষে যেন মনে হতে লাগল আমি তোমার কবরের কাছে এসেছি, অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছি তার ওপর, আলিঙ্গন করে আড়ষ্ট হয়ে, আছি যন্ত্রণায়। মনে হল যেন কবরটায় চুমু খেয়ে তোমায় ডাকছি, একটুখানির জন্যে বেরিয়ে এসো; ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি অলৌকিক কিছু একটা করে এক মুহূর্তের জন্যে যেন তিনি তোমায় পুনর্জন্ম দিয়ে আমার সামনে দাঁড়াতে দেন। ভাবছিলাম, তাহলে ছুটে গিয়ে তোমায় আলিঙ্গন করব, চেপে জড়িয়ে ধরব তোমায়, চুমু দেব, মনে হচ্ছিল অন্তত এক মুহূর্তের জন্যে তোমায় আমি আগের মতোই আলিঙ্গন করতে পারলে সুখাবেশেই মরে যাব। এসব যখন ভাবছিলাম তখন মনে হল, এক মুহূর্তের জন্যে তোমায় ফিরে চাইছি ভগবানের কাছে, অথচ তুমি তো আমার সঙ্গেই ছিলে ছয় মাস, আর এই ছয় মাসের মধ্যে কতবারই না আমরা ঝগড়া করেছি, কত দিনই না আমাদের কথা বন্ধ হয়েছে। সারা দিন ধরে আমরা মুখ বন্ধ করে থেকেছি, নিজেদের সুখকে তুচ্ছ করেছি, অথচ এখন আমি তোমায় কবর থেকে উঠে আসতে ডাকছি শুধু এক মিনিটের জন্যে, আর সে মিনিটটুকুর জন্যে আমার সারা জীবন দিতেও আমি প্রস্তুত!.. এসব কথা ভাবতে ভাবতে আর সইতে পারলাম না, একেবারে সাত তাড়াতাড়ি ছুটে

গেলাম তোমার কাছে, তুমিও আমারই পথ চেয়েছিলে। ঝগড়ার পর যখন আমরা আলিঙ্গন করলাম, মনে আছে তখন এমন জোরে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলাম যেন সত্যিই তোমায় হারাতে বসেছি বুঝি। সত্যি, কখনো যেন আমাদের ঝগড়া না হয় নাতাশা! এত কষ্ট হয় আমার। ভগবান, তোমায় আমি ছেড়ে যেতে পারি একথা ভাবা যায় কখনো কখনো!'

নাতাশা কাঁদছিল। আবেগে আলিঙ্গন করলে ওরা; আলিওশা ফের শপথ করলে, কখনো ওকে ছেড়ে যাবে না। তারপর ও ছুটল ওর বাপের কাছে। দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ওর, সবকিছু ও মিটিয়ে নিতে পারবে, সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে।

'সব শেষ, সব চুকে গেল!' আবেগের দমকে আমার হাতে চাপ দিতে দিতে নাতাশা বললে, 'আমায় ও ভালোবাসে, সে ভালোবাসা ওর যাবে না। কিন্তু কাতিয়াকেও যে ও ভালোবাসে, আর কিছুদিন বাদে ভালোবাসতে শুরু করবে আমার চেয়েও বেশি। বিষধর প্রিন্স তো আর ঘুমিয়ে থাকবে না — তারপর...'

'নাতাশা! আমারও বিশ্বাস, যে প্রিন্স সততা দেখাছেন না, কিন্তু...'

'কিন্তু আমি ওঁকে যেসব বললাম, তা তুমি বিশ্বাস করো না! তোমার মুখ দেখে আমি তা টের পেয়েছি। কিন্তু সবুর করো, নিজেই দেখবে আমার কথা ঠিক কিনা। আমি তো শুধু সাধারণভাবে বলেছি, কিন্তু ওঁর মনে যে আরো কী আছে তা ঈশ্বরই জানেন! সাংঘাতিক লোক উনি। গত চার দিন ধরে এই ঘরখানায় আমি পায়চারি করে গেছি, সমস্ত পরিস্কার হয়ে গেছে আমার কাছে। আলিওশাকে মুক্তি দিতেই, যে কষ্টটায় ওর দিনযাপনে বাধা হচ্ছে, তার বোঝা থেকে, আমায় ভালোবাসার কর্তব্যবোধ থেকে ওর মনটাকে ভারমুক্ত করতেই উনি চাইছিলেন। বিয়ের ব্যাপারটা ও'র মাথায় খেলেছে তার এই উদ্দেশ্যও ছিল যে, আমাদের মাঝখানে উনি তাঁর প্রভাব নিয়ে সেঁধবেন, উদারতা, মহানুভবতা দেখিয়ে মুগ্ধ করে ফেলবেন আলিওশাকে। কথাটা সত্যি ভানিয়া, খাঁটি সত্যি! আলিওশা যে একেবারে ওইরকমের লোক। আমার সম্পর্কে মন ওর নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে, আমার দরুন দুশ্চিন্তা ওর কেটে যাবে। ভাববে, "ও তো এখন আমার বউ, সারা জীবনই থাকবে আমার সঙ্গে।" আর অলক্ষ্যে মন বেশি যাবে কাতিয়ার দিকে। বোঝা যাচ্ছে প্রিন্স এই কাতিয়াকে ভালো করে বিচার করেছেন, বুঝেছেন মেয়েটি ঠিক ওরই যোগ্য, আমার চেয়ে কাতিয়া ওকে আকৃষ্ট করতে পারে বেশি। ওঃ ভানিয়া,

তুমিই এখন আমার একমাত্র ভরসা! কেন জানি না উনি তোমার সঙ্গে মিশতে, পরিচিত হতে চান। এতে আপত্তি করো না, আর দোহাই তোমার, চেষ্টা ক'রো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাউণ্টেসের সঙ্গে পরিচয় করে নিতে। এই কাতিয়ার সঙ্গে আলাপ ক'রো, ভালো করে ওকে খংটিয়ে দেখে আমায় ব'লো মেয়েটি কেমন। আমি চাই ও বাড়িতে যেন তোমার নজর থাকে। তোমার মতো আর কেউ আমায় চেনে না, তুমি বঝেবে কী আমি চাই। ভালো করে দেখো ওদের বন্ধত্ব কতদরে গড়িয়েছে, ওদের মধ্যে সম্পর্ক কতখানি, কী নিয়ে আলাপ করে। কাতিয়া, কাতিয়াকেই সবচেয়ে লক্ষ্য করে দেখবে... আর একবার লক্ষ্মীটি, আমার অনরোগী ভানিয়া, আর একবার দেখাও তোমার বন্ধত্ব। তুমিই, এখন কেবল তুমিই আমার ভরসা...

. . . .

বাড়ি যখন ফিরলাম তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। ঘম-ঘম মখে দরজা খলে দিলে নেল্লী। হেসে মিষ্টি করে তাকালে আমার দিকে। ঘমিয়ে পড়েছিল বলে ভারি বিব্রত বোধ করছিল বেচারী। ইচ্ছে ছিল আমার জন্যে জেগে বসে থাকবে। বললে, কে যেন আমার খোঁজ করেছিল, কিছক্ষণ বসে অপেক্ষা করে একটা চিরকুট রেখে গেছে আমার জন্যে, টেবিলে আছে। চিরকুটটা মাসলবোয়েভের। পরদিন বেলা বারোটা থেকে একটার মধ্যে ও আমায় নেমন্তন্ন করেছে তার বাড়িতে। নেল্লীকে আরো কিছ জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সেটা পরদিনের জন্যে মলতুবি রাখলাম। আপাতত, জেদ ধরলাম এক্ষনি ওকে ঘমোতে হবে। আমার জন্যে অপেক্ষা করে করে এমনিতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বেচারী, ঘমিয়ে পড়েছিল আমি আসার মাত্র আধ ঘণ্টাখানেক আগে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গত সন্ধ্যের অতিথি সম্পর্কে বেশ অদ্ভুত কথাই নেল্লী শোনালে সকালে। তবে সেদিন সন্ধ্যেয় মাসলবোয়েভ যে আদৌ আসবে বলে ঠিক করল, এই ঘটনাটাই অদ্ভুত। ওর নিশ্চিত জানা ছিল যে আমি বাড়ি থাকব না। পরিষ্কার মনে আছে আমাদের গত সাক্ষাৎকালে সে কথা আমি ওকে নিজেই বলে রেখেছিলাম। নেল্লী বললে, প্রথমটা ও দরজা খলতে চায় নি, ভয় করছিল — আটটা বেজে গিয়েছিল তখন। কিন্তু দরজার আড়াল থেকে মাসলবোয়েভ

ওকে বোঝায় যে আমার জন্যে একটা চিরকুট লিখে রেখে না গেলে পরদিন কেন জানি আমার পক্ষে খারাপ হবে। ও দরজা খুলে দিতেই সঙ্গে সঙ্গে সে চিরকুটটা লিখে ফেলে তারপর ওর কাছে এসে পাশে বসে সোফার ওপর।

নেল্লী বললে, 'আমি উঠে দাঁড়ালাম, ওর সঙ্গে কথা কইতে চাই নি, ভারি ভয় করছিল। ও বুবনভার কথা কইতে শুরু করে, বলে, এখন ভারি রেগে আছে বুবনভা, কিন্তু আমাকে আর নিয়ে যাবার সাহস পাবে না। আপনার খুব প্রশংসা করছিল। বললে, ও আপনার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ছেলেবেলা থেকে আপনাদের চেনা। এর পর ওর সঙ্গে আমিও কথা কই। কিছু লজেঞ্চুস বার করে আমায় দিতে চায়। আমি নিতে চাই নি। আমায় তখন ও বোঝায় যে সে ভালো লোক, গান গাইতে পারে, নাচতে পারে। লাফিয়ে উঠে নাচ শুরু করে দিলে। আমার হাসি গেল। তারপর বললে, একটুখানি বসে থাকবে, "ভানিয়ার জন্যে একটু অপেক্ষা করি, হয়ত এসে পড়বে।" আমায় খুব করে বললে যেন ওকে ভয় না পাই, ওর পাশে বসি। আমি বসলাম, কিন্তু কথা কইতে চাইছিলাম না। ও তখন বললে, আমার মা দাদুকে ও চিনত... তখন আমিও কথা কইতে শুরু করলাম। অনেকক্ষণ ও ছিল।'

'কিন্তু কী কথা তোমরা কইলে?'

'মার কথা... বুবনভার কথা... দাদুর কথা। ঘণ্টা দুয়েক ও ছিল।'

কী আলাপ ওরা করেছিল নেল্লীর যেন সে কথা বলার ইচ্ছে নেই। ওকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। ভাবলাম মাসলবোয়েভের কাছ থেকেই সব শোনা যাবে। মনে হল, মাসলবোয়েভ যেন ইচ্ছে করেই আমি না থাকতে এসেছিল একলা নেল্লীর কাছে। ভাবলাম, "কিন্তু কেন?"

যে তিনটে মিষ্টি ও নেল্লীকে দিয়েছিল নেল্লী তা দেখালে। লাল সবুজ কাগজে মোড়া লজেঞ্চুস; বাজে জিনিস, সম্ভবত কোনো তরকারির দোকান থেকে কেনা। ওগুলো দেখিয়ে নেল্লী হাসলে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'খাও নি কেন?'

ভুরু কুঁচকে গম্ভীরভাবে নেল্লী বললে, 'খাওয়ার ইচ্ছে নেই। আমি তো ওগুলো নিই নি, সোফার ওপরে ও রেখে গিয়েছিল...'

সেদিন আমার অনেক হাঁটাহাঁটি ছিল। নেল্লীর কাছে বিদায় নিলাম। যাবার সময় জিজ্ঞেস করলাম, 'একলা থাকতে একঘেয়ে লাগে?'

'লাগেও বটে, লাগেও না। একঘেয়ে লাগে কেননা অনেকক্ষণ ধরে আপনি থাকেন না।'

একথা বলার সময় ও আমার দিকে তাকালে ভারি অনুরাগের দৃষ্টিতে। সারা সকাল ও সেদিন অমনি কোমল দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল আমার দিকে, ভারি হাসিখুশি স্নেহাতুর বলে মনে হচ্ছিল ওকে, তার সঙ্গেই কেমন একটা লজ্জা, একটা ভীরুতাও ছিল ওর, যেন ভয় পাচ্ছিল পাছে আমার বিরক্তি ঘটায়, আমার স্নেহ হারায় আর... আর বড়ো বেশি আত্মপ্রকাশ ঘটে যায়, সেটায় লজ্জা পাচ্ছিল।

'আর একঘেয়ে লাগে না কেন? বললে যে "লাগেও বটে, লাগেও না?"' জিজ্ঞেস করলাম আপনা থেকেই হেসে, আমার কাছে ও ভারি মিষ্টি আর আপন হয়ে উঠেছিল।

'সেটা আমিই জানি।' ও বললে মুচকি হেসে, কেন জানি ফের লজ্জা পেলে।

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আমরা কথা কইছিলাম। নেল্লী দাঁড়িয়ে ছিল আমার সামনে, চোখ নিচু করে এক হাত আমার কাঁধে রেখে অন্য হাত দিয়ে আমার আস্তিনটাকে খুঁটছিল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা কী, গোপন কিছু?'

'না... ও কিছু নয়... আমি... আপনি যখন থাকেন না তখন আপনার বইটা পড়ি।' অর্ধস্ফুট গলায় ও বলে ফেললে; তারপর আমার দিকে কোমল গভীর দৃষ্টিপাত করে লাল হয়ে উঠল।

'বটে! ভালো লাগছে তোমার?' লেখকের সামনেই তার প্রশংসা করলে যেরকম বিব্রত লাগে, তাই বোধ করছিলাম আমি। তবু সেই মুহূর্তে কী ভয়ানক ইচ্ছেই না হয়েছিল ওকে চুমু খাব! কিন্তু সেটা কেমন যেন সম্ভব ছিল না।

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল নেল্লী।

'কেন ও মারা গেল, কেন?' আমার দিকে ক্ষণিক চেয়েই হঠাৎ ফের চোখ নামিয়ে ও জিজ্ঞেস করলে গভীর খেদে।

'কে?'

'ওই যে... বইয়ের ওই ক্ষয়রোগী ছেলেটা।'

'উপায় ছিল না নেল্লী, ওকে মরতেই হত।'

'না, মোটেই মরা উচিত ছিল না ওর।' নেল্লী বললে প্রায় ফিসফিস করে, কিন্তু ভারি হঠাৎ, আচমকা, প্রায় সক্রোধে, ঠোঁট ফুলিয়ে, আর আরো একগুঁয়ের মতো চেয়ে রইল মেঝের দিকে।

একমিনিট কাটল।

'আর ও... মানে ওরা... মেয়েটা আর ওই বুড়োটা?' জিজ্ঞেস করলে ফিসফিস করে, আমার আস্তিনটা তখনো ও খুঁটছিল আগের চেয়েও জোরে, 'ওরা কি একসঙ্গে থাকবে? গরিব থাকবে না আর?'

'না নেল্লী, মেয়েটি চলে যাবে অনেক দূরে, এক জমিদারকে বিয়ে করবে। ও পড়ে থাকবে একা।' বললাম একান্ত দুঃখের সঙ্গেই। সত্যিই দুঃখ হচ্ছিল যে সান্ত্বনা দেবার মতো কিছু ওকে শোনাতে পারছি না।

'সে কী... মা গো, কী বিচ্ছিরি! ফুঃ! আর ও বই আমি পড়তে চাই না!'

রাগ করে ও ঠেলে দিলে আমার হাতখানা, দ্রুত পেছন ফিরে চলে গেল টেবিলের কাছে। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে কোণের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। লাল হয়ে উঠেছিল ও, নিঃশ্বাস পড়ছিল এলোমেলো, যেন ভারি আশাহত হয়েছে ও।

কাছে গিয়ে বললাম, 'শোনো নেল্লী, রাগ করেছ, কিন্তু যা লেখা আছে সে তো সত্যি নয়, সবই বানানো। রাগ করার কী আছে! ভারি নরম মন তোমার।'

'রাগ করি নি,' ও বললে ভয়ে ভয়ে, ভারি পরিষ্কার, ভারি ভালোবাসায় ভরা চোখ তুলে চাইলে আমার দিকে; তারপর হঠাৎ আমার হাতটা টেনে নিয়ে মুখ গুঁজল আমার বুকে, কেন জানি কেঁদে ফেলল।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই হেসেও ফেলল আবার — হাসি-কান্না চলল একই সঙ্গে। আমারও হাসি পেল আর কেমন যেন... ভালোও লাগল। কিন্তু কিছুতেই ও আমার দিকে মুখ তুলতে চাইছিল না। আমি যখন কাঁধ থেকে ওর মুখখানাকে সরাবার চেষ্টা করলাম, ততই ঘন হয়ে ও মাথা গুঁজে রইল, আর ততই বেশি করে হাসতে শুরু করল।

অবশেষে এই ভাবাকুল দৃশ্যটার সমাপ্তি ঘটল। আমি চলে গেলাম; তাড়া ছিল। নেল্লী লাল হয়ে কেমন যেন লজ্জিত মুখে ছুটে গেল আমার পেছু পেছু একেবারে সিঁড়ি পর্যন্ত, তারার মতো জ্বলজ্বল করছিল ওর চোখদুটো; মিনতি করলে যেন তাড়াতাড়ি ফিরি। কথা দিলাম, নিশ্চয় দুপুরের খাওয়া নাগাদ ফিরে আসব, আর যতসম্ভব তাড়াতাড়ি।

প্রথমে গেলাম ইখমেনেভদের কাছে। দু'জনেরই ওঁদের শরীর ভালো নেই। আন্না আন্দ্রেয়েভনা তো বেশ অসুস্থই। নিকোলাই সেগেয়িচ বসে

ছিলেন তাঁর কাজের ঘরে। আমি এসেছি সে শব্দ ওঁর কানে গেছে, কিন্তু জানতাম, ওঁর প্রথামতো সিকি ঘণ্টার আগে তিনি বেরুবেন না, মন খুলে আমাদের আলাপ চালাবার সময় দিতে চান। আন্না আন্দ্রেয়েভনাকে খুব বিচলিত করে দেবার ইচ্ছে ছিল না আমার, তাই গত রাত্রের বিবরণ যথাসম্ভব নরম করেই বললাম, কিন্তু বললাম সত্যি কথাই। অবাক লাগল, বৃদ্ধা দুঃখিত হলেও ছাড়াছাড়ির সম্ভাবনায় কেমন যেন আশ্চর্য হলেন না।

বললেন, 'তাই-ই ভেবেছিলাম বাপু। তুমি চলে যাবার পর অনেকক্ষণ ভেবে দেখছিলাম। বেশ বুঝেছিলাম, ও হবার নয়। ভগবানের অতখানি কৃপার তো আমরা যোগ্য নই, আর লোকটাও যে ভারি পাজী। ওর কাছ থেকে কি আর কোনো মঙ্গল আশা করা সম্ভব? খামোকা আমাদের কাছ থেকে দশ হাজার রুবল নিচ্ছে সে কি আর ঠাট্টার ব্যাপার, জানে খামোকা, তবু নিচ্ছে। আমাদের শেষ অন্নটুকুও কেড়ে নিচ্ছে। ইখমেনেভ্কা বিক্রি করে দেবে। ওদের কথায় বিশ্বাস না করে নাতাশা ঠিক করেছে, বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছে। আর জানো বাপু, আমার উনি,' গলার স্বর নামিয়ে বলে গেলেন বৃদ্ধাটি, 'বিয়ের বিরুদ্ধে উনি একেবারে বেঁকে আছেন। বলেও ফেলেছেন তা। বলছিলেন, "এ আমি চাই না।" প্রথমটা ভেবেছিলাম, এ ওঁর একটা খেয়াল। কিন্তু না, সত্যিই ওই ওঁর ইচ্ছে। আহা, মেয়েটির কী হবে তাহলে? উনি যে তাহলে একেবারেই অভিশাপ দিয়ে বসবেন। আর ওটি, ওই আলিওশা, ওটির কী খবর?'

অনেকক্ষণ ধরে আমায় প্রশ্ন করে চললেন উনি, আমার প্রত্যেকটি উত্তরে যথারীতি হায় হায় করলেন, বিলাপ করলেন। ইদানীং দেখছি, কেমন যেন ভারি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন উনি। যেকোনো সংবাদেই বিচলিত হয়ে ওঠেন। নাতাশার শোকে ওঁর স্বাস্থ্য, হৃদয় ভেঙে পড়ছিল।

ড্রেসিং গাউন আর স্লিপার পরে বৃদ্ধ এসে দাঁড়ালেন, বললেন জ্বর হয়েছে, কিন্তু স্ত্রীর দিকে চাইলেন সস্নেহে; যতক্ষণ আমি ছিলাম ততক্ষণ স্ত্রীর যত্ন নিচ্ছিলেন নার্সের মতো, ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন, এবং মনে হল যেন কেমন একটু ভয়ও পাচ্ছেন স্ত্রীকে। দৃষ্টি থেকে তাঁর অপরিসীম স্নেহ ঝরে পড়ছিল। ওঁর অসুখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন উনি। টের পাচ্ছিলেন যে ওঁকে হারালে জীবনের সবই যাবে।

এক ঘণ্টা ছিলাম ওঁদের কাছে। চলে যাবার সময় উনি আমার সঙ্গে বারান্দা পর্যন্ত এলেন। নেল্লীর কথা তুললেন। সত্যি সত্যিই নিজের মেয়ের

জায়গায় নেল্লীকে ওঁদের সংসারে নেবার কথা উনি ভাবছিলেন। আন্না আন্দ্রেয়েভনাকে কী করে এর অনুকূলে নিয়ে আসা যায় সে বিষয়ে আমার পরামর্শ চাইলেন। বিশেষরকমের ঔৎসুক্য নিয়ে প্রশ্ন করলেন নেল্লী সম্পর্কে — জিজ্ঞেস করলেন ওর সম্পর্কে নতুন কিছু আর জেনেছি কিনা।

যা জানি সংক্ষেপে বললাম। আমার কাহিনীটায় উনি অভিভূত হলেন।

দৃঢ়ভাবে বললেন, 'পরে ফের এ নিয়ে কথা হবে। ইতিমধ্যে... থাক, একটু ভালো হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজেই তোমার কাছে যাব। তখন ঠিকঠিক করা যাবে।'

ঠিক বারোটার সময় পেঁছোলাম মাসলবোয়েভের ওখানে। সেখানে ঢুকে একান্ত বিস্ময়ে প্রথম যাকে দেখলাম তিনি প্রিন্স ভালকোভস্কি। বারান্দায় উনি ওভারকোট পরছিলেন, মাসলবোয়েভ ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওঁকে সাহায্য করছিল, ছড়িটা এগিয়ে দিচ্ছিল। প্রিন্সের সঙ্গে ওর আলাপ আছে সেকথা মাসলবোয়েভ আমায় আগেই বলেছিল, তাহলেও এ সাক্ষাৎকারে একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

আমায় দেখে প্রিন্স কেমন যেন বিব্রত হয়ে উঠলেন।

বড়ো বেশি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে উনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে আপনি যে! কীরকম দেখা হয়ে গেল আশ্চর্য! অবিশ্যি, আপনাদের পরিচয় আছে তা এই কিছুক্ষণ আগে মাসলবোয়েভ মশায়ের কাছ থেকে শুনেছি। দেখা হয়ে খুশি, ভারি খুশি হলাম। আপনার সঙ্গে দেখা করতে খুব উৎসুক আমি, যত তাড়াতাড়ি পারি আপনার ওখানে যাব, যদি অনুমতি করেন। আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে: আমায় একটু সাহায্য করুন, আমাদের বর্তমান অবস্থাটা একটু বুঝিয়ে বলবেন। বুঝেছেন নিশ্চয়, কালকের ব্যাপারটার কথা বলছি... ওদের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব আছে, ব্যাপারটার সমস্ত গতি আপনি লক্ষ্য করেছেন: আপনার প্রভাবও আছে... আপনার সঙ্গে এখন থাকতে পারছি না বলে ভয়ঙ্কর দুঃখিত... কাজ আছে আর কি! কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যে, হয়ত তার আগেই আপনার ওখানে যাবার সৌভাগ্য হবে। কিন্তু এখন...'

ওঁর করমর্দনটা কেমন যেন খুবই সজোর হল, মাসলবোয়েভের সঙ্গে একবার দৃষ্টি বিনিময় করে উনি চলে গেলেন।

ঘরে ঢুকেই বললাম, 'দোহাই তোর, বল তো দেখি...'

দ্রুত টুপিটা তুলে নিয়ে বারান্দার দিকে এগুতে এগুতে মাসলবোয়েভ বাধা দিলে, 'কিছুই বলব না তোকে। কাজ আছে। আমাকেও ছুটতে হচ্ছে রে। দেরি হয়ে গেছে!..'

'সে কী, তুই নিজেই তো লিখেছিলি বারোটার সময় আসতে।'

'লিখেছিলাম তো হল কী? তোকে লিখেছিলাম কালকে, আর আজ আমাকেই যে লিখে পাঠিয়েছে, আর এমন লেখা যে কপাল টনটন করছে, এমন ধারা ব্যাপার। আমার জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই। মাপ করিস ভানিয়া। তোর তুষ্টির জন্যে যা বলতে পারি সেটা এই যে তোকে অকারণে ব্যস্ত করলাম বলে বেশ একচোট পিটুনি দে আমাকে। তুষ্টি পেতে চাইলে মার, কিন্তু খৃষ্টের দোহাই, তাড়াতাড়ি! আমায় আটকাস না, কাজ আছে, অপেক্ষা করছে।'

'কিন্তু পিটব কেন তোকে? কাজ থাকলে চলে যা! অপ্রত্যাশিত কিছু একটা তো সবারই হতে পারে। শুধু...'

'আচ্ছা, ওই "শুধু"র কথা যা বললি, সেটুকু জানাই,' ও বললে বাধা দিয়ে, বারান্দায় ছুটে এসে ওভারকোট পরতে পরতে (আমিও কোট পরতে শুরু করলাম), 'তোর সঙ্গেও কাজ আছে আমার। অত্যন্ত জরুরী কাজ। সেই জন্যেই তোকে আসতে লিখেছিলাম। ব্যাপারটা সোজাসুজি তোকে নিয়ে, তোর স্বার্থও জড়িত। এখন এক মিনিটে সব বলা যেহেতু অসম্ভব তাই দোহাই, কথা দিয়ে যা সাতটায় আসবি, একচুল আগে-পিছে না। বাড়ি থাকব।'

অনিশ্চিতভাবে বললাম, 'আজ, মানে আজ যে ভাই সন্ধ্যেয় ভেবেছিলাম যাব...'

'চলে যা বাছাধন এক্ষুনি যেখানে সন্ধ্যেবেলায় যাবি ভাবছিলি, কিন্তু সন্ধ্যেয় এখানে আসবি। তোর ধারণা নেই ভানিয়া, কী খবর দেব তোকে।'

'তা বেশ, কিন্তু কী খবর? সত্যি ভারি কৌতূহলী করে তুললি আমাকে।'

ইতিমধ্যে আমরা ফটক পেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি ফুটপাথের ওপর।

'তাহলে আসছিস তো?' ও জিজ্ঞেস করলে গোঁ ধরে।

'বলেছি তো আসব।'

'না, হলপ করে কথা দে।'

'বাব্বা, কী লোক! বেশ হলপ করেই কথা দিচ্ছি, হল?'

'এই তো দিব্যি লক্ষ্মীছেলের কাজ। কোন দিকে যাচ্ছিস?'

'এই দিকে।' বললাম ডানদিকের রাস্তায় দেখিয়ে।

'আচ্ছা, আমি চললাম এ দিকে,' ও বললে বাঁদিকটা দেখিয়ে, 'আসি ভানিয়া! মনে রাখিস সাতটা।'

"অদ্ভুত," ওর দিকে চেয়ে মনে মনে ভাবলাম।

ভেবেছিলাম সন্ধ্যেয় নাতাশার ওখানে যাব। কিন্তু এখন যেহেতু মাসলবোয়েভকে কথা দিলাম, তাই ঠিক করলাম এখনই নাতাশার কাছে যাওয়া যাক। নিশ্চিত ছিলাম আলিওশাকে ওখানে দেখতে পাব। সত্যিই সে ছিল ওখানে, আমি আসায় ভয়ানক খুশি হয়ে উঠল।

নাতাশার সঙ্গে ও ব্যবহার করছিল ভারি মধুর, অত্যন্ত নরম। আমায় দেখে বেশ হাসিখুশি হয়ে উঠল। নাতাশাও খুশির ভাব দেখাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল সেটা চেষ্টাকৃত। মুখখানা ওর অসুস্থ, বিবর্ণ। রাত্রে ভালো ঘুম হয় নি। আলিওশার প্রতি ওর মমতা অনেক বেড়ে গেছে।

আলিওশা যদিও কথা কইছিল প্রচুর, নানা বিষয় নিয়ে অনেক কিছু বলে স্পষ্টতই ওকে খুশি করে ওর অনিচ্ছায় না-হাসা ঠোঁটে হাসি ফোটাতে চাইছিল, তাহলেও বেশ দেখা যাচ্ছিল যে কাতিয়া কি ওর বাবার প্রসঙ্গ ও এড়িয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয় কালকের মিটমাট প্রচেষ্টা ওর সফল হয় নি।

মিনিটখানেকের জন্যে আলিওশা যখন মাভরাকে কী একটা বলবে বলে বাইরে গিয়েছিল তখন নাতাশা তাড়াতাড়ি ফিসফিস করে আমায় জানালে, 'জানো ভানিয়া, আমার কাছ থেকে ও ভয়ানক পালাতে চাইছে, কিন্তু ভয় পাচ্ছে। যাও বলতে আমারও ভয় হচ্ছে, কেননা তাহলে ও হয়ত ইচ্ছে করেই যাবে না। সব থেকে আমার যা ভয়, ওর একঘেয়ে লাগবে, তার ফলে একেবারেই উদাসীন হয়ে যাবে আমার প্রতি। কী করা যায়?'

'হায় ভগবান! কী অবস্থায় তোমরা গিয়ে দাঁড়াচ্ছ! কীরকম সন্দিগ্ধ তোমরা, কীভাবে নজর রাখছ পরস্পরের ওপর। স্রেফ সবটা খোলসা করে বলে কয়ে নিষ্পত্তি হয়ে যাক। এরকম অবস্থায় সত্যিই হয়ত ওর একঘেয়ে লাগতে পারে।'

ভয় পেয়ে ও চেঁচিয়ে উঠল, 'কী হবে তাহলে?'

'একটু দাঁড়াও। আমি সব ব্যবস্থা করছি...' কাদামাখা আমার একটা গালোশ পরিষ্কার করার জন্যে মাভরাকে বলতে যাচ্ছি ছুতো করে রান্নাঘরে গেলাম।

আমার উদ্দেশে ও বললে, 'সাবধান কিন্তু ভানিয়া।'

যেই মাভরার কাছে গেছি, অমনি আলিওশা ছুটে এল আমার কাছে, যেন আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

'ইভান পেত্রোভিচ, কী করি ভাই বলুন। একটু পরামর্শ দিন! গতকাল আমি কাতিয়াকে কথা দিয়ে এসেছিলাম যে ঠিক এই সময় ওর কাছে যাব। কথার খেলাপ তো করতে পারি না! নাতাশাকে আমি যে কী ভালোবাসি জানি না, ওর জন্যে আগুনেও ঝাঁপ দিতে পারি। কিন্তু ওকেও তো একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না...'

'বেশ তো, চলে যান-না...'

'কিন্তু নাতাশার কী হবে? ওর মনে যে ঘা লাগবে ইভান পেত্রোভিচ, আমার একটা উপায় করে দিন...'

'আমার মনে হয় আপনার বরং যাওয়াই উচিত। আপনি জানেন ও আপনাকে কত ভালোবাসে। সারাটাক্ষণ ওর কেবলি মনে হবে, আপনার ভারি ব্যাজার লাগছে তবু নিতান্ত জোর করে থাকছেন, তার চেয়ে বরং সহজ হওয়াই ভালো। আচ্ছা চলুন, আমি আপনাকে সাহায্য করব।'

'সত্যি কী ভালো আপনি ইভান পেত্রোভিচ!'

ফিরে এলাম আমরা। মিনিটখানেক পরে ওকে বললাম:

'আপনার বাবার সঙ্গে একটু আগে দেখা হল।'

'কোথায়?' ভয় পেয়ে ও চেঁচিয়ে উঠল।

'রাস্তায়, হঠাৎ। উনি একমিনিট থেমে কথা কইলেন, ফের বললেন পরিচিত হতে চান। উনি আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন, বললেন, আপনি কোথায় তা আমি জানি কিনা। আপনার সঙ্গে দেখা করে কী একটা কথা বলা ওঁর খুব দরকার।'

'তাহলে আলিওশা চলে যাও, গিয়ে দেখা করো।' আমার কথাটা লুফে নিয়ে নাতাশা বললে। ও বুঝেছিল আমার কী মতলব।

'কিন্তু... কোথায় ওঁকে পাব? এখন কি বাড়ি থাকবেন?'

'না। মনে হচ্ছে উনি বলেছিলেন যে এখন কাউণ্টেসের ওখানে থাকবেন।'

'কী করি আমি তাহলে?..' সরলভাবে জিজ্ঞেস করলে আলিওশা, করুণভাবে চাইলে নাতাশার দিকে।

'ওহ্ আলিওশা, তাতে কী হল?' নাতাশা বললে, 'সত্যিই কি তুমি আমার মন শান্ত করবার জন্যে এই আলাপ-পরিচয়টা ছেড়ে দিতে চাও। এ যে ছেলেমানুষি! প্রথমত, এটা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, কাতিয়ার প্রতি তাতে

অকৃতজ্ঞতা দেখানো হবে। তোমরা বন্ধু — সে সম্পর্ক অমন রূঢ়ভাবে চুকিয়ে দেওয়া যায় কখনো? আর শেষ কথা, আমি ঈর্ষা বোধ করছি এ কথা ভাবলে স্রেফ আমায় অপমানই করবে। যাও, মিনতি করছি এক্ষুনি যাও! তোমার বাবাও নিশ্চিন্ত হবেন।'

আনন্দে আর অনুতাপে বলে আলিওশা, 'নাতাশা, তুমি দেবী, আমি তোমার কড়ে আঙুলেরও যোগ্য নই! এত ভালো তুমি অথচ আমি... আমি... তোমাকে বলেই দিই। এক্ষুনি রান্নাঘরে ইভান পেত্রোভিচকে বলছিলাম আমার চলে যাওয়ার একটা উপায় করে দিতে। এটা ওঁরই ফন্দি। কিন্তু আমার ওপর নির্দয় হয়ো না নাতাশা, রানী আমার! আমার তেমন দোষ নেই, কেননা দুনিয়ার সবকিছুর চাইতেও হাজার গুণ বেশি তোমায় ভালোবাসি, তাই একটা নতুন ফন্দি বার করেছি আমি — কাতিয়াকে সবকিছু বলে আমাদের বর্তমান অবস্থার কথা জানাব, কাল যা যা ঘটেছিল সব। সে নিশ্চয় একটা উপায় বার করতে পারবে। মনে-প্রাণে ও আমাদের অনুরাগী...'

নাতাশা হেসে বললে, 'বেশ তো, যাও না। আর একটা কথা, কাতিয়ার সঙ্গে পরিচয় করতে আমি নিজেই খুব চাই। সে ব্যবস্থা করা যায় কি?'

আলিওশার উল্লাস আর ধরে না। কীভাবে ওদের সাক্ষাৎকার ঘটানো যায়, তৎক্ষণাৎ তা নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল সে। ওর কাছে ব্যাপারটা খুবই সোজা মনে হল: কাতিয়া নিশ্চয় কিছু একটা বাতলে দেবে। উত্তেজিতভাবে এ আইডিয়াটাকে ও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে লাগল। কথা দিলে, সেইদিনই ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে সে জবাব নিয়ে আসবে এবং সন্ধ্যেটা কাটাবে নাতাশার সঙ্গে।

বিদায় দেবার সময় নাতাশা জিজ্ঞেস করল, 'সত্যিই আসবে তো?'

'সত্যিই সন্দেহ আছে তাতে? আসি নাতাশা, আসি প্রিয়তমে, চিরকাল প্রিয়তমা! আসি ভানিয়া। যাঃ, আপনাকে হঠাৎ ভানিয়া বলে ডাকলাম। বলছিলাম কী, ইভান পেত্রোভিচ, এত ভালোবাসি আপনাকে — "তুমি" বলেই ডাকব না কেন। "তুমি" বলেই ডাকি।'

'বেশ তো।'

'বাঁচা গেল! শতেক বার জিনিসটা আমার মনে হয়েছে, কিন্তু কেন জানি বলে উঠতে পারি নি আপনাকে। ওই দেখুন, এখনো "আপনি" বলছি। "তুমি" বলে ডাকতে শুরু করা তো খুবই কঠিন। তলস্তোয় কোথায় যেন বেশ

লিখেছিলেন: দু'জন লোক ঠিক করলে "তুমি" বলে ডাকবে, কিন্তু কিছুতেই পারলে না, শেষ পর্যন্ত সর্বনাম ব্যবহার করাই এড়িয়ে যেতে থাকল। ওহ্ নাতাশা, "শৈশব ও কৈশোর" বইখানা দু'জনে মিলে কখনো একবার পড়া যাবে। ভারি সুন্দর!'

হেসে নাতাশা ওকে তাড়ালে, 'যাও, এখন যাও তো। খুশিতে খই ফুটছে মুখে...'

'আসি। দু'ঘণ্টার মধ্যেই ফের তোমার কাছে।'

হাতে চুমু খেয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল ও।

'দেখছ তো ভানিয়া, দেখছ?' বলেই নাতাশা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

দুই ঘণ্টা আমি রইলাম নাতাশার কাছে। সান্ত্বনা দিলাম, সবকিছু বোঝানো গেল। বলাই বাহুল্য, ওর সবকিছু কথা, সবকিছু শঙ্কাই ঠিক। ওর বর্তমান অবস্থার কথা ভেবে মন আমার কষ্টে ভরে উঠেছিল। ভয় পাচ্ছিলাম ওর জন্যে। কিন্তু কী করা যায়?

আলিওশাকেও আমার কাছে বিচিত্র লেগেছিল। আগের চেয়ে নাতাশাকে সে কম ভালোবাসছে না, অনুতাপ আর কৃতজ্ঞতায় ওর সে প্রেম হয়ত আরো জোরালো, আরো মর্মান্তিক। কিন্তু সেই সঙ্গে ওর এই নতুন প্রেমটাও ওর বুকে বেশ জুড়ে বসেছে। কী এর পরিণতি তা অনুমান করা অসম্ভব। আমার নিজেরই ভারি কৌতূহল হচ্ছিল, কাতিয়াকে দেখি। নাতাশার কাছে ফের কথা দিলাম, ওর সঙ্গে পরিচয় করব।

শেষের দিকে নাতাশা যেন প্রায় খুশিই হয়ে উঠল। আলাপের মধ্যে আমি তাকে নেল্লীর কথা, মাসলবোয়েভ আর বুবনভার কথা, আজকে মাসলবোয়েভের ওখানে প্রিন্স ভালকোভস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ, মাসলবোয়েভের ওখানে সাতটার সময় দেখা করার কথা ইত্যাদি সব বললাম। ও ভারি কৌতূহলী হয়ে উঠল। ওর মা-বাবার কথা আমি বললাম সামান্যই। ইখমেনেভ যে আমার ওখানে গিয়েছিলেন সে ব্যাপারে আপাতত চুপ করে রইলাম; প্রিন্সের সঙ্গে ওঁর ডুয়েলের প্রস্তাবে হয়ত ও ভয় পেয়ে যেতে পারত। নাতাশারও মনে হল প্রিন্সের সঙ্গে মাসলবোয়েভের সম্পর্কটা আর আমার সঙ্গে পরিচয়ের জন্যে তাঁর ওই একান্ত ব্যগ্রতাটা ভারি অদ্ভুত, যদিও বর্তমানে যা অবস্থা, তাতে তার বেশ একটা ব্যাখ্যা মেলে...

বাড়ি ফিরলাম তিনটের সময়। ছোট্ট মিষ্টি মুখে নেল্লী আমায় স্বাগত করলে...

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যে সাতটার সময় পেঁছিলাম মাসলবোয়েভের ওখানে। উচ্চ চিৎকারে আমায় ও অভ্যর্থনা করলে দু'বাহু বাড়িয়ে। বলাই বাহুল্য, ও ছিল আধা-মাতাল। কিন্তু সবচেয়ে অবাক লাগল এই দেখে যে আমার জন্যে অসাধারণ বড়োরকমের একটা আয়োজন করা হয়েছে। বেশ বোঝা গেল আমার জন্যে অপেক্ষা করে ছিল ওরা। সুন্দর দামী টেবিলক্লথে ঢাকা একটি ছোট্ট গোল টেবিল। তার ওপর চমৎকার কাঁসার সামোভারে জল ফুটছে। চায়ের টেবিল ঝকমক করছে স্ফটিকের, রুপোর আর চীনেমাটির বাসনে। আর একটা টেবিল ঢাকা একটা ভিন্নরকম টেবিলক্লথে, যদিও সেটাও কম জমকালো নয়। তার ওপর ভারি সুন্দর সব মিষ্টির প্লেট, শুকনো এবং শুকনো-তরল কিয়েভ জ্যাম, ফলের জেলি, ফরাসী জ্যাম, কমলালেবু, আপেল, তিন-চার রকমের বাদাম — মানে, একেবারে একটা ফলের দোকান। ধবধবে শাদা কাপড়ে ঢাকা তৃতীয় এক টেবিলে নানা ধরনের খাবার — মাছের ডিমের আচার, পনীর, পেস্ট, নানা ধরনের সসেজ, পক্ক শুকরমাংস, মাছ আর একসারি বেলোয়ারি সুরাপাত্র, তাতে নানা ধরনের এবং সবুজ, সিঁদুরে, বাদামী, সোনালী নানা মনোরম রঙের সব ভদকা। পরিশেষে শাদা কাপড়ে ঢাকা দূরে আরো একটি ছোটো টেবিলে বরফের পাত্রে বসানো শ্যামপেন। সোফার সামনে এক টেবিলে তিন বোতল সোতের্ন, লাফিত আর কনিয়াক — ইয়েলিসেয়েভের দোকান থেকে আনা সেরা মাল। আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা বসে ছিল চায়ের টেবিলের কাছে। বেশভূষাটা সাধারণ হলেও বোঝা যায় বেশ মার্জিত ও সুচিন্তিত, সত্যি দাঁড়িয়েছে চমৎকার। ও জানে কী ওকে মানায়, তাতে যেন একটা গর্বও আছে ওর। খানিকটা সমারোহের সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়ে ও আমায় স্বাগত করলে। তাজা মুখখানা ওর জ্বলজ্বল করে উঠল ফুর্তিতে, খুশিতে। মাসলবোয়েভের পরনে চমৎকার চীনে স্লিপার, দামী একটা ড্রেসিং গাউন আর আনকোরা শৌখিন পাজামা। যেখানে যেখানে লাগানো সম্ভব শার্টের ওপর তেমন প্রত্যেকটি স্থানেই ফ্যাশন-দুরস্ত বোতাম, কফ-বোতাম। ফ্যাশন মাফিক পাশকে টেরি কেটে চুল আঁচড়ানো, কেশরাগে প্রসাধিত।

এমন বিহ্বল হয়ে গেলাম যে ঘরের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে হাঁ করে চাইলাম কখনো মাসলবোয়েভের দিকে, কখনো আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনার

দিকে। আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনার আত্মতৃপ্তি একেবারে পরমানন্দে পেঁছেছে।

'এসব কী মাসলবোয়েভ? আজ সন্ধ্যেয় কি তুই পার্টি দিচ্ছিস নাকি?' খানিকটা অস্বস্তি নিয়েই বলে উঠলাম অবশেষে।

'পার্টি নয়, শুধু তুই।' ও বললে সমারোহের ভাব করে।

'কিন্তু এসব কী?' জিজ্ঞেস করলাম খাবারগুলো দেখিয়ে, 'এ তো এক রেজিমেণ্ট কুলিয়ে যাবার মতো খাবার!'

'এবং যথেষ্ট মদ! প্রধান বস্তুটাই তুই বললি না — মদ!' যোগ করলে মাসলবোয়েভ।

'এসবই একলা আমার জন্যে?'

'এবং আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনার জন্যে। ওর ইচ্ছে হয়েছিল এসব করবে।'

'ঐ আবার শুরু হয়েছে ওর! জানতাম!' লাল হয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠল আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা, পরিতৃপ্তির ভাবটা তবু তার মোটেই ক্ষুণ্ণ হল না, 'ভালো করে অতিথি সৎকার করারও যো নেই, অমনি আমার দোষ!'

'সকাল থেকে, কল্পনা করতে পারিস, একেবারে সকাল থেকে যেই শুনেছে তুই সন্ধ্যেয় আসবি তখন থেকে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে; দুর্ভাবনায় মরছে...'

'ফের মিথ্যে কথা! মোটেই সকাল থেকে নয়, কাল রাত থেকে। কাল সন্ধ্যেয় তুমি এসে বলেছিলে যে ওঁরা সারা সন্ধ্যেটা এখানে কাটাবেন...'

'আমায় ভুল বুঝেছিলেন আপনি।'

'একটুও নয়। তাই বলেছিলে মশায়। আমি কখনো মিছে কথা বলি না। আর অতিথি এলে যোগ্য অভ্যর্থনা কেন করব না শুনি? দিনের পর দিন কাটে, কেউ তো আমাদের কাছে আসে না, অথচ সবই আছে আমাদের। ভালোমানুষেরা দেখুন আমরাও মানুষের মতো থাকি।'

'এবং সর্বোপরি দেখুন, কী চমৎকার এক গৃহিনী ও কর্ত্রী আপনি।' যোগ দিলে মাসলবোয়েভ, 'ভেবে দ্যাখ রে দোস্ত, ওদিকে আমি, আমি পড়েছি কী ফ্যাসাদে। ওলন্দাজী শার্টের মধ্যে ও পুরেছে আমাকে, হাতার বোতাম লাগিয়েছে, স্লিপার, চীনে ড্রেসিং গাউন, নিজেই চুল আঁচড়ে দিয়েছে আমার, আর কেশরাগ: বের্গামোট। চেয়েছিল একটু আতর ছিটোবে — ক্রীম ব্রুলি — কিন্তু আর আমার সহ্য হল না, বিদ্রোহ করে আমার দাম্পত্য কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলাম...'

'মোটেই বের্গামোট নয়। রঙীন চীনে মাটির পাত্র থেকে সেরা ফরাসী

পমেটম!' লাল হয়ে উঠে বললে আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা, 'আপনিই বলুন ইভান পেত্রোভিচ, কখনো ও আমায় থিয়েটার কি নাচে যেতে দেয় না, শুধু পোশাক উপহার দেয়। কিন্তু পোশাকে কী হবে আমার? সাজগোজ করে একলা একলা পায়চারি করি ঘরের মধ্যে। সেদিন ওকে থিয়েটারে যাবার জন্যে বুঝিয়ে রাজী করিয়েছিলাম। কিন্তু যেই আমার ব্রোচটা লাগাতে মুখ ফিরিয়েছি অমনি ও ছুটলে আলমারির দিকে, গ্লাসের পর গ্লাস উড়িয়ে একেবারে বেহেড্ মাতাল হয়ে উঠল। ব্যস, ওইখানেই ইতি। কেউ আমাদের কাছে নেমন্তন্নে আসে না; কেউ না, কেউ না, কেউ না! শুধু মাঝে মাঝে সকালে কাজের ব্যাপারে কী সব লোক আসে, আমায় তখন ও ভাগিয়ে দেয়। অথচ সামোভার রয়েছে আমাদের, ডিনার সেট, চমৎকার টি-সেট — সবই আছে আমাদের, সবই উপহার। খাবার জিনিসও কত পাঠায় ওরা — কিনি কেবল মদ আর ওই মাথার তেল কি বিশেষ কোনো খাবার যেমন পেস্ট কি হ্যাম্ বা মিষ্টি যা আপনার জন্যে কিনেছি... কেমন ভাবে আমরা থাকি, কেউ যদি দেখত। এক বছর ধরে ভাবছি, কেউ একদিন অতিথি আসবে আমাদের কাছে, সত্যিকারের অতিথি, এসব তাকে দেখাব আমরা, খাওয়াব। লোকে তারিফ করবে, আমরাও খুশি হব। আর ওর চুল যে পাট করে দিয়েছি, ও তার যোগ্যই নয়! ওর কেবলি নোংরা পোশাকে ঘুরতে পারলেই হল। যে ড্রেসিং গাউনটা পরেছে দেখুন — ওটা উপহার পাওয়া। কিন্তু সে গাউনের কি ও যোগ্য? ওর শুধু ইচ্ছে মাতাল হওয়া। দেখবেন, চায়ের আগেই ও আপনাকে ভদকা এগিয়ে দেবে।'

'নয়ত কী! সত্যিই তো, কী বলো ভানিয়া? সোনামার্কার কিছুটা আর রুপোমার্কার কিছুটা হয়ে যাক। তারপর চাঙ্গা প্রাণে অন্য পানীয়ের পেছনে লাগা যাবে।'

'ঐ দেখুন, জানতাম ঐ হবে!'

'কিছু ভাবনা নেই সখি, চা-ও খাব কনিয়াক দিয়ে, আপনার স্বাস্থ্য পান করব।'

'ঐ দেখুন যা ভেবেছিলাম!' হতাশার ভঙ্গি করে চেঁচিয়ে উঠল আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা, 'এটা খানদানী চা, ছ'রুবল দাম, পরশু একজন ব্যবসায়ী আমাদের উপঢৌকন দিয়ে গেছেন, আর ও তা খেতে চায় কিনা কনিয়াক দিয়ে। ওর কথা শুনবেন না ইভান পেত্রোভিচ। এক কাপ আপনাকে এক্ষুনি দিচ্ছি, খেয়ে দেখুন... দেখুন কীরকম চা।'

সামোভার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল সে।

বোঝা গেল সারা সন্ধ্যেটা ওরা আমায় ওখানে আটকে রাখার মতলব করেছে। অতিথির জন্যে আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা অপেক্ষা করে আছে গোটা বছর ধরে, এবার তার সব শোধ তুলবে আমার ওপর দিয়ে। এসব আমার হিসেবের মধ্যে ছিল না।

আসন নিয়ে বললাম, 'শোন মাসলবোয়েভ, আমি তোর কাছে নেমন্তন্নে আসি নি, এসেছি কাজে। তুই নিজেই কী বলবি বলে ডেকেছিলি।'

'কাজ তো নিশ্চয়, কিন্তু দোস্তী একটু আলাপেরও পালা হোক।'

'না বন্ধু, থাকব বলে ভেবো না। ঠিক সাড়ে আটটায় বিদায় নেব। কাজ আছে — কথা দিয়েছি...'

'তা চলবে না, সে কী! ভেবে দ্যাখ আমার কী দশা করছিস। আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনার কী দশা করছিস। তাকিয়ে দ্যাখ ওর দিকে — স্তম্ভিত হয়ে গেছে। তাহলে কিসের জন্যে আমার চুল পাট করে ও দিলে আমার মাথায় বের্গামোট; ভেবে দ্যাখ!'

'তোর কেবলি তামাসা মাসলবোয়েভ। আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনার কাছে শপথ করে যাচ্ছি, পরের সপ্তাহে — যদি চাস শুক্রবারেই — আমি তোদের এখানে খেয়ে যাব, কিন্তু আজকে কথা দিয়েছি, মানে বলা ভালো, বিশেষ একটা জায়গায় যাওয়া আজ আমার স্রেফ দরকার। তুই বরং বল, কী বলতে চেয়েছিলি।'

'সত্যিই সাড়ে আটটা পর্যন্ত থাকছেন?' চমৎকার এক কাপ চা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে ভীত কাতর কণ্ঠে, প্রায় কান্নার গলায় বলে উঠল আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা।

মাসলবোয়েভ বললে, 'ভাবনা নেই সখি, বাজে কথা। ও থাকবে। ওসব বাজে কথা। বরং বল দেখি ভানিয়া, কোথায় যাবার অমন তাড়া তোর লেগেই আছে? কী তোর কাজ? জানতে পারি কি? কাজকর্ম ছেড়ে রোজই কোথায় যেন তুই ছুটছিস...'

'কিন্তু জানতে চাস কেন? তবে পরে তোকে হয়ত বলব। এখন বরং বল তো, আমি নিজেই তোকে বলেছিলাম, বাড়ি থাকব না মনে আছে, তা সত্ত্বেও কাল আমার ওখানে গিয়েছিলি কেন?'

'পরে মনে পড়েছিল, কাল ভুলে গিয়েছিলাম। সত্যিই তোর সঙ্গে কাজের কিছু কথা কইতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সর্বোপরি দরকার ছিল আলেক্সান্দ্রা

সেমিওনোভনাকে খুশি করার। ও বলে, "এই তো একজন লোক পাওয়া গেছে, দেখা যাচ্ছে তোমার বন্ধু। ওঁকে নেমন্তন্ন করো না কেন?" গত চার দিন ধরে এই নিয়ে ভায়া আমায় উত্যক্ত করে চলেছে। এই বের্গামোটের জন্যে পরকালে আমার চল্লিশটি পাপ তো খণ্ডন হয়ে যাবে অবশ্যই, কিন্তু ভাবলাম, সত্যিই একটা সন্ধ্যে বন্ধুর সঙ্গে কাটানো যাক না। তাই চাতুরীর আশ্রয় নেওয়া গেল। তোকে লিখে এলাম, এমন একটা কাজ আছে যে তুই না এলে আমাদের জাহাজ-ডুবি হয়ে যাবে।'

অনুরোধ করলাম, ভবিষ্যতে অমন কাজ না করে খোলাখুলিই যেন বলে। ওর কৈফিয়ৎটায় অবশ্য আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারলাম না।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তা সকালে অমন পালালি কেন?'

'সকালে সত্যিই কাজ ছিল, ধ্রুব সত্য কথা।'

'প্রিন্সের সঙ্গে?'

'আমাদের চা'টা ভালো লাগছে?' মধুমাখা সুরে জিজ্ঞেস করলে আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা।

পাঁচ মিনিট ধরে ও অপেক্ষা করেছিল আমি চায়ের প্রশংসা করব, কিন্তু আমার খেয়ালই হয় নি।

'চমৎকার চা আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা, অপূর্ব! এমন চা আমি কখনো খাই নি।'

আনন্দে একেবারে লাল হয়ে উঠে আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা ছুটে গেল আমায় আরো এক` ঢেলে দেবার জন্যে।

'প্রিন্স!' মাসলবোয়েভ চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই রাজাবাহাদুরটি ভাই, এমন ধড়িবাজ রাস্কেল যে!.. মানে, তোকে বলছি শোন, আমি নিজেও রাস্কেল, কিন্তু নেহাৎ সততার বশে ওর জায়গা নিতে আমি নারাজ। কিন্তু বাস, এইটুকুই! আর কোনো কথা নয়। ওর সম্পর্কে এইটুকুই যা বললাম বাস।'

'ওদিকে আমি অন্য কথা ছাড়াও, ইচ্ছে করেই এসেছি ওর কথা জিজ্ঞেস করব বলে। কিন্তু সে কথা পরে হবে। এখন বল, কাল যখন ছিলাম না তখন আমার এলেনাকে মিষ্টি দিয়ে নাচ দেখিয়ে এসেছিস কেন? দেড় ঘণ্টা ধরে কী কথাই বা বললি ওর সঙ্গে?'

হঠাৎ আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনার দিকে ফিরে মাসলবোয়েভ বুঝিয়ে বললে, 'এলেনা হল বারো কি হয়ত এগারো বছরের একটি খুকি, আপাতত

ইভান পেত্রোভিচের ওখানে আছে। দ্যাখ দ্যাখ ভানিয়া,' আঙ্বল দেখিয়ে বলে চলল, 'অজানা একটা মেয়ের কাছে মিষ্টি নিয়ে গিয়েছিলাম শ্বনে কীরকম লাল হয়ে উঠেছে দ্যাখ। এমনভাবে লাল হয়ে চমকে উঠল যেন আমরা হঠাৎ একটা পিস্তল ছ্বড়েছি... দ্যাখ ওর চোখদ্বটো, আগ্বন ঠিকরোচ্ছে! কিছ্ব লাভ নেই আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা, ল্বকোবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই! ঈর্ষা আপনার হয়েছে ঠিকই। ও যে এগারো বছরের মেয়ে তা যদি না বলতাম, তাহলে তক্ষ্বনি ও আমার ঝ্বটি ধরে টানত, বের্গামোটেও পরিত্রাণ পেতাম না।'

'এখনো পাবে না!'

বলেই আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা এক লাফে চায়ের টেবিলের পেছন থেকে এসে দাঁড়াল আমাদের কাছে, মাসলবোয়েভকে মাথা বাঁচাবার সময় না দিয়েই ওর এক ম্বঠো চুল ধরে কষে একখান হে'চকা টান মারলে।

'হয়েছে তো, হয়েছে তো! বাইরের লোকের সামনে খবরদার বলবে না আমার ঈর্ষা হয়! খবরদার না! খবরদার না! খবরদার না!'

লাল হয়ে উঠেছিল ও যদিও হাসছিল, তবে মাসলবোয়েভ কিন্তু পিটুনিটা খেল বেশ ভালোরকমই।

আমার দিকে ফিরে আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা গম্ভীরভাবে বললে, 'যত সব লজ্জার কথা বলা চাই ওর!'

চুল ঠিক করে প্রায় ছ্বটে ডিকাণ্টারটার কাছে গিয়ে মাসলবোয়েভ সিদ্ধান্ত টানলে, 'দেখছিস তো ভানিয়া, এই আমার জীবনের হাল! এই কারণে অবশ্য অবশ্যই ভদকা!' কিন্তু আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা তার আগেই ছ্বটে গেল টেবিলে, নিজেই খানিকটা ঢেলে ওকে দিলে, এমনকি একটা আদরের ঠোনাও দিলে ওর গালে। সগর্বে মাসলবোয়েভ আমার দিকে চোখ ঠেরে টাকরায় আওয়াজ করে গম্ভীরভাবে গ্লাসটি শ্বন্য করে দিলে।

তারপর সোফায় আমার পাশে বসে বলতে লাগল, 'ওই মিষ্টিগ্বলোর ব্যাপারটা ঠিক বলা ম্বশকিল। মাতাল অবস্থায় ওগ্বলো পরশ্ব কিনেছিলাম তরকারির দোকান থেকে, জানি না কেন। সম্ভবত স্বদেশী শিল্প বাণিজ্য সমর্থন করার জন্যে, কিন্তু সঠিক মনে নেই। শ্বধ্ব মনে আছে যে মাতাল হয়ে হাঁটছিলাম রাস্তা দিয়ে, কাদার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম, এবং নিজেকে অপদার্থ ভেবে চুল ছি'ড়ে কাঁদছিলাম। মিষ্টিগ্বলোর কথা অবিশ্যি ভুলে গিয়েছিলাম, তাই কাল পর্যন্ত ওগ্বলো আমার পকেটেই ছিল এবং তোর সোফার ওপর

যখন বসেছিলাম তখন বসেছিলাম ওগুলোর ওপরেই। নাচটার জন্যেও ওই একই বেসামাল অবস্থাটা দায়ী: কাল বেশ মাতালই ছিলাম আর মাতাল অবস্থায় যখন নিজের ভাগ্যটায় বেশ সন্তুষ্ট লাগে, তখন মাঝে মাঝে একটু নাচি। এই হল ব্যাপার; তাছাড়া ওই বাচ্ছা অনাথ মেয়েটার জন্যে একটু করুণাও জাগে। আর, তাছাড়া আমার সঙ্গে ও কথা কইতে চাইছিল না, মনে হচ্ছিল রেগে আছে। তাই ওকে খুশি করে তোলার জন্যে একটু নেচেছিলাম, মিণ্টিগুলোও দিয়েছিলাম।'

'ওর কাছ থেকে কিছু একটা বার করবার জন্যে ঘুষ দিচ্ছিলি না তো? সত্যি করে কবুল কর, আমি বাড়ি থাকব না জেনে ইচ্ছে করেই এসেছিলি, দু'জনে আলাপ করে ওর কাছ থেকে কিছু একটা বার করবার জন্যে নাকি নয়? আমি তো জানি যে, তুই ওর সঙ্গে দেড় ঘণ্টা কাটিয়েছিস, ওকে বুঝিয়েছিস ওর মাকে তুই চিনতিস, কী সব কথা জিজ্ঞেসাবাদ করেছিস।'

চোখ কুঁচকে চোয়াড়ের মতো হাসল মাসলবোয়েভ। বললে, 'তা করলে অবিশ্যি মন্দ হত না। কিন্তু না রে ভানিয়া, তা নয়। মানে, সুযোগ পেলে জিজ্ঞেসাবাদ কেনই বা করব না, কিন্তু তা নয়। শোন রে পুরাতন বন্ধু, সচরাচরের মতো আমি এখন যদিও যথেষ্ট মাতাল তথাপি জেনে রাখ, বদ মতলব নিয়ে ফিলিপ তোকে কখনো ঠকাবে না, মানে বদ মতলব নিয়ে।'

'কিন্তু ধরা যাক, বদ মতলব না নিয়ে?'

'তা... হ্যাঁ, বদ মতলব ছাড়াও। কিন্তু চুলোয় যাক ওসব, আর একটু পান করা যাক, তারপর কাজের কথা।' ও বললে খানিকটা মদ খেয়ে, 'ব্যাপারটা খুব একটা কিছু না। মেয়েটাকে নিজের কাছে রাখার কোনো অধিকার ওই বুবনভা মাগীটার নেই। আমি সব জেনেছি। মেয়ে হিশেবে পোষ্য গ্রহণ-টহন কিছু করে নি। মা ওর কাছে কিছু টাকা ধারত, সেই সুবাদে মেয়েটাকে ও দখল করে বসে। বুবনভা মাগীটা ইতর আর দুষ্কর্মা হলেও সব মেয়ের মতোই বোকা। পরলোকগতা মেয়েটির পাসপোর্টটা ছিল বৈধ, সুতরাং সব ঠিক আছে। এলেনা তোর সঙ্গে থাকতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে ভালো হয় যদি কোনো সহৃদয় পরিবার ওকে গুরুত্ব সহকারে প্রতিপালনের জন্যে ওকে গ্রহণ করে। তবে আপাতত ও তোর কাছেই থাকুক। ওটা কিছু না, আমি সেসব ব্যবস্থা করে দেব; ট্যাঁ-ফুঁ করার সাহস হবে না বুবনভার। এলেনার মায়ের সম্পর্কে সঠিক কিছু অবিশ্যি আমি এখনো জানতে পারি নি। জালৎসমান নামে কোনো এক লোকের বিধবা বউ ছিল মেয়েটি।'

'হ্যাঁ, নেল্লীও আমায় তাই বলেছে।'

'তাহলে এ ব্যাপারটার এইখানেই ইতি। এবার ভানিয়া,' খানিকটা গাম্ভীর্য নিয়ে শুরু করলে ও, 'তোর কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। পূর্ণ করতে হবে কিন্তু। যতটা পারিস বিস্তারিত বল, কী তোর কাজ, কোথায় যাস, একনাগাড়ে সারাটা দিন কাটাস কোথায়? আমি অবিশ্যি কিছুটা শুনেছি এবং খানিকটা জানি, কিন্তু আমার দরকার বিস্তারিত জানা।'

ওর এই গাম্ভীর্যে অবাক এমনকি অস্বস্তিও লাগল।

'কিন্তু কী ব্যাপার? জানতে চাইছিস কেন? এমন গুরুতর ভাব করে জিজ্ঞেস করছিস...'

'শোন ভানিয়া, বৃথা বাক্যব্যয়ে লাভ নেই: তোর একটা উপকার করে দিতে চাই। তোর সঙ্গে যদি চালাকি করতাম, তাহলে গুরুত্বের কোনো ভাব না দেখিয়েও তোর কাছ থেকে সবই বার করে নিতে পারতাম। অথচ তুই আমাকে সন্দেহ করছিস, এক্ষুনি ওই মিষ্টির ব্যাপারটা নিয়ে — আমি তো বুঝেছি। কিন্তু গুরুত্বের ভাব করে জিজ্ঞেস করছি বলেই তুই একথা ধরে নিতে পারিস যে আমার স্বার্থ নয়, তোর কথাই আমি ভাবছি। তাই অবিশ্বাস না করে সোজাসুজি বল, বিশুদ্ধ সত্যটি আমায় জানা...'

'কিন্তু কী উপকার করে দিবি? শোন মাসলবোয়েভ, বরং প্রিন্স সম্পর্কে আমায় কিছু বলতে চাইছিস না কেন? এটা আমার দরকার। সেইটাই হবে আমার উপকার।'

'প্রিন্স সম্পর্কে? হুঁ... বেশ তাই হোক, সোজাসুজিই বলছি: প্রিন্সের প্রসঙ্গেই তোকে জিজ্ঞেস করছি।'

'সে কী?'

'ব্যাপারটা এই। আমার নজরে পড়েছে যে, তোর ব্যাপারে প্রিন্স কেমন যেন জড়িয়ে পড়েছে। ভালো কথা, ও তোর সম্পর্কে আমায় জিজ্ঞাসাবাদও করছিল। আমাদের জানাশোনা আছে সে কথা ও কী করে টের পেল তা তোর জানা দরকার নেই। আসল ব্যাপার হল এই প্রিন্স সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকিস। উনি একটি বেইমান জুদাস্ — বলতে কি তার চেয়েও খারাপ। তাই যখন দেখলাম তোর ব্যাপারে ও জড়িয়েছে, তখন তোর কথা ভেবে ভয় হল আমার। তবে আমি তো কিছুই জানি না, তাই তোকে বলতে বলছি, যাতে বুঝতে পারি... সেই জন্যেই তোকে এখানে আসতে বলেছিলাম। আমার জরুরী যে কাজ সেটা এই। খোলাখুলি তোকে বললাম।'

'কিছুটা অন্তত আমায় তুই বল, অন্তত বল, কেন প্রিন্স সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে আমায়?'

'বেশ, তাই সই। কতকগুলো কাজ আমায় মাঝে মাঝে নিতে হয়। কিন্তু তুই নিজেই ভেবে দ্যাখ, লোকে তাদের কাজ আমায় বিশ্বাস করে দেয় এইজন্যে যে আমি তা বলে বেড়ানোর মতো লোক নই। তাহলে কী করে তোকে বলি? তাই কিছু মনে করিস না যদি খানিকটা সাধারণভাবে, আসলে অত্যন্তই মোটামুটি রকমে দেখাই লোকটা কী পাষণ্ড। তাহলে এবার প্রথমে শুরু কর তোর কাহিনী দিয়ে।'

ভেবে দেখলাম, মাসলবোয়েভের কাছ থেকে আমার ব্যাপারটার কোনো কিছু চেপে রেখে লাভ নেই। নাতাশার কাহিনী গোপন কিছু নয়। তাছাড়া, ওর জন্যে মাসলবোয়েভ কাছ থেকে কিছু উপকারও আশা করা যেতে পারে। অবিশ্যি, আমার গল্পের কতকগুলো দিক আমি যথাসম্ভব এড়িয়ে গেলাম। প্রিন্স ভালকোভস্কি সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা মাসলবোয়েভ শুনলে একটু বেশিরকম মনোযোগ দিয়ে। প্রায়ই আমায় বাধা দিচ্ছিল, বারবার করে প্রশ্ন করছিল। ফলে ব্যাপারটা ওকে প্রায় খ‍ুঁটিয়ে খ‍ুঁটিয়েই বলতে হল। বললাম আধ ঘণ্টা ধরে।

'হুঁ, মেয়েটার মাথায় বুদ্ধি আছে।' সিদ্ধান্ত টানলে মাসলবোয়েভ। 'প্রিন্সের ব্যাপারে একেবারে সঠিকভাবে সব কিছু ধরতে না পারলেও অন্তত এই একটা জিনিসই ভালো যে কী ধরনের লোকের পাল্লায় পড়েছে তা প্রথমেই আন্দাজ করতে পেরে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। সাবাস নাতালিয়া নিকোলায়েভনা, ওর স্বাস্থ্য পান করা যাক।' (গেলাস খালি করলে মাসলবোয়েভ।) 'শুধু বুদ্ধিই নয়, নিজেকে বঞ্চনা না করার মতো হৃদয়েরও দরকার ছিল। আর সে হৃদয় ওকে ডোবায় নি। অবিশ্যি হেরে ও গেছে, প্রিন্স তার জেদ ধরেই থাকবে এবং আলিওশা ওকে ছেড়ে যাবে। দুঃখ শুধু ইখমেনেভের জন্যে — দশ হাজার দিতে হবে এই বদমায়েসটাকে! আর কেই-বা তার মামলা চালাল, কে তদ্বির করল — নিশ্চয় নিজেই! ঈস্! একেবারে মাথা-গরম উঁচু-মনের লোক সব! কিছুই হয় না অমন লোক দিয়ে! প্রিন্সের সঙ্গে ওভাবে চলা উচিত হয় নি। ইখমেনেভের জন্যে এইসা এক উকিল আমি দিতে পারতাম — ঈস্!' ক্ষোভে টেবিলে চাপড় মারলে মাসলবোয়েভ।

'এখন তাহলে প্রিন্স সম্পর্কে বল।'

'আর তুই কেবলি ওই প্রিন্স প্রিন্স করে চলেছিস। কিন্তু ওর কথা আর

বলার কী আছে। কথাটা তুলেই বেকুবি করেছি। আমি শুধু তোকে ঐ জোচ্চোরটা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিতে চাইছিলাম, মানে ওর প্রভাব থেকে তোকে রক্ষা করতে। ওর সংস্পর্শে এলে কেউই আর নিরাপদ থাকে না। তাই চোখ খোলা রাখিস, এই হল কথা। আর তুই ভেবেছিস কোনো এক রোমহর্ষক প্যারিসীয় গোপন কথা বুঝি তোকে শোনাব। বেশ বোঝা যাচ্ছে তুই ঔপন্যাসিক। ওই বদমায়েসটার কথা আর বলবার কী আছে। বদমায়েস, সে বদমায়েসই... দৃষ্টান্ত হিশেবে তোকে ওর একটা ছোট্ট কীর্তির কথা বলব, অবিশ্যিই শহর, কি লোকজনের নাম না করে, অর্থাৎ পঞ্জিকার যাথার্থ্য ছাড়া। তুই জানিস, তরুণ বয়সে যখন চাকরির বেতন দিয়েই চালাতে হত, তখন ও বিয়ে করে এক ধনী ব্যবসায়ীর মেয়েকে। ব্যবসায়ীকন্যার সঙ্গে ও কিন্তু বিশেষ ভালো ব্যবহার করে নি, আর যদিও এখন ব্যাপারটা সেই মেয়েটিকে নিয়ে নয়, তবু বলে রাখছি দোস্ত ভানিয়া, এরকম ব্যাপার থেকে মুনাফা তুলতে ও সর্বদাই ভারি ভালোবাসে। যেমন আর একটা ঘটনা। বিদেশে যায় ও। সেখানে...'

'দাঁড়া, মাসলবোয়েভ, কোন বিদেশযাত্রার কথা তুই বলছিস, কোন বছরটায়?'

'একেবারে কাঁটায় কাঁটায় নিরানব্বুই বছর তিন মাস আগে। যাক, সেখানে তো কোনো এক পিতার কন্যাকে সে ফুসলিয়ে নিয়ে চলে যায় প্যারিসে। কান্ডও করেছিল বটে! বাপটা ছিল কোনো এক কারখানার মালিক, অথবা ওইরকমই কিছু একটার অংশীদার, নিশ্চিত করে কিছু জানি না। আমি তোকে যে বলছি সেটা আমার নিজের অনুমান এবং বিভিন্ন ঘটনা থেকে আমার যা ধারণা, তাই থেকে। প্রিন্স তার ব্যবসার মধ্যে ঢুকে পড়ে তাকেও ঠকায়। ঝাড়া জোচ্চুরি করে ওর টাকাকড়ি মেরে দেয়। প্রিন্স যে টাকা নিয়েছে, তার কিছু দলিলপত্র অবিশ্যি সেই বৃদ্ধের ছিল। কিন্তু প্রিন্স টাকাটা নিতে চাইছিল এমনভাবে যাতে আর ফেরত দিতে না হয়, অর্থাৎ সোজা কথায় চুরি করতে। বৃদ্ধের একটি মেয়ে ছিল, মেয়েটি সুন্দরী, এবং সে সুন্দরীর প্রেমে পড়েছিল আদর্শ একটি মানুষ, শিলারের জাত ভাই, কবি, সেই সঙ্গে ব্যবসায়ী, নবীন স্বপ্নদ্রষ্টা। সংক্ষেপে, খাঁটি একজন জার্মান, কে একজন ফেফারকুখেন।'

'তুই কি বলছিস যে ওর উপাধি ছিল ফেফারকুখেন?'

'মানে, ফেফারকুখেন নাও হতে পারে — চুলোয় যাক গে লোকটা — ব্যাপারটা তাকে নিয়ে নয়। কিন্তু প্রিন্স মেয়েটির কাছে গিয়ে জমাল। এমন জমান জমাল, মেয়েটি তার প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগল। প্রিন্সের তখন দুটি লক্ষ্য:

প্রথমত, করতলগত করা মেয়েটিকে এবং দ্বিতীয়ত, বৃদ্ধের কাছ থেকে নেওয়া টাকাটার দলিলগুলিকে। বৃদ্ধের সমস্ত দেরাজের চাবি থাকত মেয়েটিরই কাছে। বৃদ্ধ ভারি ভালোবাসত মেয়েকে, এতই ভালোবাসত যে কারো সঙ্গে বিয়ে দিতেও চাইত না। সত্যি বলছি। প্রতিটি পাণিপ্রার্থী সম্পর্কে ও হয়ে উঠত ঈর্ষান্বিত, মেয়েটির সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে, এ ও কল্পনা করতে পারত না। ফেফারকুখেনকে ভাগিয়ে দিলে। ক্ষ্যাপাটে এক ইংরেজ বটে...'

'ইংরেজ? কিন্তু কোথায় এসব ঘটে?'

'ইংরেজ বললাম শুধু একটা উপমা দিয়ে বোঝাবার জন্যে, আর অমনি তুই লাফিয়ে উঠলি। ব্যাপারটা ঘটেছিল সান্তা-ফে-দা-বগোতায় কিংবা হয়ত ক্রাকোভে, কিন্তু খুবই সম্ভব ওই সেলজার-জলের বোতলগুলোয় যা লেখা থাকে সেই নাসাউ রাজ্যে, নিশ্চয় নাসাউতে — খুশি হলি তো? তারপরে তো প্রিন্স মেয়েটিকে পটিয়ে বাপের কাছ থেকে নিয়ে গেল তাকে, প্রিন্সের জেদাজেদিতে মেয়েটি কী কতকগুলো দলিলও সঙ্গে নিল। এমন প্রেমও হয় রে ভানিয়া, হায় ভগবান! অথচ মেয়েটা ছিল সৎ, উদার, উন্নতমনা। অবিশ্যি ওই দলিলগুলোর মর্ম সম্পর্কে মেয়েটা হয়ত বিশেষ কিছু জানত না। তার শুধু একটাই দুশ্চিন্তা ছিল: বাপ অভিশাপ দেবে। প্রিন্স এক্ষেত্রেও বুদ্ধি খাটাল। লিখিতভাবে একটা আনুষ্ঠানিক বৈধ প্রতিশ্রুতি দিল যে ওকে বিয়ে করবে। এবং তা দিয়ে মেয়েটাকে বোঝাল যে তারা বিদেশ যাচ্ছে শুধু অল্প কিছু কালের জন্যে, কিছু বেড়ানো হবে আর কি, তারপর বৃদ্ধের রাগ পড়ে এলেই তারা ফিরে আসবে বিয়ে করে এবং অতঃপর তিনজনে সারা জীবন সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটাবে, টাকাকড়ি জমাবে, ইত্যাদি। মেয়েটা পালাল, বুড়ো বাপ অভিশাপ দিলে, এবং নিজে হয়ে পড়ল দেউলিয়া। ফ্রয়েনমিল্‌খও মেয়েটির পেছু পেছু প্যারিস গেল সবকিছু ফেলে রেখে, ব্যবসাটা পর্যন্ত ভাসিয়ে দিয়ে। লোকটা ভারি ভালোবাসত মেয়েটিকে।'

'দাঁড়া, দাঁড়া, ফ্রয়েনমিল্‌খটা কে?'

'মানে, ওই তো ওই লোকটা! কী যেন তার নাম! ফয়েরবাখ কি... ধুঃ শালা: ফেফারকুখেন! প্রিন্স অবশ্য মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারেন না, কাউণ্টেস খ্লেসতোভা কী বলবেন? ব্যারন স্লপেরাই বা কী ভাববেন।* সুতরাং প্রবঞ্চনা

---

* রুশ প্রবাদ: লোকে কী বলবে। — সম্পাঃ

করতে হল, এবং করলেও বড়ো বেশি নির্লজ্জভাবে। প্রথমত, মেয়েটির ওপর প্রায় শুধু মারধরটাই বাকি ছিল। এবং দ্বিতীয়ত, ফেফারকুখেনকে ইচ্ছে করেই নেমন্তন্ন করতে লাগল। ফেফারকুখেনও আসতে শুরু করলে এবং মেয়েটির বন্ধু হয়ে দাঁড়াল। গোটা সন্ধ্যেটা ওরা একসঙ্গে বসে কাটাত, বিলাপ করত, দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে কাঁদত। ও সান্ত্বনা দিত মেয়েটাকে, সাদাসিধে সব মানুষ আর কি। প্রিন্স ইচ্ছে করেই এইটে ঘটিয়েছিল। তারপর একদিন হঠাৎ বেশি রাত করে প্রিন্স হাজির হল ওদের সামনে, অছিলা পেয়ে গেল, বললে অবৈধ সম্পর্ক আছে ওদের মধ্যে। বললে স্বচক্ষে সে দেখেছে, তারপর দু'জনকেই বাড়ি থেকে বার করে দিয়ে নিজে কিছুকালের জন্যে চলে গেল লণ্ডনে। মেয়েটি তখন আসন্নপ্রসবা। বিতাড়িত হওয়ার পরই ওর মেয়ে হল একটি, মানে মেয়ে নয়, একটা ছেলে, সুন্দর একটি খোকাই। নাম দেওয়া হল ভলোদ্‌কা। ফেফারকুখেন হল তার ধর্ম বাপ। মেয়েটি ফেফারকুখেনের সঙ্গে গেল আর কি। কিছু টাকা ছিল তার। মেয়েটি সফর করে সুইজারল্যাণ্ড আর ইতালি... ওই সব কাব্যিময় যত জায়গা আছে সব — যা করা উচিত আর কি। মেয়েটি কেবলি কাঁদত, আর ফেফারকুখেন বিলাপ করত এবং এইভাবে বহু বছর কেটে গেল, বড়ো হয়ে উঠল মেয়েটি। প্রিন্সের পক্ষে সবকিছুই ভালোই চলেছিল, শুধু একটা হয়েছিল খারাপ: বিয়ের প্রতিশ্রুতিপত্রটা সে আর ফেরত পায় নি। বিদায়ের সময় মেয়েটি বলেছিল, "তুমি অতি নীচ, আমার টাকাকড়ি মেরেছ, আমার মান খুইয়েছ, এখন ছেড়ে যাচ্ছ। বিদায়। কিন্তু প্রতিশ্রুতিপত্রটা তোমায় আমি ফেরত দেব না। তোমায় একসময় বিয়ে করতে চেয়েছিলাম বলে নয় — ও দলিলটাকে তুমি ভয় পাও বলে। তাই ওটি চিরকাল নিজের কাছেই থাক।" উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল আর কি, কিন্তু প্রিন্সের দুশ্চিন্তা ছিল না। যাদের বলা হয় উঁচু মনের লোক তাদের সঙ্গে আচরণে এই ধরনের পাজীগুলোর সব সময়েই ভারি সুবিধে। এরা এতই উন্নতমনা যে তাদের ঠকানো খুবই সহজ। তাছাড়া, আইনের আশ্রয় নেওয়া সম্ভব হলেও ওরা সেটা কাজে না লাগিয়ে সর্বদাই একটা সমুন্নত ঘৃণায় সরে যায়। যেমন ওই তরুণী মা-টি — ভারি একটা অহঙ্কৃত ঘৃণা নিয়ে সরে গেল আর প্রতিশ্রুতিপত্রটি নিজের কাছে রেখে দিলেও প্রিন্স নিশ্চিতই জানত, তা নিয়ে মামলা করার বদলে ও বরং গলায় দড়ি দেবে। মানে আপাতত প্রিন্স নিশ্চিন্ত রইল এবং মেয়েটি ওর জঘন্য মুখে থুতু দিলেও ভলোদ্‌কা যে ওর কোলে: ও যদি মরে তবে তার দশা কী হবে? কিন্তু সেকথা মেয়েটি ভাবল

না। ব্রুদার্স্যাফ্‌ট্‌ও তাকে উৎসাহ দিচ্ছিল, এবং এসব কথা না ভেবে দু'জনে মিলে শিলারের কবিতা পড়ত। শেষ পর্যন্ত ব্রুদার্স্যাফ্‌ট্‌ কী একটা অসুখ হয়ে মারা গেল...'

'মানে ফেফারকুখেন?'

'ওই হ্যাঁ, চুলোয় যাক নাম! আর মেয়েটা...'

'দাঁড়া, দাঁড়া! কত বছর ধরে ওরা বাইরে ছিল?'

'কাঁটায় কাঁটায় দু'শ বছর। যাক, মেয়েটি ফিরে গেল ক্রাকোভে। বাপ তাকে গ্রহণ করলে না, অভিশাপ দিলে। মেয়েটি মারা গেল; এবং আহ্লাদে প্রিন্স ক্রুশ করলে। আমিও ছিলাম বঁধু, পান করেছি মধু, লম্বা মোচে চেটে, ঢুকল নাকো পেটে, টুপিটি শুধু পরার, পরেই আমি ফেরার*... আয় পান করা যাক ভানিয়া।'

'ওর ব্যাপারে তুইও কাজ করছিস বলে সন্দেহ হচ্ছে মাসলবোয়েভ।'

'একান্তই জানতে চাস?'

'কিন্তু বুঝতে পারছি না, এ ব্যাপারে তোর কী করার আছে।'

'মানে মেয়েটি যখন দশ বছর বাদে মাদ্রিদে অন্য নামে ফিরে এল, তখন ব্রুদার্স্যাফ্‌টের ব্যাপারটা, বুড়োটার ব্যাপারও, মেয়েটা সত্যি ফিরে এসেছিল কিনা, বাচ্চাটার কী হল, তারপর মেয়েটি মারা গেছে কিনা, তার কাছে কোনো দলিল ছিল কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি অশেষ ব্যাপার জানার দরকার পড়ল। আরো কিছুও আছে। অতি পাজী লোক ওটা ভানিয়া, হুঁশিয়ার থাকিস। আর মাসলবোয়েভ সম্পর্কে একটা কথা মনে রাখিস, কোনো অবস্থায় কদাচ ওকে হারামজাদা বলিস না! মাসলবোয়েভ হারামজাদা হলেও (আমার মতে কেই-বা হারামজাদা নয়) তোর বিরুদ্ধে যাবে না। খুব টেনেছি বটে, কিন্তু শোন, এখন কি দূর ভবিষ্যতে, এ বছর কি আগামী বছর যদি কখনো তোর মনে হয় যে, মাসলবোয়েভ তোকে ধাপ্পা দিয়েছে (কথাটা মনে রাখিস — ধাপ্পা), তাহলে নিশ্চিন্ত থাকিস যে সেটা কোনো কুমতলবে নয়। মাসলবোয়েভ তোর ওপর নজর রাখছে। তাই সন্দেহ পোষণ না করে খোদ মাসলবোয়েভের কাছে এসে ভাইয়ের মতো সব খোলসা করে নিবি। তাহলে এখন একটু মদ খাবি কি?'

'না।'

---

* রুশী রূপকথার শেষের ছড়া বাঙলায় যেমন — 'আমার কথাটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়লো...' — সম্পাঃ

'তাহলে কিছু খাবার খা।'

'না ভাই, মাপ কর...'

'তাহলে দূর হ। ন'টা বাজতে পনেরো। তোর বড়ো গুমর। যাবার সময় হয়ে গেছে।'

আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা প্রায় কে'দে ফেলে বলে উঠল, 'সে কী? কেন? মদ খেয়ে খেয়ে নিজে বুঁদ হয়ে এখন অতিথিকে তাড়িয়ে দিচ্ছে! চিরকাল ও এইরকম! লজ্জাও নেই!'

'ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে পদাতিকের যে দোস্তি হয় না। আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা, একসঙ্গে পড়ে থেকে দু'জন দুজনকে পুজো করব। উনি হলেন একজন জেনারেল! না ভানিয়া, ঠিক বললাম না, তুই জেনারেল নোস, কিন্তু আমি একটা হারামজাদা! শুধু একবার চেয়ে দ্যাখ, আমায় কীরকম দেখাচ্ছে! তোর পাশে আমি একটা কী? মাপ করিস ভানিয়া, রাগ করিস না, শুধু প্রাণ উজাড় করতে দে...'

আমায় জড়িয়ে ধরে ও কে'দে ফেললে। আমি বিদায় নিলাম।

সাংঘাতিক যাতনা নিয়ে বলে উঠল আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা, 'হায় ভগবান! রাতের খাবার করেছিলাম যে আপনার জন্যে! শুক্রবার অন্তত সত্যিই আসবেন তো?'

'আসব আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা, কথা দিচ্ছি আসব।'

'ও ভারি... মাতাল বলে আপনি হয়ত ঘেন্না করছেন। ওকে কিন্তু ঘেন্না করবেন না ইভান পেত্রোভিচ! ভারি ভালো মন, ভারি মন ভালো, কী ভালোবাসে আপনাকে! আমার কাছে দিন-রাত্তির শুধু আপনার কথা। আপনার বইগুলো ও বিশেষ করে কিনে এনেছিল আমার জন্যে। এখনো পড়া শুরু করি নি, কাল করব। আপনি এলে কী ভালোই না লাগবে আমার। কাউকে তো দেখি না। কেউ আমাদের এখানে এসে সন্ধ্যে কাটিয়ে যায় না। সবই আমাদের আছে, কিন্তু সব সময়েই আমরা একা। আপনারা আজ কথা কইছিলেন, বসে বসে আমি শুনছিলাম... কী ভালোই না লাগছিল... তাহলে শুক্রবারে...'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বেরিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালালাম বাড়ির দিকে। মাসলবোয়েভের কথাগুলো খুব অবাক করেছিল আমায়। ঈশ্বর জানেন কত কী ভাবনা ঘুরছিল মাথায়...

আর হবি তো হ, বাড়িতে এমন একটা ঘটনা তৈরি হয়ে ছিল আমার জন্যে যে বিদ্যুতস্পৃষ্টের মতো ঝাঁকুনি খেলাম।

আমি যে বাড়িতে থাকতাম, তার ঠিক ফটকেই একটা রাস্তার আলো ছিল। ফটকে ঢুকতে যাব এমন সময় ঠিক আলোটার কাছ থেকে এমন অদ্ভুত একটা মূর্তি বেগে ধেয়ে এল আমার দিকে যে চেঁচিয়েই উঠলাম। ভীত কম্পিত অর্ধোন্মাদ কী একটা জীব চেঁচাতে চেঁচাতে এসে হাত আঁকড়ে ধরল আমার। ভয়ে অভিভূত হয়ে তাকিয়ে দেখি নেল্লী।

চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কী হয়েছে নেল্লী, কী ব্যাপার?'

'ওপরে... আমাদের ঘরে... ও বসে আছে...'

'কে বসে আছে? এসো, আমার সঙ্গে এসো।'

'না, আমি যাব না — ও না যাওয়া পর্যন্ত আমি এখানে... বারান্দায় থাকব... যাব না।'

মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত আশঙ্কা নিয়ে ঘরে গেলাম। দরজা খুলে দেখি প্রিন্স ভালকোভস্কি। টেবিলের কাছে বসে উনি আমার উপন্যাসটা পড়ছিলেন। না পড়লেও বইটা অন্তত খোলা ছিল।

খুশি হয়ে উনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ইভান পেত্রোভিচ, আপনি অবশেষে যে ফিরে এলেন ভারি আনন্দ হল। প্রায় চলে যাচ্ছিলাম একটু হলে। এক ঘণ্টার বেশি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি। কাউণ্টেসের একান্ত আগ্রহ ও ইচ্ছায় আমি কথা দিয়ে এসেছি, এই সন্ধ্যেতেই আপনাকে ওঁর কাছে নিয়ে যাব। উনি অনুনয় করেছেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে উনি খুব উৎসুক। আর আপনি তো আমায় আগেই কথা দিয়ে রেখেছিলেন, তাই ভাবলাম, অন্য কোথাও আপনি বেরিয়ে যাবার আগেই গিয়ে আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই। আমার দুঃখটা কল্পনা করুন; এলাম কিন্তু আপনার দাসীর কাছ থেকে শুনলাম আপনি বাড়ি নেই। এখন উপায়? আমি যে কথা দিয়ে এসেছি আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাব, তাই অপেক্ষা করে বসে রইলাম। ভেবেছিলাম পনেরো মিনিট অপেক্ষা করব। আর এই দেখুন আপনার পনেরো মিনিট। আপনার উপন্যাসখানা খুলে পড়ায় ডুবে গিয়েছিলাম। ইভান পেত্রোভিচ! এ যে অপূর্ব, এর পরেও লোকে আপনাকে বুঝছে না! আমার চোখ থেকেও যে জল ঝরিয়েছেন আপনি। সত্যি কেঁদে ফেলেছিলাম আমি, যদিও কান্না আমার বিশেষ আসে না...'

'আপনি তাহলে আমায় যেতে বলছেন? কিন্তু বলতেই হচ্ছে যে এখন... মানে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু...'

'ঈশ্বরের দোহাই, চলুন যাই! ভেবে দেখুন, আমার প্রতি আপনি কত অবিচার করছেন! দেড় ঘণ্টা ধরে আপনার জন্যে বসে আছি!.. তাছাড়া আপনার সঙ্গে যে আমার কথা বলা খুবই, খুবই দরকার। বুঝছেন তো কী নিয়ে। গোটা জিনিসটা আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন... হয়ত কিছু একটা স্থির করা যাবে, কিছু একটা আলোচনা করা যাবে, একটু বিবেচনা করুন! দোহাই আপনার, না করবেন না।'

ভেবে দেখলাম আজ হোক, কাল হোক যেতেই হবে। নাতাশা অবিশ্যি এখন একলা, আমায় তার খুব প্রয়োজন, কিন্তু ও নিজেই তো আমায় যথাশীঘ্র কাতিয়াকে চিনে নেবার ভার দিয়ে রেখেছে। তাছাড়া আলিওশাও হয়ত সেখানে... জানতাম, কাতিয়ার সংবাদ না দেওয়া পর্যন্ত নাতাশা স্বস্তি পাবে না। তাই ঠিক করলাম যাব। কিন্তু দুশ্চিন্তাটা নেল্লীর জন্যে।

প্রিন্সকে বললাম, 'একমিনিট দাঁড়ান।' বেরিয়ে এলাম সিঁড়িতে, অন্ধকার একটা কোণে নেল্লী দাঁড়িয়ে আছে।

'ভেতরে আসছ না কেন নেল্লী? কী করেছেন উনি? কী বলেছেন?'

'কিছু করেন নি... আমি ভেতরে যাব না, যাব না...' পুনরাবৃত্তি করলে ও, 'ভয় লাগছে আমার...'

যতই ওকে বোঝাবার চেষ্টা করি না কেন কোনো ফল হল না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, প্রিন্সকে নিয়ে আমি বেরিয়ে গেলেই ও ঘরে ঢুকে তালা বন্ধ করে থাকবে।

'আর কাউকেও ঢুকতে দিও না নেল্লী, যতই কেন না বোঝাবার চেষ্টা করুক।'

'কিন্তু আপনি কি ওর সঙ্গে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

কেঁপে উঠে ও আমার হাতখানা আঁকড়ে ধরলে। যেন মিনতি করতে চায় যাবেন না। কিন্তু কোনো কথা বললে না। ঠিক করলাম পরের দিন ওকে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করব।

প্রিন্সের কাছে মার্জনা চেয়ে নিয়ে আমি বেশভূষা করতে শুরু করলাম। প্রিন্স আশ্বাস দিলেন, ওখানে বেশভূষার দরকার নেই, প্রসাধনের দরকার নেই। তারপর বিচারকের মতো আমার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখে যোগ

করলেন, 'এই একটু ফিটফাট হলেই হবে। জানেন তো... সামাজিক এই সব সংস্কারগুলো... একেবারে তো কাটিয়ে ওটা যায় না। তেমন একটা পূর্ণতা আপনি খুঁজে পাবেন না আমাদের সমাজে।' আমার একটা ড্রেস-কোট আছে দেখে মন্তব্য করলেন খুশি হয়ে।

আমরা বেরিয়ে গেলাম। নেল্লী ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। প্রিন্সকে সিঁড়িতে একটু দাঁড় করিয়ে রেখে আমি ফিরে গিয়ে আরো একবার বিদায় জানালাম ওকে। ভারি অস্থির হয়ে উঠেছিল সে। মুখটা নীলাভ। তার জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল আমার। ওকে ফেলে, রেখে যেতে কষ্ট হচ্ছিল আমার।

নিচে নামতে নামতে প্রিন্স বললেন, 'আপনার চাকরানীটি অদ্ভুত। মেয়েটা তো আপনার চাকরানী, না?'

'না... ও... ও এমনি আমার সঙ্গে আপাতত আছে।'

'ভারি অদ্ভুত মেয়ে। আমার নিশ্চয় ধারণা, ওর মাথাটা খারাপ। প্রথমটা আমায় বেশ ভালোভাবেই জবাব দিলে, কিন্তু তারপর আমার দিকে ভালো করে একবার তাকিয়েই চেঁচিয়ে-মেচিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ধেয়ে এল আমার দিকে, আঁকড়ে ধরল আমায়... কী বলতে গেল, পারল না। স্বীকার করছি সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ওর কাছ থেকে পালাই, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ও নিজেই পালিয়ে গেল। আমি একেবারে থ। ওর সঙ্গে থাকেন কী করে?'

বললাম, 'ওর মৃগীরোগ আছে।'

'ও, তাই! যদি ফিট হয়... তাহলে অবিশ্যি অবাক হবার কিছু নেই।'

হঠাৎ একটা কথা আমার মনে খেলে গেল — আগের দিন আমি বাড়িতে নেই জেনেও মাসলবোয়েভের আগমন, সকালে মাসলবোয়েভের ওখানে আমার যাওয়া, অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় এবং অনিচ্ছায় আজ মাসলবোয়েভ আমায় যে কাহিনীটা শুনিয়েছে সেটা, সন্ধ্যা সাতটায় যাবার জন্যে ওর নিমন্ত্রণ, আমাকে ও ধাপ্পা দেবে না এই কথা বিশ্বাস করাবার জন্যে ওর আগ্রহ এবং পরিশেষে, আমি মাসলবোয়েভের ওখানে আছি হয়ত একথা জেনেই এবং নেল্লীর ছুটে পালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও প্রিন্সের দেড় ঘণ্টা যাবৎ এখানে আমার জন্যে অপেক্ষা — নিজেদের মধ্যে এসবেরই যেন কেমন একটা যোগাযোগ আছে। বেশ ভাবনার কথা।

ফটকের কাছে প্রিন্সের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা গাড়িতে চেপে রওনা দিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আমাদের গন্তব্য বেশি দূর নয়, তরগোভি ব্রিজ্। প্রথমটা চুপ করেছিলাম আমরা। কেবলি ভাবছিলাম কী করে উনি শুরু করবেন। ভেবেছিলাম, আমাকে একটু যাচাই করে বাজিয়ে দেখে নিতে চাইবেন। কিন্তু ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে না গিয়ে উনি সোজাসুজিই কথাটা পাড়লেন।

বললেন, 'একটা ব্যাপারে এখন আমি খুব চিন্তিত বোধ করছি, সর্বাগ্রে সেই কথাটাই বলে আপনার পরামর্শ নেব। মোকদ্দমায় জিতে আমি যা পেয়েছি সেটা ছেড়ে দেব বলে বহু আগেই মন ঠিক করে রেখেছি, ঐ দশ হাজার রুবল আমি ইখমেনেভকেই ফেরত দেব। কীভাবে তা করা যায়?'

মনে আমার বিদ্যুতের মতো কথাটা খেলে গেল, "কী করা যায় তা তুমি জানো না এ হতেই পারে না। মজা করছ না তো আমায় নিয়ে?"

যথাসাধ্য সহজভাবে বললাম, 'জানি না প্রিন্স, তবে অন্য ব্যাপার, মানে নাতালিয়া নিকোলায়েভনা সম্পর্কিত কোনো ব্যাপার হলে আপনার এবং আমাদের সকলের প্রয়োজনীয় খবর আমি দিতে পারি, কিন্তু এ ব্যাপারে তো আপনি নিশ্চয় আমার চেয়ে ভালো জানেন।'

'না, না, আপনার চেয়ে আমি অবশ্যই অনেক কম জানি। আপনি ওদের জানাশোনা লোক, তাছাড়া নাতালিয়া নিকোলায়েভনা নিজেও হয়ত এ বিষয়ে তাঁর মতামত আপনার কাছে প্রকাশ করে থাকতে পারেন, আর সেইটেই আমার কাছে প্রধান পরামর্শ। আপনি আমায় প্রভূত সাহায্য করতে পারেন — ব্যাপারটা যে ভারি জটিল। ছেড়ে দিতে আমি রাজী, এমনকি একেবারে ঠিকই করেছি যে ছেড়ে দেব, তাতে অন্যান্য ব্যাপারের যে পরিণতিই হোক না কেন, বুঝতে পারছেন তো? কিন্তু কেমন করে, কী প্রকারে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব? সেই হল সমস্যা। বৃদ্ধ গর্বিত, একগুঁয়ে। খুবই সম্ভব, হয়ত উনি আমার সদাশয়তার জন্যেই অপমান করে বসবেন, টাকাটা ছুঁড়ে ফেলে দেবেন আমার মুখের ওপর।'

'কিন্তু, একটা কথা বলুন, ও টাকাটা সম্পর্কে কী ভাবছেন, ওটা আপনার না ওঁর?'

'মোকদ্দমায় আমি জিতেছি, সুতরাং টাকাটা আমারই।'

'কিন্তু আপনার বিবেকের কাছে?'

আমার সোজা সাপটা কথায় কিছুটা তিক্ত হয়ে উনি জবাব দিলেন,

'অবশ্যই আমার বলে মনে করি। তবে আপনি বোধ হয় ব্যাপারটার সমস্ত তথ্য জানেন না। বৃদ্ধ আমায় ইচ্ছে করে প্রতারণা করেছেন, এ দোষ আমি দিচ্ছি না, এবং আপনাকে বলছি সে অভিযোগ আমি কদাচ আনি নি। উনি নিজেই গায়ে পড়ে নিজেকে অপমানিত করে তুলেছেন। ওঁর দোষটা অবহেলা, ওঁর ওপরে ভার দেওয়া বিষয়-আষয়টার খারাপ ব্যবস্থাপনা, আর আমাদের আগের চুক্তি অনুসারে এই ধরনের কিছু ব্যাপারের জন্যে জবাবদিহি করতে উনি বাধ্য। কিন্তু কি জানেন, সেটাও আসল কথা নয় — আসল ব্যাপারটা হল আমাদের ঝগড়া, সেদিন পরস্পর অপমান, মানে, দু'দিক থেকেই একটা আহত অহমিকা। নোংরা ঐ হাজার দশেক টাকাটা আমি হয়ত গ্রাহ্যেই আনতাম না, কিন্তু আপনি তো জানেন, কী থেকে, কেমন করে তখন এই গোটা ব্যাপারটা বাধল। আমি মেনে নিতে রাজী যে আমি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলাম, বলতে কি সেটা অন্যায়ই হয়েছিল (অর্থাৎ তখন অন্যায় হয়েছিল), কিন্তু সেটা আমার খেয়াল হয় নি, ওঁর রূঢ়তায় অপমানিত আর বিরক্ত হয়ে সুযোগটা আর ছাড়ি নি, মামলা ঠুকে দিই। আপনার মনে হতে পারে, জিনিসটা আমার দিক থেকে খুব মহত্ত্বের হয় নি। নিজের দোষ ঢাকতে চাই না, শুধু বলব, ক্রোধ, এবং প্রধান কথা, আহত অহমিকা মানেই মহত্ত্বের অভাব নয়, সেটা খুবই স্বাভাবিক এবং মানবিক ব্যাপার। ফের বলছি, ইখমেনেভকে তখন তো আমি প্রায় আদৌ চিনতাম না, আলিওশা এবং ওর মেয়ে সম্পর্কে গুজবগুলো আমি নিঃসংশয়েই বিশ্বাস করেছিলাম, সুতরাং টাকাটাও যে ইচ্ছাকৃত চুরি সে কথা ভাবাও আমার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল... কিন্তু ওসব কথা থাক, আসল প্রশ্ন হল এখন কী আমার করণীয়? টাকাটা নয় নিলাম না; কিন্তু সেই সঙ্গে যদি বলি যে আমার মামলাটা ন্যায্য বলে ভাবছি, তার অর্থ দাঁড়ায় টাকাটা আমি ওঁকে দান করছি। তার ওপর নাতালিয়া নিকোলায়েভনাকে নিয়ে এই স্পর্শকাতর অবস্থাটা ধরুন... নিশ্চয় উনি টাকাটা আমার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারবেন।'

'এই দেখুন, আপনি নিজেই বলছেন যে টাকাটা উনি ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। সুতরাং মনে করছেন উনি সৎ লোক, অতএব আপনি একেবারেই নিঃসন্দেহ যে টাকাটা উনি চুরি করেন নি। তাই যদি হয় তাহলে, ওঁর কাছে গিয়ে খোলাখুলিই বলুন না কেন, আপনার দাবি ন্যায্য নয় বলে আপনি ভাবছেন। এটা হত মহত্ত্বের কাজ এবং নিজের টাকাটা নিতে ইখমেনেভের হয়ত অসুবিধা হত না।'

'হুম্, ওঁর নিজের টাকা... সেই যে সমস্যা। কী অবস্থায় আমায় ফেলতে চাইছেন? ওঁর কাছে গিয়ে বলব যে আমার দাবিটা ন্যায্য নয়। অন্যায্য বলেই যদি জানতেন তাহলে সে দাবি করেছিলেন কেন? এই কথাই সেক্ষেত্রে সবাই বলবে আমার মুখের ওপর। অথচ সেটা অনুচিত, কেননা দাবিটা আমার আইনসঙ্গত। মুখে বা লিখে আমি কদাচ বলি নি যে উনি চুরি করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অসতর্কতা, অবহেলা, অকর্মণ্যতায় আমি এখনো নিঃসন্দেহ। টাকাটা অবশ্যই আমার, তাই নিজেই নিজের কুৎসা রটনা করা মর্মান্তিক। শেষ কথা, ফের বলি অপমানটা বৃদ্ধ নিজেই গায়ে পড়ে নিয়েছেন, সে অপমানবোধের জন্যে ওঁর কাছে আপনি আমায় ক্ষমা চাইতে বলছেন — সেটা দুরূহ বৈকি।'

'আমার মনে হচ্ছে, ফের মিলমিশ হোক এই যদি দু'জনে চান, সেক্ষেত্রে...'

'আপনার ধারণা সেক্ষেত্রে এটা সহজ?'

'হ্যাঁ।'

'না, কখনো কখনো সেটা অত্যন্তই কঠিন, বিশেষ করে...'

'বিশেষ করে যদি তার সঙ্গে অন্যান্য পরিস্থিতিও জড়িয়ে থাকে। হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে একমত প্রিন্স। নাতালিয়া নিকোলায়েভনা ও আপনার ছেলের প্রশ্ন নিয়ে যে ব্যাপারগুলো আপনার ওপরে নির্ভর করছে সেগুলোর মীমাংসা আপনাকে আগে করে নিতে হবে, এবং করতে হবে ইখমেনেভদের পুরোপুরি সন্তুষ্ট করে। কেবল তখনি আপনি মোকদ্দমার ব্যাপারটা নিয়েও ইখমেনেভের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন একেবারে অকপটে। কিন্তু এখন যেহেতু কিছুরই মীমাংসা হয় নি, সেহেতু একটা পথই আপনার পক্ষে খোলা: আপনার দাবি যে অন্যায্য সে কথা স্বীকার করা, স্বীকার করা খোলাখুলি, প্রয়োজন হলে জনসমক্ষে — এই আমার মত। আমি খুব খোলাখুলি বললাম কারণ আপনি নিজেই আমার পরামর্শ চেয়েছিলেন, এবং নিশ্চয় আশা করেন নি যে আপনার সঙ্গে চাতুরী করে কথা কইব। তাই সাহস করে আরো একটা কথা জিজ্ঞেস করি, ইখমেনেভকে টাকা ফেরত দেওয়া নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? যদি ভাবেন দাবি আপনার ন্যায্য, তাহলে ফেরত কেন আবার। কৌতূহল প্রকাশ করছি বলে মাপ করুন, কিন্তু এই বিষয়টার সঙ্গে অন্যান্য ব্যাপারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে...'

'আচ্ছা, বলুন তো,' প্রিন্স জিজ্ঞেস করলেন হঠাৎ, যেন আমার প্রশ্ন তাঁর কানে যায় নি, 'এইসব শর্ত আর... আর... এইসব তোয়াজ ছাড়াই

যদি টাকাটা দেওয়া হয় তাহলে বৃদ্ধ ইখমেনেভ কি তা প্রত্যাখ্যান করবেন?'

'অবশ্যই করবেন!'

ফুঁসে উঠলাম আমি, রাগে এমনকি কেঁপেই উঠেছিলাম। ধৃষ্ট, চক্ষুলজ্জাহীন এই প্রশ্নটায় মনে হল যেন আমার মুখের ওপর থুতু দিলেন উনি। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, তা লক্ষ্যেই না পড়ার ভাব দেখিয়ে যে রূঢ় অভিজাত কায়দায় উনি আমাকে বাধা দিয়ে অন্য প্রশ্ন করে বসলেন, সম্ভবত আমাকে এইটে বুঝিয়ে দেবার জন্যে যে, আমি একটু বেশি বাড় বেড়েছি, অমন প্রশ্নের স্পর্ধা করে অন্তরঙ্গতা দেখাতে চেয়েছি — তাতে আমার অপমানটা আরো বেশি বিঁধল।

এই অভিজাত কায়দাকে আমি ঘেন্নাই করি, অতীতে আলিওশার এ অভ্যেস কাটিয়ে তোলার জন্যে যথাসাধ্য করেছিলাম।

'হুম্... আপনি খুব আবেগপ্রবণ, কিন্তু বাস্তব জীবনে কিছু কিছু ব্যাপার ঠিক আপনার কল্পনা অনুসারে ঘটে না।' আমার কথা শুনে শান্তভাবে মন্তব্য করলেন প্রিন্স, 'তবে আমার ধারণা নাতালিয়া নিকোলায়েভনা হয়ত এ সমস্যাটার কিছু আংশিক সমাধান দিতে পারবেন। ওঁকে ব্যাপারটা বলবেন, হয়ত কিছু পরামর্শ দেবেন।'

'একটুও না,' বললাম রূঢ়ভাবে, 'আমি আপনাকে যা বলছিলাম তা শুনতেও আপনি চাইলেন না, থামিয়ে দিলেন। নাতালিয়া নিকোলায়েভনা বেশ বুঝবেন, টাকাটা আপনি যখন দিচ্ছেন আন্তরিকভাবে নয়, আপনার উক্তিমতো ঐসব তোয়াজ ছাড়াই, তখন তার অর্থ হবে আপনি বাপকে দিচ্ছেন মেয়ের জন্যে, মেয়েকে দিচ্ছেন আলিওশার জন্যে মূল্য — অর্থাৎ আপনি ওদের খেসারত দিচ্ছেন টাকায়...'

'হুম্... তাহলে এইভাবেই আপনি আমায় বুঝলেন হে ইভান পেত্রোভিচ।' হেসে উঠলেন প্রিন্স। কেন হাসলেন উনি? 'অথচ,' বলে চললেন প্রিন্স, 'কত, কত যে কথা আছে আপনার সঙ্গে। কিন্তু এখন আর সময় নেই। শুধু মিনতি করি, একটা জিনিস বুঝুন, নাতালিয়া নিকোলায়েভনা এবং তাঁর গোটা ভবিষ্যতের সঙ্গে ব্যাপারটা সরাসরি সম্পর্কিত, এবং কিছু পরিমাণে তা সব নির্ভর করছে আমরা কী স্থির করব, কোন সমাধানে পৌঁছব তার ওপর। আপনি এ ব্যাপারে অপরিহার্য — আপনি নিজেই তা দেখবেন। তাই নাতালিয়া নিকোলায়েভনার প্রতি যদি এখনো আপনার স্নেহ থাকে

তাহলে, আমার প্রতি আপনার সহানুভূতি যত কমই থাক, আমার সঙ্গে আলোচনা করতে অস্বীকার আপনি করতে পারেন না। কিন্তু এসে গেছি আমরা... শিগ্‌গিরই আবার কথা হবে।'

নবম পরিচ্ছেদ

কাউণ্টেস থাকেন খুব ভালো কেতা-কায়দায়। ঘরগুলো বেশ রুচি এবং আরামের প্রতি লক্ষ্য রেখে সাজানো, যদিও মোটেই তাতে জাঁক দেখাবার ভাব নেই। সবকিছু থেকেই অবিশ্যি মনে হবে যেন ওটা ওঁর অস্থায়ী আবাস — নেহাৎই একটা সাময়িক শোভন বাসা, ধনীদের যতকিছু ঢালাও জাঁকজমক আর যাকিছু খামখেয়ালকে তাঁরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন, সেসব সমেত একটা স্থায়ী ভবনের মতো নয়। গুজব ছিল, গ্রীষ্মে কাউণ্টেস চলে যাবেন সিম্‌বির্স্ক প্রদেশে তাঁর জমিদারিতে, সে জমিদারি অবশ্য উচ্ছন্নে গেছে, বাঁধা পড়েছে বহুবার, এবং প্রিন্স থাকবেন তাঁর সঙ্গে। কথাটা আমি আগেই শুনেছিলাম, ভেবে কষ্ট হয়েছিল, কাউণ্টেসের সঙ্গে কাতিয়াও যখন চলে যাবে, তখন কী করবে আলিওশা। কথাটা নাতাশাকে বলি নি, বলতে শঙ্কা হয়েছিল, কিন্তু কয়েকটা লক্ষণ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, সেও সম্ভবত গুজবটা শুনেছে। কিন্তু ও চুপ করেই থাকছিল, কষ্ট পাচ্ছিল নিজের মনে মনে।

কাউণ্টেস আমায় খুবই ভালোভাবে অভ্যর্থনা করলেন, হাত বাড়িয়ে দিলেন সসৌজন্যে, বললেন অনেকদিন থেকেই চাইছিলেন যেন আমি ওঁর ওখানে আসি। চমৎকার এক রুপোর সামোভার থেকে চা ঢেলে দিলেন নিজেই। তাঁর কাছেই আমরা বসেছিলাম, প্রিন্স, আমি এবং কে একজন অতি অভিজাত ভদ্রলোক — বয়স্ক গোছের, বুকের ওপর একটা তারকা-পদক, কড়া ইস্ত্রির জামা, কূটনীতিকদের মতো চালচলন। ভদ্রলোককে মনে হল সকলেই বেশ সম্মান করেন। বিদেশ থেকে ফেরার পর কাউণ্টেসের যা ইচ্ছে ও ভরসা ছিল তেমন করে পিটার্সবুর্গে খুব একটা বৃহৎ আলাপীমণ্ডলী গড়ে তুলে এ পর্যন্ত নিজের প্রতিষ্ঠা গুছিয়ে নিতে পারেন নি। সারা সন্ধ্যেয় এই ভদ্রলোকই ছিলেন একমাত্র অভ্যাগত, আর কেউ এলেন না। কাতেরিনা ফিওদরোভনার সন্ধানে তাকিয়ে দেখলাম — ও ছিল পাশের ঘরে আলিওশার সঙ্গে। কিন্তু আমাদের আসার খবর পেয়েই ও এসে দাঁড়াল। প্রিন্স ওর হস্ত চুম্বন করলেন সৌজন্যসহ, এবং কাউণ্টেস ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন

আমার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্স আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। অধীর আগ্রহে আমি তাকালাম কাতিয়ার দিকে। সোনালী চুলের নরম একটি মেয়ে, পরনে শাদা পোশাক, বিশেষ লম্বা নয়, মুখে একটা শান্ত মৃদু ভাব, আর চোখদুটো, আলিওশা যা বলেছিল তেমনি নিখুঁত নীল, সবটাই তারুণ্যের যা সৌন্দর্য শুধু তাই। আশা করেছিলাম দেখব রূপের পরাকাষ্ঠা, কিন্তু ওর তেমন অপরূপতা কিছু নেই। সুষ্ঠু নরম ছাঁদের ডিম্বাকৃতি মুখ, বেশ সুশ্রী ছিরিছাঁদ, ঘন এবং সত্যিই চমৎকার চুল, আটপৌরে ঘরোয়া কেশবিন্যাস, চোখে একটা স্থির শান্ত দৃষ্টি — অন্য কোথাও ওকে দেখলে ওর দিকে খুব একটা নজর না দিয়েই চলে যেতে পারতাম। কিন্তু এ শুধু প্রথম নজরে। সেদিন সন্ধ্যেয় পরে ওকে আরো ভালো করে লক্ষ্য করেছিলাম আমি। যেভাবে ও আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে, কোনো কথা না বলে আমার চোখে চোখে চেয়ে রইল এমন একটা সরল, অতিরিক্ত রকমের আগ্রহ নিয়ে, তাতেই খুব অদ্ভুত লেগেছিল। ওর দিকে চেয়ে আমার মুখে কেমন যেন আপনা থেকেই হাসি ফুটল। সেই মুহূর্তে টের পেয়েছিলাম, নির্মল হৃদয়ের এক অধিকারিণী আমার সামনে দাঁড়িয়ে। কাউণ্টেস একদৃষ্টে ওকে লক্ষ্য করছিলেন। করমর্দন করে কাতিয়া খানিকটা যেন তাড়াতাড়ি সরে গেল, বসল আলিওশার সঙ্গে ঘরখানার অন্য প্রান্তে। আমায় সম্ভাষণ জানাবার সময় আলিওশা ফিসফিস করে বললে, 'এখানে এসেছি মিনিটখানেকের জন্যে, এক্ষুনি যাব ওখানে।'

কূটনীতিক ব্যক্তিটি — ভদ্রলোকের নাম জানি না, কূটনীতিক বলছি শুধু কিছু একটা বলতে হয় বলে — বেশ শান্তভাবে গাম্ভীর্যের সঙ্গে কথা কয়ে যাচ্ছিলেন, কী একটা বিষয় বিস্তারিত করে বোঝাচ্ছিলেন। কাউণ্টেস শুনছিলেন মন দিয়ে। প্রিন্স সায় দিয়ে তোষামুদে হাসি হাসছিলেন। বক্তা কথা কইছিলেন ঘন ঘনই তাঁকে লক্ষ্য করেই। বোঝা যাচ্ছিল ওঁকে উনি যোগ্য শ্রোতা বলে ভাবছেন। চা দিয়ে নির্বিঘ্নে বসে থাকতে দেওয়া হল আমায়, তাতে খুশিই হয়েছিলাম আমি। বসে বসে লক্ষ্য করছিলাম কাউণ্টেসকে। প্রথম দর্শনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওঁকে ভালো লাগল। হয়ত তখন তিনি আর যুবতী নন, কিন্তু আমার কাছে ওঁকে আটাশের বেশি মনে হল না। মুখখানা ওঁর এখনো তাজা, প্রথম যৌবনে নিশ্চয় একদা অতি রূপসী ছিলেন। কালচে-বাদামী চুল তাঁর এখনো বেশ ঘন। দৃষ্টি অতি সহৃদয়, কিন্তু কেমন যেন চপল, দুষ্টুমির পরিহাস তাতে। কিন্তু সেই মুহূর্তে

উনি যেকোনো কারণেই হোক, নিজেকে স্পষ্টতই সংযত করে রাখছিলেন। সে দৃষ্টিতে তাঁর বুদ্ধিরও বেশ ছাপ, কিন্তু সবচেয়ে বেশি ছিল মায়ামমতা আর হাসিখুশি। আমার ধারণা হল, খানিকটা লঘুচিত্ততা ও উপভোগ-বাসনা আর ভালোমানুষী একটা স্বার্থপরতা — হয়ত রীতিমতো স্বার্থপরতাই — ওঁর প্রধান চরিত্র। প্রিন্সের কথায় উনি চলেন, ওঁর ওপর প্রিন্সের অসাধারণ প্রভাব। জানতাম ওঁদের মধ্যে মাখামাখি আছে; একথাও শুনেছি যে, যখন ওঁরা বিদেশে ছিলেন, তখন প্রিন্স মোটেই এক ঈর্ষাতুর প্রণয়ীর মতো আচরণ করেন নি; তবু কেবলি মনে হচ্ছিল এবং এখনো আমার তাই ধারণা যে এই পুরনো সম্পর্কটা ছাড়াও অন্য কিছু একটায়, অংশত রহস্যজনক কোনো বাঁধনে ওঁরা দু'জন বাঁধা, কোনো একটা মতলব থেকে পারস্পরিক বাধ্যবাধকতার মতো কিছু... মোটের ওপর ওইরকমের কিছু একটা থাকারই কথা। এও জানতাম যে প্রিন্স এখন ওঁকে নিয়ে ক্লান্ত বোধ করছেন, তবু সম্পর্ক ওঁদের ভাঙে নি। সম্ভবত, ওঁদের জোটটা কাতিয়া সম্পর্কে মতলবের কারণে — এবং বলাই বাহুল্য, সেটার উদ্যোগ আসার কথা প্রিন্সের কাছ থেকে। ওঁর সৎমেয়ের সঙ্গে আলিওশার বিয়ে দেবার জন্যে সাহায্য করতে রাজী করিয়ে প্রিন্স কাউণ্টেসকে বিয়ে করার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন, এ বিয়ের জন্যে কাউণ্টেস সত্যিই খুব জেদ ধরেছিলেন। সরল মনে আলিওশা যেসব কথা বলেছে — পর্যবেক্ষণের কিছু ক্ষমতা আলিওশারও আছে বৈকি — তা থেকে অন্তত এই সিদ্ধান্তই আমি করেছিলাম। অংশত আলিওশার ওইসব কথা থেকে এও আমার ধারণা হয়েছিল যে কাউণ্টেস যদিও প্রিন্সের কথায় ওঠেন বসেন, তবু কোনো কারণে যেন প্রিন্স ওঁকে ভয়ও করেন। এমনকি আলিওশারও তা চোখে পড়েছে। পরে জেনেছিলাম যে কারো সঙ্গে কাউণ্টেসের বিয়ে ঘটিয়ে দেবার জন্যে প্রিন্স খুব উদ্‌গ্রীব, খানিকটা সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ওঁকে তিনি সিম্‌বির্স্কে পাঠাচ্ছেন, আশা করছেন মফস্বলে ওঁর জন্যে একটা চলনসই পাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে।

বসে বসে ওদের আলাপ শুনছিলাম, ভেবে পাচ্ছিলাম না কী করে যথাসম্ভব কাতেরিনা ফিওদরোভনার সঙ্গে মুখোমুখি একটু কথা বলা যায়। বর্তমান পরিস্থিতি, আশু প্রবর্তনীয় সংস্কার, তা থেকে ভয়ের কিছু আছে কিনা — সে বিষয়ে কাউণ্টেসের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন কূটনীতিক ভদ্রলোক। অনেক কথা উনি বলছিলেন এবং বেশ বহুক্ষণ ধরে, ধীরভাবে, কর্তৃত্বের সঙ্গে। ওঁর বক্তব্যটা উনি বেশ সূক্ষ্মভাবে, বুদ্ধিমানের মতোই ব্যাখ্যা

করছিলেন বটে, কিন্তু বক্তব্যটাই ন্যক্কারজনক। উনি কেবলি বলতে চাইছিলেন যে, সংস্কার ও সংশোধনীর এই প্রেরণা থেকে শিগ্‌গিরই কতকগুলো ফলাফল ঘটবে, এবং তা দেখে লোকের চৈতন্য হবে। শুধু যে সমাজ থেকেই (অর্থাৎ অবশ্যই তার একটা অংশ থেকে) এই নতুন প্রেরণাটা কেটে যাবে তাই নয়, অভিজ্ঞতা থেকে ভুলটাও দেখতে পাবে, তখন দ্বিগুণ আগ্রহে সমর্থন করতে শুরু করবে পুরনোটাকেই। এ অভিজ্ঞতা কষ্টের হলেও তাতে ভারি উপকার হবে, কেননা তা থেকে লোকে নিরাপদ পুরনোটা সমর্থন করতে শিখবে, তার জন্যে নতুন নতুন তথ্য মিলবে, সুতরাং তাড়াতাড়ি অসতর্কতাটার চূড়ান্ত হয়ে যাক, এই কামনাই করা উচিত। 'আমাদের ছাড়া ওদের গত্যন্তর নেই', এই সিদ্ধান্ত টানলেন উনি, 'আমাদের বাদ দিয়ে কোনো সমাজ এ পর্যন্ত টেকে নি। আমাদের ক্ষতি হবে না কিছু, বরং আমরাই জিতব। ওপরে ভেসে উঠব আমরা, নিশ্চয়ই উঠব, এবং আপাতত আমাদের নীতি হল 'pire ça va, mieux ça est!'* গা ঘিনঘিন করা সমর্থন জানিয়ে প্রিন্স হাসলেন। বক্তার আত্মতৃপ্তি একেবারে পরিপূর্ণ। বোকার মতো আমি প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলাম আর কি। রক্ত টগবগ করছিল। কিন্তু সংযত হলাম প্রিন্সের বিষাক্ত দৃষ্টিপাতে; উনি পলকে একবার আমার দিকে চেয়ে দেখলেন আর আমার মনে হল, সত্যি করেই উনি আশা করছেন আমার পক্ষ থেকে এবার একটা অদ্ভুত তারুণ্যসুলভ বিস্ফোরণ ঘটবে। এটা তিনি চাইছিলেন যাতে আমি অপদস্থ হই আর উনি সেটা উপভোগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও আমি স্থির জানতাম যে কূটনীতিক ভদ্রলোকটি নির্ঘাৎ আমার প্রতিবাদ এমনকি আমাকেও হয়ত উপেক্ষা করে যাবেন। ওঁদের কাছে বসে থাকতে অসহ্য লাগছিল, কিন্তু আমায় বাঁচালে আলিওশা।

নিঃশব্দে ও আমার কাছে এসে কাঁধে হাত দিয়ে বললে কিছু কথা আছে। অনুমান করলাম ও এসেছে কাতিয়ার দূত হিশেবে। বটেও তাই।

একমিনিট পরেই গিয়ে বসলাম কাতিয়ার পাশে। প্রথমটা ও আমায় কেবল একদৃষ্টে দেখলে এমনভাবে যেন বলতে চায়, "ও এই তাহলে আপনি।" আলাপ শুরু করার মতো কথা প্রথমে আমাদের কারো জোগাল না। আমার অবিশ্যি কোনো সন্দেহ ছিল না, একবার কথা কইতে শুরু

---

* যত খারাপ ততই ভালো। (ফরাসী ভাষায়)

করলে পরদিন সকাল পর্যন্ত না থেমে কথা চালিয়ে যেতে পারে ও। আলিওশা যে "মাত্র পাঁচ-ছয় ঘণ্টার আলাপের" কথা বলেছিল, তা মনে পড়ল আমার। আমাদের পাশে বসে আলিওশা অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল কী করে শুরু করব।

তারপর আমাদের দিকে চেয়ে হেসে বললে, 'কই, কিছু বলছ না কেন তোমরা? আলাপ করতে এলে অথচ একটি কথা নেই কারো মুখে।'

কাতিয়া বললে, 'আহ্, কী যে বলো আলিওশা... এক্ষুনি শুরু করছি আমরা। জানেন তো ইভান পেত্রোভিচ, আমাদের এত সব আলোচনা করতে হবে যে কোত্থেকে শুরু করব ভেবে পাচ্ছি না। পরিচয় হল আমাদের দেরিতে, অনেক আগেই সাক্ষাৎ হওয়া দরকার ছিল, যদিও আমি আপনাকে জানি বহু দিন থেকে। আপনাকে দেখবার জন্যে আমার ভারি ইচ্ছে! এমনকি ভেবেছিলাম একটা চিঠিই লিখি...'

'কী বিষয়ে?' জিজ্ঞেস করলাম আপনা থেকেই হেসে ফেলে।

'যে বিষয়েই হোক না,' ও বললে গুরুগম্ভীরভাবেই, 'যেমন ধরুন আলিওশা যে বলে ওকে এ সময় একলা ফেলে রেখে এলেও নাতালিয়া নিকোলায়েভনা কিছু মনে করে না, তা ঠিক কিনা। ওর মতো ব্যবহার কি করা উচিত? কেন তুমি এখন এখানে, সে কথা বলবে দয়া করে?'

'কী মুশকিল! এক্ষুনি তো যাচ্ছি! বললামই তো শুধু এক মিনিটের জন্যে এসেছি, একসঙ্গে তোমাদের দুটিকে একবার দেখে যাব কেমন করে তোমরা আলাপ করো, তারপরেই চলে যাব ওখানে।'

'তা এই তো আমরা একসঙ্গে বসে আছি, দেখলে তো?' তারপর একটু লাল হয়ে ওর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, 'সব সময়ই ও ওইরকম। বলছে "এক মিনিট! শুধু এক মিনিটের জন্যে!" কিন্তু দেখতে না দেখতে মাঝরাত পেরিয়ে যাবে আর তখন তো আর যাওয়া যায় না, দেরি হয়ে গেছে। বলে "ও রাগ করবে না। ও ভারি ভালো।" ওই হল ওর যুক্তি! সেটা কি ভালো? সেটা কি উঁচু মনের কাজ হল?'

'বেশ, আমি যাচ্ছি,' করুণভাবে জবাব দিলে আলিওশা, 'কিন্তু তোমাদের দু'জনের সঙ্গে একটু থেকে যেতে ভারি ইচ্ছে করছে আমার...'

'আমাদের সঙ্গে তোমার কী কাজ? আমাদেরই বরং অনেক কথা একটু আলাদাভাবে আলাপ করার আছে। আরে শোনো, রাগ ক'রো না। এটা যে দরকার, ভালো করে বুঝে দ্যাখো।'

'দরকারই যদি হয়, তাহলে এখনি যাচ্ছি... রাগ করার কী আছে — মিনিটখানেকের জন্যে একটু লেভিন্‌কার কাছে যাব, তারপরেই সোজা নাতাশার কাছে। ইভান পেত্রোভিচ,' যাবার জন্যে টুপিটা নিয়ে ও বললে, 'জানেন কি ইখমেনেভের সঙ্গে মোকদ্দমা জিতে বাবা যে টাকাটা পাচ্ছেন সেটা উনি ছেড়ে দিতে চান?'

'জানি। উনি বলছিলেন আমাকে।'

'কী উদারতা ওঁর, দেখেছেন? কাতিয়া কিন্তু বিশ্বাস করতে চায় না উনি উদারতা দেখাচ্ছেন। সেকথা ওকে একটু বলুন। আসি কাতিয়া, এবং দয়া করে ভেবো না যে নাতাশাকে আমি ভালোবাসি না। সকলেই তোমরা এমন সব সর্ত চাপাও কেন আমার ওপরে বলো তো, ধমক দাও, নজর রাখো আমার ওপর — যেন আমি তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছি। নাতাশা জানে আমি ওকে কীরকম ভালোবাসি, আমার ওপর বিশ্বাস আছে ওর, আমারও দৃঢ় ধারণা যে আমার ওপর ওর বিশ্বাস আছে। আমি ওকে ভালোবাসি এইসব বাধ্যবাধকতা ছাড়াই। ওকে যে কী ভালোবাসি বলতে পারব না, স্রেফ ভালোবাসি। তাই আসামীর মতো আমায় জেরা করার কিছু নেই। ইভান পেত্রোভিচকে তুমি জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো, উনি তো এখানেই আছেন, উনি তোমায় সত্যি করেই বলবেন যে নাতাশা ঈর্ষাতুর, আমায় ও খুবই ভালোবাসলেও ওর ভালোবাসার মধ্যে অনেকখানি স্বার্থপরতা আছে, কারণ আমার জন্যে ও কোনো আত্মত্যাগই করতে চায় না।'

'সে কী!' জিজ্ঞেস করলাম অবাক হয়ে। নিজের কানকে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

'কী বলছ তুমি আলিওশা?' দুই হাত নেড়ে হতাশার ভঙ্গি করে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কাতিয়া।

'হ্যাঁ, তাতে অবাক হবার কী আছে! ইভান পেত্রোভিচ সে কথা জানেন। সব সময়েই নাতাশা দাবি করে যেন আমি ওর সঙ্গে থাকি। দাবি না করলেও বোঝাই যায় এই ওর ইচ্ছে।'

'লজ্জা করছে না? লজ্জা করছে না তোমার?' রাগে জ্বলে উঠল কাতিয়া।

'লজ্জার কী আছে! সত্যিই কী অদ্ভুত মেয়ে তুমি কাতিয়া। ওর যা ধারণা তার চেয়েও যে বেশি ওকে ভালোবাসি আমি। ও যদি সত্যি করেই আমায় ভালোবাসত, আমি যেমন ভালোবাসি তেমনি, তাহলে আমার জন্যে ওর নিজের তুষ্টি ও বিসর্জন দিত নিশ্চয়। ও নিজেই আমায় যেতে দেয় তা বটে,

কিন্তু ওর মুখ দেখেই যে বুঝতে পারি, তাতে ভারি কষ্ট হচ্ছে ওর। তার মানেই হল যেতে না দেওয়া।'

'উঁহু, ব্যাপারটা সুবিধের নয়!' আমার দিকে ফিরে ক্রুদ্ধ জ্বলন্ত চোখে চেঁচিয়ে উঠল কাতিয়া, 'স্বীকার করো আলিওশা, এই মুহূর্তেই বলো, তোমার বাবাই এসব কথা তোমার মাথায় ঢুকিয়েছেন? আজকে বুঝিয়েছেন? দয়া করে আমার সঙ্গে চালাকি ক'রো না, এক্ষুনি আমি জেনে নেব। বলো তাই কিনা?'

থতমত খেয়ে আলিওশা বললে, 'হ্যাঁ, উনি কথা বলেছিলেন আমার সঙ্গে, কিন্তু তাতে কী? অত্যন্ত সস্নেহে, একেবারে বন্ধুর মতো উনি আলাপ করছিলেন আজ, অনবরত নাতাশার প্রশংসা করছিলেন। আমি তো অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম, নাতাশা ওঁকে অমন অপমান করার পরেও উনি তাঁকে প্রশংসা করছেন।'

আমি বললাম, 'আর আপনি, আপনি তাঁকে বিশ্বাস করে বসলেন? আপনি, যাকে দেবার মতো যা ছিল সবই দিয়েছে নাতাশা, এমনকি এখনো, আজও তার যত কিছু উদ্বেগ শুধু আপনাকে নিয়ে, আপনার যেন একঘেয়ে না লাগে, কাতেরিনা ফিওদরোভনাকে দেখার সুযোগ আপনার যেন না যায়। ও নিজেই আজ আমায় সে কথা বলেছে। আর হঠাৎ ওইসব মিথ্যে নিন্দেগুলো আপনি বিশ্বাস করে বসলেন! লজ্জা নেই আপনার?'

'অকৃতজ্ঞ তুমি! কিন্তু কী লাভ বলে, কিছুতেই ওর কখনো লজ্জা হয় না।' হাত ঝামটা দিয়ে কাতিয়া বললে এমনভাবে যেন আলিওশার আর কোনো আশা নেই।

কাতর কণ্ঠে আলিওশা বললে, 'কিন্তু সত্যি কী যে বলছ তোমরা! কাতিয়া তুমি চিরকালই ওইরকম! আমার মধ্যে খারাপ ছাড়া আর কিছুই দ্যাখো না... ইভান পেত্রোভিচের কথা তো তুলছিই না! তোমরা ভাবছ, আমি নাতাশাকে ভালোবাসি না। ওর স্বার্থপরতা আছে বলতে গিয়ে আমি সেকথা বলতে চাই নি। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম, ও আমায় অতিরিক্ত ভালোবাসে, ফলে সবই একেবারে মাত্রাছাড়া হয়ে যায়, তাতে ওরও কষ্ট, আমারও কষ্ট। আর আমাকে ঠকাতে চাইলেও বাবা তা কখনো পারবেন না, আমি তা মানব না। মোটেই খারাপ অর্থে উনি বলেন নি যে নাতাশা স্বার্থপর। আমি যে ওঁর কথাটা বুঝতে পেরেছিলাম। এখন যা বললাম উনি হুবহু ঠিক তাই বলেছিলেন: ও আমায় এত বেশি ভালোবাসে, এত

প্রবলভাবে, যে সেটা নিতান্ত স্বার্থপরতায় গিয়ে পেঁছয় এবং ওরও কষ্ট, আমারও কষ্ট, ভবিষ্যতে আরো কঠিন হবে আমার পক্ষে। সে তো সত্যি কথাই। উনি বলেছিলেন আমার প্রতি স্নেহবশে, তা থেকে মোটেই এক কথা আসে না যে উনি নাতাশাকে অপমান করেছেন, বরং নাতাশার মধ্যে অতি প্রবল একটা ভালোবাসা, অপরিমেয়, প্রায় অসম্ভব একটা ভালোবাসাই উনি দেখেছেন...'

কিন্তু কাতিয়া থামিয়ে দিলে ওকে। কথা শেষ করতে দিলে না। উত্তেজিত হয়ে ও আলিওশাকে ধমক দিতে লাগল, প্রমাণ করতে চাইল যে, প্রিন্স নাতাশার প্রশংসা করেছেন শুধু একটা সহৃদয়তার ভান করে ওকে প্রবঞ্চনা করার জন্যে, ওদের সম্পর্ক ছিন্ন করার মতলব নিয়ে অলক্ষ্যে অজান্তে নাতাশার ওপর আলিওশাকে বিরূপ করে তোলার উদ্দেশ্যে। উত্তেজিতভাবে এবং বুদ্ধিমানের মতো ও বোঝালে যে নাতাশা ওকে কত ভালোবাসে, নাতাশার সঙ্গে ও যে ব্যবহার করছে কোনো ভালোবাসাই তাকে ক্ষমা করতে পারে না, সত্যিকারের স্বার্থপর আলিওশা নিজেই। ধীরে ধীরে এক সাংঘাতিক মর্মপীড়া আর পরিপূর্ণ অনুশোচনার মধ্যে কাতিয়া ওকে টেনে আনল। একেবারে ভেঙে পড়ে ও বসে রইল আমাদের পাশে মাটির দিকে চেয়ে, মুখে যন্ত্রণার ছাপ, জবাব দেবার আর কোনো চেষ্টাই ও করলে না। কিন্তু কাতিয়া নির্মম। একান্ত আগ্রহে আমি চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম ওকে। অদ্ভুত এই মেয়েটিকে বোঝার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছিলাম আমি। একেবারে ও ছেলেমানুষ, কিন্তু অদ্ভুত এক ছেলেমানুষ — তার মধ্যে আছে প্রত্যয়, সুদৃঢ় নীতিবোধ, ন্যায় ও মঙ্গলের প্রতি একটা সহজাত সাবেগ অনুরাগ। ওকে ছেলেমানুষ বলতে হলে ও পড়বে সেই সব চিন্তাশীল ছেলেমানুষদের দলে, রুশ সংসারে যাদের সংখ্যা বেশ অগুন্তি। বোঝা যাচ্ছিল, ও অনেক কিছু ভেবে দেখেছে। বেশ হত যদি ওর মাথাটায় উঁকি দিয়ে দেখতে পেতাম কীভাবে সেখানে নিতান্ত ছেলেমানুষী ভাবনা-ধারণার সঙ্গে মিশে আছে ভুক্তভোগী জ্ঞান আর পর্যবেক্ষণ (জীবনের কিছুটা তো কাতিয়া ইতিমধ্যেই জেনেছে), সেই সঙ্গে এমন সব আইডিয়া যার জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ওর এখনো নেই বটে, কিন্তু ওকে আকৃষ্ট করেছে বিমূর্ত আকারে, বই থেকে, সংখ্যায় যা অনেক হবার কথা, যা সে ভেবেছে তার নিজেরই অভিজ্ঞতা বলে। সেদিন সন্ধ্যায় এবং পরেও অনেকবার আমি ওকে অনুধাবন করেছি, সম্ভবত বেশ খুঁটিয়েই। মনখানা ওর আবেগপ্রবণ, সংবেদনশীল। কোনো কোনো

ক্ষেত্রে ও যেন আত্মসংযমকেও তুচ্ছ করে, সত্যের ওপর সবচেয়ে বেশি মূল্য দিয়ে সাংসারিক সহিষ্ণুতাকে শুধু প্রথাসিদ্ধ কুসংস্কার বলে মনে করতে চায় এবং এইসব প্রত্যয় নিয়ে ওর যেন একটা আত্মশ্লাঘাও ছিল, বয়সে তরুণ না হলেও আবেগপ্রবণ লোকেদের বেলায় প্রায়ই এ জিনিসটা দেখা যায়। কিন্তু ঠিক এই জন্যেই একটা বিশেষ রকমের মোহনতা ছিল ওর মধ্যে। চিন্তা করতে, সত্য খুঁজে দেখতে ভারি ঝোঁক ওর, কিন্তু এতই সেটা পণ্ডিতীসুলভ নয়, এতই তাতে ছেলেমানুষী দমক যে প্রথম মুহূর্ত থেকেই ওর সমস্ত মৌলিকতাকে ইচ্ছা করে ভালোবাসতে, সায় দিতে হয় ওর কথায়।

লেভিন্‌কা আর বোরিন্‌কার কথা মনে পড়ল আমার। মনে হল এসবই খুবই স্বাভাবিক। এবং আশ্চর্য, প্রথম দর্শনে মেয়েটির যে মুখে আমি খুব একটা অপরূপতা খুঁজে পাই নি, সেদিন সন্ধ্যেয় প্রতি মুহূর্তেই যেন সেই মুখই আমার কাছে অপরূপ আর আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে লাগল। ছেলেমানুষ আর চিন্তাশীল নারীর এই সরল দ্বৈত, ন্যায় আর সত্যের জন্যে শিশুসুলভ এবং অতি সত্যনিষ্ঠ তৃষ্ণার সঙ্গে নিজের লক্ষ্যের ওপর অটল বিশ্বাস — এ সবকিছুর ফলে ওর মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল অকৃত্রিমতার এক অপূর্ব আভায়, ফুটে উঠেছিল এক উঁচু দরের আত্মিক সৌন্দর্য, আর টের পাচ্ছিলাম, মামুলী নির্বিকার দৃষ্টিপাতে এই যে সৌন্দর্য অবিলম্বে ধরা পড়ে না তার পুরো তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। বুঝলাম, এ মেয়ের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হতে আলিওশা বাধ্য। নিজের ভাবনা-চিন্তার ক্ষমতা ওর না থাকলেও যারা ওর হয়ে ভাবতে এমনকি ওর হয়ে ইচ্ছাটা পর্যন্ত প্রকাশ করতে পারে ঠিক তাদেরই ও ভালোবাসে এবং ইতিমধ্যেই কাতিয়া ওকে নিজের অভিভাবকত্বে নিয়েছে। মনটা আলিওশার উদার আর মোহনীয়। যা সৎ ও সুন্দর তেমন সবকিছুর কাছে ও আত্মসমর্পণ করে বসে একমুহূর্তে। আর কাতিয়া ইতিমধ্যেই দরদ দিয়ে ছেলেমানুষী অকৃত্রিমতায় নানা আলাপ করেছে ওর সঙ্গে। নিজের ইচ্ছাশক্তি আলিওশার বিন্দুমাত্র নেই। কাতিয়ার আছে এক জেদী, প্রবল, অগ্নিময়ী ইচ্ছা। আর আলিওশা কেবল তার প্রতিই আকৃষ্ট হতে পারে যে তার ওপর কর্তৃত্ব করবে, হুকুম চালাবে। অংশত এই জিনিসটা দিয়েই নাতাশা তাকে আকর্ষণ করেছিল তাদের অনুরাগের শুরুতে, কিন্তু নাতাশার চেয়ে কাতিয়ার একটা বড়ো প্রাধান্য এইখানে যে, কাতিয়া নিজেও এখনো ছেলেমানুষ এবং দীর্ঘকাল ছেলেমানুষই

থেকে যাবে বলে মনে হয়। ওর এই ছেলেমানুষি, দীপ্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সঙ্গে বিবেচনার খানিকটা ঘাটতি, এসবই যেন আলিওশারই সমগোত্রীয়। আলিওশা তা অনুভব করেছিল, সেই জন্যেই কাতিয়ার আকর্ষণ তার কাছে হয়ে উঠেছিল ক্রমাগত প্রবল। দু'জনে একত্রে আলাপের সময় কাতিয়ার গুরুগম্ভীর 'প্রচারকসুলভ' কথোপকথনের মধ্যেও ব্যাপারটা থেকে থেকেই যে সম্ভবত ছেলেখেলায় পর্যবসিত হত, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কাতিয়া সম্ভবত প্রায়ই ধমক দেয় ওকে এবং ইতিমধ্যেই ওকে নিজের শাসনে রেখেছে, তা সত্ত্বেও, বোঝা যাচ্ছে, আলিওশা নাতাশার চেয়ে কাতিয়ার কাছেই স্বস্তি বোধ করে বেশি। দুটিতে ওরা বেশি জুড়ি, সেই হল বড়ো কথা।

'হয়েছে, হয়েছে। কাতিয়া, যথেষ্ট হয়েছে। সব সময়েই দেখা যায় তুমি ঠিক, আমি ভুল। তার কারণ তোমার প্রাণটা আমার চেয়ে ভালো।' এই বলে উঠে দাঁড়াল আলিওশা; কাতিয়ার দিকে বিদায়ের হাত বাড়িয়ে দিলে, 'এক্ষুনি আমি ওর কাছেই যাচ্ছি, লেভিন্‌কার কাছেও যাব না...'

'লেভিন্‌কার কাছে তোমার করার কিছু নেই। আমার কথা শুনে যে যাচ্ছে — এটা তোমার ভারি লক্ষ্মী ছেলের কাজ!'

'সবার চেয়েও হাজার গুণ লক্ষ্মী তুমি,' বললে আলিওশা বিষণ্ণভাবে, 'ইভান পেত্রোভিচ, আপনার সঙ্গে দুটো কথা আছে।'

আমরা দুয়েক পা সরে গেলাম।

ও চুপিচুপি আমায় বললে, 'ভারি লজ্জার কাজ করলাম আজ, নীচতা করেছি। দুনিয়ায় সকলের কাছেই আমি দোষী, বিশেষ করে ওদের দু'জনের কাছে। আজ ডিনারের পর বাবা আমায় মাদামোয়াজেল আলেক্সান্দ্রাইনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন (একজন ফরাসিনী) — ভারি চমৎকার মেয়ে। আমি... মানে মেতে গিয়েছিলাম... কিন্তু ও আর বলার কী আছে... ওদের সাহচর্যের যোগ্য নই আমি... বিদায়, ইভান পেত্রোভিচ!'

'ওর মনটা ভালো, উ'চু মন,' ওর কাছে আসতে ব্যস্ত হয়ে শুরু করলে কাতিয়া, 'কিন্তু ওর সম্পর্কে পরে ঢের আলাপ করা যাবে। প্রথমে আমাদের একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। প্রিন্স সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?'

'অতি খারাপ লোক।'

'আমারও তাই ধারণা। একটায় তাহলে আমরা একমত, যাক, ভালো করে বিচার করতে সুবিধা হবে। এবার নাতালিয়া নিকোলায়েভনা... কী জানেন, ইভান পেত্রোভিচ, আমি এতক্ষণ যেন অন্ধকারে, আপনার আশায়

বসেছিলাম, আপনি আলো দেখাবেন। সবকিছু আপনি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবেন, কেননা আলিওশা যা বলে তা থেকে শুধু অনুমানে ভর করে প্রধান ব্যাপারটা আমাকে ভাবতে হচ্ছে। ও ছাড়া আরো কারো কাছ থেকে যে কিছু জানব, তেমন কেউ নেই। তাহলে প্রথমে বলুন (এইটেই হল প্রধান কথা) কী আপনি ভাবেন, আলিওশা আর নাতাশার মিলনে কি ওরা সুখী হবে? চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্যে সবার আগে এই কথাটিই আমার জানা দরকার, তাহলে কী আমার করণীয় সেটা নিজের কাছে পরিষ্কার থাকবে।'

'নিশ্চয় করে কেউ কি আর তা বলতে পারে?..'

'না, নিশ্চয় করে অবশ্যই নয়,' ও বললে বাধা দিয়ে, 'কিন্তু আপনার কী মনে হচ্ছে? আপনি তো বুদ্ধিমান লোক।'

'আমার ধারণা ওরা সুখী হতে পারবে না।'

'কেন?'

'ওরা ঠিক পরস্পরের যোগ্য নয়।'

'ঠিক আমিও তাই ভেবেছি!' দু'হাত ও একত্র করলে যেন গভীর দুঃখে।

'বিস্তারিত করে বলুন। শুনুন, নাতাশার সঙ্গে দেখা করার ভয়ংকর ইচ্ছা আমার, অনেক কথা ওর সঙ্গে বলার আছে আমার। আমার ধারণা তাতে সব স্থির করে ফেলতে পারি আমরা দু'জনে। ইতিমধ্যে মনে মনে ওর একটা ছবি দাঁড় করিয়েছি: নিশ্চয়ই ও ভারি বুদ্ধিমতী, চপলতা নেই, সত্যনিষ্ঠ আর সুন্দরী। তাই না?'

'তাই।'

'আমি তা একেবারে নিশ্চয় করে জানতাম। আচ্ছা, ও যদি তাই হয়, তবে কী করে ভালোবাসল আলিওশাকে — ও যে নেহাৎ একটা ছেলেমানুষ। এইটে একটু বুঝিয়ে বলুন আমায়, প্রায়ই আমি এই নিয়ে ভাবি।'

'ওটা বোঝানো যায় না কাতেরিনা ফিওদরোভনা; কেন কী করে লোকে প্রেমে পড়ে তা বলা মুশকিল। হ্যাঁ, আলিওশা ছেলেমানুষ। কিন্তু ছেলেমানুষকে আমরা কেন ভালোবাসি জানেন কি?' (ওর মুখের দিকে, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বুক দুলে উঠল আমার — গভীর, ঐকান্তিক অধীর মনোযোগে সে চোখ আমার প্রতি নিবদ্ধ।) 'নাতাশা নিজে যে পরিমাণে শিশুর মতো নয়, যে পরিমাণে গুরুগম্ভীর, ততই দ্রুত আলিওশাকে ভালোবেসে ফেলা ওর পক্ষে সম্ভব। আলিওশা সৎ, অকপট, ভয়ানক সরল,

মাঝে মাঝে মোহনীয় রকমের সরল। হয়ত ওর ভালোবাসা এসেছিল — কী বলি ?.. এসেছিল সম্ভবত কোনো একটা অনুকম্পা থেকে। মন যাদের বড়ো, তারা ভালোবাসতে পারে অনুকম্পা থেকে... অবিশ্যি বুঝতে পারছি যে, আমি আপনাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারলাম না। তাই আপনাকেই বরং প্রশ্ন করি: আপনি তো ওকে ভালোবাসেন, তাই না?'

সাহস করেই জিজ্ঞাসা করলাম। মনে হয়েছিল এ ধরনের প্রশ্নের ব্যস্ততায় ওর সরল মনের অপরিসীম শিশুসুলভ শুচিতা বিচলিত হবে না।

আমার চোখের দিকে প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ও মৃদুস্বরে জবাব দিলে, 'সত্যি, এখনো ঠিক জানি না। কিন্তু মনে হয় খুবই ভালোবাসি...'

'তবেই দেখছেন তো! আচ্ছা, কেন ওকে ভালোবাসেন তা কি বুঝিয়ে বলতে পারেন?'

একটু ভেবে ও বললে, 'ওর মধ্যে মিথ্যে কিছু নেই। ও যখন সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলে তখন ভারি ভালো লাগে আমার... আমায় একটু বলুন তো ইভান পেত্রোভিচ, আপনার সঙ্গে এই নিয়ে যে কথা কইছি — আমি কুমারী, আপনি তো পুরুষ, — সেটা কি খারাপ হচ্ছে, নাকি না?'

'কেন, এতে এমন কী একটা হল?'

'ঠিক, বটেই তো, এতে এমন কী একটা হল, কিন্তু ওরা,' সামোভার ঘিরে বসা চক্রটির দিকে চোখের ইঙ্গিত করলে কাতিয়া, 'ওরা নিশ্চয়ই বলবে এটা খারাপ। ওরা কি ঠিক?'

'না। আপনি যখন নিজের অন্তরে অনুভব করছেন না খারাপ, তখন...'

'ঠিক তাই-ই করি আমি সব সময়,' ব্যস্ত হয়ে বাধা দিলে ও, বোঝা গেল আমার সঙ্গে যতখানি পারে কথা কয়ে নেওয়ার জন্যে ওর ভারি তাড়া, 'কোনো কিছুতে গোলমালে পড়লে নিজের প্রাণের দিকে তাকাই। প্রাণ শান্ত থাকলে আমিও শান্ত। সর্বদাই তাই করা উচিত। একেবারে নিজের মতো করে এমন খোলাখুলি আপনার সঙ্গে কথা কইছি, কেননা প্রথমত, আপনি খুব চমৎকার লোক, আলিওশা আসার আগে পর্যন্ত আপনার সঙ্গে নাতাশার সম্পর্কের কাহিনী সব আমি জানি। শুনে কেঁদে ফেলেছিলাম।'

'কে শোনালে?'

'কেন, আলিওশা। আমায় যখন বলছিল তখন ওর চোখেও জল এসেছিল। ভারি ভালো মনের পরিচয় দিয়েছিল ও, ভারি ভালো লেগেছিল আমার।

আমার মনে হয় ইভান পেত্রোভিচ, ওকে আপনার যতটা ভালো লাগে, আপনাকে ও ভালোবাসে তার চেয়ে বেশি। এই সবের জন্যেই ওকে আমার পছন্দ। আর দ্বিতীয়ত, নিজের কাছে যেমন খোলাখুলি হতে পারি আপনার সঙ্গেও তেমনি খোলাখুলি বলছি, তার কারণ আপনি খুব বুদ্ধিমান লোক, আমায় পরামর্শ দিতে পারবেন, নানা বিষয়ে শেখাতে পারবেন।'

'কেমন করে জানলেন, আপনাকে শেখাবার মতো বুদ্ধি আমার আছে?'

'বাঃ, কী যে বলেন আপনি!' একটু চিন্তিত হয়ে উঠল ও।

'ওটা আমি এমনি বললাম। আসুন, সবচেয়ে জরুরী জিনিসটা নিয়েই কথা বলা যাক। ইভান পেত্রোভিচ, বলুন তো — এখন আমি টের পাচ্ছি যে আমি নাতাশার প্রতিদ্বন্দ্বিনী, আমি যে তা জানি, কীভাবে আমার চলা উচিত? সেই জন্যেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম ওরা সুখী হবে কিনা। দিনরাত সেই কথাই ভাবছি। নাতাশার অবস্থাটা সাংঘাতিক, সাংঘাতিক! নাতাশার প্রতি ওর ভালোবাসাটা যে একেবারেই কেটে গেছে, অথচ আমাকে ক্রমেই বেশি করে ভালোবাসছে, তাই না?'

'তাই তো মনে হয়।'

'অথচ ওকে ও ঠকাচ্ছে না। ও নিজেই জানে না যে ওর ভালোবাসা চলে যাচ্ছে। কিন্তু নাতাশা নিশ্চয় সে কথা জানে। কী যে ওর কষ্ট!'

'আপনি কী করতে চান কাতেরিনা ফিওদরোভনা?'

গম্ভীরভাবেই ও বললে, 'অনেক পরিকল্পনা আছে আমার, তবু কীরকম গুলিয়ে যাচ্ছে। সেই জন্যেই আপনার সঙ্গে দেখা করব বলে অত ব্যস্ত হয়েছিলাম, আপনি আমার কাছে সব পরিষ্কার করে দিতে পারবেন। এসব ব্যাপার আপনি আমার চেয়ে অনেক ভালো বোঝেন। আমার কাছে আপনি এখন প্রায় একটা দেবতার মতো। শুনুন, প্রথমে আমি ভাবছিলাম এই: ওরা যদি পরস্পরকে ভালোবাসে, তাহলে আমার উচিত আত্মত্যাগ করে ওদের সাহায্য করা যাতে তারা সুখী হয় — তাই না?'

'আমি জানি, স্বার্থত্যাগ আপনি তো করেছেনই।'

'হ্যাঁ, করেছিলাম, কিন্তু পরে ও যখন এখানে ঘন ঘন আসতে লাগল, ক্রমেই আমায় ভালোবাসতে শুরু করল, তখন ভাবনা হল আমার, এখনো ভাবছি, আত্মত্যাগ করব কিনা। আমার পক্ষে এটা খুব অন্যায় হচ্ছে, তাই না?'

উত্তর দিলাম, 'সেটা স্বাভাবিক, তাই হওয়ার কথা... আপনার দোষ নেই।'

'আমি তা মনে করি না। আপনি ভালোমানুষ বলে ও কথা বললেন। আর আমি যে ও কথা ভাবছি, তার কারণ, আমার অন্তঃকরণ খুব নির্মল নয়। সৎ অন্তঃকরণ থাকলে আমি বুঝতে পারতাম কী করতে হবে। কিন্তু সে কথা থাক। পরে আমি প্রিন্স, মা, আর স্বয়ং আলিওশার কাছ থেকে ওদের সম্পর্কের কথা আরো বিশদে শুনেছি এবং অনুমান করলাম, ওরা ঠিক সমকক্ষ নয়। আপনিও তো এখন তা সমর্থন করলেন। আমি ভাবনায় পড়লাম আরো বেশি — এখন কী করে যায় তাহলে? ওরা যদি অসুখীই হয়, তাহলে তো ওদের ছাড়াছাড়ি হওয়াই ভালো। পরে ঠিক করলাম, আপনাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ব্যাপারটা সব জিজ্ঞেস করে নেব, আর নিজেই যাব নাতাশার কাছে, ওর সঙ্গে মীমাংসা করে ফেলব।'

'কিন্তু মীমাংসা করা যাবে কী করে? সেই হল প্রশ্ন।'

'আমি তাকে এই কথাই বলব, "আপনি ওকে প্রাণাধিক ভালোবাসেন, সুতরাং আপনার নিজের সুখের চেয়ে বেশি করে দেখা উচিত ওর সুখ — তাই ওর সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ হওয়া দরকার।"'

'ঠিকই, কিন্তু এ কথা শুনতে কীরকম লাগবে ওর? তাছাড়া ও যদি আপনার কথায় সায়ও দেয়, তাহলেও সেরকম কাজ করার মতো জোর থাকবে কি তার?'

'সেই কথাই আমি ভাবছি রাতদিন... আর... আর...'

হঠাৎ কেঁদে ফেললে ও।

'আপনি বিশ্বাস করবেন না কীরকম কষ্ট লাগে নাতাশার জন্যে।' ফিসফিসিয়ে কান্নায় থরোথরো ঠোঁটে বললে কাতিয়া।

আর কিছু বলবার ছিল না। চুপ করে রইলাম আমি। ওকে দেখে আমারও কান্না পাচ্ছিল কেমন একটা স্নেহবশে। কী অপূর্ব ছেলেমানুষ ও! আলিওশাকে ও সুখী করতে পারবে বলে ভাবছে কেন, সে কথা আর জিজ্ঞেস করলাম না।

'আপনি বাজনা ভালোবাসেন?' একটু শান্ত হয়ে ও জিজ্ঞেস করলে, কান্নাটার দরুন তখনো একটু আনমনা।

'হ্যাঁ।' জবাব দিলাম একটু অবাক হয়ে।

'সময় থাকলে আপনাকে বেটোফেনের তৃতীয় কনসার্টো বাজিয়ে শোনাতাম। আজকাল আমি ওইটেই বাজাই। এখন যা মনে হচ্ছে... সেই

সবকিছু অনুভূতি আছে ওর ভেতরে। অন্তত আমার তাই মনে হয়। কিন্তু সেটা অন্য সময় হবে, এখন কথা বলা যাক।'

কী করে ও নাতাশার সঙ্গে দেখা করবে, কীভাবে তার সব ব্যবস্থা করতে হবে তার আলোচনা করতে লাগলাম আমরা। কাতিয়া জানালে, ওর ওপর নজর রাখা হয়, সৎমা ওকে ভালোবাসলেও এবং ভালোমানুষ হলেও কিছুতেই নাতালিয়া নিকোলায়েভনার সঙ্গে দেখা করতে যেতে দেবে না। সুতরাং ও ছলনার আশ্রয় নেবে ঠিক করেছে। সকালে ও মাঝে মাঝে বেড়াতে বেরোয়, কিন্তু প্রায় সব সময়েই কাউণ্টেস থাকে সঙ্গে। মাঝে মাঝে কাউণ্টেস না গেলে তাকে পাঠায় ফরাসী মহিলাটির সঙ্গে। উনি আপাতত অসুস্থ। এরকম ব্যাপার ঘটে সাধারণত যখন কাউণ্টেসের মাথা ধরে, সুতরাং পরবর্তী মাথা ধরা পর্যন্ত ওকে অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে সে ফরাসী ভদ্রমহিলাটির সঙ্গে কথা বলে ভজিয়ে রাখবে (উনি হলেন সহচারিণী গোছের এক বৃদ্ধা), কেননা ভদ্রমহিলা খুবই ভালোমানুষ। এ সবকিছুর ফল দাঁড়াল এই যে, কবে সে নাতাশার সঙ্গে দেখা করতে পারবে তার তারিখ আগে থেকে ধার্য করা সম্ভব হল না।

বললাম, 'নাতাশার সঙ্গে আলাপ করে আপনার অনুতাপের কারণ ঘটবে না। আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে নিজেও সে খুব উদ্‌গ্রীব, সেটা দরকার অন্তত একটা কারণের জন্যে যে, কার হাতে ও আলিওশাকে তুলে দিচ্ছে তা ওর জানা চাই। এ ব্যাপারটা নিয়ে কষ্ট পাবেন না। সময়ে সবকিছুরই মীমাংসা হয়ে যাবে। আপনি তো গ্রামাঞ্চলে যাচ্ছেনই।'

ও বললে, 'হ্যাঁ, খুবই শিগ্‌গির — হয়ত একমাসের মধ্যেই, আমি জানি প্রিন্স খুব পেড়াপীড়ি করছেন।'

'আপনার কী মনে হয়, আলিওশা কি আপনার সঙ্গে যাবে?'

'সে কথাও ভেবেছি।' ও বললে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে, 'ও যাবে।'

'তা যাবে।'

'মা গো! এসব থেকে যে কী দাঁড়াবে জানি না। শুনুন ইভান পেত্রোভিচ, আমি আপনাকে সবকিছু লিখে জানাব, প্রায়ই লিখব আপনাকে, অনেক। এবার আপনাকে জ্বালাতে শুরু করলাম। আপনি প্রায়ই আমাদের এখানে আসবেন তো?'

'বলতে পারি না কাতেরিনা ফিওদরোভনা, অবস্থার ওপর নির্ভর করছে। হয়ত আদৌ আর আসব না।'

'কেন?'

'নানা কারণের ওপর তা নির্ভর করছে, বিশেষ করে প্রিন্সের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক থাকবে তার ওপর।'

'উনি অসাধু লোক।' কাতিয়া বললে দৃঢ়ভাবে, 'আচ্ছা ইভান পেত্রোভিচ, আমি যদি আপনার কাছে দেখা করতে যাই, তাহলে? সেটা কি ভালো হবে, নাকি খারাপ?'

'আপনার নিজের কী মনে হয়?'

'আমার মনে হয় অন্যায় হবে না, এমনি গিয়ে দেখা করে আসা...' ও যোগ করলে একটু হেসে, 'এ কথা বলছি কেননা সম্মান করা ছাড়াও আপনাকে আমার ভালোও লাগে... আপনার কাছ থেকে অনেককিছু শিখতেও পারব। আর আপনাকে আমার বেশ লাগে... এসব যে আপনাকে বলছি সেটা কি লজ্জার ব্যাপার?'

'লজ্জা কেন? এর মধ্যেই তো আপনি আমার আত্মীয়ের মতো আপন হয়ে উঠেছেন।'

'আপনি তাহলে আমার বন্ধু হতে চান?'

বললাম, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!'

'ওরা কিন্তু নিশ্চয়ই বলত যে লজ্জার ব্যাপার, কুমারী মেয়ের এরকম আচরণ উচিত নয়।' ও বললে চায়ের টেবিলের আলাপীদের দিকে ফের ইঙ্গিত করে। এখানে বলে রাখি যে প্রিন্স মনে হয় ইচ্ছে করেই আমাদের সাধ মিটিয়ে কথা কইতে দেবার জন্যে একলা ছেড়ে রেখেছেন।

কাতিয়া বললে, 'আমি ভালোই জানি যে প্রিন্স আমার টাকাটা দখল করতে চান। ওদের ধারণা আমি নিতান্ত ছেলেমানুষ, সে কথা সোজাসুজিই ওরা বলে আমায়। আমি কিন্তু তা ভাবি না। ছেলেমানুষ আমি আর নই। অদ্ভুত লোক সব, নিজেরাই ওরা ঠিক ছেলেমানুষের মতো; কী নিয়ে এত ছোটাছুটি?'

'আচ্ছা, কাতেরিনা ফিওদরোভনা, জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম, এই যে লেভিন্‌কা আর বোরিন্‌কার কাছে আলিওশা প্রায়ই যায়, তারা কে?'

'ওরা আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ভারি বুদ্ধিমান আর খুব সৎ, কিন্তু বকে বড্ডো বেশি... আমি ওদের চিনি...'

ও একটু হাসল।

'ভবিষ্যতে ওদের দশ লক্ষ টাকা দেবেন, তা কি সত্যি?'

'দেখুন না, এই দশ লক্ষের কথাটাই ধরুন। এই নিয়ে ওরা এত বকবক শুরু করেছে যে একেবারে অসহ্য। হিতকর সমস্ত কাজে আমি অবশ্য দিয়ে দেব সানন্দেই — এত প্রচুর টাকা থেকে কী লাভ, তাই না? কিন্তু তা দেওয়া ঘটবে কবে, আর এখনি ওরা সে টাকা বাঁটোয়ারা করছে, আলোচনা লাগিয়েছে, চিৎকার করছে, তর্ক জুড়েছে কোন কাজে তা লাগানো ভালো, তা নিয়ে এমনকি ঝগড়া পর্যন্ত বাধাচ্ছে — সে সত্যিই বিচিত্র ব্যাপার। বড়ো বেশি ওদের তাড়াহুড়ো। তা হলেও ওরা কিন্তু খুবই অকপট আর... বুদ্ধিমান। পড়াশুনো করছে। অনেকে যেভাবে দিন কাটায় তার চেয়ে এটা তো ভালো, তাই না?'

আরো অনেক কথা হল আমাদের। ও তার প্রায় গোটা জীবনকাহিনীটাই আমায় শোনালে, আর আমি যা বললাম তা শুনলে লোলুপের মতো। আমায় খুব করে ধরলে, নাতাশা আর আলিওশার কথা যেন আমি আরো বলি। প্রিন্স যখন আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন এইটে বুঝিয়ে দেবার জন্যে যে যাবার সময় হয়েছে, তখন রাত বারোটা। বিদায় জানালাম আমি। কাতিয়া আমার করমর্দন করলে আবেগভরে, তাকালে অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে। কাউণ্টেস বললেন ফের আসতে। প্রিন্স আর আমি একত্রে বেরিয়ে গেলাম।

অদ্ভুত এবং সম্ভবত একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক একটা মন্তব্য না করে পারছি না। কাতিয়ার সঙ্গে তিন ঘণ্টা আলাপ থেকে আমার এই একটা অদ্ভুত কিন্তু নিশ্চিত ধারণা হল যে, এখনো ও এতই ছেলেমানুষ যে নর-নারী সম্পর্কের সমস্ত রহস্য ও আদৌ জানে না। ফলে ওর যুক্তিতর্কে এবং নানা গুরুতর বিষয় নিয়ে ও মোটের ওপর যে গুরুগম্ভীর সুরে আলাপ করে গেল তাতে ভারি একটা হাস্যকরতার আমেজ লেগেছিল...

দশম পরিচ্ছেদ

গাড়িতে আমার পাশে বসার পর প্রিন্স বললেন, 'শুনুন, গিয়ে এবার নৈশ ভোজন করলে কেমন হয়, এ্যাঁ? কী বলেন আপনি?'

ইতস্তত করে বললাম, 'ঠিক বলতে পারছি না প্রিন্স, নৈশ ভোজন কখনো করি না...'

'খেতে খেতে খানিকটা আলাপও অবিশ্যি করা যাবে।' আমার চোখের দিকে ধূর্তভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে প্রিন্স যোগ করলেন।

না বোঝার কিছু নেই! ভাবলাম, উনি খুলে বলতে চান, এবং ঠিক সেইটাই আমার দরকার। রাজী হয়ে গেলাম।

'ব্যস্, পাকা কথা। বলশায়া মরস্কায়া-র 'ব'তে।'

'রেস্তোরাঁয়?' জিজ্ঞেস করলাম খানিকটা থতমত খেয়ে।

'হ্যাঁ, তাতে কী? বাড়িতে নৈশ ভোজন আমি করি কদাচিৎ। আমার আমন্ত্রণ গ্রহণে সত্যিই আপনার আপত্তি থাকতে পারে কি?'

'কিন্তু আপনাকে তো আগেই বলেছি, নৈশ ভোজন আমি কখনো করি না।'

'কিন্তু এক-আধ বারে কিছু এসে যায় না। তাছাড়া নেমন্তন্ন করছি আমিই...'

তার অর্থ পয়সাটা উনি দেবেন। ইচ্ছে করেই যে ওটা উনি বললেন তাতে আমার সংশয় ছিল না। ঠিক করলাম যাব, কিন্তু রেস্তোরাঁয় নিজের পয়সাটা নিজে দেব স্থির করলাম। এলাম আমরা। একটা আলাদা ঘর প্রিন্স নিলেন এবং সমঝদারের রুচি সহকারে দুটি কি তিনটি ডিশ বেছে নিলেন। জিনিসগুলো দামী, যে সুচারু সুরার বায়না দিলেন সেটাও তাই। সব মিলিয়ে আমার সাধ্যের বাইরে। তালিকা দেখে আমি আধ ডিশ উডকক আর এক গ্লাশ লাফিতের অর্ডার দিলাম। প্রিন্স ক্ষেপে উঠলেন।

'সে কী, আমার সঙ্গে আপনি খেতে চান না! এ যে একেবারে হাস্যকর! মাপ করুন বন্ধুবর, কিন্তু এ যে... এ একেবারে অসহ্য রকমের একটা শুচিবাই। অতি তুচ্ছে একটা অহমিকা। প্রায় শ্রেণীগর্বের ব্যাপার, এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি। সত্যি, আপনি আমায় অপমান করছেন।'

কিন্তু আমি জেদ ধরে রইলাম।

উনি বললেন, 'বেশ, তাহলে আপনার যা খুশি। আমি জোর করব না... আচ্ছা, ইভান পেত্রোভিচ, আপনার সঙ্গে কি বন্ধুর মতো কথা কইতে পারি?'

'বন্ধুর মতোই বলুন।'

'বেশ, তাহলে আমার ধারণা, এরকম শুচিবাইয়ে আপনারই ক্ষতি। এতে করে আপনি নিজের আর আপনাদের সবাইকারই অনিষ্ট সাধেন। আপনি লেখক, সমাজের সঙ্গে পরিচয় থাকা আপনার দরকার, অথচ আপনি পর-পর হয়ে থাকছেন। আমি আপনার ঐ খাদ্যটার বিষয়ে এখন বলছি না, কিন্তু আমাদের মহলের সঙ্গে কোনোরকম মেলামেশায় আপনার একান্তই আপত্তি — এটা রীতিমতো ক্ষতিকর। আপনি অনেককিছু হারাচ্ছেন... মানে, একটা

কেরিয়ারের কথা বলছি আর কি, — কিন্তু সে ছাড়াও, আপনাদের উপন্যাসে তো কাউণ্ট, প্রিন্স, বোদোয়ার এসব আছে, তাদের অন্তত জানা দরকার... কিন্তু কেন যে বলছি! এখন তো আপনাদের রীতি — দারিদ্র্য, হারানো কোট, ইনস্পেক্টর, ফাজিল অফিসার, কেরানি, সেকেলে লোক, সনাতনী — জানি, জানি।'

'কিন্তু ভুল করছেন, প্রিন্স। আপনাদের তথাকথিত "উঁচু মহলে" যদি আমি না গিয়ে থাকি, তবে তার কারণ প্রথমত, সেটা একঘেয়ে এবং দ্বিতীয়ত, সেখানে আমার করার কিছু নেই। শেষত, তা সত্ত্বেও মাঝে মধ্যে আমি গিয়ে থাকি...'

'জানি। প্রিন্স 'র'এর ওখানে বছরে একবার। ওখানেই আপনাকে দেখেছিলাম। আর বছরের বাকি সময়টা আপনার কাটে গণতান্ত্রিক গর্বের অচলায়তনে, খুপরির মধ্যে ক্ষয়-কাসিতে, অবিশ্যি আপনাদের সবাই ঠিক তা করেন না। কেউ কেউ এমনই ভাগ্যান্বেষী যে আমারও পর্যন্ত গা ঘিনঘিন করে...'

'অনুরোধ করছি, প্রিন্স, প্রসঙ্গটা বদলান, আমাদের খুপরিতে আর যেন না ফেরেন।'

'দেখুন দেখি, আপনি আহতই বোধ করছেন। অথচ বন্ধুর মতো কথা বলার অনুমতি তো আপনিই আমায় দিয়েছেন। তবে আমারই দোষ, আপনার বন্ধুত্ব পাবার মতো অবিশ্যি এখনো কিছু আমি করি নি। মদটা চমৎকার, একটু খেয়ে দেখুন।'

ওঁর বোতল থেকে আধ গ্লাস ঢেলে দিলেন আমায়।

'জানেন ভাই ইভান পেত্রোভিচ, কারো ওপরে জোর করে বন্ধুত্ব চাপানো ভারি অশোভন তা বেশ ভালো বুঝি। আপনাদের যা ধারণা, আপনাদের প্রতি আমরা সবাই তেমন রূঢ় আর নির্লজ্জ নই। এ কথাও আমি বেশ বুঝি যে, আপনি আমার সঙ্গে যে বসে আছেন, সেটা আমার প্রতি কোনো প্রীতিবশে নয়, নিতান্তই আমি আপনার সঙ্গে কথা কইবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম বলে। ঠিক না?'

প্রিন্স হাসলেন।

'এবং যেহেতু জনৈক ব্যক্তির স্বার্থরক্ষার ওপর আপনি নজর রাখছেন। তাই আমি কী বলি সেকথা আপনি শুনতে চান। তাই না?' উনি যোগ করলেন একটু ক্রূর হাসি হেসে।

অধীরভাবে বাধা দিলাম, 'আপনি ভুল করেন নি প্রিন্স!' (দেখতে পাচ্ছিলাম উনি তাদেরই একজন যারা যেই দেখে কেউ তার বিন্দুমাত্র ক্ষমতাধীন, অমনি সেটা তাকে টের পাইয়ে দেন। আমি ওঁর ক্ষমতাধীন। উনি যা বলতে চান তা সবটা না শুনে আমি চলে যেতে পারি না, সেটা উনি বেশ ভালোই জানতেন। কথার সুর তাঁর হঠাৎ পালটে গিয়ে ক্রমেই নির্লজ্জ রকমের সৌজন্যহীন ও ব্যঙ্গাত্মক হয়ে উঠছিল।) 'ভুল হয় নি আপনার। ঠিক সেই জন্যেই আমি এসেছি, নইলে সত্যি... এত রাতে এখানে আমি বসে থাকতাম না।'

ইচ্ছে ছিল বলি, নইলে কোনো ক্রমেই আপনার সঙ্গে থাকতাম না। কিন্তু তা না বলে কথাটা শেষ করলাম একটু অন্যভাবে। ভীরুতার জন্যে নয়, আমার অভিশপ্ত দুর্বলতা ও ভদ্রতাবোধের জন্যে। আর সত্যিই, লোকের মুখের ওপরে কি আর রূঢ় কথা বলা যায়, যদিও সেটাই তার প্রাপ্য, এবং রূঢ় কথাই বলতে চেয়েছিলাম। মনে হয়, প্রিন্স আমার চোখ দেখে তা ঠাহর করেছিলেন; আমার কথাটা শুনলেন বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তাকিয়ে, যেন আমার দুর্বলতা দেখে মজা লেগেছে ওঁর, যেন চোখ দিয়ে আমায় উসকাতে চান, "সাহস হল না তো, হেদিয়ে গেলে ভায়া!" নিশ্চয়ই তাই, কেননা আমার কথা শেষ হতেই উনি হো-হো করে হেসে আমার হাঁটুর ওপর একটা মুরুব্বিয়ানার চাপড় বসালেন।

ওঁর চোখে যেন লেখা, তুমি আমায় হাসালে হে ছোকরা! মনে মনে ভাবলাম, আচ্ছা, সবুর করুন!

চেঁচিয়ে বললেন, 'ভারি ফুর্তি লাগছে আজ, কেন কে জানে। সত্যি, সত্যি ভাই। আপনার সঙ্গে কথা কইতে চাইছিলাম কিন্তু ঠিক ঐ তরুণীটি সম্পর্কেই। সব খোলসা করে একটা শেষ সিদ্ধান্তে আসতেই তো হবে। আশা করি, হবার আপনি আমাকে পুরোপুরি বুঝতে পারবেন। কিছু আগে ঐসব টাকা-কড়ি, ঐ বুড়ো বাপটা — ষাট বছরের ঐ খোকাটির কথা বলছিলাম... ওসব কথা এখন আর নয়। ও শুধু কথার কথা আর কি! হা-হা-হা! আপনি সাহিত্যিক, ব্যাপারটা আপনার যে আন্দাজ করা উচিত ছিল...'

আশ্চর্য হয়ে তাকালাম ওঁর দিকে। নিশ্চয় এর মধ্যেই উনি মাতাল হয়ে পড়েন নি।

'আর ঐ মেয়েটি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমি ওকে সত্যি সম্মান করি, এমনকি ভালোইবাসি। একটু খামখেয়ালী, কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে লোকে

যা বলত, কাঁটা বিনে গোলাপ নেই। তোফা কথাটা কিন্তু। কাঁটায় খোঁচা লাগে কিন্তু সেই জন্যেই তার আকর্ষণ বেশি। আমার আলিওশাটা একটা নির্বোধ হলেও ওর সুরুচি আছে দেখে ইতিমধ্যেই ওকে আমি খানিকটা ক্ষমা করে বসেছি। সংক্ষেপে, এই ধরনের তরুণী মহিলা আমার ভালো লাগে এবং আসলে আমার' (একান্ত অর্থময় ভঙ্গিতে ঠোঁট চেপে বললেন উনি) 'নিজস্ব প্ল্যান একটা আছে... কিন্তু সেকথা পরে হবে...'

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'প্রিন্স! শুনুন প্রিন্স! আপনার এই দ্রুত ভোলবদলটা আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু... অনুরোধ করছি প্রসঙ্গ বদলান।'

'এই রে, আবার রেগেছেন! বেশ... প্রসঙ্গ বদলাব, বদলাচ্ছি! কিন্তু প্রিয় বন্ধু, শুধু জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম মেয়েটিকে কি আপনি খুবই সম্মান করেন?'

'নিশ্চয়ই।' বললাম রূঢ় অধৈর্যের সঙ্গে।

'এবং... ওকে ভালোবাসেন?' চোখ কুঁচকে গা ঘিনঘিন করা একটা হাসি হেসে উনি বলে চললেন।

চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আত্মবিস্মৃত হচ্ছেন আপনি!'

'আচ্ছা, আচ্ছা, বলব না! শান্ত হোন। আজ আমার আশ্চর্য মেজাজ, বহুদিন এমন ফুর্তি লাগে নি। শ্যামপেন চলবে? কী বলেন হে কবি?'

'আমি মদ খাব না, খাবার ইচ্ছে নেই।'

'ওকথা বলবেন না। আজ আমায় সাহচর্য দিতেই হবে আপনাকে। ভারি ভালো লাগছে। এবং যেহেতু আমার মনটা দরাজ, প্রায় ভাবাকুল, তাই একলা একলা আনন্দ আমার চলবে না। কে বলতে পারে, হয়ত "তুমি" সম্বোধনে চলে আসার জন্যে একটা টোস্টও পান করে ফেলতে পারি। হা-হা-হা! না হে যুবাবন্ধু, আমায় এখনো আপনি চেনেন না! আমি নিশ্চয় জানি যে আমায় আপনি ভালোবেসে ফেলবেন। আজ আমি চাই আপনি আমার দুঃখে সুখে, আনন্দে অশ্রুতে ভাগ নেবেন, যদিও আশা করি আমি অন্তত কাঁদব না। কেমন ইভান পেত্রোভিচ? আপনি শুধু ভেবে দেখুন, আমি যা চাইছি তা যদি না হয়, তাহলে সব প্রেরণা আমার হারিয়ে যাবে, উধাও হবে, উড়ে যাবে, তখন কিছুই শোনা হবে না আপনার। আর আপনি এখানে এসেছেন তো শুধু কিছু শোনার আশায়। তাই না?' ফের বেহায়ার মতো আমার দিকে চোখ মটকে যোগ করলেন, 'সুতরাং, বেছে নিন।'

হুমকিটা গুরুতর। রাজী হয়ে গেলাম। ভাবলাম, আমায় মাতাল করে দিতে চাইছেন না তো? প্রসঙ্গত প্রিন্স সম্পর্কে একটা গুজবের কথা এখানে বলে নেওয়া ভালো। গুজবটা বহু আগেই আমার কানে এসেছিল। শুনেছি, সমাজে অতি মার্জিত ও ভদ্র হলেও মাঝে মাঝে রাত্রে পানাধিক্যের ঝোঁক ছিল প্রিন্সের — ভালোবাসতেন মদ খেয়ে বেহেড হয়ে যেতে, গোপনে ব্যভিচার করতে, জঘন্য আর গোপন ব্যভিচার... ভয়ঙ্কর সব গুজব আমি শুনেছি ওর সম্পর্কে... শুনেছি, আলিওশা জানে যে বাপ মাঝে মাঝে মাতাল হয়ে যায়, কিন্তু সে কথা সে সবার কাছ থেকে, বিশেষ করে নাতাশার কাছ থেকে চেপে রাখতে চাইত। একবার আমার সামনে মুখ ফসকে খানিকটা বলে ফেলেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে নেয়, আমার প্রশ্নের জবাব দেয় নি। আমি অবশ্য গুজবটা আলিওশার কাছ থেকে শুনি নি এবং বলতে বাধ্য যে আগে তাতে বিশ্বাসও হয় নি। এখন কী দাঁড়াবে দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মদ এল। প্রিন্স দুই পাত্র ঢাললেন, নিজের জন্যে আর আমার জন্যে।

'মিষ্টি, মিষ্টি মেয়ে, যদিও আমায় ধমক দিতে ছাড়ে নি,' পরিতৃপ্তির চুমুক দিতে দিতে প্রিন্স বলে চললেন, 'কিন্তু এইসব মিষ্টি মেয়েরা ঠিক তখনই মিষ্টি, ঠিক ওইরকম মুহূর্তগুলোতেই... অথচ সেদিন রাত্রে, মনে আছে তো, ও নিশ্চয় ভেবেছিল আমায় ভারি লজ্জায় ফেলেছে, একেবারে চূর্ণ করে ছেড়েছে! হা-হা-হা! কী মানায় ওকে রাঙা হয়ে ওঠে! নারীর ব্যাপারে আপনি রসিক তো? লক্ষ্য করেছেন কি, ফ্যাকাশে গাল হঠাৎ লাল হয়ে উঠলে কী চমৎকার মানায়? এই সেরেছে, আবার চটেছেন বুঝি?'

'চটেছি!' নিজেকে আর সংযত না রেখে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এবং নাতালিয়া নিকোলায়েভনাকে নিয়ে আপনি কথা কইবেন... মানে ওই ঢঙে কথা কইবেন, তা আমি চাই না। আমি... আমি আপনাকে তা করতে দেব না!'

'বটে! বেশ, আপনার সন্তোষ বিধান করে প্রসঙ্গ পালটাব। আমি তো ময়দার তালের মতো নরম, তাহলে আপনার কথা বলি। আপনাকে আমার বেশ লাগে ইভান পেত্রোভিচ। আপনার সৌভাগ্যে কীরকম বন্ধুর মতো, কত অকপটে আমি বিশ্বাস করি, তা যদি জানতেন...'

বাধা দিয়ে বললাম, 'কাজের কথাটায় আসা কি ভালো নয় প্রিন্স?'

'তার মানে, আমাদের কাজটার কথা বলছেন তো? মুখ হাঁ করতেই বুঝেছি, প্রিয় বন্ধু। কিন্তু আপনার ধারণাই নেই এখন আপনার বিষয়ে কথা

বললেই সে ব্যাপারটার কত কাছাকাছি এসে যাব, অবশ্য যদি বাধা না দেন। তাহলে যা বলছিলাম! অমূল্য ইভান পেত্রোভিচ আমার, আমি বলি কী, আপনি যেভাবে জীবন কাটাচ্ছেন তার অর্থ স্রেফ নিজেকে ধ্বংস করা। সংকোচের এই প্রসঙ্গটা তোলার অনুমতি দিন — বলছি বন্ধু হিশেবে। আপনি গরিব, প্রকাশকের কাছ থেকে আগাম কিছু নিয়ে ধার-দেনা শোধ দিয়ে যা বাকি রইল তাতে ছ'মাস চালাবেন চা খেয়ে, এবং প্রকাশকের পত্রিকার জন্যে উপন্যাসটা কবে শেষ হবে তার প্রতীক্ষায় শীতে কাঁপতে থাকবেন আপনার ঐ খুপরিতে। ঠিক কিনা?'

'ঠিক যদি হয় তাহলেও সেটা...'

'তাহলেও সেটা চুরি কি খোশামোদ কি ঘুষ কি চক্রান্ত ইত্যাদি ইত্যাদির চেয়ে ঢের শ্লাঘ্য। জানি, জানি কী বলতে চান — বহু আগেই ওসব কথা লোকে লিখে গেছে।'

'সুতরাং, আমার ব্যাপার নিয়ে কথা বলার কোনো দরকার নেই প্রিন্স। আমায় কি আপনাকে ভদ্রতা শেখাতে হবে!'

'আপনাকে শেখাতে হবে না তা নিশ্চয়। কিন্তু ঠিক এই সংকোচের ব্যাপারটিই যদি আমাদের আলোচনা করার প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে কী করা যায় বলুন? এড়িয়ে তো যাওয়া যাবে না। কিন্তু যাক, খুপরির কথাটা থাক। নিতান্ত দু-একটা ক্ষেত্র ছাড়া ও বস্তুটিতে আমারও বিশেষ প্রীতি নেই।' বলেই একটা জঘন্য হাসি হাসলেন প্রিন্স। 'কিন্তু অবাক লাগছে এই দেখে: গৌণ একটা ভূমিকা নেবার শখ কেন আপনার? অবিশ্যি আপনাদের এক লেখক মনে হচ্ছে যেন কোথাও বলেছিলেন যে, মানুষের বৃহত্তম কীর্তি হল জীবনে একটা গৌণ ভূমিকায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারা... যতদূর ধারণা ঐরকমই কিছু একটা হবে। এরকম কথা আমি যেন কোথাও শুনেছি। কিন্তু আলিওশা তো আপনার কনেকে ছিনিয়ে নিয়েছে — আমি তো সেটা জানি — অথচ আপনি কোনো এক শিলারের মতো ওদের জন্যে খেটে খেটে মরছেন, পরিচর্যা করছেন, ডাকতে না ডাকতেই ছুটছেন... মাপ করবেন ভাই, কিন্তু এ হল বিচ্ছিরি একটা মহত্ত্ব মহত্ত্ব খেলা... সত্যি আপনার বিরক্তি ধরে না! লজ্জার কথা। আমি হলে বিরক্তিতেই মরে যেতাম, এবং সবচেয়ে বড়ো কথা লজ্জা!'

'প্রিন্স! মনে হচ্ছে আমায় অপমান করার উদ্দেশ্যেই আপনি ইচ্ছে করে আমায় এখানে নিয়ে এসেছেন!' ক্রোধে আত্মহারা হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম।

'না, না বন্ধু, মোটেই নয়! এই মুহূর্তে আমি নিতান্তই এক সাংসারিক ব্যক্তি, চাই আপনি সুখী হোন। মোট কথা আমি সব ঠিকঠাক করে দিতে চাই। কিন্তু আপাতত গোটা ব্যাপারটা থাক। শেষ পর্যন্ত আমার কথাটা শুনুন, অন্তত দু'মিনিটের জন্যে হলেও উত্তেজিত না হবার চেষ্টা করুন। এখন বলুন, নিজে বিয়ে করা সম্পর্কে কী ভাবছেন? দেখছেন তো, এখন আমি একেবারে বাইরেকার কথা বলছি। অমন অবাক হয়ে তাকাচ্ছেন কেন?'

'আপনার বক্তব্য শেষের অপেক্ষা করছি।' বললাম সত্যিই ওঁর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে।

'মানে, বিস্তারিত বলার কিছু নেই। আমি শুধু জানতে চাই, কী আপনি বলবেন যদি আপনার কোনো একজন বন্ধু আপনার কেবল একটু সাময়িক আনন্দ নয়, সত্যিকারের স্থায়ী সুখ কামনা করে একটি পাত্রীর প্রস্তাব দেয় — তরুণী, সুন্দরী, কিন্তু... একটু অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এসেছে। একটু আভাসে বলছি, কিন্তু আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন — এই ধরুন নাতালিয়া নিকোলায়েভনার মতো কেউ, অবশ্যই ভালো রকমের ক্ষতিপূরণ সমেত... (আমাদের ব্যাপার নয়, একেবারেই অন্য ব্যাপারের কথা বলছি); তাহলে কী বলবেন আপনি?'

'বলব যে আপনি... পাগল।'

'হা-হা-হা! বাপ্‌স্, আপনি আমায় যেন প্রায় মারতে উঠেছেন!'

সত্যিই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম আর কি। আর নিজেকে সংযত রাখতে পারছিলাম না। ওঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা জঘন্য রকমের কোনো প্রাণীকে দেখছি, প্রকাণ্ড একটা মাকড়সা যাকে পিষে মারার অসহ্য ইচ্ছে হচ্ছিল আমার। আমাকে উপহাস করে উনি তৃপ্তি পাচ্ছিলেন; ইঁদুরকে নিয়ে বেড়ালের খেলার মতো উনি খেলছিলেন আমার সঙ্গে, ভেবেছিলেন আমি সম্পূর্ণই ওঁর ক্ষমতাধীন। মনে হল (এবং বেশ বুঝতে পারছিলাম), নিজের যে নীচতায়, নির্লজ্জতায়, অসূয়ায় উনি অবশেষে মুখোশ খসাচ্ছেন তার মধ্যে যেন কেমন একটা তৃপ্তি, এমনকি যেন একটা ইন্দ্রিয়সুখই লাভ করছেন। আমার বিস্ময়, আমার আতঙ্ক উপভোগ করতে চাইছিলেন উনি। আমায় উনি সত্যি ঘৃণা করছিলেন, হাসছিলেন আমায় নিয়ে।

প্রথম থেকেই আমার কেমন একটা সন্দেহ হয়েছিল যে এসবই ওঁর ইচ্ছাকৃত, পেছনে কোনো মতলব আছে; কিন্তু আমি তখন এমন অবস্থায় যে, যাই ঘটুক, শেষ পর্যন্ত ওঁর কথা শুনে যেতে বাধ্য। এটা নাতাশার স্বার্থে,

এবং যাই হোক সর্বকিছুতে রাজী হতে, সব সইতে আমি বাধ্য, কেননা পুরো ব্যাপারটার সিদ্ধান্ত হয়ে যাচ্ছিল হয়ত ঠিক ওই মুহূর্তেই। কিন্তু নাতাশাকে নিয়ে ওঁর এই নীচ, নির্লজ্জ তামাশা আমি শুনে যাই কী করে, নির্বিকার হয়ে কী করে তা সহ্য করি! এর ওপর উনি বেশ বুঝছিলেন যে, ওঁর কথা সব না শুনে আমার গতি নেই, ফলে আরো দ্বিগুণ হয়ে উঠছিল আঘাত। তবে আমাকে যে ওঁর নিজেরই প্রয়োজন, এই ভেবে জবাব দিতে লাগলাম কাটা কাটা, গালাগালির মতো। উনি বুঝলেন ব্যাপারটা।

গুরুত্বের ভাব করে আমার দিকে চেয়ে উনি বললেন: 'শুনুন আমার নওজোয়ান বন্ধু, এভাবে আমাদের চলবে না। বরং একটা বোঝাপড়ায় আসা ভালো। আমি ঠিক করেছিলাম কিছু একটা ব্যাপার আপনাকে বলব, আর আমি যাই বলি আপনি সৌজন্য সহকারে তা শুনবেন। আমি কথা কইতে চাই যেমন খুশি, যা ইচ্ছে — আসলে তাই উচিত। তাহলে বন্ধু নওজোয়ান, ধৈর্য ধরবেন কি?'

নিজেকে সংযত করে নিলাম আমি, কোনো জবাব দিলাম না, যদিও আমার দিকে উনি চাইছিলেন এমন গা-জ্বালানো বিদ্রুপের দৃষ্টিতে, যেন কড়া একটা প্রতিবাদ জানাতে চ্যালেঞ্জ করছেন। অবিশ্যি উনি বুঝেছিলেন যে আমি থাকতে রাজী; তাই বলে চললেন:

'আমার ওপর চটবেন না বন্ধু! চটার কারণটা কী? কেবল আমার বাহ্যিক ভঙ্গির জন্যেই তো, তাই না? কিন্তু সত্যি বলতে কি, আপনিও তো আমার কাছ থেকে এ ছাড়া অন্য কিছু আশা করেন নি, তা আমি যেভাবেই না কেন কথা বলি: মিষ্টি একটা ভদ্রতা করেই হোক বা এখনকার মতো। সুতরাং তার অর্থটা হত এখনকার মতো একই। আমাকে আপনি ঘৃণা করেন, তাই না? দেখছেন তো আমার মধ্যে কী মধুর এই সরলতা, অকপটতা, কী bonhomie*! আপনার কাছে সবকিছুই আমি স্বীকার করতে রাজী, এমন কি আমার ছেলেমানুষী খেয়ালগুলোর কথাও। সত্যি, mon cher**, সত্যি, আপনার দিক থেকেও আর একটু bonhomie হলেই আমাদের মিটমাট, পুরোপুরি ঠিকঠাক হয়ে যাবে এবং পরিশেষে পরস্পরকে চূড়ান্ত রূপে বুঝতে পারব। এবং আমার দিকে অমন হাঁ করে

---

* ভালোমানুষি। (ফরাসী ভাষায়)

** প্রিয়বর। (ফরাসী ভাষায়)

তাকিয়ে থাকবেন না! এইসব নিরীহপনা, আলিওশার এই যতসব রাখালিয়া পদাবলী, এইসব "শিলারপনা", নাতাশার সঙ্গে যাচ্ছেতাই (তবে মেয়েটি ভারি মিষ্টি) এইসব সম্পর্কের মহানুভবতা — এসবে আমি এত তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছি যে বলা যেতে পারে একটু মুখ ভেংচানির সুযোগ পেয়ে খুশিই লাগছে। মানে, সুযোগটা এসেছে। তাছাড়া, আমার মনটা আপনার কাছে খুলে ধরার জন্যে ভারি ইচ্ছে হয়েছিল আমার। হা-হা-হা!'

'আমায় অবাক করলেন প্রিন্স, আপনাকে এখন প্রায় চেনাই দায়। আপনার কথায় এক ভাঁড়ের আমেজ লাগতে শুরু করেছে। অপ্রত্যাশিত এইসব অকপটতা...'

'হা-হা-হা! নিশ্চয় এ কথা খানিকটা ঠিক! চমৎকার তুলনা, হা-হা-হা! একটু বেলেল্লাগিরি করতে বেরিয়েছি হে, একটু বেলেল্লাপনা। মেজাজ আমার শরিফ! আর কবিবর, যথাসম্ভব আমায় প্রশ্রয় দিতে হবে আপনাকে। কিন্তু তার চেয়ে বরং পান করা যাক,' পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তির সঙ্গে নিজের গ্লাসটি ভর্তি করে উনি সমাপ্তি টানলেন, 'কী জানেন বন্ধু, নাতালিয়া নিকোলায়েভনার ওখানে সেই নির্বোধ সন্ধ্যেটা আমাকে খতম করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। মেয়েটা ভারি মনোহারিণী, সে সত্যি, কিন্তু আমি ফিরেছিলাম এক সাংঘাতিক আক্রোশ নিয়ে, সেটা ভুলতে চাই না। ভুলতেও চাই না, চাপতেও চাই না। আমার সময় আসবে নিশ্চয়, এবং দ্রুতই তা কাছিয়ে আসছে, কিন্তু সেকথা এখন থাক। প্রসঙ্গত আপনাকে বোঝাতে চাইছিলাম যে আমার চরিত্রের একটা দিকের খবর আপনার এখনো জানা নেই — সে হল ঐ সব ছেঁদো, মূল্যহীন যত সরলতা আর রাখালিয়াপনার প্রতি আমার বিদ্বেষ। চিরকালই আমার অতি ঝাঁঝালো একটা তৃপ্তি এই যে, আমি নিজেই প্রথমে ঐ ভঙ্গিটা গ্রহণ করে সুরে সুর মেলাই, চিরকিশোর কোনো শিলারকে সোহাগভরে উৎসাহিত করে তুলি, তারপর হঠাৎ চমকে দিই তাকে, হঠাৎ আমার মুখোশ নামিয়ে, গদগদ মুখখানাকে বিকৃত করে সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে জিভ ভেংচাই তাকে। কী? এটা আপনার বোধগম্য হচ্ছে না? ভাবছেন বোধ হয় জিনিসটা জঘন্য, বিদঘুটে, হীন, তাই তো?'

'বলাই বাহুল্য, তাই।'

'লোক আপনি খোলামেলা। কিন্তু কী আমার করার থাকে যদি ওরা আমায় জ্বালিয়ে মারে? আমিও একটু বোকার মতোই খোলামেলা লোক, কিন্তু এই যে আমার চরিত্র। তবে আম্যর জীবনের কয়েকটা দিকের কথা

আমি আপনাকে বলি শুনুন, তাতে আমাকে ভালো করে বুঝতে সুবিধা হবে আপনার, জিনিসটা খুব কৌতূহলেরও বটে। ঠিকই, সত্যিই বোধ হয় আমি আজ এক ভাঁড়, কিন্তু ভাঁড়ও অকপট, তাই না?'

'শুনুন প্রিন্স, অনেক রাত হয়ে গেছে এখন, এবং সত্যিই...'

'কী বললেন? বাপ্‌রে, কী অধৈর্য! তাছাড়া তাড়া কিসের? এক গ্লাস মদ নিয়ে দিলখোলা একটু দোস্তী আলাপ চলুক, পুরনো বন্ধুর মতো আর কি। ভাবছেন আমি মাতাল হয়ে পড়েছি। হলামই বা, সে তো আরো ভালো। হা-হা-হা! সত্যি, ইয়ারী এইসব আড্ডাগুলোর কথা কিন্তু পরে বহুদিন মনে থাকে, এত আনন্দ লাগে মনে করতে। আপনি লোক ভালো নন ইভান পেত্রোভিচ। কোনো ভাবালুতা, কোনো হৃদয়াবেগ আপনার নেই। আমার মতো এক দোস্তের খাতিরে দু'এক ঘণ্টায় আপনার কী এসে যায় ? তাছাড়া, এটাও ব্যাপারটার সঙ্গেও জড়িত... সেটা বুঝছেন না কেন? আপনি তো আবার সাহিত্যিক মানুষ — এ সুযোগের জন্যে আপনার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। আমাকে নিয়ে আপনি একটা টাইপ চরিত্র দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন, হা-হা-হা! ভগবান, কী চমৎকার দিলখোলাই না আমি আজ হয়ে উঠেছি!'

স্পষ্টতই উনি বেসামাল হয়ে উঠছিলেন। মুখখানা ওঁর বদলে গিয়ে একটা বিদ্বেষের ভাব জেগে উঠছিল। স্পষ্টতই, হুল ফোটানো, কামড়ানো, টিটকারি দেবার ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর। মনে হল, মাতাল হয়েছে একদিক থেকে সেটা ভালোই। মাতালদের পেটে কথা থাকে না। কিন্তু জ্ঞান ওঁর টনটনে।

নিঃসন্দেহে আত্মতৃপ্তিতে উনি শুরু করলেন, 'বন্ধুবর, মাঝে মাঝে কতকগুলো ক্ষেত্রে কাউকে ভেংচি কাটার অদম্য একটা ইচ্ছে আমায় পেয়ে বসে, আপনার কাছে এই স্বীকারোক্তিটা আমি করেছি, যদিও সেটা প্রাসঙ্গিক নয়। এই সরল ভালোমানুষী অকপটতার জন্যে আপনি আমায় ভাঁড়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন — সেটা সত্যি আমার ভারি মজার লাগছে। কিন্তু আপনার প্রতি এখন রূঢ়তা দেখাচ্ছি, বলতে কি চোয়াড়ের মতো অভদ্রতা করছি, মোট কথা সুর পালটেছি বলে যদি আপনার অবাক লাগে বা আমায় অনুযোগ করেন, তাহলে আপনার খুবই অন্যায় হবে। প্রথমত, তাতেই আমার সুবিধে, দ্বিতীয়ত, আমি এখন স্বগৃহে নই, আছি আপনার সঙ্গেই... তার মানে বলতে চাচ্ছি যে আমরা এখন ফূর্তি ওড়াচ্ছি ইয়ারের মতো, এবং তৃতীয়ত, খামখেয়াল আমি ভারি ভালোবাসি। জানেন, খেয়াল চাপায় একবার মানবহিতৈষী আর দার্শনিক হয়ে যাই? ঠিক আপনার মতোই তখন নানা

আইডিয়ায় ভরপুর ছিলাম। কিন্তু সে বহু যুগ আগে, আমার তারুণ্যের সোনালি দিনগুলোয়। মনে আছে, সে সময় আমার গাঁয়ের জমিদারিতে আমি গিয়েছিলাম সব মানবদরদী আদর্শ নিয়ে, এবং অবশ্যই এত ব্যাজার লাগত যে কী বলব। বিশ্বাস করবেন না, কী তখন অবস্থা আমার। একঘেয়েমির ফলে কিছু-কিছু সুন্দরীর সঙ্গে পরিচয় করতে শুরু করলাম ... ও কী, এর মধ্যেই মুখ বাঁকাচ্ছেন নাকি? হায় আমার যুবাবন্ধু, আমরা তো এখন ইয়ারের আড্ডায়! কখন তাহলে আর ফুর্তি লুটব, দিল উজাড় করব? আমার মেজাজটা যে রুশ, একেবারে সাঁচ্চা রুশ চরিত্র, আমি হলাম স্বদেশী লোক, সংযম হারাতে ভালোবাসি। তাছাড়া, জোর করে এক একটা মুহূর্ত ছিনিয়ে নিয়ে জীবন উপভোগ করা তো উচিত। মৃত্যু তো আছেই — তাহলে? তাই মেয়েদের পেছু নিতে লাগলাম। মনে আছে, এক রাখালিনীর স্বামী ছিল, সুপুরুষ নওজোয়ান চাষী। তাকে আগাপাছতলা খুব পিটলাম, ভেবেছিলাম সৈন্য বাহিনীতে পাঠিয়ে দেব (অতীতের দুরন্তপনা, কবি), কিন্তু পাঠাই নি। মারা গেল আমার হাসপাতালে... গাঁয়ে আমার একটা হাসপাতালও ছিল যে, বারোটি শয্যা, পরিপাটি বন্দোবস্ত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, নকসী কাঠের মেঝে। অনেক আগেই অবিশ্যি হাসপাতালটা তুলে দিয়েছি, কিন্তু সে সময় ওটা নিয়ে বড়াই করতাম। আমি ছিলাম মানবহিতৈষী কিন্তু বেতিয়ে চাষীটাকে প্রায় মেরে ফেলেছিলাম, ওই বৌটার জন্যে... এই রে, ফের মুখ বাঁকাচ্ছেন? শুনতে খারাপ লাগছে আপনার? আপনার মহদনুভূতিগুলোয় আঘাত লাগছে? নিন, শান্ত হোন। ওসবই অতীতের কাহিনী। জিনিসটা করেছিলাম যখন আমার মেজাজটা ছিল রোমাণ্টিক, চাইছিলাম মানবহিতৈষী হব, মানবহিতৈষী এক সমাজ গড়ব... ঐ গাড্ডায় পড়েছিলাম তখন। বেত মারতে এগিয়েছিলাম তখনই। এখন আর বেত মারব না; এখন তা নিয়ে শুধু মুখ বাঁকাতে হয়, সবাই আমরা মুখ বাঁকাই — এই হল এখনকার কাল... কিন্তু এখন আমার সবচেয়ে হাসি পায় ওই বোকা ইখমেনেভের কথা ভেবে। আমার দৃঢ় ধারণা, ওই চাষীটার ঘটনা ও নিশ্চয় সব জানত... কিন্তু কী হল জানেন? সরল মনে — সে মন ঝোলাগুড়ে তৈরি নিশ্চয়, — আর আমার প্রতি ভালোবাসা বশত, — নিজের কাছেই আমায় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলছিল, — ঠিক করলে কিছুই বিশ্বাস করবে না, এবং বিশ্বাস করে নি; অর্থাৎ যেটা সত্য ঘটনা সেটাও সে বিশ্বাস করবে চাইলে না এবং বারো বছর ধরে অটল পর্বতের মতো আমার পক্ষ নিয়ে এসেছে, যতক্ষণ না ও

নিজেই ঘা গেল। হা-হা-হা! কিন্তু এসব ফালতু কথা! পান করা যাক তরুণ বন্ধু। আচ্ছা, আপনি নারী ভালোবাসেন?'

আমি কিছুই জবাব দিলাম না। শুধু শুনে যাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বোতল শুরু হয়েছে ওঁর।

'আর রাত্রের খাওয়ার সময় আমি নারীর গল্প করতে ভালোবাসি। খাওয়ার পরে আমি এক মাদমোয়াজেল ফিলিবার্তের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব, এ্যাঁ? কী বলেন? কিন্তু কী হল আপনার? আমার দিকে তাকাতেও চান না যে... হুম!'

মনে হল কী ভাবলেন। তারপর হঠাৎ মাথা তুলে আমার দিকে তাকালেন অর্থপূর্ণভাবে এবং বলে চললেন:

'তাহলে কবি আমার, একটি প্রাকৃতিক রহস্যের কথা আপনার কাছে আমি উন্মোচন করতে চাই, মনে হয়, সে সম্পর্কে আপনি বিন্দুমাত্র সচেতন নন। নিশ্চয় জানি, এই মুহূর্তে আপনি আমায় পাপী, এমনকি এক পাষণ্ড বলেই ভাবছেন, ভাবছেন ব্যভিচার আর পাপাচারের একটি পিশাচ। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলি শুনুন: যেসব কথা আমরা বলতে ভয় পাই, কোনোক্রমেই অন্যের কাছে বলি না, একান্ত বন্ধুর কাছেও বলবার সাহস হয় না, মাঝে মাঝে নিজের কাছেও স্বীকার করতে আপত্তি ঘটে — সেইসব গোপন ভাবনা-চিন্তাগুলোকে যদি আমরা সকলেই খুলে বলতে পারতাম (মনুষ্য প্রকৃতির নিয়মে তা অবশ্য অসম্ভব), তা যদি সম্ভব হত, তাহলে পৃথিবীটা এমন দুর্গন্ধে ভরে উঠত যে আমরা সকলেই দম বন্ধ হয়ে মরতাম। সেই জন্যেই, প্রসঙ্গত বলি, আমাদের সামাজিক শালীনতা, কেতাকায়দাগুলো অত ভালো। গভীর অর্থ আছে ওদের, — একথা বলব না যে সেটা নৈতিক, না, নিতান্তই আত্মরক্ষা, আরাম-সুবিধা — নীতিধর্মের চেয়ে সেটা ভালোই, কেননা নীতিধর্মটাও আসলে ওই আরাম-সুবিধা, একমাত্র ঐ আরাম-আয়েসের জন্যেই তা উদ্ভাবিত। কিন্তু শালীনতার কথা পরে বলা যাবে, এখন আমি প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছি, পরে মনে করিয়ে দেবেন কিন্তু। শুধু এই বলে শেষ করি: পাপাচার, ব্যভিচার, দুর্নীতির নালিশ আপনি আনছেন আমার বিরুদ্ধে, কিন্তু আমার একমাত্র দোষ সম্ভবত এই যে, আমি অন্যদের চেয়ে বেশি অকপট। তাছাড়া আর কিছু নয়। আগে যা বলেছি, অপরে নিজের কাছ থেকেও যা লুকিয়ে রাখতে চায়, আমি তা লুকিয়ে রাখি না... সেটা করছি যাচ্ছেতাইভাবে কিন্তু এখন তাই আমার ইচ্ছে। তবে ভাবনা নেই,' উনি বললেন

একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে, 'বলেছি "দোষ", কিন্তু তার জন্যে মোটেই ক্ষমা দাবি করছি না। এও জেনে রাখুন: আপনাকে বিব্রত অবস্থায় ফেলতে আমি চাই না, জিজ্ঞেস করব না আপনারও এমন কোনো গোপন ঘটনা আছে কিনা, যা দিয়ে সমর্থন করব নিজেকে... শোভন এবং মহানুভব আচরণই আমি করছি। সাধারণভাবে চিরকালই আমি মহানুভবতা দেখাই...'

'নিতান্তই ছাইভস্ম বকছেন আপনি।' বললাম ঘৃণার দৃষ্টিতে চেয়ে।

'ছাইভস্ম? হা-হা-হা! বলব, আপনি এখন কী ভাবছেন? ভাবছেন কেনই-বা আপনাকে এখানে নিয়ে এলাম এবং হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই কেনই-বা হৃদয় মেলে ধরতে শুরু করলাম। তাই না?'

'তাই।'

'কিন্তু সেটা আপনি পরে বুঝবেন।'

'সোজা কথা এই যে আপনি প্রায় দু'বোতল শেষ করে এনেছেন... এবং প্রকৃতিস্থ নন।'

'স্রেফ মাতাল। তা হতে পারে। "প্রকৃতিস্থ নন!" মাতালের চেয়ে একটু নরম কথা। ওহ্, ভদ্রতায় একেবারে ভরপুর! কিন্তু... ফের আমরা পরস্পর গালাগালি শুরু করেছি অথচ ভারি চিত্তাকর্ষক একটা বিষয় নিয়ে আলাপ করছিলাম আমরা। হ্যাঁ হে কবিবর, সুমধুর সুন্দর কিছু দুনিয়াতে এখনো যদি থেকে থাকে তবে তা নারী।'

'শুনুন প্রিন্স, এখনো আমার মাথায় ঢুকছে না, কেন আপনার গোপন কথা এবং... প্রণয়লীলা শোনাবার মতো লোক বলে আমায় ঠাওরালেন।'

'হুম্... কিন্তু বলেছি তো, সে কথা পরে বুঝবেন। অস্থির হবেন না; কিন্তু সম্ভবত এটা এমনিই, বিনা কারণেই। আপনি কবি লোক, আমায় বুঝতে পারবেন, কিন্তু সে তো আগেই বলেছি। হঠাৎ এই মুখোশ ছুড়ে ফেলার মধ্যে, লজ্জারও পরোয়া না করে সহসা অপর একজনের সামনে আত্ম-উদ্ঘাটনের এই বেহায়াপনার মধ্যে একটা বিশেষ রকমের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি আছে। একটা গল্প বলি আপনাকে। প্যারিসে এক ছিটগ্রস্ত কর্মচারী ছিল, পরে অবিশ্যি লোকে যখন পুরোপুরি নিশ্চিত হল যে লোকটা পাগল তখন ওকে পাগলাগারদে দেওয়া হয়। ওর যখন মাথা খারাপ হতে শুরু হয়, তখন ও মজা পেত এই করে: বাড়িতে সমস্ত পোশাক খুলে ও একেবারে নগ্ন হয়ে যেত আদমের মতো, পায়ে শুধু থাকত জুতোজোড়া; তারপর গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলন্ত এক চওড়া আলখাল্লা গায়ে চাপিয়ে বেশ করে নিজেকে

মুড়ে রাস্তায় বেরুত গম্ভীর জাঁদরেল চালে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হত — দিব্যি যেকোনো লোকের মতোই, আত্মতৃপ্তির জন্যে একটু চওড়া আলখাল্লা পরে ভ্রমণ সারছে। কিন্তু একা একা কোনো পথচারীর দেখা পেলেই ও তার কাছে হেঁটে যেত নীরবে, অতি সিরিয়স, প্রগাঢ় একটা চিন্তার ভাব করে, তারপর হঠাৎ তার সামনে দাঁড়িয়ে আলখাল্লা খুলে আত্মপ্রকাশ করত তার সমস্ত অকপটতায়! শুধু মিনিটখানেক মাত্র, তারপর আবার আলখাল্লা জড়িয়ে নিয়ে নীরবে একান্ত নির্বিকার মুখে বিস্ময়াভিভূত দর্শকের সামনে দিয়ে হেঁটে যেত হ্যামলেট নাটকের প্রেতচ্ছায়ার মতো গম্ভীর ভাসমান চালে। নারী, পুরুষ, বালক সকলের সঙ্গেই ছিল ওর এই আচরণ এবং এই তার একমাত্র তৃপ্তি। মানে, অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে হঠাৎ কোনো এক রোমান্টিক শিলারকে স্তম্ভিত করে ভেংচি কেটে খানিকটা এই তৃপ্তিই পাওয়া যায়। "স্তম্ভিত" — কী একখান শব্দ। আপনাদের আধুনিক সাহিত্যেই কোথাও কথাটা পেয়েছি।'

'কিন্তু সে ছিল পাগল, আর আপনি...'

'মতলববাজ, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

প্রিন্স হেসে উঠলেন।

একটা অতি বেহায়া মুখভঙ্গি করে বললেন, 'ঠিক ধরেছেন বটে!'

ওঁর নির্লজ্জতায় চটে উঠে বললাম, 'প্রিন্স, আমাকে সমেত আমাদের সকলকে আপনি ঘৃণা করেন, এখন এই সকলের জন্যে, সবকিছুর জন্যে শোধ নিচ্ছেন আমার ওপর। এটা আসছে আপনার অতি তুচ্ছ অহমিকা থেকে। আপনার আক্রোশ হয়েছে, হীন আক্রোশ। আমরা আপনাকে চটিয়েছি, সম্ভবত বেশি রাগ হয়েছে আপনার ওই সন্ধ্যেটার জন্যে। বলাই বাহুল্য, আমার প্রতি এইরকমের একটা চূড়ান্ত ঘৃণা ছাড়া আর কিছু দিয়ে ভালোরকম শোধ তোলার উপায় নেই আপনার। নিতান্ত মামুলী, সার্বজনীন যে ভদ্রতাটুকু আমাদের পরস্পরের পক্ষে আবশ্যিক তাও আপনি অগ্রাহ্য করছেন। আমার সম্মুখে প্রকাশ্যে সহসা আপনার ওই জঘন্য মুখোশটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নৈতিক অসূয়ায় নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করে পরিষ্কার দেখাতে চান যে আমার কাছে আপনি লজ্জা পাবারও প্রয়োজন বোধ করেন না...'

'এসব কথা বলছেন কেন!' রূঢ় আক্রোশের চোখে আমায় লক্ষ্য করে প্রিন্স জিজ্ঞেস করলেন। 'আপনার অন্তর্দৃষ্টি দেখাবার জন্যে?'

'এইটে দেখাবার জন্যে যে আমি আপনাকে বেশ বুঝি এবং সেকথা খোলাখুলি আপনাকে বলছি।'

'Quelle idée, mon cher*,' সুর বদলে হঠাৎ সেই আগের খোশমেজাজী বাচালতায় ফিরে গিয়ে প্রিন্স বলে চললেন, 'আমার প্রসঙ্গটা থেকে আমায় কেবল দূরে সরিয়ে দিলেন। পান করা যাক বন্ধু আমার, আপনার গ্লাসটা ভরে দিই, কেমন। অথচ আমি আপনাকে একটি চমৎকার, অসাধারণ কৌতূহলোদ্দীপক অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী শোনাতে চাইছিলাম। মোটামুটিভাবে বলছি। একদা আমি এক মহিলাকে জানতাম। প্রথমযৌবনা তিনি ছিলেন না, সাতাশ-আটাশ বয়স; পয়লা নম্বরের সুন্দরী, কী বুক, কী গড়ন, কী ঠাট! ইগলের চোখের মতো তীক্ষ্ম চোখ, কিন্তু সর্বদাই নিষ্করুণ, কঠোর। আচরণ তাঁর দর্পিত, প্রশ্রয়হীন। ঝোড়ো তুষারের মতো ঠান্ডা বলে তাঁর নাম ছিল, অলঙ্ঘনীয় ভয়ঙ্কর সতীত্বে তিনি সবাইকে ভয় পাইয়ে দিতেন। ভয়ঙ্করই একেবারে। ওঁদের মহলে ওঁর মতো কঠোর বিচারক আর কেউ ছিল না। অন্য মেয়েদের মধ্যে পাপ তো দূরের কথা, এতটুকু দুর্বলতাও তিনি ক্ষমা করতেন না, নির্মমভাবে তার শাস্তি বিধান করতেন, এবং তার আর কোনো নড়চড় ছিল না। নিজের মহলে তাঁর ছিল বিপুল প্রভাব। সবচেয়ে অহঙ্কারী আর সতীত্বের তেজে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বুড়ি-বুড়ি মেয়েরা পর্যন্ত তাঁকে সম্মান করত, তোয়াজই করত। মধ্যযুগের মঠ-কর্ত্রীর মতো সবাইকেই তিনি দেখতেন অপক্ষপাত নিষ্ঠুরতায়। ওঁর দৃষ্টিপাত আর সমালোচনার সামনে যুবতী মেয়েরা সব কাঁপত। তাঁর মুখের একটি মন্তব্য, একটি ইঙ্গিতেই সুনাম নষ্ট হয়ে যেতে পারত — সমাজে এমনি একটা প্রতিষ্ঠা উনি গড়ে তুলেছিলেন — এমনকি পুরুষেরাও ভয় করত তাঁকে। পরিশেষে, এক ধরনের অতীন্দ্রিয়বাদী ধ্যানের মধ্যে উনি ডুবে গিয়েছিলেন — সেটাও সমান সুস্থির এবং সমান রাজকীয়... কিন্তু বিশ্বাস করবেন কী? ওঁর চেয়ে বেশি ব্যভিচারিনী আর কেউ ছিল না। ওঁর পরিপূর্ণ আস্থা অর্জনের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। অর্থাৎ আমি ছিলাম তাঁর গোপন, রহস্যময় প্রণয়ী। এমন চতুর ওস্তাদী কায়দায় আমাদের মিলনের ব্যবস্থা হত যে ওঁর বাড়ির লোকেদের পর্যন্ত তাতে এতটুকু সন্দেহ হত না। তার সমস্ত গোপন ব্যাপার জানত শুধু কেবল তাঁর দাসীটি — সুন্দর দেখতে একটি ফরাসী মেয়ে, কিন্তু তার

---

* তোফা আইডিয়া, বন্ধু হে। (ফরাসী ভাষায়)

ওপরে পরিপূর্ণ নির্ভর করা যেত। কারবারে সেও অংশ নিত — কীভাবে? সে কথা এখন বাদ দিচ্ছি। আমার মহিলাটির ইন্দ্রিয়-চর্চা ছিল এমনই যে, এমনকি মার্কুইস দে সাদ পর্যন্ত ওঁর কাছ থেকে পাঠ নিতে পারতেন। কিন্তু এ ইন্দ্রিয়-চর্চার সবচেয়ে তীব্র, সবচেয়ে প্রবল রোমাঞ্চ ছিল তার গোপনীয়তায়, প্রবঞ্চনার নির্লজ্জতায়। সমাজে কাউণ্টেস যেগুলোকে উন্নত, মহনীয়, অলঙ্ঘনীয় বলে প্রচার করতেন তার সবকিছুকে এই উপহাস, ভেতরে ভেতরে এই পৈশাচিক অট্টহাসি, যা পদদলিত করা চলে না, সজ্ঞানে তেমন সবকিছুকে পায়ে দলা — এবং তার কোনো সীমা না মানা, এবং তাকে এমন পর্যায়ে তোলা যা সবচেয়ে উত্তেজিত কল্পনাতেও ভাবা যায় না, এইটেই ছিল প্রধান, — পরিতৃপ্তির সবচেয়ে প্রকট বৈশিষ্ট্য। হ্যাঁ, মহিলাটি ছিলেন মূর্তিমতী পিশাচিনী, কিন্তু সে পিশাচিনী অদ্ভুত মোহিনী। এখনো তাঁর কথা ভাবলে উল্লাস বোধ না করে পারি না। অতি উদগ্র পরিতৃপ্তির ঠিক মাঝখানে উনি ভূতে পাওয়ার মতো হেসে উঠতেন হঠাৎ, সে হাসির মানে আমি বুঝতাম পুরোপুরি, আমিও হাসতাম... ভাবতে গেলে এখনো বুক ঢিপঢিপ করে, অথচ বহুবছর পেরিয়ে গেছে। একবছর পরে উনি আমায় পরিত্যাগ করেছিলেন। তখন ওঁর ক্ষতি করার ইচ্ছে হলেও আমি তা পারতাম না। কে বিশ্বাস করত আমায়? কী একখান চরিত্র, না? কী বলেন নওজোয়ান দোস্ত আমার?'

একান্ত বিতৃষ্ণায় এই কবুলতি শোনার পর জবাব দিলাম, 'ছ্যো — কী নীচতা!'

'অন্য জবাব যদি দিতেন তাহলে তো আমার নওজোয়ান দোস্তই হতেন না। জানতাম এই বলবেন। হা-হা-হা! একটু সবুর করুন প্রিয় বন্ধু, আর কিছু দিন বাঁচুন, তখন বুঝবেন, আপাতত আপনার পরমান্নই চলুক। না হে, না, এরপর আপনাকে আর কবি বলা চলে না। জীবন কী তা ঠিক বুঝেছিলেন মহিলাটি, তা কাজে লাগাতে পারতেন।'

'তাই বলে এমন পাশবিকতায় নামা কেন?'

'কিসের পাশবিকতা?'

'মহিলাটি যাতে নেমেছিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আপনিও।'

'ও, একেই আপনি পাশবিকতা বলছেন — তার মানে, ঠোঁট থেকে আপনার এখনো দুধের গন্ধ যায় নি। অবিশ্যি, একেবারে বিপরীত একটা দিকেও স্বাধীন-চিত্ততা প্রকাশ পেতে পারত তা আমি মানি... কিন্তু

আরো খোলাখুলি কথা বলা যাক বন্ধু... নিশ্চয় মানবেন যে, ওসব তো অর্থহীন।'

'কোনটা তাহলে অর্থহীন নয়?'

'অর্থহীন নয় ব্যক্তিত্ব — অহম্। সবকিছু আমার জন্যে, দুনিয়ার সৃষ্টি আমার জন্যে। শুনুন বন্ধু, এখনো আমার বিশ্বাস, দুনিয়ায় ভালোভাবেই দিন কাটানো সম্ভব। শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস হল এইটেই, কেননা এ বিশ্বাস ছাড়া খারাপভাবেও বাঁচা সম্ভব নয়: বিষপান ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না তাহলে। লোকে বলে জনৈক নির্বোধ নাকি তাই করেছিল। এমনই দার্শনিকতায় পেয়ে বসল তাকে যে সবকিছু সে নাকচ করতে শুরু করে, এমনকি স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ মানবিক কর্তব্যগুলোর বৈধতা পর্যন্ত, পরিশেষে কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না। যোগফল দাঁড়াল শূন্য। সুতরাং সে ঘোষণা করলে যে জীবনের সেরা জিনিস হল সায়ানাইড বিষ। আপনি বলবেন, এ হল হ্যামলেট, এ হল ভয়ংকর এক নৈরাশ্য, মোট কথা, মহনীয় এমন একটা কিছু যা আমাদের স্বপ্নেরও বাইরে। কিন্তু আপনি কবি এবং আমি হলাম সাধারণ মানুষ, সুতরাং আমি বলব, সাধারণ ব্যবহারিক দিক থেকে ব্যাপার-স্যাপার দেখা দরকার। আমি যেমন সবকিছু শেকল এমনকি বাধ্যবাধকতা থেকে অনেক দিন হল নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছি। বাধ্যবাধকতা আমার কাছে গ্রাহ্য শুধু তখনই যখন দেখি তা থেকে আমার কিছু লাভ ঘটতে পারে। আপনি অবশ্যই সেভাবে দেখতে পারবেন না, পায়ে আপনার শেকল, রুচি আপনার অসুস্থ। আদর্শের জন্যে, সাধুতার জন্যে আপনি ব্যাকুল। কিন্তু প্রিয় বন্ধু, আপনি যা বলবেন সব মানতে রাজী, কিন্তু কী আমার করার আছে যখন এ কথা নিশ্চিত বলে জানি যে, সমস্ত মানবিক সাধুতার মূলে রয়েছে অতি গভীর স্বার্থপরতা। ব্যাপারটা যত সাধু, স্বার্থপরতাও তত বেশি। আত্মপ্রেম — আমি স্বীকার করি এই একটি নিয়ম। জীবন হল একটা ব্যবসায়িক বেচা-কেনা, অযথা টাকা নষ্ট করবেন না, তবে, হ্যাঁ, খরচা করুন উপভোগের জন্যে, তাহলেই আত্মপরিজনের প্রতি আপনার কর্তব্য করা হবে। নৈতিকতা যদি একান্তই চান, তবে এই হল আমার নীতি, যদিও স্বীকার করছি যে আমার মতে আরো ভালো হয় আত্মপরিজনের জন্যে টাকা খরচ না করেই তাকে দিয়ে মুফতে নিজের কাজটা করিয়ে নেওয়া। আদর্শ আমার কিছু নেই এবং তা রাখতেও চাই না। কদাচ তার জন্যে কোনো ব্যাকুলতা বোধ করি নি। উঁচু সমাজে লোকে বিনা

আদর্শেই ভারি ফুর্তিতে চমৎকার জীবন কাটাতে পারে... এবং en somme*, সায়ানাইড বিষ ছাড়াই আমি চালাতে পারি বলে আমি খুব খুশি। আর একটু বেশি ভালোমানুষ হলে ঐ নির্বোধ দার্শনিকটির মতো (স্বভাবতই জার্মান) ও বিষ ছাড়া হয়ত আমার চলত না। না, না! ভালো জিনিস জীবনে এখনো প্রচুর। আমি ভালোবাসি প্রতিষ্ঠা, পদমর্যাদা, হোটেল, এবং তাসের খেলায় মস্ত বাজি ধরা (ভয়ংকর জুয়ার ভক্ত আমি)। কিন্তু সবার চেয়ে, সবচেয়ে ভালোবাসি মেয়েমানুষ... সবরকমের মেয়েমানুষ; এমনকি গোপন লাম্পট্যও আমার পছন্দ — যত অদ্ভুত আর মৌলিক ধরনের হবে ততই ভালো, বৈচিত্র্যের জন্যে একটু নোংরামিও চাই আর কি... হা-হা-হা! আপনার মুখ দেখে বুঝতে পারছি, কী ঘেন্নার চোখেই না আপনি চাইছেন আমার দিকে!'

জবাব দিলাম, 'ঠিকই বুঝেছেন।'

'কিন্তু ধরলাম আপনি ঠিক — তাহলেও অন্তত সায়ানাইড বিষের চেয়ে তো নোংরামিটা ভালো, তাই না?'

'আজ্ঞে না, বিষই ভালো।'

'"তাই না" জিজ্ঞেস করেছিলাম ইচ্ছে করেই, আপনার জবাবটা উপভোগ করব বলে, এ জবাব আসবে আগেই জানতাম। না হে বন্ধু, আপনি যদি সাঁচ্চা মানবপ্রেমিক হন তাহলে আপনার কামনা করা উচিত যেন সমস্ত বুদ্ধিমান লোকেরই রুচিটা হয় আমার মতো, এমনকি ওই নোংরামিটুকু থাকলেও, নইলে দুনিয়ায় বুদ্ধিমান লোকের করার কিছু থাকবে না, থাকবে শুধু নির্বোধেরা। তখন কী সৌভাগ্য তাদের! এখনি তো একটা বচন আছে যে নির্বোধরাই ভাগ্যবান। আর জানেন তো, বোকাদের মধ্যে বাস করা আর কথায় হ্যাঁ-হ্যাঁ করে যাওয়ার চেয়ে আনন্দের আর কিছু নেই: লাভ আছে তাতে! দেখছেন না যে কুসংস্কারের মূল্য দিই আমি, কতকগুলো মেনে-চলে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্যে চেষ্টা করছি। আমি তো দেখছিই যে এক ফাঁপা সমাজে বাস করছি, কিন্তু যতদিন আরামে আছি, তার মতামতে হ্যাঁ-হ্যাঁ করে যাব, দেখাতে চাইব যে আমি তার পক্ষে অটল হয়ে দাঁড়াব, কিন্তু বিপদ দেখলেই সর্বাগ্রে সে সমাজ পরিত্যাগ করব। আপনাদের আধুনিক আইডিয়াগুলো সব আমার জানা, যদিও তাতে কখনো পীড়িত হই নি,

---

* সাধারণভাবে। (ফরাসী ভাষায়)

পীড়িত হবার মতো তাতে কী আছে? কখনো কিছুতেই বিবেক দংশন আমার জাগে নি। আরামে থাকতে পেলে সবকিছু মানতে আমি রাজী, এবং আমার মতো লোক অসংখ্য, আর সত্যিই আছিও আমরা আরামে। দুনিয়ায় সবকিছু ধ্বংস পেতে পারে কেবল আমাদের কখনো ধ্বংস নেই। দুনিয়ার অস্তিত্বের দিন থেকে আমরা আছি। সারা বিশ্ব কোনো দিন ডুবতে পারে, কিন্তু আমরা, আমরা ভেসে উঠব ওপরে। প্রসঙ্গত, আমাদের মতো লোকেদের প্রাণশক্তির কথাটা অন্তত একটু ভেবে দেখুন। আমরা যে অসাধারণ রকমের দুর্মর; তাতে কখনো অবাক লাগে নি আপনার? তার মানে প্রকৃতি স্বয়ং আমাদের রক্ষা করে, হে-হে-হে! আমি চাই অবশ্য-অবশ্যই নব্বই বছর পর্যন্ত বাঁচতে। মৃত্যু আমি ভালোবাসি না, ভয় করি। শুধু শয়তানই জানে কীভাবে মরতে হবে। কিন্তু কী হবে এসব কথা বলে? এই বিষ-খাওয়া দার্শনিকটাই আমায় তাতিয়েছে। চুলোয় যাক গে দর্শন! পান করা যাক হে বন্ধু, শুরু করেছিলাম সুন্দরী মেয়েদের কথা... আরে যাচ্ছেন কোথায়?'

'আমি বাড়ি চললাম এবং আপনারও যাবার সময় হয়েছে...'

'হয়েছে! হয়েছে! আমার বলা যেতে পারে গোটা দিলখানা আপনার কাছে খুলে ধরলাম অথচ বন্ধুত্বের এত বড়ো প্রমাণটা যেন আপনি খেয়ালও করছেন না। হে-হে-হে! আপনার হৃদয়ে খুব একটা প্রীতি নেই কবি। কিন্তু দাঁড়ান, আর একটি বোতল আমার চাই।'

'তৃতীয় বোতল?'

'হ্যাঁ। এবং সাধুতার ব্যাপারে, তরুণ চেলা আমার (মিষ্টি এই নামে আপনাকে ডাকলে আপত্তি নেই তো? কে জানে হয়ত আমার এ শিক্ষা ভবিষ্যতে আপনার কাজেও লেগে যেতে পারে)... তাহলে, চেলা আমার, সাধুতার বিষয়ে আমি আগেই বলেছি: সাধুতা যত বেশি সাধু ততই তাতে স্বার্থপরতা। এ প্রসঙ্গে ভারি সুন্দর একটি গল্প আপনাকে বলতে চাই। একদা একটি তরুণীকে আমি ভালোবাসতাম এবং ভালোবাসতাম প্রায় সত্যি করেই। মেয়েটা আমার জন্যে খুব স্বার্থত্যাগ করেছিল...'

'যার টাকা মেরেছিলেন সেই মেয়েটি তো?' নিজেকে আর সংযত রাখতে না চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম রূঢ়ভাবে।

প্রিন্স চমকে উঠলেন, মুখখানা বদলে গেল ওঁর, আরক্তিম দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল আমার দিকে। চোখে ওঁর বিমূঢ়তা এবং আক্রোশ।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান।' বললেন যেন নিজের মনে মনেই, 'একটু ভেবে দেখতে দিন, সত্যিই মাতাল হয়ে গেছি আমি — সবটা ঠিক ধরতে পারছি না...'

একটু থেমে সেই একই বিদ্বেষের দৃষ্টিতে সন্ধানী চোখে চাইলেন আমার দিকে, আমার হাতটাও ধরে রেখেছিলেন যেন ভয় ছিল আমি চলে না যাই। আমার স্থির বিশ্বাস, সে মুহূর্তে উনি মনে মনে হাতড়াচ্ছিলেন, ধরবার চেষ্টা করছিলেন, এই যে ঘটনাটার কথা কেউ জানে না, সেটা আমি কোথা থেকে শুনতে পারি, এবং এতে ওঁর কোনো বিপদের আশঙ্কা আছে কিনা। এক মিনিট এমনি কাটল। তারপর হঠাৎ দ্রুত বদলে গেল ওঁর মুখখানা। ফের সেই ব্যঙ্গাত্মক নেশাতুর ফুর্তির ভাব ফুটে উঠল চোখে। হাসলেন।

'হা-হা-হা! একেবারে এক তালেরাঁ! তা, যখন ও আমার মুখের ওপর বলে দিলে যে আমি তার টাকা মেরেছি, তখন সত্যিই মুখে থুথু দেওয়া একটা লোকের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম ওর সামনে। কী চিল্লানি, কী গালাগালি! ভারি উগ্রচণ্ডী মেয়ে, এতটুকু সংযমও ছিল না। কিন্তু আপনি নিজেই বিচার করে দেখুন: প্রথমত, আপনি এখন যা বললেন, সেভাবে আদৌ ওর টাকা আমি মারি নি। টাকাটা ও নিজেই আমায় দিয়েছিল, সুতরাং সেটা আমারই টাকা। ধরুন আপনি আমায় আপনার সেরা ড্রেসকোটটা উপহার দিলেন' (কথাটা বলার সময় উনি আমার একমাত্র এবং বেশ কদাকার ড্রেসকোর্টটির দিকে নজর দিলেন, কোর্টটি আমায় করে দিয়েছিল তিন বছর আগে ইভান স্কর্নিয়াগিন নামে এক দর্জি), 'সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ, কোটটা পরছি, তারপর হঠাৎ একবছর পরে আপনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করে কোর্টটি ফেরত চেয়ে বসলেন, অথচ ইতিমধ্যে সেটি পরে পরে জীর্ণ। এটা ভালো নয়, তাহলে কেনই-বা দেওয়া? দ্বিতীয়ত, টাকাটা আমার হয়ে গেলেও নিশ্চয় তা আমি ফেরত দিতাম, কিন্তু হঠাৎ অত টাকা কোত্থেকে তখন পাই বলুন তো? তাছাড়া সবচেয়ে বড়ো কথা, যত সব শিলারবাদ আর রাখালিয়া পদাবলি আমি সইতে পারি না। সেকথা তো আপনাকে আগেই বলেছি — সেই হল সবকিছুর মূলে। ভাবতে পারবেন না, কী একখান পোজ দিয়েছিল মেয়েটা, চ্যাঁচালে যে টাকাটা সে আমায় দান করছে (সে তো আগেই আমার হয়েই আছে)। তখন রাগ হয়ে গেল আমার, আর হঠাৎ একেবারে ঠিকঠাক সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম, কেননা উপস্থিত বুদ্ধি আমি কখনো হারাই না। ভেবে দেখলাম, টাকাটা ফেরত দিলে আমি হয়ত ওকে অসুখী করে দেব; তাতে পুরোপুরি আমার জন্যেই অসুখী হয়ে থাকা আর সারা জীবন ধরে আমায় অভিশাপ

দেবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতাম ওকে। বিশ্বাস করুন বন্ধু, ঐ ধরনের দুঃখের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ ন্যায্য ও মহানুভব বলে মনে করে অন্যায়কারীকে পাষণ্ড বলে গাল দেবার একান্ত অধিকার পাবার খুব একটা দিব্যানন্দ থাকে। আক্রোশের এই দিব্যানন্দ অবশ্যই দেখা যায় এই ধরনের শিলারী স্বভাবের মানুষগুলোর মধ্যে। পরে হয়ত মেয়েটার অন্নও জোটে নি, কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা সে সুখীই ছিল। সে সুখ আমি কেড়ে নিতে চাই নি বলেই টাকাটা আর পাঠাই নি। এ থেকেও আমার ওই সূত্রটাই পুরোপুরি প্রমাণিত হচ্ছে — মানবিক মহানুভবতা যত উচ্চকণ্ঠ আর বৃহৎ, ন্যক্কারজনক স্বার্থপরতা তার মধ্যে ততই বেশি... সেটা কি আর আপনার কাছে পরিষ্কার নয়? অথচ... আমায় ল্যাং মারতে চেয়েছিলেন আপনি, হা-হা-হা!.. বলুন, খোঁচা মারতে চেয়েছিলেন... হায় রে তালেরা!'

'বিদায়,' বললাম উঠে দাঁড়িয়ে।

'এক মিনিট! উপসংহারের দুটি কথা!' সহসা ওঁর সেই জঘন্য সুর পালটে গুরুত্ব দিয়ে বলতে লাগলেন উনি, 'আমার শেষ কথাটা শুনে যান। যত কথা আপনাকে বলেছি তা থেকে পরিষ্কার ও অভ্রান্তরূপে দাঁড়ায় (আপনি নিজেও তা ধরতে পেরেছেন বলে আমার ধারণা) যে, কারো জন্যে, কখনো আমি নিজের স্বার্থটি ছাড়তে রাজী নই। টাকা আমি ভালোবাসি এবং তা আমার প্রয়োজন। কাতেরিনা ফিওদরোভনার অঢেল টাকা। ওর বাপের মদের ঠিকা ছিল, দশ বছর ধরে নিয়েছিল। তিরিশ লক্ষ টাকা ওর আছে, এবং এই তিরিশ লক্ষ আমার খুব কাজে লাগবে। আলিওশা আর কাতিয়ায় দুটিতে তোফা মিলবে। দু'জনেই ওরা ডাঁহা আহাম্মক, সেটাই আমার দরকার। তাই আমার অবধারিত বাসনা ও কামনা ওদের বিয়ে দেওয়া এবং যথাসত্বর। দু'তিন সপ্তাহের মধ্যে কাউণ্টেস এবং কাতিয়া গ্রামে যাচ্ছে। আলিওশাকে যেতে হবে ওদের সঙ্গে। নাতালিয়া নিকোলায়েভনাকে হুঁশিয়ার করে দেবেন যেন ওইসব রাখালিয়াপনা, শিলারপনা যেন না চালায়, আমার বিরুদ্ধতা যেন না করে। আমি বদরাগী লোক, প্রতিহিংসাপরায়ণ। নিজের স্বার্থ নিয়ে আমি লড়ব। ওকে আমার ভয় করার কিছু নেই, কোনো সন্দেহ নেই যে সবই হবে আমার মর্জিমতো। সুতরাং আগে থেকে ওকে এই যে সাবধান করে দিচ্ছি, সেটা বরং ওরই কথা ভেবে। দেখবেন যেন বোকামি না করে, বুদ্ধিমানের মতো যেন চলে। নইলে পস্তাতে হবে, ভয়ানক পস্তাবে। উচিতমতো আইনের আশ্রয় যে নিই নি, শুধু সেই জন্যেই তো বরং ওর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। জানেন

তো কবি, আইনে পারিবারিক শান্তিভঙ্গ নিষিদ্ধ, বাপের কাছে ছেলে যাতে বাধ্য থাকে, আইনে সে অধিকার দেওয়া আছে, মা-বাপের প্রতি পবিত্র কর্তব্য থেকে যারা সন্তানকে ফুসলিয়ে নিয়ে যায়, আইনে তাদের উৎসাহ দেওয়া হয় না। শেষত এও বুঝে রাখুন যে, ওসব মহলে আমার জানাশোনা লোক আছে, ওর নেই, এবং... সত্যিই কি বুঝতে পারছেন না, কী আমি ওর করতে পারি!? কিছু করি নি কারণ এ পর্যন্ত ও বিবেচকের মতোই আচরণ করেছে। ভাবনা নেই, গত ছয় মাস ধরে প্রতিটি মুহূর্ত, ওদের প্রতিটি গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখা হয়েছে। নিতান্ত খুঁটিনাটি পর্যন্ত সবই আমার নখদর্পণে। সেই জন্যেই আমি নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করেছি, আলিওশা নিজেই ওকে ছেড়ে যাবে। সেটা শুরু হচ্ছে, আপাতত ছেলের ওটা একটা মধুর ফুর্তির ব্যাপার। আমিও এদিকে ছেলের কাছে সদয় বাপ হয়ে রইলাম, এবং আমিও চাই যে ছেলে তা ভাবুক। হা-হা-হা! মনে পড়ছে, সেদিন সন্ধ্যেয় আমি মেয়েটিকে প্রায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে শুরু করেছিলাম, আলিওশাকে বিয়ে না করতে চেয়ে সে মহত্ত্ব ও স্বার্থহীনতা দেখাচ্ছে! কিন্তু, বিয়ে ও আর করবে কী করে শুনি! সে রাতে আমি যে ওর কাছে গিয়েছিলাম, সে শুধু একমাত্র এইজন্যে যে সম্পর্কছেদের সময় এসেছিল। তবু স্বচক্ষে সবটা দেখে নিজের অভিজ্ঞতায় নিঃসন্দেহ হবার দরকার ছিল আমার... যাক, শুনলেন তো সব? নাকি এও জানতে চান, কেন আপনাকে আমি এখানে এনেছি, আপনার কাছে কেন এমন ন্যাকামি করলাম, এমন খোলাখুলি স্বীকারোক্তি ছাড়াও যখন এটা বলা সম্ভব, তখন আপনার কাছে কেন এমন করে স্বরূপ দেখাতে গেলাম, তাই না?'

'হ্যাঁ।' নিজেকে সংযত করে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম; জবাব দেবার আর কিছু ছিল না।

'তার কারণ বন্ধুবর, শুধু এই যে আমাদের ঐ দুটি মূর্খের তুলনায় আপনার মধ্যে কিছু বেশি কাণ্ডজ্ঞান আর পরিষ্কার দৃষ্টিশক্তি আমার নজরে পড়েছে। আমি লোকটা কেমন তা আপনি হয়ত আগেই জেনে থাকতে, আন্দাজ করতে, আমার সম্পর্কে একটা ধারণা করে থাকতে পারেন, কিন্তু ইচ্ছে হল, সে ঝামেলা থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে দিই, ঠিক করলাম কার পাল্লায় পড়েছেন সেটা পষ্টাপষ্টি দেখুন। বাস্তব অভিজ্ঞতাটা বড়ো জিনিস। বুঝেছেন বন্ধুবর, আপনি জানলেন কার সঙ্গে লড়তে হবে, নাতালিয়া নিকোলায়েভনাকে আপনি ভালোবাসেন, তাই আশা করি অতঃপর কিছু

অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে মেয়েটিকে বাঁচাবার জন্যে আপনার সমস্তটুকু প্রভাব কাজে লাগাবেন (আর মেয়েটির ওপর আপনার তো প্রভাব আছেই)। নইলে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঠেকানো যাবে না, এবং আপনাকে বলছি, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে সেটা নিতান্ত একটা তামাসা নয়। পরিশেষে, আপনার সঙ্গে আমার এই অকপটতার তৃতীয় কারণ হল... (কিন্তু নিশ্চয় সেটা আপনি আন্দাজ করেছেন বন্ধুবর), হ্যাঁ, সত্যিই আমার ইচ্ছে হয়েছিল সমস্ত ব্যাপারটার ওপর একটু থুতু ফেলা যাক এবং তা করা যাক ঠিক আপনার চোখের সামনেই...'

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বললাম, 'এবং সে সাধ আপনি মিটিয়েছেন। মানতে বাধ্য যে এই ধরনের আত্মপ্রকাশ ছাড়া আমার ওপর এবং আমাদের সকলের ওপর আপনার ঘেন্না বিদ্বেষ আর কিছুতেই দেখাতে পারছেন না। আপনার সে অকপটতায় আমার চোখে খাটো হয়ে যাবার ভয় তো দূরের কথা, লজ্জাও হয় নি আপনার... সত্যিই সেই আলখাল্লা-পরা পাগলাটার মতোই কাজ করছেন আপনি। আমায় মানুষ বলেই আপনি ধরছেন না।'

'ঠিক বুঝেছেন যুবাবন্ধু,' উঠে দাঁড়িয়ে উনি বললেন, 'সবই ঠিক ধরেছেন। আপনি যে লেখক সেটা তো অকারণে নয়। আশা করি বন্ধুর মতোই বিদায় নিচ্ছি আমরা। ইয়ারী টোস্ট্ তো আর পান হবে না?'

'আপনি মাতাল, উপযুক্ত জবাব যদি আপনাকে না দিয়ে থাকি তবে তা শুধু এইজন্যেই...'

'ফের কথা উহ্য রইল — কী জবাব দেওয়া উচিত ছিল তা বললেন না, হা-হা-হা! আপনার খাবারের দামটা আমায় দিতে দেবেন না নিশ্চয়।'

'ব্যস্ত হবেন না, আমি নিজেই দেব।'

'তাতে সন্দেহ নেই। আমরা কি একদিকেই যাচ্ছি?'

'না, আপনার সঙ্গে নয়।'

'বিদায় কবিবর, আশা করি আমায় বুঝতে পেরেছেন...'

বেরিয়ে গেলেন প্রিন্স, পা ফেলছিলেন খানিকটা বেসামালের মতো, আমার দিকে আর ফিরে তাকালেন না। সহিসের সাহায্যে গাড়িতে উঠলেন। আমি নিজের পথ ধরলাম। রাত দুটো বেজে গেছে। বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার রাত...

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

কী যে বিদ্বেষ অনুভব করেছিলাম, তার বর্ণনা দেব না। এসবই আশাতীত না হলেও হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ যেন লোকটা তার সমস্ত কদর্যতায় আবির্ভূত হল আমার সামনে। তবে মনে আছে, আমার অনুভূতিগুলো কেমন ঘোলাটে হয়ে উঠেছিল, যেন ঘা খেয়েছি, বিপর্যস্ত হয়ে গেছি, বুকের মধ্যে একটা অন্ধকার যন্ত্রণা কুরে কুরে খাচ্ছিল। নাতাশার কথা ভেবে ভয় পেয়েছিলাম। টের পাচ্ছিলাম, ভবিষ্যতে ওর কপালে অনেক কষ্ট আছে, কী করে তা এড়াই, সমস্ত ব্যাপারটার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির আগের মুহূর্তগুলোকে কী করে একটু কোমল করে দিই, তাই নিয়ে এলোমেলো দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। চূড়ান্ত সে নিষ্পত্তির ব্যাপারে সন্দেহ ছিল না। তা কাছিয়ে আসছে এবং তা যে কী রূপ নেবে সেটাও আন্দাজ না করা অসম্ভব নয়!

সারা রাস্তা বৃষ্টিতে ভিজেছি। কী করে বাড়ি ফিরলাম খেয়াল ছিল না। ভোর তখন তিনটে। ঘরের দরজায় টোকা দিতেই একটা গোঙানি কানে এল, এবং দ্রুত দরজা খুলে গেল। মনে হল যেন নেল্লী না ঘুমিয়ে সারা রাত আমার জন্যে ঠিক দরজার কাছেই অপেক্ষা করে থেকেছে। মোমবাতি জ্বলছিল। নেল্লীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেলাম; একেবারে বদলে গিয়েছে সে। চোখদুটো ওর জ্বলছে অসুস্থের মতো, দৃষ্টি এমন উদ্‌ভ্রান্ত যেন আমায় চিনতেই পারছে না। ভয়ানক জ্বর এসেছে ওর।

ওর দিকে নুয়ে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, 'নেল্লী, কী ব্যাপার, অসুখ করেছে?'

কী যেন একটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ও আমার কাছে ঘেঁষে এল, তাড়াতাড়ি দমকে দমকে কী যেন বলতে শুরু করলে, যেন এই কথাগুলো

বলবার জন্যেই ও এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। কিন্তু সেকথা ওর অসংলগ্ন আর অদ্ভুত। আমি কিছুই বুঝলাম না। ভুল বকছিল নেল্লী।

তাড়াতাড়ি করে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। কিন্তু আমায় ও ছাড়তে চাইলে না, শক্ত করে আঁকড়ে রইল যেন ভয় পেয়েছে কিছু, যেন অনুনয় করছে কিছু থেকে ওকে রক্ষা করতে। পাছে আমি ফের চলে যাই এই ভয়ে বিছানায় শুয়েও ও আমার হাতখানা আঁকড়ে ধরে রইল সজোরে; স্নায়ুগুলো আমার এত বিকল হয়ে পড়েছিল যে ওর দিকে তাকিয়ে সত্যি করেই চোখে জল এসে পড়ল আমার। নিজেও আমি সুস্থ ছিলাম না। আমার চোখে জল দেখে নেল্লী স্থির হয়ে এক দৃষ্টিতে বহুক্ষণ চেয়ে রইল আমার দিকে। কী যেন একটা বোঝার, কী যেন একটা ধরবার চেষ্টায় মনোযোগ ওর তীব্র হয়ে উঠল। বোঝা যাচ্ছিল, তাতে খুবই কষ্ট হচ্ছে ওর। শেষ পর্যন্ত ওর মুখে চেতনার মতো খানিকটা আভাস জাগল, ভয়ানক রকমের, এক একটা ফিটের পর সাধারণত ও বেশ কিছু সময় ধরে পরিষ্কার করে কিছু ভাবতে কিংবা স্পষ্ট করে কথা বলতে পারত না। এবারেও সেই হয়েছে। আমাকে কী একটা বলবার জন্যে প্রচণ্ড চেষ্টা করলে ও। কিন্তু টের পেলে আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তখন ছোট্ট হাতখানা বাড়িয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিলে, আমার গলা জড়িয়ে ধয়ে কাছে টেনে এনে চুমু খেতে লাগল।

বোঝা গেল, আমি যখন ছিলাম না তখন ফিট হয়েছিল ওর। সেটা হয়েছিল ঠিক সেই মুহূর্তে যখন ও দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে। ফিট কেটে যাবার পরেও বোধ হয় বহুক্ষণ ধরে ওর জ্ঞান হয় নি। এইসব সময় বিকারের সঙ্গে বাস্তব গুলিয়ে যায় এবং নিশ্চয় কিছু একটা সাংঘাতিক, কিছু একটা ভীতি ওকে পেয়ে বসেছিল। সেই সঙ্গে আবছাভাবে ওর এই জ্ঞানটুকু ছিল যে আমি শিগ্‌গিরই ফিরে এসে দরজায় টোকা দেব। তাই ঠিক দোরগোড়ায় মেঝের ওপর শুয়ে শুয়ে উৎকর্ণ হয়ে ও আমার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করেছে, প্রথম টোকাটা শুনেই উঠে দাঁড়িয়েছে।

"কিন্তু দরজার কাছে ওকে যেতে হয়েছিল কেন?" অবাক হয়ে ভাবছিলাম। হঠাৎ আশ্চর্য লাগল এই দেখে যে ওর গায়ে ওভারকোট (এক চেনা বুড়ি ফিরিওয়ালীর কাছ থেকে জিনিসটা আমি ওকে সবে কিনে দিয়েছিলাম — বুড়িটা আমার বাসায় এসে প্রায়ই ধারে জিনিস বেচে যেত)। তাহলে নিশ্চয় ও বাইরে কোথাও যাবার আয়োজন করছিল। খুব সম্ভব দরজাটা খোলার

পরই হঠাৎ ফিট হয়। কিন্তু যাচ্ছিল কোথায়? তখনও কি বিকারের মধ্যে ছিল ও?

এদিকে কিন্তু জ্বরের তাপ ওর কমছিল না। অচিরেই ফের অচৈতন্য হয়ে বিকার শুরু হল। আমার বাসায় ইতিমধ্যেই ওর দু'বার ফিট হয়েছে, কিন্তু ভালোয় ভালোয় তা কেটে গেছে। এবার কিন্তু ওর গা যেন আগুন। আধ ঘণ্টাখানেক ওর পাশে বসে থাকার পর সোফার কাছে কতকগুলো চেয়ার টেনে আনলাম, তারপর যেমন পোশাক পরা ছিল তেমনি অবস্থাতেই শুয়ে পড়লাম ওর কাছাকাছি, ও ডাকলেই যাতে জেগে উঠতে পারি। বাতিটা আর নেভালাম না। ঘুমিয়ে পড়ার আগে বহুবার ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মেয়েটা। জ্বরে শুকিয়ে গেছে ঠোঁটদুটো, তাতে রক্তের দাগ, নিশ্চয় পড়ে গিয়েছিল বলে। মুখখানায় তখনো আতঙ্ক আর কেমন একটা তীব্র যন্ত্রণার ছাপ মিলায় নি, — মনে হয় যেন ঘুমের মধ্যেও সেটা ছেড়ে যাচ্ছে না। যদি ওর অবস্থা আরো খারাপ হয় তাহলে যত সকালে পারি গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনব বলে ঠিক করলাম। ভয় হয়েছিল, সত্যি করেই জ্বর শুরু হয়ে না যায়।

মনে হল প্রিন্সকে দেখেই ও ভয় পেয়েছে! সে কথা ভেবেই শিউরে উঠলাম। প্রিন্সের মুখের ওপর সেই যে মেয়েটা তার টাকা ছুঁড়ে মেরেছিল, সে কাহিনীটা মনে পড়ল আমার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

...দুই সপ্তাহ কেটে গেল। নেল্লী ভালো হয়ে উঠছিল। জ্বর ছিল না, তবে অসুস্থ হয়েছিল বেশ গুরুতর। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এপ্রিলের শেষে এক ঝকমকে রোদের দিনে। তখন পূত সপ্তাহ পরব চলছিল।

আহা বেচারী! আগের ধারায় গল্পটা বলা আর আমার হয়ে উঠছে না। আমি এখন যখন এসব ঘটনা লিখছি তার আগে অনেক দিন কেটে গেছে, কিন্তু আজো পর্যন্ত একটা দুঃসহ মর্মভেদী কষ্ট অনুভব করি যখন মনে পড়ে ওর সেই শীর্ণ বিবর্ণ ছোট্ট মুখখানার কথা, ওর সেই কালো চোখের তীক্ষ্ন একাগ্র দৃষ্টি; আমরা যখন একলা থাকতাম, ও আর আমি, তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে বহুক্ষণ বহুক্ষণ ধরে চেয়ে থাকত আমার দিকে, যেন আমায় ডাক দিত আন্দাজ করতে ও কী ভাবছে; কিন্তু যখন দেখেছে যে আমি

ধরতে পারছি না, আগের মতোই অবুঝ হয়ে আছি, তখন আস্তে করে হেসেছে যেন নিজের মনেই, তারপর হঠাৎ তার তপ্ত ছোট্ট হাতখানার রোগা রোগা শুকিয়ে ওঠা আঙুলগুলো স্নেহাতুরের মতো বাড়িয়ে দিয়েছে আমার দিকে। এখন সবকিছুই শেষ হয়ে গেছে, সবকিছুরই ব্যাখ্যা মিলেছে, তবু আজো পর্যন্ত ওই রুগ্ন নিপীড়িত আহত ছোট্ট বুকখানার সব রহস্য জানি না আমি।

বুঝতে পারছি প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি, কিন্তু এই মুহূর্তে ভাবতে ইচ্ছে হচ্ছে শুধু নেল্লীরই কথা। আশ্চর্য, অত করে তীব্রভাবে যাদের ভালো বেসেছিলাম তাদের সবার কাছেই পরিত্যক্ত আমি যখন একটা হাসপাতালের শয্যায় পড়ে আছি একা, তবু হঠাৎ সেই অতীতের এমন কয়েকটা তুচ্ছ ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে যা তখন নজরেই আনি নি, যা তখন অচিরেই ভুলে গেছি, অথচ এখন তা স্মৃতিতে একটা একেবারেই অন্য মানে নিয়ে হাজির হচ্ছে, মানেটা সম্পূর্ণ হচ্ছে, একটু আগে পর্যন্ত যা বুঝি নি তা পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

নেল্লীর অসুখের প্রথম চারদিন আমরা, ডাক্তার আর আমি, ভয়ানক ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। পঞ্চম দিনে ডাক্তার আমায় পাশে ডেকে নিয়ে বললেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই, ও নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবে। এ ডাক্তারটি আমার সেই বহুদিনের চেনা ডাক্তার, চিরকুমার বৃদ্ধ, পাগলাটে এবং ভালোমানুষ গোছের। নেল্লীর প্রথম অসুখের সময় ওঁকেই ডেকেছিলাম। তাঁর গলায় সেই বিরাট স্তানিস্লাভ পদক দেখে নেল্লী ভারি অবাক হয়ে গিয়েছিল।

স্বস্তি পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে ভয়ের কোনোই কারণ নেই?'

'হ্যাঁ, এবারে ও ভালো হয়ে যাবে, তারপরে মারা যাবে শিগ্‌গিরই।'

'মারা যাবে মানে? কেন?' মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম।

'হ্যাঁ, শিগ্‌গিরই মারা যাবে তা নিশ্চয়। রোগীর হার্টের একটা দোষ আছে এতটুকু প্রতিকূল পরিস্থিতি হলেই ও ফের অসুখে পড়বে। হয়ত আবার ভালো হয়ে উঠবে, কিন্তু ফের শয্যা নিতে হবে এবং পরিশেষে মৃত্যু।'

'সত্যিই কি কোনোরকমে বাঁচানো যায় না ওকে? এ যে হতে পারে না!'

'কিন্তু তাই হবে। তবে প্রতিকূল পরিস্থিতি যদি দূর করা যায়, শান্ত চুপচাপ জীবন আর তাতে আরো আনন্দের উপকরণ থাকলে মরণ হয়ত

ঠেকিয়ে রাখা যায়, অপ্রত্যাশিত... অস্বাভাবিক এবং অদ্ভুত... দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় বৈকি... মোটের ওপর অনেক অনুকূল পরিস্থিতির যোগাযোগে রোগী রক্ষাও পেতে পারে বটে, কিন্তু পুরোপুরি ভালো হয়ে যাওয়া, সে কদাচ নয়।'

'কিন্তু তাহলে কী করি এখন?'

'আমার পরামর্শ মেনে চলুন, ও যেন শান্ত জীবনযাপন করে, পাউডারগুলো যেন নিয়মিত খায়। লক্ষ্য করে দেখেছি মেয়েটি খামখেয়ালী, মেজাজটা অস্থির, উপহাসে ভারি ঝোঁক। নিয়মিত পাউডার খেতে ওর খুব আপত্তি, আজ তো একেবারেই না করে দিয়েছে।'

'ঠিকই ডাক্তার। অদ্ভুত গোছের ও বটে, কিন্তু সেটা ওর ওই অসুস্থ খিটখিটানির জন্যে বলে আমার ধারণা। কাল বেশ কথা শুনেছে। কিন্তু আজ ওষুধ দিতেই চামচেটা ও ঠেলে দিলে যেন আচমকা, ইচ্ছে করে নয়। ওষুধ সব পড়ে গেল। ফের পাউডার তৈরি করছি, ও হঠাৎ বাক্সটা কেড়ে নিয়ে মেঝেয় ছুড়ে ফেলে দিয়ে তারপর কেঁদে ফেললে... কিন্তু জোর করে পাউডার খাওয়াতে গেছি বলেই যে ও এমন করল তা বোধ হয় নয়।' বললাম এক মিনিট ভেবে।

'হুঁ খিটখিটে মেজাজ! ওর ওই অতীতের দুর্ভাগ্যগুলো সব জট পাকিয়েছে এবং তাই থেকেই অসুখটা।' (নেল্লীর ইতিহাসের অনেককিছু আমি ডাক্তারকে বিস্তারিতভাবে খোলাখুলি সব বলেছিলাম, শুনে উনি খুব অবাক হয়েছিলেন।) 'আপাতত একমাত্র করণীয় পাউডারগুলো খাওয়া, পাউডার ওকে খেতে হবে। আমি আর একবার ওকে বোঝাবার চেষ্টা করব যে চিকিৎসকের নির্দেশ পালন করা এবং... মোটের ওপর বলতে গেলে... পাউডারগুলো খাওয়া ওর কর্তব্য।'

রান্নাঘর থেকে আমরা দুজনেই বেরিয়ে এলাম (সেখানেই আলাপ হচ্ছিল আমাদের)। ডাক্তার ফের রোগীর বিছানার কাছে গেলেন। কিন্তু আমাদের কথা মনে হয় নেল্লীর কানে গেছে, অন্তত বালিশ থেকে মাথা তুলে আমাদের দিকে কান খাড়া করে ও শোনার চেষ্টা করেছিল। আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে তা আমার নজরে পড়েছিল, কিন্তু ফের যখন আমরা ওর কাছে গেলাম তখন দুষ্টুটা সুড়ুৎ করে আবার কম্বলের তলে ঢুকে আমাদের দিকে তাকালে একটা উপহাসের হাসি নিয়ে। অসুখের এই চার দিনেই বেচারী খুব রোগা হয়ে পড়েছে: চোখ বসে গেছে, জ্বর তখনো ছাড়ে নি। তাই

মুখের ওই দুষ্টু-দুষ্টু ভাব এবং চিকচিকে দুরন্ত যে দৃষ্টি দেখে ডাক্তারটি — পিটার্সবুর্গের জার্মানদের মধ্যে সবচেয়ে ভালোমানুষটি — অত অবাক হয়েছিলেন, সেটা সত্যিই অদ্ভুত মানিয়েছিল ওর মুখে।

গম্ভীর চালে, যদিও গলার স্বর যথাসাধ্য কোমল করে ডাক্তার মিষ্টিভাবে সস্নেহে বোঝাতে লাগলেন পাউডারগুলো কত প্রয়োজনীয়, কত উপকারী, রুগ্ন লোকের পক্ষে তা খাওয়া কতটা অবশ্যকর্তব্য। নেল্লী মাথা তুলছিল, কিন্তু হঠাৎ হাতের যেন একটা আচমকা ধাক্কা লেগেই চামচের সমস্ত ওষুধটা ফের মেঝেতে পড়ে গেল। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, ওটা ও করলে ইচ্ছে করেই।

'এটা খুবই বিছছিরি অসতর্কতা,' বৃদ্ধ বললেন শান্তভাবে, 'সন্দেহ হচ্ছে আপনি ইচ্ছে করেই করেছেন, সেটা কিন্তু ভারি অন্যায়। যাই হোক... আর একটা পাউডার তৈরি করা যাক।'

নেল্লী সোজাসুজি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

ডাক্তার আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।

আর একটা পাউডার বানিয়ে বললেন, 'খুব খারাপ, ভারি, ভারি অন্যায়।'

'রাগ করবেন না,' হাসি চাপার বৃথা চেষ্টা করতে করতে নেল্লী বললে, 'নিশ্চয়ই খাব... কিন্তু আমায় ভালোবাসেন আপনি?'

'যদি ভালোভাবে চলেন তাহলে খুব ভালোবাসব।'

'খুব?'

'খুব।'

'আর এখন ভালোবাসছেন না?'

'এখনো ভালোবাসি।'

'আপনাকে চুমু দিতে চাইলে আপনি চুমু খাবেন আমায়?'

'খাব যদি খাবার মতো কাজ করো।'

এ কথায় নেল্লী আর নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে ফের হেসে উঠল।

'রোগীটি বেশ ফুর্তিবাজ কিন্তু এখন এ তো শুধু ওর খামখেয়াল, নার্ভের ব্যাপার।' ভারি গম্ভীর ভাব করে ডাক্তার আমায় বললেন ফিসফিসিয়ে।

দুর্বল ক্ষীণ কণ্ঠে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল নেল্লী, 'বেশ, পাউডার আমি খাব। কিন্তু আমি যখন বড়ো হব তখন বিয়ে করবেন আমায়?'

নতুন এই দুষ্টুমির খেয়ালে ভারি খুশি মনে হল নেল্লীকে; চোখদুটো ওর বেশ জ্বলজ্বল করে উঠল, ঈষৎ বিমূঢ় ডাক্তার জবাবে কী বলে শোনার আশায় ঠোঁট কেঁপে উঠল হাসিতে।

'বেশ করব,' নতুন এই খামখেয়ালে অনিচ্ছাতেও হেসে ফেলে বললেন ডাক্তার, 'করব যদি আপনি বেশ একটি সদয় সভ্যভব্য তরুণী হয়ে ওঠেন, কথা শোনেন আর...'

'পাউডার খাই?' যোগ করলে নেল্লী।

'এই তো চাই। নিশ্চয়ই — পাউডারটা খান। লক্ষ্মী মেয়ে,' ডাক্তার ফের ফিসফিসিয়ে জানালেন আমায়, 'বেশ চালাকচতুর, লক্ষ্মী... কিন্তু বিয়ে... খেয়াল বটে অদ্ভুত...'

ওষুধটা ফের নিয়ে গেলেন উনি। এবার আর কোনো ভান করলে না নেল্লী, সোজাসুজি চামচের তলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে, বেচারি ডাক্তারের মুখে চোখে শার্টফ্রণ্টে ওষুধটা গিয়ে লাগল। জোরে হেসে উঠল নেল্লী, কিন্তু তাতে ঠিক সেই আগের মতো সরল ভালোমানুষি ফুর্তির হাসি নেই। মুখে ওর একটা নিষ্ঠুর বিদ্বেষের ঝলক খেলে গেল। এই সমস্তটা সময় ও যেন আমার দৃষ্টি এড়াতে চাইছিল, তাকাচ্ছিল কেবল ডাক্তারের দিকে উপহাসের হাসি নিয়ে, সে হাসির মধ্যে উঁকি মারছিল একটা অস্থিরতা, মজার এই বুড়োটা কী করবে তার অপেক্ষা করছিল।

'আহা, ফের ওই করলেন... কী দুর্ভাগ্য! কিন্তু... ফের আর এক পুরিয়া ওষুধ বানিয়ে দেওয়া যায়!' রুমাল দিয়ে মুখ আর শার্ট মুছে নিয়ে ডাক্তার বললেন।

নেল্লীর পক্ষে এটা ভয়ানক আশ্চর্য লাগল। ভাবছিল রাগ হবে আমাদের, বকাঝকা শুরু করব এবং অজ্ঞাতসারে সেই মুহূর্তে হয়ত সে শুধু এইটেই চাইছিল যাতে একটু কাঁদবার, হিস্টিরিয়া-গ্রস্তের মতো ডুকরে ওঠার অজুহাত পায়, আগের মতো ফের পাউডারগুলো ছড়িয়ে ফেলে রাগে কিছু একটা ভেঙে চুরে তার ব্যথাতুর খেয়ালী হৃদয়টুকুকে হালকা করতে পারে। শুধু যে রুগ্নের মধ্যে, শুধু যে নেল্লীর মধ্যেই এমন খেয়াল দেখা যায় তা নয়। ঘরময় পায়চারি করতে করতে কতবার তো আমারও একটা অচেতন ইচ্ছে হয়েছে কেউ আমায় অপমান করুক, অন্তত এমন কথা বলুক যেটা আমি অপমান বলে নিয়ে কিছুর ওপরে যেন আমার মনের ঝাল ঝাড়তে পারি। মেয়েরা এইভাবে ঝাল ঝাড়তে গিয়ে কেঁদে ফেলে, সে কান্না আন্তরিক কান্না, ওদের মধ্যে যারা বেশি আবেগপ্রবণ তাদের হিস্টিরিয়া পর্যন্ত শুরু হয়ে যায়। এটা খুব সাধারণ ব্যাপার, রোজকার ঘটনা এবং ঘটে বেশির ভাগ সেই

ক্ষেত্রে যখন বুকের মধ্যে এমন একটা দুঃখ আছে যা জানে না কেউ, সেকথা বলার ইচ্ছে হয়, অথচ কাউকে বলা যাচ্ছে না।

কিন্তু অপমানিত বৃদ্ধের দেবোপম দয়া আর বিনা তিরস্কারে আর একটি পুরিয়া বানাতে বসার ধৈর্যে অভিভূত হয়ে নেল্লী হঠাৎ চুপ করে গেল। পরিহাসের হাসিটা মিলিয়ে গেল ঠোঁট থেকে, রাঙা হয়ে উঠল মুখ, সজল হয়ে উঠল চোখ। আমার দিকে একবার চকিতে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলে। ডাক্তার ওষুধটা দিলেন। ও খেলে বাধ্যের মতো, ভীরু-ভীরু ভাবে, তারপর বৃদ্ধের লালচে ফুলো ফুলো হাতখানা নিয়ে আস্তে করে ওর মুখের দিকে তাকালে।

'আপনি... রাগ করেছেন আমি বদরাগী বলে...' ও বলতে শুরু করেছিল, কিন্তু শেষ না করেই কম্বলের তুলে ঢুকে মাথা গুঁজে সশব্দে হিস্টিরিয়ার মতো ডুকরে উঠল।

'ছি, ছি মেয়ে, কাঁদতে নেই... ওটা কিছু নয়... নার্ভের ব্যাপার আর কি। একটু জল খান।'

কিন্তু নেল্লীর কানে কিছু ঢুকছিল না।

'শান্ত হোন, বিচলিত হতে নেই,' ডাক্তার বলে চলল ওর ওপর ঝুঁকে, প্রায় নাকি কান্নায়, কেননা খুব আবেগপ্রবণ লোক ছিলেন উনি, 'কিছু মনে করব না আমি; বিয়েও করব যদি লক্ষ্মী মেয়ের মতো বেশ ভালো ব্যবহার করে...'

'পুরিয়াগুলো খাই,' ছোট্ট একটা স্নায়বিক হাসির সঙ্গে কম্বলের তল থেকে বেরিয়ে এল কথাগুলো। ঘণ্টির ক্ষীণ শব্দের মতো সে হাসিটা বেজে উঠে ভেঙে গেল ফোঁপানিতে — এ হাসি আমার খুব চেনা।

'ভালো, কৃতজ্ঞ মেয়ে!' ডাক্তার বললেন বিজয়ের সুরে, দুচোখে তাঁর প্রায় জল এসে গেছে, 'বেচারি!'

সেদিন থেকে ডাক্তার আর নেল্লীর মধ্যে একটা আশ্চর্য এবং বিচিত্র ধরনের ভালোবাসা গড়ে উঠল। ওদিকে আমার সঙ্গে ব্যবহারে নেল্লী কিন্তু ক্রমেই গোমড়া, মেজাজী আর খিটখিটে হয়ে উঠতে লাগল। কারণটা কী বুঝে না পেয়ে শুধু অবাক লাগত, বিশেষ করে এই জন্যে যে বদলটা একেবারে হঠাৎ। অসুখের প্রথম কয়েকটা দিন আমার প্রতি ওর ছিল অসাধারণ একটা কোমলতা আর স্নেহ, মনে হত যেন আমায় দেখে দেখে ওর আশ মিটছে না, কাছ-ছাড়া করতে চাইত না, জ্বরতপ্ত ছোট্ট হাতটুকু দিয়ে আমার হাত ধরে

টেনে বসাত ওর পাশে; আমার মুখ ভার কি দুশ্চিন্তা চোখে পড়লে খুশি করে তোলার চেষ্টা করত — তামাসা করত, খুনসুটি করত, নিজের কষ্টটা চেপে রেখে হাসত। চাইত না আমি রাত্রে কাজ করি কিংবা বসে বসে ওকে আগলাই। ওর কথা শুনছি না দেখে কষ্ট পেত। মাঝে মাঝে দেখতাম মুখে ওর একটা দুশ্চিন্তার ছায়া। প্রশ্ন করে করে জানতে চাইত কেন আমার মন খারাপ, কী ভাবছি। কিন্তু ভারি অবাক লাগত যে নাতাশার কথা উঠলেই ও চুপ করে যেত, নয়ত অন্যকিছু একটা বলতে শুরু করত। নাতাশার কথা ও যেন এড়াতে চাইত, তাতে অবাক লাগত আমার। আমি বাড়ি ফিরলে ও খুশি হয়ে উঠত, কিন্তু যেই বেরুবার জন্যে টুপি পরতাম, অমনি বিষণ্ণভাবে, কেমন যেন অদ্ভুত অনুযোগের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত আমার দিকে।

ওর অসুখের চতুর্থ দিনটায়, আমি সারা সন্ধ্যেটা কাটিয়েছিলাম নাতাশার কাছে, ছিলাম রাত দুপুরেরও বেশি। আলাপ-আলোচনার মতো অনেককিছু ছিল। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় আমার রোগীটিকে বলে গিয়েছিলাম তাড়াতাড়ি ফিরব, ভেবেওছিলাম তাই। খানিকটা ঘটনাচক্রে নাতাশার ওখানে আটকে গেলেও নেল্লী সম্পর্কে মনে আমার দুশ্চিন্তা ছিল না, কেননা নেল্লীকে একা থাকতে হয় নি। আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা ওর কাছে ছিল। মাসলবোয়েভ একবার কিছুক্ষণের জন্যে আমার কাছে এসেছিল, তার কাছ থেকে আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা শুনেছিল নেল্লী অসুস্থ এবং আমি নানা ঝামেলায় একা পড়েছি। বাপ্‌রে, কী হৈচৈ না শুরু করেছিল ভালোমানুষ আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা।

'তাহলে, এখন আর উনি আমাদের এখানে নেমন্তন্নেও আসবেন না!.. পোড়া কপাল! বেচারি একেবারে একা পড়েছেন, একেবারে একা! বেশ, এখন তাহলে উনি দেখুন আমাদের আন্তরিকতা। সুযোগ যখন পেয়েছি তা ছাড়া চলবে না।'

তৎক্ষণাৎ আমাদের ওখানে এসে হাজির হল আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা, গাড়ি করে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল মস্তো এক পোঁটলা। প্রথমেই এসে ঘোষণা করলে যে সে এখান থেকে যাবে না, এসেছে আমার ঝামেলায় সাহায্য করার জন্যে, পুঁটলি খুললে। তাতে ছিল সিরাপ, রোগীর খাবার মতো জ্যাম; রোগী হয়ত-বা ভালো হয়ে উঠতে থাকবে সেই ভেবে মুরগী আর মুরগীছানা; ছিল ঝলসে খাবার মতো আপেল, কমলালেবু এবং কিয়েভের শুকনো মোরব্বা (ডাক্তার যদি তাতে আপত্তি না করেন) এবং পরিশেষে ছিল

অন্তর্বাস, বিছানার চাদর, টেবিলের তোয়ালে, নৈশ-গাউন, ব্যাণ্ডেজ, কমপ্রেস — গোটা একটা হাসপাতালের মতো সরঞ্জাম।

'সব জিনিসই তো আমাদের রয়েছে,' যেন ভয়ানক একটা তাড়া আছে এমনি ভাব করে ব্যস্তসমস্ত দ্রুত গলায় বলতে লাগল আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা, 'আর এদিকে আপনি দিন কাটাচ্ছেন আইবুড়োর মতো। এসব জিনিস তো বিশেষ আপনার নেই। সেই জন্যে দয়া করে... আর ফিলিপ ফিলিপিচও তাই বলেছে। তাহলে এখন কী করার আছে... তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, এবার কী করব আমি বলুন? কেমন আছে? জ্ঞান নেই? ওহ, কীরকম বিচ্ছিরিভাবে শুয়ে আছে। বালিশটা ঠিক করে দিই দাঁড়ান, মাথাটা একটু নিচুতে থাক, আচ্ছা কী বলেন... চামড়ার একটা বালিশ হলেই ভালো হত না? চামড়ার জিনিস বেশি ঠাণ্ডা। উঃ, কী বোকামিই করেছি! চামড়ার একটা বালিশ নিয়ে আসার কথা মনেই হল না। দাঁড়ান, গিয়ে নিয়ে আসব... আগুন করে রাখা দরকার, কী বলেন? আমার বুড়ি মেয়েটাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। একটা চেনা বুড়ি আছে আমার। আপনার তো কোনো চাকরানী নেই... তাহলে আমি এবার কী করি বলুন। এগুলো কী? ওষধি লতা দেখছি... ডাক্তার কি খেতে বলেছেন? ওষধি লতার চা বলেছেন নিশ্চয়। যাই, গিয়ে উনুনে আঁচ দিই।'

আমি ওকে আশ্বস্ত করলাম। খুব বেশি কিছু করার নেই দেখে ও বেশ অবাক এবং খানিকটা ক্ষুণ্ণও হল। কিন্তু তাতে ওর উৎসাহ একেবারে যে নিভে গেল তা নয়। নেল্লীর সঙ্গে একমুহূর্তেই ওর বন্ধুত্ব হয়ে গেল এবং সারা অসুখটায় ও ভারি সাহায্য করেছিল আমায়। রোজই প্রায় ও দেখতে আসত এবং আসত এমন ভাব করে যেন কিছু একটা হারিয়েছে, ওকে তাড়াতাড়ি গিয়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিবারই সে জানাত ওটা নাকি ফিলিপ ফিলিপিচেরও ইচ্ছা। নেল্লীর খুব পছন্দ হয়েছিল ওকে। ঠিক দুটি বোনের মতো ভাব হয়ে গেল ওদের এবং আমার ধারণা নানা দিক থেকে আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা ছিল ঠিক নেল্লীর মতোই শিশু। নানারকম গল্প করত আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা, হাসাত নেল্লীকে, ও বাড়ি চলে গেলে নেল্লীর বড্ডো একা লাগত।

ওর প্রথম আগমনে রোগিনীটি আমার অবাক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ও টের পেয়ে গেল অনিমন্ত্রিত অতিথিটি কেন এসেছেন। ফলে যথারীতি ভ্রূকুটি করে নীরব ও অকরুণ হয়ে উঠল নেল্লী।

আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা চলে গেলে নেল্লী মুখ ব্যাজার করে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমাদের কাছে ও এসেছিল কেন?'

'তোমায় সাহায্য করতে নেল্লী, তোমার দেখাশুনা করতে।'

'কিন্তু কেন?.. কিসের জন্যে? আমি তো ওর জন্যে কখনো কিছু করি নি?'

'যাদের মন ভালো তারা নিজের জন্যে কেউ কিছু আগে করুক, তার অপেক্ষা করে না নেল্লী। তা না করলেও লোকের দরকারের সময় তারা সাহায্য করতে ভালোবাসে। দুনিয়ায় ভালোমানুষ অনেক আছে নেল্লী, নেহাৎ তোমার কপাল খারাপ যে তাদের দেখা পাও নি, তোমার দরকারের সময় তাদের পাও নি।'

নেল্লী কথা কইলে না। আমি ওর কাছ থেকে সরে এলাম। কিন্তু মিনিট পনেরো পরে ক্ষীণ কণ্ঠে নেল্লী নিজেই আমায় ডেকে পান করার মতো কিছু দিতে বললে, এবং হঠাৎ আমায় সজোরে জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে লেগে রইল, ছাড়লে না বহুক্ষণ। পরের দিন আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা যখন এল, তখন নেল্লী তাকে স্বাগত করলে একটা সানন্দ হাসি নিয়ে যদিও তখনো কেন জানি, একটু লজ্জা লজ্জা করছিল তার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেই দিনই সারা সন্ধ্যেটা আমায় কাটাতে হয়েছিল নাতাশার ওখানে। বাড়ি ফিরলাম দেরি করে। নেল্লী ঘুমোচ্ছিল। আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনারও ঢুলুনি এসেছে, তবু আমার ফেরার অপেক্ষায় বসে ছিল রোগীর কাছে। আমাকে দেখেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে ফিসফিসিয়ে বলতে শুরু করলে যে নেল্লী প্রথমটা বেশ ফুর্তিতে ছিল, এমনকি হেসেছেও খুব, কিন্তু পরে মনমরা হয়ে যায়, আমায় ফিরতে না দেখে চুপচাপ আর অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। 'তারপর বলে মাথা ধরেছে, কান্নাকাটি করতে শুরু করে। আমি তো ভেবেই পাই না কী করি,' বললে আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা, 'নাতালিয়া নিকোলায়েভনার কথা তুলেছিল আমার কাছে, কিন্তু আমি ওকে কিছুই বলতে পারলাম না। ও-ও আমায় আর জিজ্ঞেসাবাদ না করে কাঁদতেই থাকল। কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। যাক, আমি তাহলে চলি ইভান পেত্রোভিচ। মোটের ওপর ও এখন একটু ভালো, আমি দেখতে পাচ্ছি। বাড়ি যেতে হবে এবার, ফিলিপ ফিলিপিচও

তাই বলে দিয়েছে। সত্যি বলতে কি, এবার ও আমায় শুধু দু'ঘণ্টার জন্যে আসতে দিয়েছিল, কিন্তু আমি নিজে থেকেই রয়ে গেলাম। কিন্তু তাতে কী হয়েছে, আমার জন্যে দুশ্চিন্তা নেই, আমার ওপরে রাগ করার সাহস পাবে না... শুধু বোধ হয়... হা ভগবান, কী করি এখন ইভান পেত্রোভিচ? আজকাল যে রোজই বাড়ি ফেরে মাতাল হয়ে। কী একটা কাজে ও এখন ভারি ব্যস্ত, আমার সঙ্গে কথাও বলে না, কী সব দুশ্চিন্তা করে, খুব জরুরী কিছু একটা নিয়ে ভাবছে তা বেশ বুঝি। অথচ প্রত্যেক দিন সন্ধ্যেয় মাতাল হয়ে ফিরবে... শুধু ভাবছি এখন ও বাড়ি ফিরেছে, কে ওকে ধরে শুইয়ে দেবে? তাহলে চলি, চললাম, বিদায়। বিদায় ইভান পেত্রোভিচ! আপনার এই বইগুলো আমি দেখছিলাম। কী রাশি রাশি বই আপনার, নিশ্চয় খুব চমৎকার বই। আর আমি এমন মুর্খ, আমি কখনো কিছু পড়ি নি... চলি, কাল আসব...'

কিন্তু পরের দিন সকালে নেল্লী ঘুম থেকে উঠল মনমরার মতো, গোমড়া মুখ, আমার কথার জবাব দিচ্ছিল অনিচ্ছায়। নিজে থেকে কথাও কইছিল না আমার সঙ্গে, যেন রাগ করেছে আমার ওপর। কয়েকবার শুধু এইটুকু চোখে পড়ল যে লুকিয়ে লুকিয়ে ও তাকাচ্ছে আমার দিকে। সে চাউনির মধ্যে কেমন একটা গোপন মর্মান্তিক যন্ত্রণা আছে, তবু একটা কোমলতাও আছে, সোজাসুজি আমার দিকে যখন তাকাত তখন সেটা দেখি নি। সেই দিনই ওষুধ নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে ঐ কান্ডটা হয়। কী ভাবা যায় বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

তবে আমার প্রতি নেল্লীর আচরণ একেবারে বদলে গেল। ওর এই বিচিত্র মনোভাব, এই খামখেয়াল, সময় সময় আমার প্রতি প্রায় একটা ঘৃণা ওর থেকেছে একেবারে সেই দিনটি পর্যন্ত যখন আমার সঙ্গে থাকা ওর শেষ হয়ে গেল — একেবারে সেই বিপর্যয় পর্যন্ত, যা আমাদের উপন্যাসের শেষাংক। কিন্তু সেকথা পরে।

মাঝে মাঝে অবিশ্যি ঘণ্টাখানেকের জন্যে ও হঠাৎ ঠিক আগের মতোই স্নেহাতুর হয়ে উঠেছে আমার প্রতি। এসব মুহূর্তে ওর দরদ যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠত, এবং প্রায়ই এইরকম সব মুহূর্তেই ও কাঁদত তীব্রভাবে। কিন্তু অচিরেই এ মুহূর্তগুলোর অবসান হয়ে যেত, আবার ও ফিরে যেত সেই আগের মনঃকষ্টে, আমার দিকে ফের তাকাত সেই বিরূপতা নিয়ে, নয়ত-বা ডাক্তারের সঙ্গে যা করেছিল তেমনি কিছু খেয়াল নিয়ে মাতত, কিংবা হঠাৎ

যেই হয়ত নজরে পড়ত ওর নতুন কোনো দুষ্টুমি আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না, অমনি হো-হো করে হাসতে শুরু করত আর প্রতিবারই তার শেষ হত কান্নায়।

একবার আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনার সঙ্গেও ঝগড়া বাধিয়ে বসল। বলে দিলে, তার কাছ থেকে কিছুই ও চায় না। আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনার সামনেই আমি যখন ওকে তিরস্কার করলাম, তখন হঠাৎ ও জ্বলে উঠল, মনে মনে জমে ওঠা সমস্ত ঝাল ঝেড়ে জবাব দিলে কাটা-কাটা, তারপর হঠাৎ চুপ করে গেল। পুরো দু'দিন ধরে আমার সঙ্গে কোনো কথা কইলে না, ওষুধ খেলে না, এমনকি খাওয়াদাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করলে। ওকে বোঝাতে, ওর কাণ্ডজ্ঞান ফেরাতে পেরেছিল কেবল ওই বৃদ্ধ ডাক্তার।

আগেই বলেছি, ওষুধ খাওয়াবার সেই দিনটা থেকেই নেল্লী আর ডাক্তারের মধ্যে কেমন একটা আশ্চর্য স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ডাক্তারকে খুব ভালোবাসতে শুরু করেছিল নেল্লী; যত মন খারাপই হোক, ডাক্তার এলেই ও সর্বদা তাকে অভ্যর্থনা জানাত আনন্দের হাসি হেসে। তার প্রতিদানে বুড়ো ডাক্তারও রোজই, মাঝে মাঝে দিনে দুবার করেও আসতেন — নেল্লী যখন উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছে, প্রায় ভালো হয়ে গেছে, তার পরেও। মনে হত, মেয়েটা ওঁকে এমনিই যাদু করেছে যে নেল্লীর হাসি না শুনে, ওঁকে নিয়ে নেল্লীর রগড়, মাঝে মাঝে খুবই মজার এই রগড় না দেখে উনি যেন এক দিনও কাটাতে পারছেন না। নেল্লীর জন্যে উনি শিক্ষামূলক সব সচিত্র বই আনতে লাগলেন। তার একটা কিনেছিলেন ঠিক ওর জন্যেই ইচ্ছে করে। চমৎকার চমৎকার বাক্স করে তারপর আনতে লাগলেন মিষ্টি। সেরকম ক্ষেত্রে উনি আসতেন এমন একটা গম্ভীর ভাব করে, যেন সেটা ওঁর জন্মদিন। দেখেই নেল্লী টের পেত নিশ্চয় উপহার নিয়ে এসেছেন। উনি কিন্তু উপহারটি দেখাতেন না, সেয়ানার মতো হাসতেন আর নেল্লীর পাশে বসে ইঙ্গিত করতেন; জনৈক তরুণী যখন সভ্য হয়ে চলতে শিখেছে, তাঁর অবর্তমানেও ব্যবহার যখন তার প্রশংসনীয়, তখন ভালো একটা পুরস্কার তার পাওয়া উচিত। সে সময় উনি নেল্লীর দিকে এমন সরলমনে ভালোমানুষের মতো তাকিয়ে থাকতেন যে ওঁকে নিয়ে নেল্লী একেবারে অকপটেই হাসাহাসি করলেও জ্বলজ্বলে চোখদুটো থেকে ঝরে পড়ত আন্তরিক সোহাগ আর মমতা। শেষ পর্যন্ত চেয়ার ছেড়ে গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়াতেন বৃদ্ধ, মিষ্টির বাক্সটা বার করে নেল্লীকে দিয়ে অনিবার্যই যোগ করতেন, 'আমার প্রিয়তমা ভাবী বউয়ের

জন্যে।' সেই মুহূর্তে নেল্লীর চেয়েও বোধ হয় সুখ বোধ করতেন উনি নিজে।

অতঃপর আলাপ শুরু হত ওদের আর প্রত্যেকবারই গুরুত্বসহকারে এবং অকাট্যরূপে ডাক্তার নেল্লীকে বোঝাতেন যে স্বাস্থ্যের দিকে ওর নজর রাখা উচিত। চিকিৎসা সংক্রান্ত উপদেশ দিতেন ভালো ভালো।

'সবার ওপরে, স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া উচিত,' উনি বলতেন বক্তৃতার সুরে, 'প্রথমত ও প্রধানত সেটা বেঁচে থাকার জন্যে, এবং দ্বিতীয়ত, সর্বদাই সুস্থ থাকা আর তাতে করে জীবনে সুখ পাওয়ার জন্যে। আপনার মনে যদি কোনো দুঃখু থাকে তবে তার কথা ভুলে যান গো মেয়ে, কিংবা আরো ভালো, তা নিয়ে না ভাবা। আর দুঃখু যদি না থাকে... মানে তাহলেও সেসব কথা নিয়ে ভাববেন না, শুধু আনন্দের কথা ভাবুন... মানে হাসিখুশি রঙ্গরসের কোনো কথা...'

নেল্লী জিজ্ঞেস করত, 'কিন্তু কোন ধরনের হাসিখুশি রঙ্গরস?'

সঙ্গে সঙ্গেই মুশকিলে পড়তেন ডাক্তার।

'মানে... এই কোনো একটা নির্দোষ রঙ্গরস আর কি, আপনার বয়সের পক্ষে যা শোভন কিংবা... মানে, এইরকমই কিছু একটা...'

'রঙ্গরস আমার চাই না, রঙ্গরস ভালোবাসি না আমি,' নেল্লী বলত, 'তবে নতুন নতুন ড্রেস আমার ভালো লাগে বেশি।'

'নতুন নতুন ড্রেস! হুঁ, মানে সেটা কিন্তু ততো ভালো নয়। জীবনের সবকিছুতেই অল্পে তুষ্ট থাকা উচিত আমাদের। অবিশ্যি... তা নতুন ড্রেসও ভালো লাগতে পারে...'

'আপনাকে বিয়ে করলে আমায় অনেক ড্রেস দেবেন তো?'

ডাক্তার বলতেন, 'কথা শোনো মেয়ের!' এবং ভ্রূকুটি না করে পারতেন না। ধূর্তের মতো নেল্লী হাসত, একবার আত্মবিস্মৃত হয়ে আমার দিকেও চেয়েছিল হেসে। ডাক্তার বলে চলতেন, 'বেশ... ড্রেস একটা আমি দেব, যদি আচরণ হয় তা পাবার মতো।'

'আর আপনাকে বিয়ে করার পরেও কি আমায় রোজ পুরিয়া খেতে হবে?'

'না, তখন সব দিন ওষুধ না খেলেও চলবে।' ডাক্তার হাসতে শুরু করতেন।

হেসে উঠে আলাপ থামিয়ে দিত নেল্লী।

বৃদ্ধও হাসতেন ওর সঙ্গে, সস্নেহে ওর ফুর্তি লক্ষ্য করতেন।

আমার দিকে ফিরে বলতেন, 'রঙ্গরস আছে বেশ, তবু খামখেয়াল আর খানিকটা রগচটা ভাবও দেখা যাচ্ছে।'

ঠিকই বলেছিলেন ডাক্তার। নেল্লীর যে কী হল আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমার সঙ্গে ও কথা যেন বলতেই চাইত না, যেন ওর কাছে কী একটা দোষ করেছি আমি। এতে ভারি মনে লাগত আমার। নিজেও আমি ভুরু কুঁচকে থাকতাম, একবার সারা দিন ওর সঙ্গে কথা বলি নি। কিন্তু পরদিন লজ্জা হল। প্রায়ই কাঁদত ও, কী করে যে ওকে সান্ত্বনা দেব ভেবে পেতাম না। একবার অবিশ্যি আমার সঙ্গে কথা বন্ধের পালা ও ভেঙেছিল।

একদিন বিকেলে অন্ধকার হবার ঠিক আগে বাড়ি ফিরে দেখি বালিশের নিচে তাড়াতাড়ি করে নেল্লী বই লুকোচ্ছে। বইটা আমারই লেখা উপন্যাস। আমি না থাকলে নেল্লী তা টেবিল থেকে নিয়ে পড়ত। ভাবলাম, কিন্তু আমার কাছ থেকে লুকোবার কী দরকার? ঠিক যেন লজ্জা পাচ্ছে, কিন্তু আমার চোখে যে কিছু পড়েছে তা বুঝতে দিলাম না। মিনিট পনেরো পরে কিছুক্ষণের জন্যে আমি রান্নাঘরে যেতেই ও তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে বইখানা যথাস্থানে রেখে দিয়ে এল। ফিরে এসে দেখলাম উপন্যাসটা টেবিলেই রয়েছে। এক মিনিট পরে নেল্লী আমায় ডাকলে। গলার স্বরে ওর কেমন একটা আবেগের কাঁপন। চার দিন আমার সঙ্গে ও প্রায় কথাই বলে নি।

থেমে থেমে জিজ্ঞেস করলে, 'আজ কি... নাতাশার কাছে... যাবেন?'

'হ্যাঁ নেল্লী, আজ ওর সঙ্গে দেখা করা ভারি দরকার।'

নেল্লী খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।

'আপনি কি ওকে... খুবই... ভালোবাসেন?' ফের ও জিজ্ঞেস করলে ক্ষীণ কণ্ঠে।

'হ্যাঁ নেল্লী, খুবই ভালোবাসি।'

'আমিও ভালোবাসি ওকে,' আস্তে করে নেল্লী বললে। তারপর ফের নীরবতা।

'আমি ওর কাছে যেতে চাই, ওর সঙ্গে থাকব।' ভীরু-ভীরু চোখে আমার দিকে চেয়ে নেল্লী বললে।

'সে হয় না নেল্লী।' বললাম একটু অবাক হয়ে, 'আমার কাছে থাকতে তোমার কি খুবই খারাপ লাগছে?'

'কেন হয় না?' মুখ লাল হয়ে উঠল নেল্লীর, 'কেন, আপনিই তো আমায় ওর বাবার ওখানে গিয়ে থাকার জন্যে বোঝাচ্ছেন; অথচ আমি সেখানে যেতে চাই না। নাতাশার ঝি আছে?'

'আছে।'

'তাহলে ঝি ও ছাড়িয়ে দিক, আমি ওর জায়গায় কাজ করব। ওর সব কাজ আমি করে দেব, মাইনে কিছু নেব না। নাতাশাকে আমি ভালোবাসব, তার জন্যে রান্না করে দেব। আপনি ওকে আজ এই কথা বলুন।'

'কিন্তু কিসের জন্যে? এ আবার কী খেয়াল নেল্লী? তাছাড়া নাতাশা সম্পর্কেই বা এ কী ভাবছ তুমি? তুমি কি ভেবেছ, ও তোমায় রাঁধুনী করে রাখবে? তোমায় যদি ও রাখে তাহলে রাখবে সমান সমানের মতো, ছোটো বোনের মতো করে।'

'না, আমি সমান হতে চাই না। তা চাই না আমি...'

'কিন্তু কেন?'

নেল্লী কিছু বললে না। ঠোঁটদুটো ওর কাঁপছিল, কাঁদতে চাইছিল। শেষকালে বললে।

'যাকে ও এখন ভালোবাসে সে তো চলে যাবে, ওকে ত্যাগ করবে, তাই না?'

অবাক লাগল আমার।

'কিন্তু কোত্থেকে তা জানলে নেল্লী?'

'আপনি নিজেই তো আমায় সব বলেছেন। তাছাড়া, পরশুদিন আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনার স্বামী এসেছিলেন সকালে। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি সব বলেছেন আমায়।'

'সে কী! মাসলবোয়েভ এসেছিল নাকি সকালে?'

'হ্যাঁ।' ও বললে চোখ নামিয়ে।

'এসেছিল আমায় বলো নি কেন?'

'এমনি...'

এক মুহূর্ত ভাবলাম। ঈশ্বর জানেন, কেন এই মাসলবোয়েভটা এমন রহস্যময় রকমে ঘুরঘুর করছে। নেল্লীর সঙ্গে কেমন ধারা তার সম্বন্ধ? ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

'তা ও যদি নাতাশাকে ত্যাগই করে তাতে তোমার কী নেল্লী?'

'কিন্তু আপনি তো ওকে খুব ভালোবাসেন।' নেল্লী বললে আমার দিকে চোখ না তুলে, 'আপনি যখন ওকে ভালোবাসেন, তখন ঐ লোকটা চলে গেলে আপনি ওকে বিয়ে করবেন।'

'না নেল্লী, আমি ওকে যতটা ভালোবাসি, ও আমায় ততটা ভালোবাসে না। আর আমিও... না নেল্লী, সে হতে পারে না।'

'আপনাদের দুজনের জন্যে ঝিয়ের কাজ করতাম তাহলে। সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতেন আপনারা...' ও বললে প্রায় ফিসফিসিয়ে, আমার দিকে না তাকিয়ে।

"কী হল ওর, কী ব্যাপার?" ভাবতেই বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। নেল্লী চুপ করে গেল, সারা সন্ধ্যে আর একটি কথাও কইলে না। আমি চলে যেতেই ও ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে এবং কাঁদে সারা সন্ধ্যেটা ধরে, আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনার কাছ থেকে শুনেছি। কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়ে ও। রাত্রেও কেঁদেছে, কী যেন বকেছে ঘুমের মধ্যে।

কিন্তু সেই দিন থেকেই ও আরো বিমর্ষ হয়ে উঠল, আরো চুপচাপ হয়ে পড়ল; আমার সঙ্গে একেবারেই প্রায় কথা কইত না। অবিশ্যি আমার দিকে ওর দু-তিনটে চোরা চাউনি আমার চোখে পড়েছে, কী মমতাই না থাকত তাতে! কিন্তু প্রীতিকর মমতা জাগানো এই মুহূর্তগুলোর সঙ্গে সঙ্গেই ওর এই ভাবটা উবে যেত, এবং এটাকে চ্যালেঞ্জের মতো করে নিয়ে নেল্লী ঘণ্টায় ঘণ্টায় কেবলি হয়ে উঠত মনমরা, এমনকি ডাক্তারের কাছেও, ওর এই মেজাজ বদলে ভারি অবাক হয়ে যেতেন ডাক্তার। ইতিমধ্যে নেল্লী প্রায় সম্পূর্ণই ভালো হয়ে উঠেছিল। ডাক্তার তাকে খোলা হাওয়ায় বেড়াবার অনুমতি দিলেন, তবে অল্প সময়ের জন্যে। আবহাওয়া তখন উষ্ণ উজ্জ্বল। পূত সপ্তাহ চলছে। পরবটা সে বছর পড়েছিল একটু দেরি করে। সকালে আমি বেরিয়ে গিয়েছিলাম। নাতাশার ওখানে যাওয়া একান্তই দরকার ছিল, কিন্তু ঠিক করেছিলাম তাড়াতাড়ি ফিরে নেল্লীকে একটু বাইরে বেড়িয়ে আনব। এই সময়টুকু ও একাই রইল ঘরে।

কিন্তু বাড়িতে যে কী আঘাত অপেক্ষা করেছিল আমার জন্যে তা অবর্ণনীয়। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছি, দেখি বাইরে তালার সঙ্গে চাবিটা লাগানো। ভেতরে ঢুকলাম, কেউ নেই। আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। টেবিলে এক টুকরো কাগজ চোখে পড়ল। বড়ো বড়ো অসমান ছাঁদের হস্তাক্ষরে তাতে পেনসিলে লেখা:

'আমি আপনাকে ছেড়ে গেলাম, আর কখনো ফিরব না। কিন্তু খুব ভালোবাসি আপনাকে।

আপনার বিশ্বস্তা নেল্লী।'

আতঙ্কে চিৎকার করে ছুটে বেরিয়ে গেলাম বাইরে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তখনো ঠিক রাস্তায় পেঁছিতে পারি নি, কী করব ভেবে ওঠার সময় পাই নি তখনো, হঠাৎ দেখি একটা গাড়ি এসে থামল আমাদের বাড়ির ফটকে। আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা নেল্লীর হাত ধরে গাড়ি থেকে নামছে। নেল্লীকে খুব শক্ত করে ধরে রেখেছে আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা, যেন ভয় পাচ্ছে ফের না পালায়। আমি ছুটে গেলাম ওদের দিকে।

চেঁচিয়ে উঠলাম, 'নেল্লী, কী ব্যাপার? কোথায় গিয়েছিলে, কেন?'

আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা তাড়াতাড়ি করে বললে, 'দাঁড়ান একটু, অত অধৈর্য হবেন না। আপনার ওখানে চলুন তাড়াতাড়ি। সেখানে সব শুনবেন।' তারপর যেতে যেতে দ্রুত ফিসফিসিয়ে জানালে, 'অদ্ভুত সব কাণ্ড ইভান পেত্রোভিচ... একেবারে থ' হয়ে যেতে হয়... আসুন বলছি।'

ভয়ানক জরুরী একটা কিছু যে ওর জানাবার আছে তা ওর সারা মুখে ফুটে উঠেছে।

ঘরে ঢোকা মাত্র ও নেল্লীকে বললে, 'যাও নেল্লী, যাও একটু শুয়ে পড়ো গে, খুব হয়রানি গেছে তোমার, বুঝতে তো পারছি। অতটা ছোটাছুটি তো আর তামাসা নয়, অসুখের পর খুব কষ্ট হয় তো। শুয়ে পড়ো নেল্লী, শুয়ে পড়ো লক্ষ্মী। চলুন আমরা একটু বেরিয়ে যাই, ওর অসুবিধা করব না। ও একটু ঘুমোক।' চোখের ইশারায় আমায় বললে রান্নাঘরে যেতে।

নেল্লী কিন্তু শুল না। সোফার ওপর বসে দুই হাতে মুখ ঢাকলে।

আমরা বেরিয়ে যেতে কী ঘটেছিল তা তাড়াতাড়ি জানাল আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা। পরে আরো বিশদভাবে আমি ঘটনাটা জেনে নিয়েছিলাম। ব্যাপারটা হয়েছিল এই।

আমি ফেরার ঘণ্টা দুই আগে আমার জন্যে চিঠিটি লিখে রেখে নেল্লী ফ্ল্যাট ছেড়ে প্রথমটা ছুটে যায় বৃদ্ধ ডাক্তারের কাছে। আগে থেকেই ঠিকানাটা

ও জোগাড় করে রেখেছিল। ডাক্তারের কাছে শ্নেছি, ওঁর ওখানে নেল্লীকে দেখে উনি একেবারে থ' হয়ে গিয়েছিলেন, যতক্ষণ ও সেখানে ছিল 'নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে' পারছিলেন না, গল্পটা শেষ করে ডাক্তার বলেছিলেন, 'এখনো পর্যন্ত আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, এবং কখনো হবে না।' তাসত্ত্বেও নেল্লী কিন্তু সত্যিই ওঁর ওখানে গিয়েছিল। ডাক্তার তখন পড়ার ঘরে ড্রেসিং গাউন পরে আরামকেদারায় নিশ্চিন্তে বসে কফি খাচ্ছিলেন, সেই সময় নেল্লী ছ্টে এসে ওঁকে কিছ্ ভাববার অবকাশ না দিয়েই গলা জড়িয়ে ধরে। কাঁদছিল নেল্লী, ডাক্তারকে জড়িয়ে ধরে চুম্ খেতে থাকে, হাতে চুম্ খেয়ে খ্ব আকুল হয়ে অসংলগ্নভাবে মিনতি করেছিল, ডাক্তার যেন ওকে থাকতে দেন। বলেছিল, আমার সঙ্গে ও আর থাকতে চায় না, থাকতে পারবে না, সেই জন্যে আমায় ছেড়ে চলে এসেছে। ওর খ্ব কষ্ট হয়। আর কখনো ডাক্তারকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করবে না, নতুন ড্রেসের কথা তুলবে না, ভালো হয়ে চলবে, শিখবে, ডাক্তারের 'শার্টফ্রণ্ট কেচে ইস্ত্রি করা শিখে নেবে' (সমস্ত বক্তব্যটা বোধ হয় ও আসতে আসতে কিংবা তারও আগে থেকে তৈরি করে রেখেছিল), মোটের ওপর সে বাধ্য হয়ে চলবে এবং যে প্রিয়াই দেওয়া হোক প্রতিদিন তা খাবে। তাছাড়া ডাক্তারকে ও যে বিয়ে করার কথা বলেছিল সেটা নিতান্তই একটা রহস্য, সেকথা সত্যি করে ও কখনো ভাবে নি। ব্দ্ধ জার্মানটি এমন বিম্ঢ় হয়ে গিয়েছিলেন যে সারা সময় ম্খ হাঁ করে চুর্ট-ধরা হাতটা তুলে বসেছিলেন, হাতের চুর্টটার কথাও মনে ছিল না, ফলে তা নিভে যায়।

অবশেষে কথা বলার ক্ষমতা কোনোক্রমে ফিরে পেয়ে উনি বলেছিলেন, 'মাদমোয়াজেল, আপনার কথা যতটা ব্ঝছি, আপনি চান আমার বাড়িতে একটা কাজ। কিন্তু সে অসম্ভব। দেখছেন তো আমার এখানে জায়গা কম, তাছাড়া আমার আয়ও বেশি নয়... আর শেষ কথা, অমন ঝট করে, না ভেবেচিন্তে... সে যে ভারি সাংঘাতিক ব্যাপার! আর শেষ কথা, আমি যা ব্ঝছি, আপনি পালিয়ে এসেছেন বাড়ি থেকে। এ ভারি অন্যায় এবং অসম্ভব... আর শেষ কথা ভালো আবহাওয়া থাকলে আপনার অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে অল্প একটু আধটু বেড়াবার অন্মতি আমি দিয়েছিলাম, আর আপনি নিজের হিতৈষীকে ফেলে রেখে ছ্টে এসেছেন আমার কাছে, অথচ আপনার উচিত নিজের শরীরের যত্ন নেওয়া এবং... এবং... ওষ্ধ খাওয়া। আর শেষ কথা... শেষ কথা... কিছ্ই আমার মাথায় ঢুকছে না...'

নেল্লী ওঁকে শেষ করতে দেয় নি। কাঁদতে থাকে ফের, আবার মিনতি শুরু করে কিন্তু কোনো ফল হয় না। বৃদ্ধ কেবলি হতভম্ব হতে থাকেন এবং আরো বেশি করে সব গুলিয়ে যেতে থাকে তাঁর। অবশেষে নেল্লী ওঁকে ছেড়ে 'ও ভগবান!' বলে চেঁচিয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। 'সারা দিনটা অসুস্থ ছিলাম,' উপসংহারে ডাক্তার জানালেন, 'রাত্রে পাঁচন খেয়েছিলাম একটা...'

নেল্লী ছুটে যায় মাসলবোয়েভদের ওখানে। এদের ঠিকানাটাও সে জোগাড় করে রেখেছিল। মুশকিল হলেও ওদের খুঁজে পাওয়া তার অসম্ভব হয় নি। মাসলবোয়েভ বাড়িতেই ছিল। নেল্লী ওখানে আশ্রয় চাইলে আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। কেন সে ওখানে থাকতে চাইছে, আমার কাছে থাকতে তার কষ্ট হচ্ছে নাকি, এসব কথা জিজ্ঞেস করাতে নেল্লী কোনো জবাব না দিয়ে ডুকরে চেয়ারে নেতিয়ে পড়ে। আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা বললে, 'কী ফোঁপানি, কী ফোঁপানি! আমি তো ভাবলাম মরল বুঝি।' নেল্লী মিনতি করেছিল রাঁধুনি করে হোক, ঝি করে হোক, ওকে রাখুক। বলেছিল ঘর ঝাড় দেবে, কাপড় কাচতে শিখবে। (এই কাপড় কাচা ব্যাপারটার ওপর খুব ভরসা করে ছিল নেল্লী, কী কারণে যেন ভেবেছিল ওকে চাকরানী রাখার পক্ষে এইটেই বোধ হয় সবচেয়ে বড়ো যুক্তি হবে।) আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনার মত ছিল ব্যাপারটা সব পরিষ্কার না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ওকে কাছে রাখবে এবং ইতিমধ্যে আমায় জানিয়ে দেবে। কিন্তু ফিলিপ ফিলিপিচ খুব কড়া করে তার বিরোধিতা করে এবং তৎক্ষণাৎ পলাতকাকে আমার কাছে নিয়ে যেতে বলে। রাস্তায় আসতে আসতে আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছে, তাতে আরো বেশি করে কেঁদেছে নেল্লী। তা দেখে আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনাও চোখের জল ফেলেছে। সারা রাস্তাটা দুটিতে এসেছে কাঁদতে কাঁদতে।

'কিন্তু কেন নেল্লী, কেন ওঁর সঙ্গে থাকতে চাইছ না! উনি তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন না, তাই কী কারণ?' সাশ্রুনয়নে জিজ্ঞেস করেছে আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা।

'না, না ভালো ব্যবহারই করেন...'

'তাহলে কী ব্যাপার?'

'এমনি, আমি থাকতে চাই না ওঁর সঙ্গে, পারছি না... আমি সব সময় ওঁর সঙ্গে বিশ্রী ব্যবহার করি, কিন্তু উনি খুব ভালো মানুষ... তবে

আপনাদের সঙ্গে আমি বিশ্রী ব্যবহার করব না, কাজ করব।' হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো ফোঁপাতে ফোঁপাতে নেল্লী বলোছল।

'কেন ওঁর সঙ্গে বিচ্ছিরি ব্যবহার করো নেল্লী? ..'

'এমনি...'

'ওর এই 'এমনি' ছাড়া বেশি আর কিছু ওর কাছ থেকে বার করতে পারি নি,' চোখের জল মুছে সিদ্ধান্ত টানল আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা, 'এমন কষ্ট পাচ্ছে কেন মেয়েটা? মৃগী রোগ নাকি? আপনার কী মনে হয় ইভান পেত্রোভিচ?'

নেল্লীর কাছে ফিরে এলাম আমরা। বালিশে মুখ গুঁজে ও শুয়ে শুয়ে কাঁদছে। হাঁটু গেড়ে পাশে বসে ওর হাত দুখানা নিয়ে চুমু খেতে লাগলাম আমি। ঝটকা মেরে হাতটা টেনে নিয়ে ও আরো জোরে ফোঁপাতে লাগল। কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এমন সময় বৃদ্ধ ইখমেনেভ ঘরে ঢুকলেন।

'একটা কাজে তোমার কাছে এলাম ইভান। কেমন আছো?' বৃদ্ধ বললেন আমাদের সকলের দিকে চেয়ে দেখে। হাঁটু গেড়ে আমি বসে আছি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ইদানীং অসুখ যাচ্ছিল বৃদ্ধের। রোগা আর ফ্যাকাশে হয়ে গেছে চেহারা। কিন্তু কার ওপর যেন স্পর্ধা করে উনি অসুখটাকে আমল দিচ্ছিলেন না; আন্না আন্দ্রেয়েভনার কাকুতি মিনতি অগ্রাহ্য করে যথারীতি কাজে-কর্মে ঘোরাঘুরি করছিলেন, কিছুতেই শয্যা নিতে চাইছিলেন না।

বৃদ্ধের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা বললে, 'তাহলে আপাতত আসি, যত তাড়াতাড়ি পারি চলে আসতে বলে দিয়েছে ফিলিপ ফিলিপিচ। কিছু একটা কাজ আছে। কিন্তু সন্ধ্যেয়, গোধূলিতে আসব ফের। ঘণ্টা দু-এক থেকে যাব।'

'কে মেয়েটি?' বৃদ্ধ ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। স্পষ্টতই অন্যকিছু একটা ভাবছিলেন তিনি। আমি বুঝিয়ে বললাম।

'হুম, যাক, আমি একটা কাজে এসেছি ইভান...'

জানতাম কাজটা কী, আশা করছিলাম উনি আসবেন। এসেছেন আমার সঙ্গে আর নেল্লীর সঙ্গে কথাবার্তা কইতে, নেল্লীকে ওঁদের কাছে ডাকতে। অনাথাটিকে পোষ্য করার প্রস্তাবে আন্না আন্দ্রেয়েভনা অবশেষে সম্মতি দিয়েছেন। এটা আমাদের ওই গোপন আলাপগুলোর ফল। বৃদ্ধাকে আমি

বুঝিয়েছিলাম, মেয়েটির আপন মা-ও তার বাপের কাছ থেকে ক্ষমা পায় নি, বাপ তাকে অভিশাপ দিয়েছে। তাই মেয়েটিকে দেখে হয়ত বৃদ্ধের মত পালটাতে পারে। এমন জ্বলজ্বলে করে আমার পরিকল্পনাটা পেশ করেছিলাম যে আন্না আন্দ্রেয়েভনা নিজে থেকেই মেয়েটিকে নেবার জন্যে স্বামীকে পেড়াপীড়ি করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। সাগ্রহেই রাজী হন বৃদ্ধ। প্রথমত, তিনি আন্না আন্দ্রেয়েভনাকে তুষ্ট করতে চাইছিলেন। তাছাড়া তাঁর নিজেরও একটা বিশেষ লক্ষ্য ছিল... কিন্তু সেকথা আরো বিশদভাবে বলা যাবে পরে...

আগেই বলেছি, প্রথম আগমনের দিন থেকেই বৃদ্ধকে পছন্দ করে নি নেল্লী। পরে দেখেছি, তার সামনে ইখমেনেভের নাম করলেই নেল্লীর মুখে চোখে কেমন একটা বিদ্বেষ ফুটে উঠত। কোনো ভণিতা না করে বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ কথাটা পেড়ে বসলেন। বালিশে মাথা গুঁজে নেল্লী তখনো শুয়ে ছিল। বৃদ্ধ সোজাসুজি তার কাছে গিয়ে তার হাতটি ধরে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের মেয়ের মতো হয়ে নেল্লী থাকবে কি না।

বৃদ্ধ বললেন, 'একটি মেয়ে ছিল আমার, নিজের চেয়েও তাকে বেশি ভালোবাসতাম। কিন্তু এখন আর সে আমার সঙ্গে নেই। সে মারা গেছে। আমাদের সংসারে আর... আমার বুকের মাঝখানে তুমি কি তার জায়গাটি নেবে?' জ্বরতপ্ত শুষ্ক চোখে তাঁর এক বিন্দু অশ্রু দুলে উঠল।

মাথা না তুলে নেল্লী জবাব দিলে, 'না, নেব না।'

'কিন্তু কেন বাছা? তোমার কেউ নেই। ইভান তো আর তোমাকে চিরকাল রাখতে পারবে না অথচ আমার কাছে তুমি থাকবে একেবারে নিজের বাড়ির মতো।'

'থাকতে চাই না কারণ আপনি খারাপ লোক, হ্যাঁ খারাপ লোক,' মাথা তুলে বিছানায় বৃদ্ধের মুখোমুখি বসে বললে নেল্লী, 'নিজেও আমি খারাপ, সকলের চেয়ে পাজি, কিন্তু আপনি আমার চেয়েও খারাপ!..' বলতে গিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে উঠল নেল্লী, চোখদুটো জ্বলছিল। থরো থরো ঠোঁটদুটোও তার ফ্যাকাশে হয়ে কী এক প্রবল আবেগের দমকে কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। বৃদ্ধ ওর দিকে তাকালেন হতভম্ব হয়ে।

'হ্যাঁ, আমার চেয়েও আপনি খারাপ, কেননা মেয়েকে আপনি ক্ষমা করতে চান না। মেয়েকে একেবারে ভুলে যাবার ইচ্ছে আপনার, আর অন্য একটা মেয়ে পুষ্যি নিচ্ছেন। কিন্তু নিজের মেয়েকে ভোলা যায় কখনো? আমায়

ভালোবাসতে পারবেন ভাবছেন? আমার দিকে তাকালেই আপনার মনে হবে, আমি পরের মেয়ে, আপনার নিজের একটি মেয়ে ছিল, তাকে আপনি নিজেই ভুলে গেছেন, কেননা নিষ্ঠুর লোক আপনি। নিষ্ঠুর লোকের কাছে আমি থাকতে চাই না, চাই না, চাই না!..' নেল্লী কে'দে ফেললে, চকিতে চাইলে আমার দিকে।

'পরশু "ইস্টার", লোকেরা সবাই সবাইকে চুমু খাবে, কোলাকুলি করবে, ঝগড়াঝাঁটি মিটিয়ে নেবে, দোষ-অন্যায় ক্ষমা করবে... আমি তো জানি... কিন্তু আপনি... কেবল আপনিই... কী নিষ্ঠুর! চলে যান এখান থেকে!'

কান্নায় ভেঙে পড়ল নেল্লী। কথাগুলো নিশ্চয় ও আগে থেকে তৈরি করে মুখস্থ রেখেছিল, পাছে বৃদ্ধ ফের তাকে মিনতি করেন তাঁদের ওখানে যেতে।

স্তম্ভিত আর বিবর্ণ হয়ে গেলেন বৃদ্ধ। মুখে ফুটে উঠল যন্ত্রণা।

'কেন, কেন আমাকে নিয়ে সবার এমন দুশ্চিন্তা? আমি চাই না, আমি এসব চাই না!' ক্ষেপার মতো হঠাৎ চে'চিয়ে উঠল নেল্লী, 'আমি রাস্তায় ভিক্ষে করব!'

'নেল্লী, কী হল তোমার? নেল্লী, লক্ষ্মীটি!' অনিচ্ছাসত্ত্বেও চে'চিয়ে উঠলাম আমি, কিন্তু আমার সে কথায় শুধু আগুনে ঘি পড়ল।

'হ্যাঁ, সেই ভালো, আমি বরং রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করব, এখানে থাকব না!' ফোঁপানির মধ্যে চেঁচিয়ে উঠল নেল্লী, 'আমার মা-ও ভিক্ষে করত, মরবার সময় আমায় বলে গেছে, গরিব হয়ে রাস্তায় ভিক্ষে করিস সেও ভালো তবু... ভিক্ষেতে লজ্জার কিছু নেই। আমি তো একজনের কাছে ভিক্ষে করছি না, সকলের কাছে করছি। সবাই হলে তো আর একজন বলে ধরা যায় না। একজনের কাছে ভিক্ষে করা লজ্জার কথা, কিন্তু সকলের কাছ থেকে ভিক্ষেতে লজ্জা নেই — একজন ভিখারিণী আমায় তা বলেছে। আমি ছেলেমানুষ, টাকা রোজগারের কোনো উপায় আমার নেই, তাই সকলের কাছ থেকেই ভিক্ষে করব। আর এখানে আমি থাকতে চাই না, চাই না, চাই না! আমি খারাপ, সকলের চেয়ে আমি খারাপ। দেখবেন কেমন খারাপ আমি!'

বলে হঠাৎ টেবিল থেকে একটা কাপ তুলে নিয়ে নেল্লী আছড়ে মারলে মেঝেয়।

তারপর উদ্ধত বিজয়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললে, 'দেখলেন তো, ভেঙে গেল! কাপ তো শুধু দুটো, ওটাও ভেঙে ফেলব... তখন চা খাবেন কেমন করে?'

যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে ও, আর সে ক্ষ্যাপামি থেকে যেন ও আনন্দ পাচ্ছে। যেন জানে জিনিসটা লজ্জাকর, অন্যায়, তবু আরো নষ্টামির জন্যে নিজেকে তাতিয়ে তুলতে চাইছে।

'তোমার ও মেয়েটি অসুস্থ ভানিয়া, এই হল কথা,' বৃদ্ধ বললেন, 'অথবা... আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কেমন ধারা মেয়ে। আসি!'

টুপি তুলে নিয়ে করমর্দন করলেন আমার সঙ্গে। মনে হল কেমন ভেঙে পড়েছেন। নেল্লী ওকে ভয়ানক অপমান করেছে। আমি ক্ষেপে উঠেছিলাম।

উনি চলে যেতেই চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ওঁর জন্যে তোমার একটু কষ্টও হল না নেল্লী? লজ্জা করে না? লজ্জা করে না তোমার? না, তুমি ভালো মেয়ে নও, সত্যিই তুমি বদরাগী!' এবং ওই অবস্থাতেই, বিনা টুপিতে বৃদ্ধের পেছনে ছুটে গেলাম। মনে হল, যাই ফটক পর্যন্ত ওঁকে পৌঁছে দিয়ে কিছু সান্ত্বনার কথা বলে আসি। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় নেল্লীর মুখখানা যেন দেখতে পাচ্ছিলাম, আমার বকুনিতে সাংঘাতিক শাদা হয়ে যাওয়া সেই মুখখানা।

দ্রুত গিয়ে বৃদ্ধের সঙ্গ ধরলাম।

একটু তিক্ত হাসি হেসে উনি বললেন, 'বেচারি মেয়েটা বড়ো আহত, ওর নিজেরই কত কষ্ট, আর দ্যাখো দিখি ইভান, আমি ওকে বলতে গিয়েছিলাম আমার দুঃখের কথা। ওর আহত জায়গাটায় আমি ঘা দিয়েছিলাম। লোকে বলে ভূরিভোজীরা ক্ষুধার্তের জ্বালা বোঝে না, কিন্তু আমি আরো বলি, ক্ষুধার্তও সব সময় ক্ষুধার্তকে বুঝতে পারে না। আচ্ছা আসি।'

আমি অন্যকিছু বলতে চাইছিলাম, কিন্তু বৃদ্ধ হাত দিয়ে আমায় নিবৃত্ত করলেন।

'আমায় সান্ত্বনা দেবার প্রয়োজন নেই। তুমি বরং তোমার ওই মেয়েটিকে গিয়ে দ্যাখো গে আবার না পালায়, সেইটেই যেন ওর মতলব।' ঝাঁঝের সঙ্গে কথাগুলো বলে উনি দ্রুত পায়ে আমায় ফেলে চলে গেলেন ছড়ি দোলাতে দোলাতে আর ঠুকতে ঠুকতে।

ওঁর ধারণা ছিল না যে তাঁর মুখের কথাটা ফলে যাবে।

ফিরে এসে যখন সভয়ে দেখলাম নেল্লী ফের অন্তর্ধান করেছে, তখন কী যে মনের ভাব হয়েছিল বোঝাতে পারব না! বারান্দায় ছুটে গেলাম, সিঁড়িটায় খুঁজে দেখলাম, নাম ধরে ডাকাডাকি করলাম, এমনকি প্রতিবেশীদের

ঘরেও ঢোকা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ওর সম্পর্কে। ও ফের পালাবে সেকথা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, বিশ্বাস করতে চাইছিলাম না। তাছাড়া পালাবেই বা কেমন করে? বেরুবার ফটক শুধু একটি। সেখানে বৃদ্ধের সঙ্গে কথা কইছিলাম আমি। তাই যেতে হলে আমাদের পেরিয়েই ওকে যেতে হত। কিন্তু অবিলম্বেই এই কথা মনে হতে ভয়ানক দমে গেলাম যে আমি না ফেরা পর্যন্ত ও হয়ত সিঁড়িতে কোথাও লুকিয়ে থেকে অপেক্ষা করেছে, তারপর পালিয়েছে, দেখতে পাই নি। তাহলেও বেশি দূর যাওয়া ওর সম্ভব নয়।

ভয়ানক অস্থির হয়ে আবার ছুটলাম ওর খোঁজে, ও যদি ফেরে এই ভেবে ঘরে চাবি দিলাম না।

সর্বাগ্রে গেলাম মাসলবোয়েভদের ওখানে। বাসায় না মাসলবোয়েভ, না আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা, কাউকে পেলাম না। একটা চিরকুট লিখে রেখে এলাম, তাতে এই নতুন বিপদের কথা জানিয়ে অনুরোধ করলাম, নেল্লী যদি আসে, তাহলে আমায় যেন তৎক্ষণাৎ জানায়। তারপর গেলাম ডাক্তারের কাছে, তিনিও বাসায় ছিলেন না। চাকরানী জানাল, সকাল বেলার পরে নেল্লী আর আসে নি। কী করি? গেলাম বুবনভার ওখানে। আমার পূর্বপরিচিত কফিন-মিস্ত্রির বউয়ের কাছ থেকে শুনলাম বাড়িউলীটি গত কাল থেকে কেন জানি থানায় আটক আছে। আর সে-ই দিন থেকে নেল্লীকে ওখানে আর দেখা যায় নি। ক্লান্ত অবসন্ন অবস্থায় ফের গেলাম মাসলবোয়েভদের ওখানে, সেখানেও একই জবাব — আসে নি কেউ, মাসলবোয়েভরাও বাড়ি ফেরে নি। আমার চিরকুটটা টেবিলেই পড়ে আছে। কী করা যায়?

বেশ রাত করে বাড়ি ফিরছিলাম। মনটা ভয়ানক খারাপ। সন্ধ্যায় নাতাশার কাছে যাওয়া উচিত ছিল, নাতাশা নিজেই বলে পাঠিয়েছিল সকালে। কিন্তু সারাদিন ধরে এতটুকু খাবার পর্যন্ত পেটে পড়ে নি। নেল্লীর কথা ভেবে আমার সমস্ত বুক তোলপাড় করছিল। ভেবে পাচ্ছিলাম না, কী এর মানে? ওর রোগেরই কোনো একটা বিচিত্র পরিণাম নয়ত? ও পাগলই হয়ে গেছে, নাকি হতে চলেছে? কিন্তু হায় ভগবান, ও গেল কোথায়? কোথায় খুঁজি ওকে?

মনে মনে কথাগুলো ভাবতে না ভাবতে দেখি, আমার কাছ থেকে কয়েক পা দূরে, ব্রিজের ওপর নেল্লী। রাস্তার একটা ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়িয়েছিল সে, আমায় দেখতে পায় নি। ছুটে যেতে গিয়ে সংযত করলাম নিজেকে।

"এখানে ও করছে কী?" ভেবে পেলাম না। আর ওকে ছাড়ছি না এইটে ঠিক করে নিয়ে স্থির করলাম অপেক্ষা করে দেখা যাক কী করে। মিনিট দশেক কেটে গেল, ও দাঁড়িয়েই আছে, পথচারীদের লক্ষ্য করছে। অবশেষে সুবেশধারী একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক যখন যাচ্ছিলেন তখন নেল্লী ওঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ভদ্রলোক না থেমে পকেট থেকে কী একটা বার করে দিলেন নেল্লীকে। নেল্লী মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলে। সে মুহূর্তে আমার যা মনের অবস্থা হল তা বলার নয়। যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠল আমার ভেতরটা। আমার কাছে আদরণীয় কিছু, যা আমি ভালোবেসেছি, মাথায় করে রেখেছি, স্বপ্ন গড়েছি, এমন একটা কিছুকে যেন সেই মুহূর্তে মসীলিপ্ত করে থুতু ফেলা হচ্ছে আমার চোখের সামনেই। সেই সঙ্গে অনুভব করলাম গাল বেয়ে জল পড়ছে আমার।

হ্যাঁ, বেচারি নেল্লীর জন্যে চোখের জল, যদিও সেই মুহূর্তেই রাগে রিরি করছিল শরীর: নেল্লী এই যে ভিক্ষা করছে সে তো অভাবে পড়ে নয়, তাকে তো কেউ ত্যাগ করে নি, ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেয় নি; নির্মম পীড়কদের হাত থেকে তো সে পালাচ্ছে না, পালাচ্ছে আপন বন্ধুদের কাছ থেকেই, যারা তাকে ভালোবাসে, বুকে করে রাখে। যেন ও তার এই কীর্তি দেখিয়ে কাউকে স্তম্ভিত আতঙ্কিত করতে চায়, যেন এই নিয়ে বড়াই করছে কারো কাছে! কিন্তু মনের মধ্যেও ওর গোপন কিছু একটাও পরিণত হয়ে উঠেছে... হ্যাঁ, ইখমেনেভ ঠিক কথাই বলেছিলেন — ঘা খেয়েছে নেল্লী, ক্ষত ওর শুকতে পারে না, আর ওর এই রহস্যময়তা আমাদের সকলের প্রতি ওর এই অবিশ্বাস দিয়ে সে ক্ষতটাকে ও যেন ইচ্ছে করেই বাড়িয়ে তুলতে চাইছে। ও যেন তার আপন ব্যথায়, বলা যেতে পারে "যন্ত্রণার অহমিকায়", তৃপ্তি লাভ করছে, যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে তুলে তা থেকে তৃপ্তি পাবার এই ব্যাপারটা আমি বুঝি। আহত লাঞ্ছিত যারা, ভাগ্যের হাতে যারা মার খেয়েছে, জানে ভাগ্য তার প্রতি অন্যায় করছে, এমন অনেকের কাছেই ওই হল এক আনন্দ। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে কোন অন্যায়ের অভিযোগ আনতে পারে নেল্লী? এ যেন তার খামখেয়াল আর উদ্দাম বেয়াদবি দিয়ে নেল্লী আমাদের স্তম্ভিত আতঙ্কিত করে তুলতে চায়, যেন সত্যি করেই আমাদের সামনে বড়াই করারই ওর ইচ্ছা... কিন্তু না তো, ও তো এখন একা, আমাদের কেউ তো দেখছে না যে ও ভিক্ষে করছে। নিজেকে দেখিয়েই কি আনন্দ পাচ্ছে ভিক্ষায়? এ ভিক্ষার প্রয়োজন কী ওর, কী দরকার ওর টাকার?

ভিক্ষে শেষ করে ও ব্রিজ ছেড়ে দিয়ে হে'টে গেল একটা দোকানের আলোঝলমল জানলার কাছে। সেখানে ও তার তহবিল গুণতে শুরু করলে। আমি দাঁড়িয়েছিলাম দশ-বারো পা দূরে। হাতে ওর বেশকিছু পয়সা, বোঝাই যায় ভিক্ষে করছিল সকাল থেকে। পয়সাগুলো মুঠো করে ধরে ও রাস্তা পেরিয়ে ঢুকল একটা ছোটো দোকানে। তৎক্ষণাৎ আমি দোকানের হাট করে খোলা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখতে লাগলাম, সেখানে ও কী করতে চায়।

দেখলাম পয়সাটা ও দিলে কাউণ্টারে আর নিলে একটা কাপ, সাদামাঠা চায়ের কাপ একটা, ও কত খারাপ তা ইখমেনেভ আর আমার কাছে প্রমাণ করার জন্যে সকালে যে কাপটা ও ভেঙেছিল প্রায় তারই মতো। কাপটার দাম হয়ত পনের কোপেক, হয়ত আরো কম। দোকানী কাগজে মুড়ে বে'ধে সেটিকে নেল্লীর হাতে দিল। সন্তুষ্ট মুখে নেল্লী দ্রুত বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

কাছাকাছি আসতেই চে'চিয়ে উঠলাম, 'নেল্লী! নেল্লী!'

ও চমকে উঠে তাকালে আমার দিকে। কাপটা হাত ফসকে পেভমেণ্টের ওপর পড়ে ভেঙে গেল। ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল নেল্লী, কিন্তু আমার দিকে চেয়ে ও যখন বুঝলে আমি সবই দেখেছি, টের পেয়েছি, তখন হঠাৎ লাল হয়ে উঠল। এ লালিমায় ফুটে উঠেছিল অসহ্য, যন্ত্রণাকর একটা লজ্জা। হাত ধরে ওকে বাড়ি নিয়ে এলাম। পথটা বেশি ছিল না। রাস্তায় একটা কথাও আমরা কইলাম না। বাড়ি এসে আমি বসলাম, নেল্লী দাঁড়িয়ে রইল মাটির দিকে তাকিয়ে, বিব্রত চিন্তিতভাবে, আগের মতোই ফ্যাকাশে। চোখ নামানো মাটির দিকে, আমার পানে চাইতে পারছিল না।

'নেল্লী, ভিক্ষে করছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ!' ফিসফিসিয়ে বললে ও। মুখখানা ওর আরো নিচে নুয়ে এল।

'সকালে যে কাপটা ভেঙেছ তার জন্যে পয়সা জোগাড় করছিলে?'

'হ্যাঁ...'

'কিন্তু তোমাকে আমি বকেছি কি, ধমকেছি কি ওই কাপটার জন্যে? সত্যি কি বুঝতে পারছ না নেল্লী, তোমার ব্যবহারটা কীরকম খারাপ হয়েছিল, কীরকম বিদঘুটে রকমের খারাপ? এটা কি ভালো? লজ্জা হচ্ছে না তোমার? তুমি কি...'

'হচ্ছে...' ও বললে ফিসফিস করে, গলার স্বর প্রায় শোনাই গেল না। গাল বেয়ে নামল একটি অশ্রুবিন্দু।

'লজ্জা হচ্ছে...' পুনরুক্তি করলাম আমি, 'নেল্লী লক্ষ্মীটি, তোমার ওপর যদি অন্যায় করে থাকি মাপ ক'রো। এসো মিটমাট করে নিই।'

আমার দিকে চাইলে ও। অঝোরে জল ঝরল ওর দু'চোখ দিয়ে। আমার বুকে ও ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ঠিক সেই মুহূর্তে ছুটে এল আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা।

'কী ব্যাপার? ফিরেছে? আবার সেই? ও নেল্লী, কী শুরু করেছিস নেল্লী? যাক বাপু, ভালোয় ভালোয় বাড়ি তো ফিরেছে... কোথায় পেলেন ওকে, ইভান পেত্রোভিচ?'

আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনাকে আমি চোখ টিপে বারণ করলাম যেন কোনো জিজ্ঞাসাবাদ না করে, ও সেটা বুঝল। নেল্লী তখনো ভারি কাঁদছিল। আদর করে ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সহৃদয়া আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনাকে বলে গেলাম, আমি না ফেরা পর্যন্ত যেন সে নেল্লীর কাছে থাকে। ছুটলাম নাতাশার কাছে।

দেরি হয়ে গিয়েছিল, তাই তাড়া ছিল আমার।

আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছিল এই সন্ধ্যেতেই; নাতাশার সঙ্গে অনেককিছু বলা-কওয়ার ছিল, তবু ওর ফাঁকে নেল্লীর কথাটা একটু তুললাম আমি, যা ঘটেছিল সবিস্তারে সব জানালাম নাতাশাকে। আমার কাহিনীতে নাতাশা খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠল, এমনকি স্তম্ভিতই হল।

একটু ভেবে ও বললে, 'কী জানো ভানিয়া, আমার মনে হয় ও তোমার প্রেমে পড়েছে।'

'কী বললে... সে কী করে হয়?' বললাম অবাক হয়ে।

'হ্যাঁ, এটা প্রেমের শুরু, সত্যি সত্যিই এক নারীর প্রেমের শুরু...'

'কী বলছ নাতাশা, খুব হয়েছে! ও তো এখনো ছেলেমানুষ!'

'শিগ্‌গিরই যে চোদ্দয় পড়বে। ওর জ্বালা এই জন্যে যে তুমি ওর ভালোবাসাটা বোঝো না, আর হয়ত-বা নিজেকেও সে এখনো বোঝে না। এ জ্বালার মধ্যে অনেককিছুই আছে ছেলেমানুষী, তবু সেটা গভীর আর যন্ত্রণাকর। সবচেয়ে বড়ো কথা, ওর ঈর্ষা হচ্ছে আমাকে। তুমি আমায় এত ভালোবাসো যে নিশ্চয় বাড়িতে থাকলেও আমার কথা নিয়েই চিন্তাভাবনা করো, আলাপ করো, এবং ওর দিকে যথেষ্ট নজর দাও না। সেটা ও লক্ষ্য

করেছে আর এইটেই খুব মনে লেগেছে ওর। হয়ত ওর ইচ্ছে তোমার সঙ্গে কথা কয়, তোমার কাছে নিজের মনটা মেলে ধরার তাগিদ বোধ করে কিন্তু পারে না, লজ্জা পায়, নিজেকেই নিজে বোঝে না, একটু সুযোগের আশায় আছে আর তুমি সে সুযোগ ওকে না দিয়ে বরং দূরে সরে থাকছ, ছুটে আসছ আমার কাছে, এমনকি ওর অসুখের সময়েও দিনের পর দিন ওকে একলা ফেলে রেখে গেছ। সেই জন্যেই ওর কান্না। ও তোমায় পাচ্ছে না আর তুমি যে সেটা খেয়াল করছ না সেইটেই ওর বড়ো ব্যথা। এমনকি এখনি, এইরকম এক মুহূর্তেও তুমি ওকে একলা ফেলে রেখে এলে আমার কাছে। এর জন্যেই দেখো, কালই অসুখ হবে ওর। আর তুমিই বা কী বলে ফেলে রেখে এলে ওকে? এক্ষুনি ফিরে যাও...'

'রেখে আসতাম না, কিন্তু...'

'হ্যাঁ জানি, আমিই তোমায় আসতে বলেছিলাম। কিন্তু এখন যাও।'

'যাচ্ছি, কিন্তু এর কিছুই অবিশ্যি আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'তার কারণ ওর ব্যাপারটা অন্য সকলকার চেয়ে একটু আলাদা। ওর কাহিনীটা মনে করো, সবটা ভেবে দ্যাখো, তাহলে বিশ্বাস হবে। তোমার আমার মতো করে তো আর ওর ছেলেবেলাটা কাটে নি...'

তাসত্ত্বেও বাড়ি ফিরতে দেরি হল। আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা বললে, আগের দিনকার সন্ধ্যের মতো আজও নেল্লী খুব কেঁদেছে, 'কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়েছে' সেদিনকার মতোই। 'এবার কিন্তু আমায় যেতে হবে ইভান পেত্রোভিচ, ফিলিপ ফিলিপিচও তাই বলে দিয়েছে। বেচারি আমার পথ চেয়ে আছে।'

ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বসলাম নেল্লীর শিয়রের কাছে। এইরকম একটা সময়ে ওকে ফেলে রেখে গিয়েছিলাম বলে নিজেরই কষ্ট হচ্ছিল আমার। বহুক্ষণ ধরে, গভীর রাত পর্যন্ত আমি ওর পাশে বসে চিন্তায় ডুবে রইলাম... তখন সময়টা যাচ্ছিল নিদারুণ।

কিন্তু এই দু'সপ্তাহে যা-যা ঘটেছিল সেটা আগে বলে নিতে হয়...

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রিন্স ভালকোভস্কির সঙ্গে রেস্তোরাঁয় আমার কাছে সেই স্মরণীয় সন্ধ্যেটির পর থেকে নাতাশার কথা ভেবে কয়েকদিন খুব ভয়ে ভয়ে কেটেছিল। প্রতিমুহূর্তে নিজেকে প্রশ্ন করেছি, "দুরাত্মা প্রিন্সটির কাছ থেকে কী বিপদ

আছে নাতাশার এবং ঠিক কী উপায়ে প্রতিশোধ নেবেন?" নানারকম অনুমানের মধ্যে গুলিয়ে যেতাম। শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এলাম যে প্রিন্সের হুমকিটা মোটেই বাজে কথা কিছু নয়, বাগাড়ম্বর নয়। আলিওশা যতদিন নাতাশার সঙ্গে থাকছে, ততদিন উনি সত্যি করেই নানা উপদ্রব করতে পারেন। ভেবে দেখলাম, লোকটা নীচমনা, প্রতিহিংসাপরায়ণ, ক্রূর এবং ফন্দিবাজ। অপমানের কথা উনি ভুলে যাবেন, শোধ তোলার কোনো একটা সুযোগ পেলেও ছেড়ে দেবেন, এ প্রায় অসম্ভব। মোটের ওপর অন্তত একটা কথা উনি আমায় বলেছেন এবং বেশ স্পষ্ট করেই তাঁর মত জানিয়ে দিয়েছেন। ওঁর জিদ, নাতাশার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে আলিওশাকে এবং আশা করেন এই আসন্ন বিচ্ছেদের জন্যে নাতাশাকে আমি প্রস্তুত করে রাখব এমনভাবে যাতে 'কোনো নাটক, কোনো রাখালিয়া পদাবলী বা শিলারপনা না হয়'। প্রধান দুশ্চিন্তা অবশ্য ওঁর এই, আলিওশা যেন ওঁর ওপর প্রসন্ন থাকে, স্নেহময় পিতা বলেই যেন ওঁকে ভাবে। ভবিষ্যতে কাতিয়ার টাকাটা সহজে হাত করতে হলে এটি ওঁর পক্ষে ভারি প্রয়োজন। তাই আসন্ন বিচ্ছেদের জন্যে নাতাশাকে তৈরি করার দায়িত্ব নিতে হয় আমায়। কিন্তু নাতাশার মধ্যে ভারি একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। আমার সঙ্গে তার সেই আগের খোলামেলা সম্পর্কের চিহ্ন মাত্র আর ছিল না, শুধু তাই নয়, আমার সম্পর্কেও যেন অবিশ্বাসীই হয়ে উঠেছিল। ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে গেলে তাতে শুধু ওর ব্যথাই বাড়ত। প্রশ্ন করলে ক্রমেই বিরক্ত হত, এমনকি রেগেও উঠত। মাঝে মাঝে ওর ঘরে বসে ওকে লক্ষ্য করে দেখতাম: হাত আড়াআড়ি গুটিয়ে বিবর্ণ বিষণ্ণভাবে ও পায়চারি করে যেত ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণ। কিছুরই যেন খেয়াল নেই, এমনকি আমি যে এখানে, ওর কাছেই আছি তাও যেন ভুলে গেছে। হঠাৎ যদি-বা চোখ পড়ত আমার দিকে (আমার চোখাচোখি হতেও সে চাইত না), তাহলে ওর মুখে ফুটে উঠত একটা অধীর বিরক্তির ছাপ, সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিত ও। বুঝেছিলাম, আসন্ন বিচ্ছেদের জন্যে ও নিজেই বোধ হয় একটা উপায় খুঁজছে, আর সেটা বিনা যন্ত্রণায়, বিনা তিক্ততায় ভাবতে পারে কি? বিচ্ছেদের জন্যে ও যে মন তৈরি করে নিয়েছে তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। তবু ওর এই বিমর্ষ হতাশায় কষ্ট হত আমার, ভয় পেতাম। তাছাড়া মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে কথা কইতে কি সান্ত্বনা দিতেও ভরসা পেতাম না। তাই আতঙ্কে কাল গুণছিলাম, শেষটা কী হবে।

আমার প্রতি ওর কঠোর বিরাগটায় যদিও অস্থির লাগত, কষ্ট হত তাহলেও আমার নাতাশার হৃদয়টা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ছিলাম, দেখছিলাম ও সাংঘাতিক কষ্ট পাচ্ছে, বড়ো বেশি বিচলিত হয়ে আছে। বাইরেকার কোনো হস্তক্ষেপে ওর বিরক্তি আর রাগই বেড়ে যেত শুধু। এইসব ক্ষেত্রে গোপনীয় সব কিছু যারা জানে তেমন অন্তরঙ্গ কেউ হস্তক্ষেপ করতে এলেই বিরক্তি লাগে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এও ভালো করে জানতাম, শেষ মুহূর্তটিতে নাতাশা ফের আমার কাছেই আসবে, আমার হৃদয়ের মধ্যেই সান্ত্বনা খুঁজবে।

প্রিন্সের সঙ্গে আমার যে আলাপ হয়েছিল, সেকথা ওকে অবশ্য কিছুই বলি নি। বললে শুধু ওর অস্থিরতা আর কষ্টই বাড়ত। আমি শুধু প্রসঙ্গক্রমে বলে রেখেছিলাম যে প্রিন্সের সঙ্গে আমি কাউন্টেসের বাড়ি গিয়েছিলাম, এবং নিঃসন্দেহ হয়েছি যে লোকটি সাংঘাতিক নচ্ছার। নাতাশা কিন্তু সে সম্পর্কে আর কিছু প্রশ্নও করে নি, তাতে খুশিই হয়েছিলাম আমি। তবে কাতিয়ার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ঘটনাটা ও শুনলে তৃষিতের মতো। সবটা শোনার পর কাতিয়া সম্পর্কেও কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলে না; শুধু ওর বিবর্ণ মুখটা আরক্ত হয়ে গেল। সারাটা দিন ও রইল একটু বিশেষ রকমের উত্তেজনায়। কাতিয়া সম্পর্কে আমি কিছুই লুকোই নি, খোলাখুলি স্বীকার করেছিলাম যে আমার কাছেও ওকে চমৎকার লেগেছে। তাছাড়া লুকিয়ে লাভ কী? নাতাশা তো ধরতেই পারত যে আমি কিছু চেপে রাখছি, তাতে শুধু চটেই যেত ও। তাই ইচ্ছে করেই যথাসাধ্য সবখানি বললাম ওকে, ও যা-যা জিজ্ঞেস করতে পারে এমন সমস্ত কথাই, কেননা বিশেষ করে ওর যা অবস্থা তাতে ওর পক্ষে প্রশ্ন করা কঠিন হত: নির্বিকার ভাব করে প্রতিদ্বন্দ্বিনীর গুণের কথা জানতে চাওয়া কি আর সহজ?

ভেবেছিলাম, ও বুঝি এখনো একথা জানে না যে প্রিন্সের পরিষ্কার নির্দেশ, কাউন্টেস আর কাতিয়ার সঙ্গে আলিওশাকেও গ্রামে যেতে হবে। ওর আঘাতটা যথাসাধ্য নরম করে কীভাবে কথাটা পাড়া যায় ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু দেখে ভয়ানক অবাক হয়ে গেলাম যে, কথাটা তুলতেই নাতাশা আমায় থামিয়ে দিয়ে বললে ওকে সান্ত্বনা দেবার প্রয়োজন নেই, পাঁচ দিন আগে থেকেই সে সব জানে।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'সেকী! কে বললে?'

'আলিওশা।'

'তার মানে? তোমায় বলে রেখেছে?'

'হ্যাঁ। আর আমিও সব স্থির করে নিয়েছি ভানিয়া।' ও বললে যে ভাব করে তাতে পরিষ্কার এবং কেমন একটা অসহিষ্ণু নির্দেশ ছিল যেন ও আলাপটা আমি আর না চালাই।

নাতাশার কাছে আলিওশা আসত প্রায়ই, কিন্তু কেবল মিনিট দুই-একের মতো। শুধু একবার ও ছিল বেশ কয়েক ঘণ্টা, কিন্তু সে সময় আমি ছিলাম না সেখানে। সাধারণত ও আসত মনমরার মতো, ভীরু-ভীরু ভাব করে সস্নেহে চাইত নাতাশার দিকে। কিন্তু নাতাশা ওকে নিত এমন আদরে, এমন মিষ্টি করে যে ও ততক্ষণাৎ সবকিছু ভুলে হাসিখুশি হয়ে উঠত। আমার বাসাতেও ঘন ঘন আসতে শুরু করেছিল আলিওশা, প্রায় প্রত্যেক দিনই। ভারি মনঃকষ্ট যাচ্ছিল ওর তা সত্যি, কিন্তু দুঃখ নিয়ে একাকী থাকতে ও পারত না, ক্ষণে ক্ষণে আমার কাছে ছুটে আসত সান্ত্বনার জন্যে।

কিন্তু কী ওকে বলব আমি? ও অভিযোগ করত যে আমি নিরুত্তাপ, নিস্পৃহ, ওর ওপর এমনকি রাগই আছে আমার। দুঃখ করত ও, চোখের জল ফেলত, তারপর চলে যেত কাতিয়ার কাছে, সান্ত্বনা পেত সেখানে।

নাতাশা যেদিন আমায় বললে যে আলিওশা চলে যাচ্ছে তা সে জানে (সেটা প্রিন্সের সঙ্গে আমার আলাপের এক সপ্তাহ পরে) সেদিন আলিওশা আমার কাছে ছুটে এসেছিল হতাশ হয়ে। আমাকে জড়িয়ে ধরলে, বুকের ওপর মাথা রেখে ফোঁপালে ছেলেমানুষের মতো। ও কী বলে শোনার জন্যে নীরবে অপেক্ষা করছিলাম আমি।

বললে, 'আমি নীচ, পাষণ্ড, ভানিয়া। আমার নিজের কাছ থেকেই আমায় বাঁচাও। আমি যে নীচ, পাষণ্ড, তার জন্যে কিন্তু কাঁদছি না, কাঁদছি এই জন্যে যে আমিই হব নাতাশার কষ্টের কারণ। নাতাশাকে দুঃখকষ্টে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছি আমি... ভানিয়া, বন্ধু আমার, বলো আমায়, আমার হয়ে ঠিক করে দাও কাকে আমি বেশি ভালোবাসি, নাতাশাকে না কাতিয়াকে?'

'সেকথা আমি বলব কী করে আলিওশা,' জবাব দিলাম, 'তুমিই তা ভালো জানো...'

'না ভানিয়া, ও কথা নয়, ও কথা জিজ্ঞেস করব এত বোকা আমি নই। কিন্তু আসল মুশকিলটা এই যে আমি নিজেই সেটা জানি না। মনে মনে ভাবি, কিন্তু জবাব পাই না। কিন্তু তুমি বাইরে থেকে দেখছ। আমার চেয়ে হয়ত অনেক বেশি জানো, না জানলেও অন্তত বলো, কী মনে হচ্ছে তোমার?'

'আমার মনে হচ্ছে, কাতিয়াকেই তুমি বেশি ভালোবাসো।'

'তাই মনে হচ্ছে তোমার? না, না, মোটেই না! একেবারেই ধরতে পারো নি তুমি। নাতাশাকে আমি অপরিসীম ভালোবাসি। ওকে আমি কিছুর জন্যেই কখনোই ছাড়তে পারব না, কাতিয়াকে আমি তা বলেছি, পুরোপুরি ও আমার সঙ্গে একমত। চুপ করে আছো যে? দেখলাম এখনি হাসলে। এহ্, ভানিয়া, আমি খুব কষ্ট পেলেও কখনো তুমি আমায় সান্ত্বনা দাও নি, যেমন কষ্ট পাচ্ছি এখন... চললাম!'

নীরবে আমাদের কথাগুলো শুনছিল নেল্লী। ওকে অবাক করে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল আলিওশা। তখনো নেল্লী অসুস্থ, শয্যাশায়ী, ওষুধ খাচ্ছে। আলিওশা ওর সঙ্গে কখনো কথা কইত না, আমার এখানে এলে প্রায় নজরই করত না ওকে।

দুই ঘণ্টা পরে ফের আবির্ভূত হল আলিওশা। অবাক হয়ে গেলাম ওর খুশি-খুশি মুখ দেখে। গলা জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলে আমায়।

চেঁচিয়ে বললে, 'ফয়সালা হয়ে গেল, ভুল বোঝাবুঝি সব মিটে গেল। তোমার এখান থেকে সোজা চলে গিয়েছিলাম নাতাশার কাছে। খুব মুষড়ে পড়েছিলাম, ওকে নইলে চলছিল না। ঘরে ঢুকে হাঁটু গেড়ে বসে ওর পায়ে চুমু খেতে লাগলাম। এ আমায় করতেই হত, ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল, নইলে মনের দুঃখে মরেই যেতাম। কথা না বলে ও আমায় জড়িয়ে ধরে কাঁদল। আমি তখন সোজাসুজি ওকে বললাম যে ওর চেয়েও আমি কাতিয়াকে বেশি ভালোবাসি...'

'কী বললে ও?'

'কিছুই বললে না। আমায় কেবল আদর করলে, সান্ত্বনা দিলে — আর সেটা কিনা আমায় যে ঐ কথা বলেছে! কী করে প্রবোধ দিতে হয় তা ও জানে বটে ইভান পেত্রোভিচ! আমার সব দুঃখ কেঁদে কেঁদে আমি উজাড় করে দিলাম ওর কাছে, সবকিছু বললাম। অকপটে ওকে বললাম যে, আমি ভয়ানক ভালোবাসি কাতিয়াকে, কিন্তু যতই ভালোবাসি, যাকেই ভালোবাসি না কেন, নাতাশাকে ছাড়া আমার চলবে না, আমি মরব। হ্যাঁ ভানিয়া, ওকে ছাড়া একদিনও আমি বাঁচব না। সেটা বেশ টের পাচ্ছি, সত্যি। তাই আমরা ঠিক করলাম, অবিলম্বে বিয়ে করে ফেলতে হবে। কিন্তু আমি চলে যাবার আগে তা হয় না, কেননা এখন লেণ্ট পরব, লেণ্ট পরবের মধ্যে তো বিয়ে হয় না, তাই ঠিক করলাম বিয়েটা করা যাবে ফিরে এলেই, সেটা হবে পয়লা জুন

নাগাদ। বাবা মত দেবেন, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। আর কাতিয়া, সে কী করা যাবে! নাতাশাকে ছাড়া আমি যে বাঁচতে পারব না... বিয়ে করেই নাতাশাকে নিয়ে আমরা যাব কাতিয়ার কাছে...'

বেচারী নাতাশা! এই বালকটিকে সান্ত্বনা দিতে, তার কাছে বসে বসে তার স্বীকারোক্তি শুনে সরলমনা এই স্বার্থপরটিকে শান্ত করার জন্যে আসন্ন বিয়ের এই রূপকথাটি আবিষ্কার করতে কী না করতে হয়েছে নাতাশাকে। কয়েকদিনের জন্যে সত্যি করেই শান্তি পেলে আলিওশা। ওর দুর্বল হৃদয় দুঃখটা একা সইতে পারে না বলেই ও নাতাশার কাছে যেত, তবু যতই তাদের বিচ্ছেদের সময় ঘনিয়ে আসতে লাগল, ততই ফের আলিওশার কান্না আর অস্থিরতা বাড়তে লাগল। ফের আমার কাছে এসে তার দুঃখ উজাড় করতে লাগল ও। ইদানীং নাতাশার প্রতি ওর অনুরাগ এতই বেড়েছিল যে, দেড় মাস তো দূরের কথা একদিনও তাকে ছেড়ে থাকতে পারছিল না। ওর অবিশ্যি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে নাতাশাকে ও ছেড়ে যাচ্ছে মাত্র দেড় মাসের জন্যে, ফিরে এলেই তাদের বিয়ে হবে। আর নাতাশা — সেও পরিষ্কার বুঝেছিল, তার গোটা ভাগ্যটাই এবার বদলে যাচ্ছে, আলিওশা আর কখনো ওর কাছে ফিরবে না এবং তাই হওয়া উচিত।

ওদের বিচ্ছেদের দিন এগিয়ে আসছিল। কেমন বিবর্ণ রুগ্ন হয়ে উঠল নাতাশা, চোখ দুটো উত্তপ্ত, ঠোঁট দুখানা শুকনো। থেকে থেকে ও নিজের মনেই কথা বলত, থেকে থেকে তীক্ষ্ম চকিত দৃষ্টি হানত আমার দিকে। কাঁদত না ও, আমার প্রশ্নের জবাব দিত না, শুধু দরজায় আলিওশার ঝঙ্কৃত কণ্ঠস্বর শুনলেই থরথর করে কেঁপে উঠত পাতার মতো। আগুনের মতো একটা আভায় আরক্তিম হয়ে উঠে ও ছুটে যেত তার কাছে, ক্ষেপার মতো ওকে জড়িয়ে ধরত, চুমু খেত, হাসত... আলিওশা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত সন্ধানী দৃষ্টি মেলে, মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করত ওর শরীর ভালো আছে কিনা, সান্ত্বনা দিয়ে বলত, বেশি দিনের জন্যে সে যাচ্ছে না, তারপরই তো তাদের বিয়ে! বোঝা যেত অতি কষ্টে নাতাশা নিজেকে সংযত করছে, চোখের জল চাপছে। ওর সামনে নাতাশা কাঁদত না।

একবার ও বলতে শুরু করেছিল যে ওর অনুপস্থিতিতে নাতাশার জন্যে টাকা রেখে যাওয়া দরকার, নাতাশার কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না, কেননা বাইরে যাওয়া উপলক্ষে ওর বাবা যথেষ্ট টাকা দেবেন বলেছেন। নাতাশা ভুরু কোঁচকাল।

আলিওশা চলে গেলে আমি নাতাশাকে বললাম, হঠাৎ দরকার পড়লে আমার কাছে দেড়শ' রুবল আছে ওর জন্যে। নাতাশা জিজ্ঞেস করলে না কোথা থেকে টাকাটা পেয়েছি। সেটা আলিওশার চলে যাবার দুদিন আগের ঘটনা, নাতাশা আর কাতিয়ার মধ্যে প্রথম আর শেষ যে সাক্ষাৎ হয় তার আগের দিন। আলিওশার হাত দিয়ে একটা চিরকুট পাঠিয়ে পরদিন নাতাশার সঙ্গে দেখা করতে আসার অনুমতি চেয়েছিল কাতিয়া। আমাকেও লিখেছিল যেন ওদের সাক্ষাতের সময় আমি উপস্থিত থাকি।

ঠিক করেছিলাম, যত বাধাই থাক বারোটায় (কাতিয়ার নির্ধারিত সময়ে) নাতাশার ওখানে আমায় থাকতেই হবে। বাধা আর ঝামেলা ছিল অনেক। নেল্লীর ব্যাপারটা ছাড়াও ইখমেনেভ দম্পতিকে নিয়ে ইদানীং আমার বেশ ঝামেলা যাচ্ছিল।

ঝামেলা শুরু হয়েছিল এক সপ্তাহ আগে থেকে। একদিন সকালে আন্না আন্দ্রেয়েভনা আমায় ডেকে পাঠান। বলে পাঠান সবকিছু ফেলে রেখে তক্ষুনি যেন তাঁর কাছে দ্রুত চলে আসি, অত্যন্ত জরুরী একটা ব্যাপার আছে, একটুও দেরি করার উপায় নেই। গিয়ে দেখি উনি একা। ঘরের মধ্যে উনি পায়চারি করছিলেন, ভয়ানক ব্যাকুল আর উদ্বিগ্ন হয়ে দুরু বুকে ভয় করছিলেন কখন তাঁর স্বামী এসে পড়েন। কী ব্যাপার, কিসে তাঁর অত ভয় সেকথা বার করতে যথারীতি বহু সময় লেগে গেল, অথচ স্পষ্টতই প্রত্যেকটা মুহূর্তই তখন খুব মূল্যবান। অবশেষে 'কেন আমি আসি না, কেন ওঁদের দুঃখের দিনে একলা ফেলে রেখে যাই অনাথের মতো', ফলে 'আমার অনুপস্থিতির মধ্যে কী যে ঘটছে তা ভগবানই জানেন' ইত্যাকার উত্তেজিত এবং ব্যাপারটার সঙ্গে সম্পর্কহীন তিরস্কারের পর উনি জানালেন যে, গত তিন দিন ধরে নিকোলাই সের্গেয়িচ এমন বিচলিত হয়ে আছেন যে 'তা আর বলার নয়'।

বললেন, 'উনি একেবারেই আর সে মানুষ নেই, ভারি ছটফটে। রাত্রে আমায় লুকিয়ে আইকনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করেন, ঘুমের মধ্যে কী যেন বকেন, আর এমনিতে যেন আধাপাগলা। কাল আমরা সুপ খাচ্ছিলাম, চামচেটা ওঁর পাশেই, কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পেলেন না। একথা জিজ্ঞেস করলে সে কথার উত্তর দেন। ক্ষণে ক্ষণে বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছেন, বলেন, "যাচ্ছি কেবল কাজে, উকিলের সঙ্গে দেখা করতে হবে।" শেষ পর্যন্ত আজ এই সকালে কাজের ঘরে দোর বন্ধ করে বসে রইলেন। বললেন, "মোকদ্দমা

সংক্রান্ত একটা দরকারী দলিল লিখতে হবে।" বটে, আমি মনে মনে ভাবি, প্লেটের পাশে চামচেটাও উনি খুঁজে পান না, আর কী দলিলটা উনি লিখবেন? চাবির ফুটোর মধ্যে দিয়ে আমি উঁকি দিয়ে দেখি, বসে বসে কী লিখছেন, আর দুচোখ বেয়ে জল পড়ছে। মনে মনে ভাবি, এমন করে দলিল আবার লেখে কে? নাকি আমাদের ইখমেনেভ্‌কার জন্যে তাঁর এতই দুঃখু। তার মানে ইখমেনেভ্‌কা আমাদের গেল চিরকালের মতোই! আমি তো এইসব ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ উনি লাফ দিয়ে উঠলেন টেবিল ছেড়ে, কলম ছুঁড়ে ফেললেন, মুখখানা টকটকে লাল, চোখ জ্বলছে। টুপিটা টেনে নিয়ে এলেন আমার কাছে। বললেন, "এখুনি আসছি আন্না আন্দ্রেয়েভনা।" উনি চলে যেতেই গেলাম ওঁর লেখার টেবিলের কাছে। মোকদ্দমার এত গাদা গাদা কাগজ পত্র থাকে ওখানে যে উনি কখনো আমায় হাত দিতে দিতেন না। কতবার বলেছি, "কাগজগুলো একবার তুলে টেবিলটার ধুলো ঝেড়ে দিই।" অমনি উনি চিৎকার শুরু করবেন, হাত নেড়ে বারণ করবেন। পিটার্সবুর্গে এসে ভারি অধৈর্য হয়ে উঠেছেন উনি, কেবলি চেঁচামেচি লাগান। তা আমি তো টেবিলের কাছে গিয়ে দেখতে লাগলাম, কী দলিল উনি এখন লিখছিলেন। আমি ঠিক জানতাম কাগজখানা উনি সঙ্গে নিয়ে যান নি, টেবিল ছেড়ে ওঠবার সময় অন্যান্য কাগজের তলে গুঁজে রেখেছেন। তারপর তো পেলাম এইটে, পড়ে দ্যাখো বাপু ইভান পেত্রোভিচ।'

উনি আমায় একখানা কাগজ দিলেন অর্ধেকটা লেখা, কিন্তু এত কাটাকুটি যে জায়গায় জায়গায় দুর্বোধ্য।

বেচারা বৃদ্ধ! প্রথম লাইন থেকেই বোঝা যায় কাকে লিখছেন, কী লিখছেন। এটা নাতাশার কাছে, তাঁর আদরের নাতাশার কাছে চিঠি। শুরু করেছিলেন বেশ আবেগভরে সস্নেহে। মার্জনা করে তিনি নাতাশাকে ডাকছেন বাড়ি ফিরে আসতে। পুরো চিঠিটা পড়া দুঃসাধ্য, ঝোঁকের মাথায় অগোছালো লেখা, অজস্র কাটাকুটি। শুধু বোঝা গেল যে, কলম তুলে নিয়ে প্রথম কয় ছত্রের মরমী কথাগুলো লিখে ফেলার তাগিদ এসেছিল যে ভাবাবেগ থেকে, তা শুরুর ওই কয় পঙ্‌ক্তির পরেই পরিণত হয়েছে একেবারে অন্যবিধে। বৃদ্ধ তিরস্কার করতে শুরু করেছেন কন্যাকে, তার অপরাধ বর্ণনা করেছেন ফলাও করে, সরোষে তার একগুঁয়েমির কথা তুলেছেন, তার হৃদয়হীনতার জন্যে এই ধিক্কার দিয়েছেন যে একবারও সম্ভবত সে ভাবে নি মা-বাপকে কী অবস্থায় ফেলছে। মেয়ের অহঙ্কারের জন্যে শাস্তি আর অভিশাপ দেবার

ভয় দেখিয়ে চিঠি শেষ হয়েছে এই দাবি করে, যেন সে অবিলম্বে বাধ্যের মতো বাড়ি ফেরে। লিখেছেন, তখন একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই, 'পরিবারের কোলে থেকে' বাধ্য ও দৃষ্টান্তস্থানীয় নতুন জীবনযাপনের হয়ত আমরা তোমায় ক্ষমা করব। বোঝা যাচ্ছিল, কয় ছত্র লেখার পর উনি ওঁর এই মহানুভবতাকে দুর্বলতা বলে মনে করেছেন, লজ্জা পেয়েছেন এবং পরিণামে আহত অহঙ্কারের দংশনে শেষ টেনেছেন রাগ দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে। দুই হাত জড়ো করে আন্না আন্দ্রেয়েভনা দাঁড়িয়েছিলেন আমার সামনে, চিঠিটা সম্পর্কে আমি কী বলি তা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন উৎকণ্ঠায়।

আমার কী মনে হচ্ছে সেটা ওঁকে বললাম খোলাখুলি; স্বামী ওঁর নাতাশাকে ছাড়া আর থাকতে পারছেন না, বেশ জোর দিয়েই বলা যায় যে ওঁদের দ্রুত মিলন অবশ্যম্ভাবী, যদিও সবকিছু নির্ভর করছে অবস্থাচক্রের ওপর। আমার অনুমানটাও তাঁকে জানালাম। প্রথমত, মোকদ্দমায় পরাজয়ে সম্ভবত তিনি খুবই ভেঙে পড়েছেন, ঝাঁকুনি খেয়েছেন, প্রিন্সের জয়লাভে তাঁর আত্মাভিমানে যে ঘা লেগেছে, যেভাবে মামলার ফয়সালা হয়েছে তাতে যে ঘৃণা বোধ করেছেন তিনি, সেকথা নয় বাদই দেওয়া গেল। এইরকম অবস্থায় প্রাণ একটু সহানুভূতি না চেয়ে পারে না, তাই যাকে তিনি দুনিয়ার সকলের চেয়ে ভালোবেসেছেন তারই কথা মনে হয়েছে তাঁর। তাছাড়া উনি সম্ভবত শুনেছেন (কেননা খবর সব তিনি রাখতেন, নাতাশার সবকথা জানতেন) যে, আলিওশা শিগ্‌গিরই নাতাশাকে ত্যাগ করবে। বুঝতে পারছিলেন, কী অবস্থা হবে নাতাশার, নিজেকে দিয়েই টের পাচ্ছিলেন নাতাশার পক্ষে সান্ত্বনা এখন কত দরকার। তাহলেও নিজেকে তিনি সামলাতে পারছেন না, ভাবছেন মেয়ে তাঁকে লাঞ্ছিত, অপমানিত করেছে। হয়ত তাঁর মনে হয়েছে, কই তাঁর মেয়ে তো প্রথম এগিয়ে এল না, হয়ত বা তাঁদের কথা ভাবছে না, মিটিয়ে নেবার দরকারই বোধ করছে না। নিশ্চয়ই ওঁর এই কথা মনে হয়েছিল, বললাম উপসংহার টেনে, সেই জন্যেই চিঠিটা শেষ করেন নি, আর এসবের ফলে হয়ত ফের একটা অপমানবোধ শুরু হবে ওঁর, প্রথমকার চেয়েও সেটা বিঁধবে বেশি, আর কে জানে, মিটমাটটা হয়ত বা পেছিয়ে যাবে অনেক দিন...

আমার কথা শুনতে শুনতে কাঁদলেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা। অবশেষে যখন বললাম, নাতাশার কাছে এক্ষুনি যেতে হবে, দেরি হয়ে গেছে, তখন উনি ধড়মড় উঠলেন, বললেন, প্রধান কথাটাই তিনি বলতে ভুলে গেছেন। কাগজের

স্তূপের মধ্যে থেকে চিঠিটা যখন টেনে বার করছিলেন তখন কালিটা উল্টে পড়ে যায়। চিঠির একটা কোণ সত্যিই পুরো কালি মাখা। কালির এই ছোপ দেখে স্বামী টের পেয়ে যাবেন যে তিনি তাঁর অনুপস্থিতিতে কাগজপত্র ঘেঁটেছেন, নাতাশার কাছে লেখা চিঠিটা পড়েছেন — এই হল বৃদ্ধার আতঙ্ক। সে আতঙ্কের রীতিমত কারণও আছে। আমরা তাঁর গোপন ব্যাপারটা জানি, এই একটা কারণেই উনি লজ্জায় বিরক্তিতে হয়ত-বা বেশি করে রাগ পুষে থাকবেন, অহঙ্কার করে একগুঁয়েমি করবেন ক্ষমার ব্যাপারে।

কিন্তু ব্যাপারটা দেখে শুনে আমি বৃদ্ধাকে বোঝালাম যে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। চিঠি লেখা ছেড়ে উনি উঠেছিলেন এতই বিচলিত হয়ে যে খুঁটিনাটি সবকিছু ওঁর মনে না থাকাই সম্ভব। খুব সম্ভবত এই কথাই ভাববেন যে নিজেই বোধ হয় কালি ফেলেছিলেন, ভুলে গেছেন সেটা। এই কথা বলে আন্না আন্দ্রেয়েভনাকে আশ্বস্ত করে চিঠিটা আমরা সাবধানে যথাস্থানে রেখে এলাম। যাবার সময় ঠিক করলাম, নেল্লী সম্পর্কে গুরুত্ব দিয়ে কথা বলে যাব। মনে হয়েছিল পরিত্যক্ত বেচারী এই অনাথিনীর নিজের মা-কেও অভিশাপ দিয়েছে তার পিতা, তার আগেকার জীবন আর মায়ের মৃত্যুর শোকাবহ কাহিনী বৃদ্ধের মর্ম স্পর্শ করতে পারে, উদারতা জেগে উঠবে তাঁর। সবই তো প্রস্তুত, মনের মধ্যে তাঁর সবই তো পরিপক্ক হয়ে উঠেছে: অহঙ্কার আর আহত আত্মসম্মানের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে মেয়ের জন্যে তাঁর মনঃকষ্ট। দরকার শুধু একটা ধাক্কার, শেষ একটা অনুকূল সুযোগের, সে সুযোগ দিতে পারে নেল্লী। অসাধারণ মনোযোগে বৃদ্ধা আমার কথা শুনলেন, আশায় উৎসাহে সারা মুখখানা ওঁর আলো হয়ে উঠছিল। সঙ্গে সঙ্গে উনি আমায় বকতে শুরু করলেন কেন এসব কথা ওঁকে আগে জানাই নি, নেল্লী সম্পর্কে অস্থির হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন এবং গম্ভীরভাবে শেষ করলেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে তিনি নিজেই স্বামীকে বলবেন যেন অনাথিনী মেয়েটিকে ওদের সংসারে নেওয়া হয়। নেল্লী সম্পর্কে সত্যি করেই একটা স্নেহ অনুভব করতে শুরু করেছিলেন উনি, অসুখ হয়েছে শুনে দুঃখ করলেন, নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন ওর সম্পর্কে, নিজেই ছুটে গিয়ে ভাঁড়ার ঘর থেকে আনলেন এক বয়াম জ্যাম এবং সেটি নেল্লীকে দেবার জন্যে জোর করে চাপালেন আমার ওপর, পাঁচটি রুবলও দিতে চাইলেন, ভাবলেন বোধ হয় ডাক্তার দেখাবার পয়সা আমার নেই, এবং তা প্রত্যাখ্যান করায় উনি কোনোক্রমে

শান্ত হলেন এই ভেবে যে নেল্লীর পোশাক-আশাকের দরকার, সেদিক থেকে তিনি সাহায্য করতে পারবেন। অতঃপর তৎক্ষণাৎ সিন্দুক খুলে তাঁর সবক'টি ড্রেস বার করে "অনাথ" মেয়েটিকে দেবার মতো এটা সেটা বাছতে লাগলেন।

আমি গেলাম নাতাশার কাছে। আগেই বলেছি নাতাশার ঘরে ওঠার শেষ সিঁড়িটা ঘোরানো। ওপরে ওঠার সময় দেখলাম একটা লোক দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়তে যাবে এমন সময় আমার পায়ের শব্দ শুনে থেমে গেল। তারপর খুব সম্ভব কিছুটা ইতস্তত করে লোকটা হঠাৎ সে ইচ্ছা দমন করে দ্রুত নেমে গেল। ওর সঙ্গে দেখা হল আমার সিঁড়ির শেষ ধাপে, এবং দেখে অবাক হয়ে গেলাম যে তিনি ইখমেনেভ। সিঁড়িটা দিনের বেলাতেও ভারি অন্ধকার। দেয়ালের সঙ্গে শিটিয়ে গিয়ে উনি আমায় যাবার জায়গা করে দিলেন। আমার দিকে তীক্ষ্ণভাবে উনি চেয়ে দেখেছিলেন। তাতে ওঁর চোখে যে একটা অদ্ভুত ঝিলিক দেখেছিলাম সেটা এখনো আমার মনে আছে। মনে হল উনি অত্যন্ত লাল হয়ে উঠেছেন, অন্তত পক্ষে ভয়ানক বিব্রত এমনকি হতভম্ব যে হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

স্খলিত কণ্ঠে বললেন, 'ও, ভানিয়া, তুমি নাকি। এখানে এসেছিলাম একজনের সঙ্গে দেখা করতে... একজন নকলনবীস মুহুরী... কাজ ছিল... সম্প্রতি বাড়ি বদল করে এসেছে... এদিকেই কোথাও... কিন্তু মনে হচ্ছে এখানে থাকে না। ঠিকানা ভুল হয়েছে আমার। চলি।'

দ্রুত উনি নামলেন সিঁড়ি বেয়ে।

ঠিক করলাম নাতাশাকে এই সাক্ষাৎকারের কথাটা আপাতত বলব না, কিন্তু অবশ্যই বলব আলিওশা চলে গেলে ও যখন একা পড়বে। এখন ও এত বিচলিত যে এই ব্যাপারটার পুরো গুরুত্ব টের পেলেও জিনিসটাকে তেমনভাবে গ্রহণ করতে বা বুঝতে পারবে না, যা সম্ভব পরে, ওর দুঃখ হতাশার চরম মুহূর্তটিতে। এখনো উপযুক্ত সময় আসে নি।

ইখমেনেভদের ওখানে সেদিন ফের যাওয়া যেত, যাবার খুব ইচ্ছেও হয়েছিল আমার, কিন্তু গেলাম না। মনে হল, আমায় দেখে বৃদ্ধ ভারি অস্বস্তি বোধ করবেন। এও ভাবতে পারেন যে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল বলেই বুঝি ইচ্ছে করে এলাম। দুদিন পরে ওঁদের কাছে দেখা করতে যাই। বৃদ্ধ খুব মনমরা ছিলেন, কিন্তু বেশ স্বচ্ছন্দ ভাব করেই আলাপ করলেন আমার সঙ্গে আর বললেন কেবল মোকদ্দমার কথাই।

'আচ্ছা, অত ওপর তলায় কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে সেদিন, মনে আছে, সেই যে দেখা হয়ে গেল, কবে বলো তো? পরশু, তাই না?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন উনি খানিকটা গা-ছাড়া ভাবে, যদিও আমার দিকে না তাকিয়ে চেয়েছিলেন অন্যদিকে।

আমিও অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে জবাব দিলাম, 'আমার চেনা একটি লোক থাকে ওখানে।'

'বটে। আমি কিন্তু খোঁজ করছিলাম আমার মুহুরী আস্তাফিয়েভ'এর। শুনেছিলাম ওই বাড়িতে থাকে... ঠিকানা ভুল হয়েছিল... যাক, তোমায় যা বলছিলাম: সেনেট থেকে ঠিক হয়েছে...' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মোকদ্দমার কথা বলতে গিয়ে উনি আরক্তই হয়ে উঠলেন।

আন্না আন্দ্রেয়েভনাকে খুশি করার জন্যে ঘটনাটা সেদিন সব ওঁকে জানাই এবং সেইসঙ্গে এই অনুরোধও করি যেন কোনোরকম অর্থপূর্ণভাবে উনি এখন স্বামীর দিকে না তাকাতে থাকেন, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা বা ইঙ্গিত করা শুরু না করেন, অর্থাৎ কোনোভাবেই যেন প্রকাশ না করেন যে তাঁর এই শেষতম কীর্তিটির কথাও উনি জানেন। বৃদ্ধা মহিলা এতই অবাক আর খুশি হয়েছিলেন যে প্রথমটা আমার কথাতে বিশ্বাস হচ্ছিল না তাঁর। ওদিকে তিনিও জানালেন, অনাথ মেয়েটি সম্পর্কে ইতিমধ্যেই তিনি ঠারেঠোরে নিকোলাই সের্গেয়িচের কাছে কথা তুলেছেন; উনি চুপ করে থেকেছেন, অথচ এর আগে মেয়েটিকে পুষ্যি নেবার জন্যে বলছিলেন নিজেই। ঠিক হল ঠারেঠোরে বা ইঙ্গিতে না বলে পরদিন খোলাখুলিই কথাটা তিনি বলবেন। কিন্তু পরদিন খুবই উদ্বেগ আর আতঙ্কের মধ্যে কাটল আমাদের।

মোকদ্দমার ভার যে উকিলটির ওপর ছিল, ইখমেনেভ তার সঙ্গে দেখা করেন সকালবেলায়। উকিলটি তাঁকে জানায় যে প্রিন্সের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। প্রিন্স নাকি ইখমেনেভ্‌কার স্বত্ব না ছাড়লেও 'কিছু পারিবারিক কারণের জন্যে' বৃদ্ধের ক্ষতিপূরণ করে দশ হাজার রুবল তাঁকে দেবেন ঠিক করেছেন। ভয়ানক বিচলিত হয়ে বৃদ্ধ সোজা এসে হাজির হলেন আমার কাছে। দু'চোখ রাগে জ্বলছে। কেন জানি না, বাসা থেকে আমায় বার করে ডেকে নিয়ে এলেন সিঁড়ির কাছে এবং জিদ ধরলেন, আমায় তক্ষুনি প্রিন্সের কাছে গিয়ে ডুয়েলের চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে। এমন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম যে বহুক্ষণ লাগল মাথা ঠিক করতে। ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু

বৃদ্ধ এমন ক্ষেপে উঠেছিলেন যে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এক গ্লাস জল আনবার জন্যে আমি ছুটলাম আমার ফ্ল্যাটে, কিন্তু ফিরে এসে ইখমেনেভকে আর সিঁড়িতে পাওয়া গেল না।

পরদিন দেখা করতে গেলাম। বাড়িতে ছিলেন না উনি। পুরো তিনদিন ওঁর কোনো পাত্তা মিলল না।

তৃতীয় দিনে জানা গেল কী ঘটেছিল। আমার কাছ থেকে উনি সোজা ছুটে গিয়েছিলেন প্রিন্সের কাছে, তাঁকে বাড়িতে না পেয়ে চিরকুট লিখে আসেন। চিরকুটে জানান যে উকিলের কাছে প্রিন্স যা বলেছেন তা তিনি শুনেছেন। সেটিকে এক মর্মান্তিক অপমান বলে তিনি জ্ঞান করছেন এবং প্রিন্সকে গণ্য করেছেন এক নীচ লোক বলে। এইসব কারণে তিনি প্রিন্সকে আহ্বান করছেন ডুয়েলে, এবং হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে প্রিন্স যদি সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন তাহলে জনসমক্ষে তিনি হৃতমান হবেন।

আন্না আন্দ্রেয়েভনা বললেন, উনি এমন বিচলিত, উত্তেজিত হয়ে বাড়ি ফেরেন যে তাঁকে বিছানাই নিতে হয়। আন্না আন্দ্রেয়েভনার সঙ্গে উনি ভারি কোমল ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু তাঁর কোনো প্রশ্নের জবাবই প্রায় দেন নি, বোঝা যাচ্ছিল অধীর হয়ে কিসের যেন অপেক্ষা করছেন। পরদিন একটি চিঠি আসে ডাকযোগে। চিঠিটা পড়ে উনি চিৎকার করে উঠে মাথা চেপে ধরেন। ভয়ে হিম হয়ে যান আন্না আন্দ্রেয়েভনা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই টুপি ছড়ি নিয়ে উনি বেরিয়ে যান।

চিঠিটা এসেছিল প্রিন্সের কাছ থেকে। শুষ্ক সংক্ষিপ্ত ও ভদ্রভাবে প্রিন্স ইখমেনেভকে জানিয়ে দেন যে তিনি উকিলের কাছে কী বলেছেন না বলেছেন তার জবাবদিহি করতে কারো কাছে বাধ্য নন, এবং মোকদ্দমায় হেরে যাওয়ার জন্যে ইখমেনেভের প্রতি তাঁর প্রচুর সহানুভূতি থাকলেও তিনি মনে করেন না, মোকদ্দমায় হেরে যাওয়া কোনো ব্যক্তি প্রতিশোধ নেবার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ডুয়েলে আহ্বান করার অধিকারী। আর 'জনসমক্ষে মানহানির' যে ভয় তাঁকে দেখানো হয়েছে, সে বিষয়ে ব্যতিব্যস্ত না হবার জন্যে প্রিন্স ইখমেনেভকে অনুরোধ করেছেন, কেননা জনসমক্ষে মানহানি হবে না, হতে পারে না। তাঁর চিঠিটি অবিলম্বেই যথাস্থানে পেঁছে দেওয়া হবে এবং আগে থেকে হুঁশিয়ারি পেয়ে পুলিস শৃংখলা ও শান্তি রক্ষার মতো যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনে সক্ষম।

এ চিঠি হাতে নিয়ে ইখমেনেভ তৎক্ষণাৎ ছোটেন প্রিন্সের উদ্দেশে। ফের প্রিন্স বাড়ি ছিলেন না। চাপরাশীর কাছ থেকে বৃদ্ধ জানতে পান যে প্রিন্স সম্ভবত কাউন্ট ন'এর ওখানে আছেন। বিশেষ না ভেবেচিন্তেই উনি ছোটেন কাউন্টের কাছে। সি'ড়ি দিয়ে যখন উঠছিলেন তখন কাউন্টের আর্দালী তাঁকে থামায়। ভয়ানক চটে উঠে বৃদ্ধ তাকে ছড়ির বাড়ি মারেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধকে ধরে বাড়ি থেকে বার করে দিয়ে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সে তাঁকে নিয়ে যায় থানায়। কাউন্টের কাছেও খবর যায়। প্রিন্স সেখানে ছিলেন, স্থবির এই লম্পটটিকে ('এসব ব্যাপারে' প্রিন্স একাধিকবার কাউন্টের কাজ করে দিয়েছেন) প্রিন্স যখন বললেন যে লোকটা ইখমেনেভ, ঐ যে নাতালিয়া নিকোলায়েভনা, তার বাবা, তখন মহানুভব বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি হেসে ওঠেন এবং ক্রোধের বদলে দয়া দেখান: ইখমেনেভকে একেবারে মুক্তি দেবার আদেশ গেল। ইখমেনেভ কিন্তু ছাড়া পেলেন তৃতীয় দিবসে এবং তখন (প্রিন্সের নির্দেশেই নিঃসন্দেহে) তাঁকে জানানো হল যে তাঁকে মাপ করে দেবার জন্যে প্রিন্সই স্বয়ং কাউন্টকে মিনতি করেছেন।

বৃদ্ধ বাড়ি ফিরলেন প্রায় উন্মাদের মতো। ঘণ্টাখানেক বিছানায় শুয়ে রইলেন নিশ্চল হয়ে। অবশেষে খানিকটা উঠে আন্না আন্দ্রেয়েভনাকে আতঙ্কে স্তম্ভিত করে দিয়ে গম্ভীরভাবে ঘোষণা করেন যে চিরকালের জন্যে তিনি তাঁর কন্যাকে অভিশাপ দিচ্ছেন, পিতার আশীর্বাদ সে আর পাবে না।

আন্না আন্দ্রেয়েভনা ভয়বিহ্বল হয়ে উঠেছিলেন। তবু বৃদ্ধকে দেখাশোনা করার দরকার ছিল; নিজেরও তাঁর প্রায় মাথা খারাপ হবার জোগাড় হলেও সারাটা দিন এবং প্রায় সারা রাত তিনি তাঁর শুশ্রূষা করে যান, ভিনিগারের জলপটি দেন মাথায়, বরফ চাপান। বৃদ্ধের জ্বর এসেছিল, ভুল বকছিলেন। আমি চলে আসি রাত দুটোর পর। কিন্তু পরদিন সকালে ইখমেনেভ উঠে দাঁড়ান, এবং সেইদিনই আমার কাছে আসেন চিরকালের জন্যে নেল্লীকে পোষ্য নেবেন বলে। তাঁর ও নেল্লীর মধ্যে যে কাণ্ডটা হয়েছিল, তা আমি আগেই বলেছি। এ ঘটনাতে উনি একেবারে ভেঙে পড়েন। বাড়ি ফিরে উনি শয্যা নেন। এইসব ঘটেছিল গুড্ ফ্রাইডে'তে — সেদিন কাতিয়া আর নাতাশার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার কথা, তার পরদিনই আলিওশা আর কাতিয়া পিটার্সবুর্গ ছাড়বে। সে সাক্ষাৎকারের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। ওদের দেখা হয়েছিল সকালেই, নেল্লীর প্রথমবার পালাবার আগে, ইখমেনেভ তখনো আসেন নি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নাতাশাকে জানিয়ে দেবার জন্যে আলিওশা এসেছিল এক ঘণ্টা আগেই, কিন্তু আমি এসেছিলাম ঠিক যখন কাতিয়ার গাড়িটা ফটকে এসে দাঁড়িয়েছে তখন। কাতিয়ার সঙ্গে ছিলেন একটি বুড়ি ফরাসী মহিলা। অনেক বোঝাবার পর বহু দ্বিধা করে উনি কাতিয়ার সঙ্গে আসতে রাজী হয়েছিলেন। ওঁকে ছাড়াই কাতিয়া নাতাশার কাছে যাবে এতেও তিনি মত দিয়েছিলেন শুধু এই শর্তে যে, আলিওশা কাতিয়াকে ওপরে নিয়ে যাবে, তিনি থাকবেন গাড়িতে বসে। গাড়ি থেকে না নেমে কাতিয়া আমায় ডাকলে। বললে আলিওশাকে নিচে পাঠিয়ে দিতে। গিয়ে দেখি নাতাশার চোখে জল। আলিওশা, নাতাশা দুজনেই কাঁদছে। কাতিয়া এসে গেছে শুনে নাতাশা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছে ব্যাকুল হয়ে দাঁড়াল দরজার মুখোমুখি। সেদিন সকালে ও পোশাক পরেছিল সবই শাদা। গাঢ় বাদামী চুল সমান করে আঁচড়ে মস্ত খোঁপা বেঁধেছে পেছনে। ওর এমনি ধারা কেশবিন্যাসই আমার বিশেষ ভালো লাগত। আমি ওর সঙ্গে রয়ে গেছি দেখে বললে আমিও যেন গিয়ে অতিথিদের নিয়ে আসি।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে কাতিয়া বললে, 'নাতাশার কাছে আসা এর আগে আর হয়ে উঠল না। আমার ওপর যা নজর রাখা হয়েছিল সে সাংঘাতিক। মাদাম আলবেরকে দু'সপ্তাহ ধরে বোঝাচ্ছি, এতদিনে রাজী হলেন। আপনিও তো আর একবারও আমার কাছে এলেন না ইভান পেত্রোভিচ! আপনাকেও আমি চিঠি লিখতে পারি নি। লিখতে ইচ্ছেও হচ্ছিল না, কেননা চিঠিতে তো সব বোঝানো যায় না। অথচ এত দরকার ছিল আপনার সঙ্গে দেখা করার... মাগো, কীরকম বুক ঢিপঢিপ করছে আমার...'

বললাম, 'সিঁড়িটা একটু খাড়াই।'

'হ্যাঁ... সিঁড়িগুলোর জন্যেও বটে... আচ্ছা বলুন তো, নাতাশা কি আমার ওপর রাগ করবে?'

'না, কেন?'

'না, সে তো বটেই... কেন রাগ করবে? তাছাড়া জিজ্ঞেস করেই বা লাভ কী, নিজের চোখেই তো দেখা যাবে...'

আমি ওর হাত ধরে নিয়ে আসছিলাম। ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল কাতিয়া,

মনে হয় খুবই ভয় করছিল ওর। শেষ বাঁকে ও দম নেবার জন্যে দাঁড়াল, কিন্তু আমার দিকে একবার চেয়ে উঠতে লাগল মন স্থির করে।

আর একবার ও থেমে গেল দরজার সামনে, ফিসফিস করে বললে, 'স্রেফ ভেতরে গিয়ে বলব, ওর ওপর আমার এত বিশ্বাস যে আসতে ভয় করল না... কিন্তু এসব বলছিই বা কেন, আমি তো জানি যে নাতাশার মন খুব উঁচু, তাই না?'

ভেতরে ও ঢুকলে ভীরুর মতো, যেন কী একটা দোষ করেছে। একাগ্র দৃষ্টিতে তাকাল নাতাশার দিকে। নাতাশাও চাইলে মুখে হাসি নিয়ে। কাতিয়া তখন দ্রুত ওর কাছে গিয়ে হাত ধরে নাতাশার ঠোঁটের ওপর চেপে ধরল ওর নধর ঠোঁট দুখানি। তারপর নাতাশার সঙ্গে কোনো কথা বলার আগেই ও গুরুত্বের সঙ্গে, এমনকি কঠোরভাবেই আলিওশার দিকে ফিরে বললে, আধ ঘণ্টার জন্যে ও যেন আমাদের একলা রেখে চলে যায়।

বললে, 'রাগ ক'রো না আলিওশা, নাতাশার সঙ্গে আমার অনেক কথা কইবার আছে, জরুরী অতি গুরুতর সব কথা, যা তোমার শোনা উচিত নয়। লক্ষ্মীর মতো এখন যাও। কিন্তু আপনি থাকুন ইভান পেত্রোভিচ, আমাদের আলাপ আপনার শোনা দরকার।'

আলিওশা ঘর ছেড়ে গেলে ও নাতাশাকে বললে, 'আসুন, বসা যাক। আমি বসব ঠিক এইভাবে, আপনার মুখোমুখি। আগে আপনাকে দেখে নিই ভালো করে।'

প্রায় নাতাশার মুখোমুখি বসে ও একদৃষ্টে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। প্রত্যুত্তরে স্বতঃই একটু হাসলে নাতাশা।

'আপনার ফোটোগ্রাফ আমি আগেই দেখেছি,' কাতিয়া বললে, 'আলিওশা আমায় দেখিয়েছে।'

'আমায় কি সেইরকম লাগছে?'

'ফোটোর চেয়ে আপনি সুন্দর,' দৃঢ়ভাবে গম্ভীর হয়ে বললে কাতিয়া, 'আমি ঠিক তাই ভেবেছিলাম যে আপনি বেশি সুন্দর।'

'সত্যি? এদিকে আপনাকে দেখে যে আমি বিভোর হয়ে যাচ্ছি। কী সুশ্রী আপনি!'

কাতিয়া বললে, 'কী বলছেন! আমি কোথায়, ভাই!' তারপর নিজের কম্পমান হাতে নাতাশার হাতখানা নিয়ে ওরা দুজনেই নীরব হয়ে চেয়ে রইল পরস্পরের দিকে। 'শুনুন,' নীরবতা ভাঙলে কাতিয়া, 'আমাদের কিন্তু

মাত্র আধ ঘণ্টা একসঙ্গে থাকার সময় আছে ভাই। মাদাম আলবেরকে এইটুকুতেও রাজী করানো গেছে কোনোক্রমে অথচ কত যে আলোচনার আছে... আমি চাই... আমি মানে... আচ্ছা সোজাসুজিই আপনাকে জিজ্ঞেস করি, আলিওশাকে আপনি খুবই ভালোবাসেন, না?'

'হ্যাঁ, খুবই।'

'তাই যদি হয়... আলিওশাকে যদি আপনি খুবই ভালোবাসেন... তাহলে... ওর সুখের দিকটাও আপনার দেখা দরকার...' ও বললে ভীরুর মতো ফিসফিস করে।

'হ্যাঁ, আমি চাই ও সুখী হোক...'

'হ্যাঁ... কিন্তু প্রশ্ন হল এই, আমি কি ওকে সুখী করতে পারব? অবিশ্যি এ কথা বলার অধিকার আছে কি আমার, কেননা আপনার কাছ থেকে ওকে তো ছিনিয়ে নিচ্ছি। আপনার যদি মনে হয়, এবং আমরা স্থির করি যে ও আপনার সঙ্গেই বেশি সুখী হবে... তাহলে... তাহলে...'

'সে তো সব আগেই ঠিক হয়ে গেছে ভাই কাতিয়া, আপনি নিজেই দেখছেন, ঠিক হয়ে গেছে,' নাতাশা বললে মৃদুস্বরে, মাথা নুইয়ে। বোঝা গেল, আলাপ চালানো কষ্টকর হয়ে উঠছিল ওর পক্ষে।

ওদের মধ্যে কে আলিওশাকে সুখী করতে পারবে, কার উচিত দাবি ছেড়ে দেওয়া, এ প্রশ্নের ওপর একটা দীর্ঘ আলোচনার জন্যে কাতিয়া বোধ হয় তৈরি হয়ে এসেছিল। কিন্তু নাতাশার জবাব শোনামাত্র ওর বুঝতে বাকি রইল না যে অনেক আগেই সবকিছু স্থির হয়ে আছে, আলোচনার কিছু নেই। সুন্দর ঠোঁটদুটি অর্ধস্ফুরিত করে ও সখেদে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইল নাতাশার দিকে, নাতাশার হাত দুখানা তখনো ওর হাতে ধরা।

'আর আপনি ওকে খুবই ভালোবাসেন, না?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে নাতাশা।

'হ্যাঁ; কিন্তু আর একটা জিনিস আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, সেই জন্যেই এসেছি। ঠিক কী জন্যে আপনি ওকে ভালোবাসেন?'

নাতাশা বললে, 'জানি না।' কণ্ঠস্বরে ওর যেন একটা তীক্ত অধৈর্যের রেশ ছিল।

'আপনি কি ভাবেন ও বুদ্ধিমান?' জিজ্ঞেস করলে কাতিয়া।

'না, এমনিই ভালোবাসি...'

'আর আমিও তাই। ওর জন্যে কেমন যেন মায়া হয়।'

'আমারও তাই,' জবাব দিলে নাতাশা।

'এখন কী করা যায় ওকে নিয়ে? আমার জন্যে ও কী করে যে আপনাকে ছেড়ে যেতে পারে বুঝি না!' চেঁচিয়ে উঠল কাতিয়া, 'আপনাকে দেখার পর এ কিছুতেই আমি বুঝে উঠতে পারছি না!' মেঝের দিকে চেয়ে রইল নাতাশা, জবাব দিলে না। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কাতিয়া, তারপর হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে আস্তে করে জড়িয়ে ধরল নাতাশাকে। পরস্পরকে আলিঙ্গনে বেঁধে কাঁদল দুজনে। নাতাশাকে আলিঙ্গনমুক্ত না করেই কাতিয়া বসল নাতাশার চেয়ারের হাতলের ওপর, হাতে চুমু খেতে লাগল ওর।

কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'আপনাকে যে কী ভালোবাসি, যদি জানতেন! আসুন আমরা দুই বোনের মতো হয়ে থাকি, সব সময় চিঠি লেখালেখি করব আমরা... চিরকাল ভালোবাসব আপনাকে... কত যে ভালোবাসব... কত ভালোবাসব...'

নাতাশা জিজ্ঞেস করলে, 'জুন মাসে আমাদের বিয়ের কথা কি ও আপনাকে বলেছে?'

'হ্যাঁ, বলছিল আপনি মত দিয়েছেন। ওসব তো শুধু এমনি... ওকে প্রবোধ দেবার জন্যে, তাই না?'

'নিশ্চয়।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। সত্যি করে আমি ওকে ভালোবাসব নাতাশা, আপনাকে সব চিঠি লিখে জানাব। মনে হচ্ছে, শিগ্গিরই ও আমার স্বামী হবে এবার, তাই দাঁড়াচ্ছে। ওরা সকলেও তাই বলছে। ভাই নাতাশা, এবার তো আপনি... বাড়ি ফিরে যাবেন, তাই না?'

নাতাশা জবাব দিলে না, শুধু আবেগে চুমু খেলে ওকে।

বললে, 'সুখী হোন!'

'আর... আর আপনি... আপনাকেও সুখী হতে হবে!' বললে কাতিয়া। ঠিক সেই সময় দরজা খুলে আলিওশা ঢুকল ভেতরে। এই আধ ঘণ্টা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে সে পারে নি। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ওরা দুজনে কাঁদছে দেখে ও যন্ত্রণায় ভেঙে পড়ে হাঁটু গেড়ে বসল ওদের সামনে।

'কিন্তু তুমি কাঁদছ কেন?' নাতাশা বললে ওকে, 'আমায় ছেড়ে যাচ্ছ বলে? কিন্তু সে কি আর বেশি দিনের জন্যে? জুনে তো ফিরবে, তাই না?'

'তখন বিয়ে হবে তোমাদের,' সজলনয়নে কাতিয়াও যোগ করলে আলিওশাকে প্রবোধ দিতে।

'কিন্তু আমি পারব না, একদিনের জন্যেও ছেড়ে যেতে পারব না তোমায় নাতাশা! আমি মরব তোমায় না পেলে... জানো না, আমার কাছে এখন তুমি কতখানি! বিশেষ করে এই সময়!..'

'বেশ, তাহলে কী করবে শোনো,' নাতাশা বললে হঠাৎ সজীব হয়ে, 'কাউণ্টেস তো নিশ্চয় কিছুদিন মস্কোয় থাকবেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, প্রায় এক সপ্তাহ,' বললে কাতিয়া।

'এক সপ্তাহ! তাহলে আর চাই কি! তুমি ওদের কাল পেঁাছে দেবে মস্কো পর্যন্ত। তাতে মোটে একদিন লাগবে। সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসো এখানে। ওদের যখন আবার মস্কো ছাড়ার সময় হবে, তখন মাসখানেকের মতো আমরা বিদায় জানাব, তুমি চলে গিয়ে মস্কোতে ওদের সঙ্গ ধরবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক কথা... তাহলে আরো চারদিন তোমরা একসঙ্গে থাকতে পাবে!' খুশি হয়ে চেঁচিয়ে উঠল কাতিয়া। নাতাশার সঙ্গে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলে ও।

নতুন এই পরিকল্পনায় আলিওশা যে কী খুশি হয়ে উঠেছিল তা বলার নয়। হঠাৎ একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল ও, মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আনন্দে, নাতাশাকে জড়িয়ে ধরল, চুমু খেল কাতিয়ার হাতে, কোলাকুলি করলে আমার সঙ্গে। বিষণ্ণ একটা হাসি নিয়ে নাতাশা তাকিয়ে ছিল ওর দিকে, কিন্তু কাতিয়া সইতে পারল না। উত্তপ্ত জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ও একবার তাকালে আমার দিকে, তারপর নাতাশাকে আলিঙ্গন করে উঠে দাঁড়াল যাবার জন্যে। হবি তো হ' ফরাসী মহিলাটি ঠিক এই সময়েই লোক মারফত কাতিয়াকে বলে পাঠায় যে প্রস্তাবিত আধ ঘণ্টা কেটে গেছে, সাক্ষাৎকারটায় যেন কাতিয়া তাড়াতাড়ি সমাপ্তি টানে।

নাতাশা উঠে দাঁড়াল। দুটিতে ওরা দাঁড়াল মুখোমুখি, হাতে হাত ধরে, ওদের বুকের মধ্যে যাকিছু ভরে উঠেছে তা যেন ওরা পরস্পরকে জানাতে চাইছিল চোখ দিয়ে।

কাতিয়া বললে, 'আর কখনো আমাদের দেখা হবে না, তাই না?'

'আর কখনো না,' বললে নাতাশা।

'তাহলে বিদায়।' পরস্পর আলিঙ্গন করলে ওরা।

কাতিয়া চুপিচুপি বললে, 'আমায় যেন অভিশাপ দেবেন না। আমি... চিরকাল... আমায় বিশ্বাস করতে পারেন... ও সুখী হবে ... এসো আলিওশা, আমায় নিয়ে চলো!' ও তাড়াতাড়ি করে বললে আলিওশার হাত চেপে।

ওরা চলে গেলে বিচলিত বেদনার্ত নাতাশা বললে, 'ভানিয়া, ওদের সঙ্গে তুমিও চলে যাও... ফিরে এসো না। আলিওশা আমার কাছে থাকবে সন্ধ্যে আটটা পর্যন্ত। তার বেশি ও থাকতে পারবে না। চলে যাবে, আমি একা থাকব... নটার সময় এসো, লক্ষ্মীটি!'

নটার সময় আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনার কাছে নেল্লীকে রেখে (কাপ ভাঙার পর) গেলাম নাতাশার কাছে। ও তখন একলা, অধীর হয়ে আমার প্রতীক্ষা করছে। মাভরা সামোভার নিয়ে এল। নাতাশা চা ঢেলে, সোফায় বসে কাছে ডাকলে আমায়।

'আর কী, সব শেষ হয়ে গেল।' ও বললে আমার দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে। সে দৃষ্টি আমি কখনো ভুলব না।

'এই তাহলে আমাদের ভালোবাসার শেষ। শুধু ছ'মাসের জীবন! সারা জীবনের জন্যে,' ও বললে আমার হাত চেপে ধরে। সে হাত পুড়ে যাচ্ছিল। বোঝাবার চেষ্টা করলাম, গরম কিছু একটা গায়ে দিয়ে ও যেন শুয়ে পড়ে।

'একটু পরে ভানিয়া, একটু পরে লক্ষ্মীটি। একটু কথা কই এখন, একটু ভাবি পুরোনো কথা... একেবারে বিধ্বস্ত লাগছে নিজেকে... কাল দশটার সময় ওর সঙ্গে আমার দেখা হবে শেষবার... শেষবারের মতো!'

'নাতাশা, তোমার শরীর ভালো নেই, এখুনি জ্বর আসবে... নিজের দিকে একটু চাও।'

'তা হোক গে ভানিয়া। ও চলে যাবার পর এই আধ ঘণ্টা ধরে তোমার অপেক্ষায় বসে আছি, কিন্তু কী ভাবছিলাম বলো তো? নিজের কাছেই কী প্রশ্ন করছিলাম জানো? প্রশ্ন করছিলাম, ওকে কি আমি ভালোবাসি? নাকি বাসি না? আমাদের এই যে ভালোবাসা, সেটা কেমন ধারা? এ প্রশ্ন যে আমি কেবল এখন করছি, সে কি তোমার কাছে হাস্যকর বলে মনে হচ্ছে ভানিয়া?'

'অস্থির হ'য়ো না নাতাশা...'

'জানো ভানিয়া, আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে সমান সমানের মতো, নারী যেভাবে সাধারণত পুরুষকে ভালোবাসে তেমনভাবে ওকে আমি ভালোবাসি নি। ভালোবেসেছিলাম কী বলব, প্রায় মায়ের মতো করে... আমার ধারণা, সমান সমানের মতো ভালোবাসছে পৃথিবীতে বোধ হয় এমন ভালোবাসা নেই। কী মনে হয় তোমার?'

শঙ্কিত হয়ে আমি চাইলাম ওর দিকে। ভয় হচ্ছিল অসুখ শুরু না হয়। কী যেন একটা টানছিল ওকে, কথা বলার কেমন একটা তাগিদ পেয়ে বসেছিল। কিছু কিছু কথা কেমন যেন অসংলগ্ন, মাঝে মাঝে উচ্চারণও করছিল অস্ফুটভাবে।

ভারি ভয় পেয়ে গেলাম আমি।

'ও ছিল আমার,' বলে চলল নাতাশা, 'ওর সঙ্গে দেখা হবার প্রায় প্রথম দিন থেকেই একটা অদম্য ইচ্ছে আমায় পেয়ে বসেছিল যে ও হবে আমার, অবিলম্বে আমার, আর কারো দিকে ও চাইবে না, আমাকে, কেবল আমাকে ছাড়া আর কাউকে ও জানবে না... কাতিয়া খুব আজ ভালো বলেছিল কথাটা: ওকে আমি ভালোবেসেছি কারণ সদাই কেন জানি মায়া হত ওর ওপর... যখন একা থাকতাম, তখন সর্বদাই একটা অসহ্য ইচ্ছে, এমনকি যন্ত্রণাই হত এই ভেবে যেন ও সুখী হয়, আজীবন সুখী হয়। ওর মুখের দিকে (ওর মুখের ভাব তো তুমি জানো ভানিয়া), ওর মুখের দিকে আমি স্থির হয়ে চেয়ে থাকতে পারতাম না: অমন মুখের ভাব কারো হয় না, ও যখন হেসে উঠত, তখন সারা শরীর আমার হিম হয়ে শিরশির করে উঠত... সত্যি!..'

'নাতাশা, কথা শোনো...'

আমাকে বাধা দিয়ে ও বললে, 'লোকে ওর সম্পর্কে বলে... তুমিও বলেছ যে ওর মেরুদণ্ড নেই, ও... বুদ্ধিতেও খাটো, একেবারে ছেলেমানুষ। কিন্তু সেই জন্যেই ওকে ভালোবাসতাম সবচেয়ে বেশি... বিশ্বাস হয় সেটা? তবে জানি না শুধু সেই জন্যেই ওকে ভালোবাসতাম কিনা। ওকে ভালোবেসেছি এমনি, ওর সবখানিকে নিয়ে, ও যদি একটু অন্যরকম হত, ওর যদি একটা ইচ্ছাশক্তি থাকত কি বেশি বুদ্ধিমান হত, তাহলে হয়ত ওকে অতটা ভালোবাসতাম না। কী জানো ভানিয়া, একটা কথা তোমার কাছে স্বীকার করি: মনে আছে, তিন মাস আগে আমাদের একটা ঝগড়া হয়েছিল, ও যখন গিয়েছিল সেই — ওই যে কী নাম মেয়েটার, মিন্নার কাছে... আমি টের পেয়ে যাই, চর লাগিয়েছিলাম ওর পিছনে। কিন্তু বিশ্বাস করবে? অসম্ভব আঘাত পেয়েছিলাম আমি, তবু কেমন যেন খুশিও লেগেছিল... কেন তা জানি না... কিন্তু ও-ও যে সাবালক লোকেদের মতো আরো অনেক সাবালকের সঙ্গে সুন্দরী মেয়েদের ঘরে যাচ্ছে, ও-ও যে মিন্নার কাছে গিয়েছে, এই কথা ভেবেই... আমি — কী আনন্দই আমি পেয়েছিলাম ঝগড়া করে, তারপর ওকে ক্ষমা করে... ও প্রিয়তম!'

আমার মুখের দিকে চেয়ে ও হাসল বিচিত্রভাবে। তারপর কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল, যেন স্মৃতির মধ্যে ডুবে রইল সে। অমনিভাবেই সে বসে থাকল অনেকক্ষণ, মুখে একটু হাসি, অতীতের চিন্তায় বিভোর।

'ওকে ক্ষমা করতে আমার ভয়ানক ভালো লাগত ভানিয়া!' বলে চলল নাতাশা, 'কী জানো, ও যখন আমায় একা ফেলে চলে যেত, আমি ঘরময় পায়চারি করতাম, কষ্ট পেতাম, কাঁদতাম, অথচ মাঝে মাঝে মনে হত, যতই ও দোষ করবে, ততই ভালো... সত্যি! আর জানো, সব সময় মনে হত ও একটা ছোট্ট ছেলে। আমি চেয়ারে বসে আছি, ও আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল, আস্তে করে আমি ওর মাথায় হাত বুলাতাম, আদর করতাম... একলা থাকলে সব সময় ওকে আমি এই মূর্তিতেই ভাবতাম... আর হ্যাঁ, ভানিয়া,' ও বললে হঠাৎ করে, 'কী সুন্দর মানুষ এই কাতিয়া!'

আমার মনে হচ্ছিল যেন ইচ্ছে করেই ও নিজের ক্ষততে আঘাত দিয়ে চলেছে, আর তা করছে কীসের একটা তাগিদে, হতাশা, যন্ত্রণার একটা তাগিদে... অতি বড়ো একটা সর্বনাশের পর মানুষের এমনটা প্রায়ই হয়!

ও বলে চলল, 'মনে হয়, কাতিয়া ওকে সুখী করতে পারবে, ওর একটা চরিত্র আছে, ভারি বিশ্বাস নিয়ে কথা বলে। আলিওশার সঙ্গে কথা বলে খুব গম্ভীর সুরে, জরুরী ভাব করে — আলাপ করে বড়ো বড়ো জিনিস নিয়ে যেন ভারি বয়স হয়েছে কাতিয়ার। অথচ এমনিতে ও নিজেই এক ছেলেমানুষ! লক্ষ্মী মেয়ে! ওহ্, ওরা যেন সুখী হয়! সুখী হোক, সুখী হোক!..'

হঠাৎ চোখের জল আর ফোঁপানি ওর বেরিয়ে এল বাঁধ ভেঙে। পুরো আধ ঘণ্টা ধরেও সে আর নিজেকে সামলে নিয়ে কিছুটা শান্ত হতে পারল না।

নাতাশা, রাণী আমার! নিজের দুঃখ সত্ত্বেও কিন্তু সেদিন সে আমার দুশ্চিন্তায় আগ্রহ দেখাতে ভোলে নি। যখন দেখলাম ও একটু শান্ত হয়ে, অথবা বরং বলা ভালো, ক্লান্ত হয়ে এসেছে, তখন ওর মন অন্যদিকে ফেরাবার জন্যে নেল্লীর কথা বলেছিলাম... সেদিন ফিরেছিলাম রাত করে। ও ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত ছিলাম। যাবার সময় মাভরাকে বলে গেলাম সারা রাত যেন সে তার অসুস্থ দিদিমণির কাছে থাকে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে বলেছিলাম, 'ওহ্... তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি! শেষ হোক এ যন্ত্রণা! যা হোক, যেভাবে হোক, শুধু তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি!'

পরদিন ঠিক দশটার সময় ফের এসেছিলাম নাতাশার কাছে। আলিওশাও এসেছিল একই সময়ে... বিদায় জানাতে। সে দৃশ্যের বর্ণনা আমি করব না — মনে করতেও তা চাই না। নাতাশা বোধ হয় নিজেকে সংযত করে রাখবে ভেবেছিল, হাসিখুশি অনুদ্বিগ্ন ভাব করবে, কিন্তু পারল না। আলিওশাকে ও আলিঙ্গন করলে আবেগের দমকে, সজোরে। কথা কইলে কম, কিন্তু শহীদসুলভ, প্রায় উন্মাদের মতো একাগ্র দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল বহুক্ষণ। আলিওশার প্রতিটি কথা ও শুনলে তৃষিতের মতো, অথচ ও যা বলছিল তার কোনো অর্থই যেন ওর মাথায় ঢুকছিল না। মনে আছে, আলিওশা ওর কাছ থেকে মার্জনা চাইছিল, মার্জনা চাইছিল তার ঐ প্রেমের জন্যে, এই সময়টা ধরে ও যে আঘাত দিয়েছে নাতাশাকে তার জন্যে, তার বিশ্বাসঘাতকতা, কাতিয়ার প্রতি প্রেম, এবং বিদায়ের জন্যে... অসংলগ্ন কথা কইছিল আলিওশা, গলা বন্ধ হয়ে আসছিল কান্নায়। তারপর হঠাৎ মাঝে মাঝে সে সান্ত্বনা দিতে শুরু করছিল নাতাশাকে, বলছিল, যাচ্ছে শুধু মাসখানেক কি বড়ো জোর পাঁচ সপ্তাহের জন্যে, গ্রীষ্মকালে ফিরবে, তখন বিয়ে হবে ওদের, বাবা সম্মতি দেবেন, এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, পরশুই তো সে ফিরে আসছে মস্কো থেকে, তখন পুরো চার দিন ওরা থাকবে একসঙ্গে, সুতরাং এখনকার এ বিদায় তো শুধু একদিনের জন্যে...

অদ্ভুত ব্যাপার, নিজের ওর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সত্যি কথাই বলছে। পরশুই ফিরে আসবে মস্কো থেকে... তাহলে অত কষ্ট কেন ওর, অত কান্না?

অবশেষে এগারোটা বাজল ঘড়িতে। বহু কষ্টে ওকে বোঝালাম ওর যাওয়া দরকার। মস্কোর ট্রেন ছাড়ছে ঠিক বারোটায়। শুধু এক ঘণ্টা সময় আছে। পরে নাতাশা নিজেই আমায় বলেছে, শেষবারের মতো ওর দিকে সে কীভাবে যে তাকিয়েছে তা ওর নিজেরই মনে নেই। আমার মনে আছে, আলিওশার ওপর ও ক্রুশের চিহ্ন দেয়, চুমু খায়, তারপর দুই হাতে মুখ ঢেকে ছুটে চলে যায় ঘরের মধ্যে। আলিওশাকে সিঁড়ি বেয়ে নামিয়ে গাড়ি পর্যন্ত দিয়ে আসতে হয় আমাকে, নইলে ও নির্ঘাৎ ফিরে আসত, সিঁড়ি ছেড়ে যেত না।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ও বলেছিল, 'তুমিই আমার একমাত্র আশা ভানিয়া! বন্ধু আমার, আমি তোমার প্রতি অন্যায় করেছি, তোমার ভালোবাসা পাবার যোগ্যতা আমার কখনো হবে না, তবু ভাইয়ের মতো হয়ে থেকো শেষ পর্যন্ত — নাতাশাকে ভালোবেসো, ওকে ছেড়ে যেয়ো না, যত পারো সবকিছু লিখে জানিও। যতটা সম্ভব বিস্তারিতভাবে আর খুব ছোটো ছোটো

করে লিখো, তাহলে একটা পাতায় অনেকখানি ধরবে। পরশু আমি এখানে ফিরে আসছি নিশ্চয়! একেবারে নিশ্চয়। কিন্তু তারপর আমি চলে গেলে চিঠি লিখো!'

গাড়িতে তুলে দিলাম ওকে।

'পরশু পর্যন্ত!' গাড়ি চলতে শুরু করলে ও বললে চেঁচিয়ে, 'অবশ্য-অবশ্যই!'

আড়ষ্ট বুকে উঠে এলাম নাতাশার কাছে। ঘরের মাঝখানে ও দাঁড়িয়ে ছিল আড়াআড়ি হাত মুড়ে, আমার দিকে তাকালে বিমূঢ় দৃষ্টিতে, যেন আমায় ও চিনতে পারছে না। চুল তার একপাশে খসে পড়েছে; দৃষ্টি ঝাপসা, ঘোলাটে। দোরগোড়ায় মাভরা হতভম্ব হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে আতঙ্কে।

হঠাৎ চোখ জ্বলে উঠল নাতাশার।

'ও, তুমি! তুমি এসেছ! তুমি!' ও চেঁচিয়ে উঠল আমায় দেখে, 'এখন রইলে তো শুধু তুমি! তুমি ওকে দেখতে পারতে না। ওকে ভালোবেসেছিলাম বলে কখনো ওকে তুমি ক্ষমা করতে পারো নি... এখন ফের এসেছ আমার কাছে! কী? এসেছ তো আমায় ফের সান্ত্বনা দিতে, বোঝাবে ফিরে যাও বাবার কাছে যিনি আমায় ত্যাগ করেছেন, অভিশাপ দিয়েছেন। সে আমি কালই জানতাম, দু'মাস আগে থেকেই জানতাম!.. যেতে চাই না আমি, চাই না! আমি নিজেও অভিশাপ দিচ্ছি ওঁদের!.. চলে যাও বলছি, দু'চক্ষে তোমায় দেখতে পারি না! চলে যাও! যাও বলছি!'

বুঝলাম ও ক্ষেপে উঠেছে, আমায় দেখলেই ওর রাগ প্রায় উন্মত্ততার কোঠায় গিয়ে ঠেকবে। বুঝলাম তাই হওয়ার কথা; ঠিক করলাম, সরে যাওয়াই ভালো। বাইরে গিয়ে সিঁড়ির ওপরের ধাপে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে দরজা খুলে মাভরাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি; মাভরা কেঁদেছে।

দেড়ঘণ্টা এই করে কাটল। কী যে সইতে হয়েছিল বলতে পারব না। বুক হিম হয়ে গিয়ে ব্যথা করতে লাগল এক অসহ্য যন্ত্রণায়। হঠাৎ দরজা খুলে গেল, টুপি আর ওপরের হালকা ওভারকোট পরে সিঁড়ির দিকে ছুটে এল নাতাশা। ও যে কী করছে তার কিছু যেন ওর খেয়াল নেই। পরে নিজেও আমায় বলেছে, কী হয়েছিল তার শুধু একটা ঝাপসা ছবি মনে পড়ে ওর; কী ভেবে কোথায় যে ছুটেছিল তার কিছু মনে নেই।

লাফিয়ে উঠে কোথাও লুকিয়ে পড়ব তার সময় পেলাম না। হঠাৎ আমায় দেখে থমকে দাঁড়াল নিথর হয়ে। পরে আমায় বলেছিল, 'হঠাৎ তখন মনে ঝলক দিয়ে গেল যে ক্ষেপে গিয়ে নিষ্ঠুরের মতো বন্ধু আমার, ভাই আমার, রক্ষাকর্তা আমার, তোমায় তাড়িয়ে দিতে পারলাম কী করে! যখন দেখলাম, তুমি বেচারা, অপমানিত হয়েও সিঁড়ির ওপর বসে বসে অপেক্ষা করছ কখন আমি ফের তোমায় ডাকব — ও ভগবান! তখন যে কী মনে হয়েছিল ভানিয়া, যদি জানতে! যেন একটা ছুরি বিঁধল আমার বুকে...'

'ভানিয়া! ভানিয়া!' আমার দিকে হাত বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল ও, 'তুমি এখানে!..' লুটিয়ে পড়ল আমার বুকে।

ওকে ধরে নিয়ে গেলাম ঘরের মধ্যে। মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল ও। ভাবলাম, "কী করি, ওর যে জ্বর উঠবে তাতে সন্দেহ নেই!"

ঠিক করলাম ছুটে যাই ডাক্তারের কাছে। শুরুতেই অসুখটা ঠেকাবার জন্যে কিছু একটা করতেই হবে। সময়ও বেশি লাগবে না। দুটো পর্যন্ত আমার সেই বৃদ্ধ জার্মানটি সাধারণত বাড়িতেই থাকেন। ছুটলাম তার কাছে। মাভরাকে বলে গেলাম এক মিনিটের জন্যে, এক সেকেণ্ডের জন্যেও যেন নাতাশাকে ছেড়ে না থাকে, বাইরে যেতে যেন না দেয়। ভগবান আমায় বাঁচালেন: আর একটু দেরি হলেই বৃদ্ধকে বাড়িতে পাওয়া যেত না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে উনি রাস্তায় নেমেছেন, সেই সময় গিয়ে হাজির হলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে, অবাক হবারও সময় না দিয়ে ওঁকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চললাম নাতাশার কাছে।

সত্যি, ঈশ্বর সহায় ছিলেন আমার! যে আধ ঘণ্টা আমি ছিলাম না, তার মধ্যে এমন একটা ব্যাপার ঘটেছিল যে ঠিক সময়ে ডাক্তারকে নিয়ে আমি উপস্থিত হতে না পারলে নির্ঘাৎ মৃত্যু হত ওর। আমি যাবার পর পনেরো মিনিট না যেতেই প্রিন্স ভালকোভস্কি এসে ঢোকেন। সবাইকে গাড়িতে তুলে দিয়ে রেল-স্টেশন থেকে উনি সোজা চলে এসেছিলেন নাতাশার কাছে। এই আগমনটা উনি নিশ্চয় আগে থেকে ভেবেচিন্তে ঠিক করে রেখেছিলেন। নাতাশা নিজে পরে আমায় বলেছে, প্রিন্সকে দেখে প্রথমটা সে অবাক পর্যন্ত হয় নি। বলেছিল, 'মাথাটা আমার কেমন ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল।'

প্রিন্স বসেন নাতাশার সামনে, তাকান বেশ সস্নেহে, সহানুভূতির দৃষ্টিতে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'নাতালিয়া নিকোলায়েভনা, আপনার দুঃখ আমি বুঝতে পারছি। জানি এই মুহূর্তটা কত দুঃসহ হবে আপনার কাছে,

তাই দেখা করতে আসা আমার কর্তব্য বলে ভেবেছি। যদি পারেন অন্তত এইটুকু ভেবে সান্ত্বনা রাখুন যে, আলিওশাকে ছেড়ে দিয়ে আপনি তার সুখেরই পথ করে দিয়েছেন। কিন্তু সে তো আপনি ভালোই জানেন আমার চেয়ে, তাই এই মহানুভবতা দেখালেন...'

নাতাশা আমায় বলেছিল, 'আমি বসে বসে শুনছিলাম, কিন্তু প্রথম প্রথম সত্যিই ওঁর কথা যেন কিছু বুঝছিলাম না। শুধু এইটুকু মনে আছে যে আমি ওঁর দিকে কেবল একদৃষ্টিতে হাঁ করে চেয়েই ছিলাম। আমার হাতখানা নিয়ে উনি নিজের হাতের মধ্যে চাপ দিতে থাকেন। তা করতে বোধ হয় ওঁর বেশ ভালোই লাগছিল। আমি এত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছিলাম যে হাতটা টেনে নেবার কথাও মনে হয় নি।'

উনি বলে যান, 'আপনি বুঝতে পেরেছিলেন, আলিওশার স্ত্রী হলে পরে হয়ত ও আপনাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে, সেকথা বুঝে সিদ্ধান্ত নেবার মতো যথেষ্ট উঁচু গর্ববোধ আপনার ছিল... কিন্তু আপনার প্রশংসা করার জন্যে তো আমি এখানে আসি নি। আপনাকে শুধু বলতে চাই, আমার চেয়ে ভালো বন্ধু আপনি কখনো কোথাও পাবেন না। আপনার জন্যে সত্যিই দুঃখ হচ্ছে আমার, সহানুভূতি বোধ করছি। এই ব্যাপারটার মধ্যে অনিচ্ছুক অংশগ্রহণ আমার করতে হয়েছিল — কিন্তু সে করেছি শুধু কর্তব্যবোধে। আপনার উদার মন সেটা বুঝবে; আমার সঙ্গে আপনি মিটমাট করে নেবেন... কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনার চেয়েও আমার কষ্ট হয়েছে বেশি!'

নাতাশা বলে, 'থাক প্রিন্স, যথেষ্ট হয়েছে, আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দিন।'

'অবশ্যই, আমি চলে যাব শিগ্‌গিরই,' উনি জবাব দেন, 'কিন্তু আপনাকে আমি নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসি। অনুমতি দিন যে আপনাকে আমি এসে এসে দেখে যাব, নিজের বাপ বলে আমায় ভাববেন, আপনার কিছু উপকারে লাগতে দিন আমায়।'

'কিছুই আমার চাই না, আমায় রেহাই দিন,' ফের বাধা দেয় নাতাশা।

'জানি, আপনার গর্ব আছে... কিন্তু আমি অকপটেই বলছি, অন্তর থেকে। এখন কী করার ইচ্ছে আপনার? মা-বাপের সঙ্গে মিটমাট করে নেবেন? খুব ভালো কথা, কিন্তু আপনার বাবা তো অবিবেচক, অহঙ্কারী, অত্যাচারী। মাপ করুন, কিন্তু কথাটা ঠিক। বাড়িতে শুধু তিরস্কার আর নতুন নতুন যন্ত্রণা

ছাড়া কিছুই মিলবে না আপনার... কিন্তু আপনার যে স্বাধীনভাবে থাকা দরকার। আপনার দেখাশোনা করা, আপনাকে সাহায্য করা এখন আমার দায়িত্ব, আমার পবিত্র কর্তব্য। আলিওশা আমায় মিনতি করে গেছে, আপনাকে যেন না ছেড়ে যাই, আপনার বন্ধু হয়ে থাকি। তবে আমি ছাড়াও আপনার গভীর অনুরাগী আরো অনেকেই আছেন। কাউন্ট ন'য়ের সঙ্গে আমি আপনার পরিচয় করিয়ে দেব, নিশ্চয় অমত করবেন না। আমাদের আত্মীয় উনি, ভারি ভালো মন; এমনকি বলতে পারি, আমাদের গোটা পরিবারটিরই উনি হিতৈষী। আলিওশার জন্যে উনি অনেককিছু করেছেন। ওঁর প্রতি আলিওশার খুব শ্রদ্ধাভক্তি। অত্যন্ত গণ্যমান্য প্রভাবশালী লোক, বয়সও অনেক, সুতরাং আপনি অবিবাহিত তরুণী হলেও ওঁকে আমন্ত্রণ জানানো আপনার পক্ষে খুবই সাজে। আপনার কথা ওঁকে আগেই বলেছি। উনি আপনাকে সাহায্য করতে পারেন এবং যদি চান খুব ভালো একটা চাকরিও জুটিয়ে দেবেন... তাঁরই এক আত্মীয়ার কাছে। আমাদের ব্যাপারটার সব কথা খোলাখুলি তাঁকে বলেছিলাম বহুদিন আগে। তাতে ওঁর সহৃদয় উদার মনোবৃত্তি এতটা জেগে ওঠে যে এখন নিজেই উনি আমায় বলছেন আপনার সঙ্গে যথাসত্বর পরিচয় করিয়ে দিতে... অপরূপ সবকিছুরই উনি দরদী, বিশ্বাস করুন — বদান্য, সম্মানীয় বৃদ্ধ, লোকের গুণগ্রাহী। ইনিই সম্প্রতি একটা ব্যাপারে আপনার বাবার প্রতি অতি মহানুভবতা দেখিয়েছেন।'

সর্পদষ্টার মতো লাফিয়ে ওঠে নাতাশা। এতক্ষণে ও বুঝতে পারে প্রিন্সকে।

চেঁচিয়ে ওঠে, 'রেহাই দিন আমায়, এক্ষুনি চলে যান!'

'কিন্তু লক্ষ্মীটি, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে কাউন্ট আপনার বাবারও উপকার করতে পারেন...'

'আমার বাবা আপনার কাছ থেকে কিছুই নেবেন না। আমায় রেহাই দেবেন কি না?' নাতাশা ফের চিৎকার করে ওঠে।

'বাপ্, কী অধীর সন্দিগ্ধ মেয়ে আপনি! কী করেছি যে এসব বলছেন!' বলে ওঠেন প্রিন্স, খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে চারপাশে তাকান। তারপর পকেট থেকে একটা মোড়ক বার করে বলতে থাকেন, 'আমার সহানুভূতি, বিশেষ করে কাউন্টের সহানুভূতির এই প্রমাণটা অন্তত আমায় রেখে যেতে দিন। কাউন্টের উপদেশেই আমি এটা করছি। এই মোড়কটায় দশ হাজার রুবল আছে। একটু সবুর করুন নাতালিয়া নিকোলায়েভনা,' নাতাশাকে সক্রোধে

চেয়ার থেকে উঠতে দেখে উনি তাড়াতাড়ি করে বলেন, 'শেষ পর্যন্ত একটু ধৈর্য ধরে শুনুন। আপনি জানেন আপনার বাবা মোকদ্দমায় হেরে গেছেন, এই দশ হাজার রুবলে একটা ক্ষতিপূরণ হবে, তা থেকে...'

'বেরিয়ে যান!' চিৎকার করে ওঠে নাতাশা, 'বেরিয়ে যান আপনার টাকা নিয়ে! আপনাকে আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি... ওহ্, কী জঘন্য নীচ ইতর লোক আপনি।'

রাগে বিবর্ণ হয়ে প্রিন্স উঠে দাঁড়ান চেয়ার ছেড়ে।

সম্ভবত উনি এসেছিলেন অবস্থাটা দেখতে, ব্যাপারটা বুঝতে। নিঃস্বা পরিত্যক্তা নাতাশার ওপরে দশ হাজার রুবলের প্রতিক্রিয়ার ওপর উনি নিশ্চয় খুব একটা ভরসা করেছিলেন... নীচ ও রূঢ় এই প্রিন্সটি ও ধরনের ব্যাপারে একাধিকবার বৃদ্ধ লম্পট কাউণ্ট ন'য়ের খিদমৎগারি করেছেন। কিন্তু নাতাশাকে উনি ঘৃণা করতেন। যখন দেখলেন, ব্যাপারটা উৎরাল না, অমনি একটা ক্রুর পরিতোষ নিয়ে উনি নাতাশাকে অপমান করতে শুরু করেন, যাতে অন্তত একেবারে শূন্য হাতে চলে যেতে না হয়।

'উঁহুঁ? আপনি এত চটে উঠছেন যে এটা, লক্ষ্মীমণি, তেমন ভালো নয়,' অপমানটায় কেমন জব্দ হয় তা দেখার অধীর আগ্রহে গলার স্বর ওঁর খানিকটা কেঁপে কেঁপে যাচ্ছিল, 'এ মোটেই ভালো নয়। আপনাকে আশ্রয় দেওয়ার কথা হচ্ছে, আর দেমাক দেখাচ্ছেন আপনি... বোঝেন না যে আমার প্রতি আপনার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। পিতা হিসেবে বহুদিন আগেই আপনাকে আমি হাজতে পাঠাতে পারতাম, আমার অল্পবয়সী ছেলেটির চরিত্র নষ্ট করে তার টাকা মারছেন বলে। কিন্তু তা আমি করি নি, হেঁ-হেঁ!'

ঠিক সেই সময়েই ঢুকেছিলাম আমরা। রান্নাঘর থেকে ওদের কথা শুনতে পেয়ে এক মুহূর্তের জন্যে ডাক্তারকে থামালাম। প্রিন্সের শেষ কথাগুলো কানে এল। তারপরেই শোনা গেল তাঁর জঘন্য হাসি এবং নাতাশার আর্তচিৎকার, 'ও ভগবান!' সেই মুহূর্তে দরজা খুলে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম প্রিন্সের ওপর।

ওঁর মুখে থুতু দিয়ে গায়ের সবখানি জোরে একটা চড় কষলাম গালের ওপর। আমার ওপর উনি হয়ত ঝাঁপিয়ে পড়তেন, কিন্তু আমরা দুজন দেখে সর্বাগ্রেই টেবিল থেকে মোড়কটা টেনে নিয়ে পলায়ন করলেন। হ্যাঁ, মোড়কটা টেনেই নিলেন; নিজের চোখে দেখলাম। রান্নাঘরের টেবিল থেকে একটা বেলনা তুলে নিয়ে সেটা ছুড়ে মারলাম ওঁর দিকে... ঘরে ফিরে এসে দেখলাম,

ডাক্তার নাতাশাকে ধরে আছেন, ছটফট করে নাতাশা তাঁর হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছে, যেন মূর্ছা যাবে। ওকে শান্ত করতে অনেক সময় লাগল। অবশেষে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া গেল ওকে, ভুল বকছিল, মনে হল ব্রেন ফিভারই শুরু হয়েছে।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে ডাক্তার?'

উনি বললেন, 'দাঁড়ান, রোগটা আর একটু ভালো করে দেখতে হবে, তারপর বুঝব... কিন্তু সাধারণভাবে বললে গতিক ভালো নয়। ব্রেন ফিভারও হয়ে যেতে পারে... তবে, ব্যবস্থা নেওয়া যাবে...'

কিন্তু অন্য একটা কথা মনে এল আমার। ডাক্তারকে অনুনয় করে বললাম, আরো দুই-তিন ঘণ্টা যেন উনি নাতাশার সঙ্গে থাকেন, এবং প্রতিশ্রুতি দিন যেন এক মিনিটের জন্যেও ওকে ছেড়ে না যান। ওঁর প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমি ছুটলাম বাড়ি।

মনমরার মতো উদ্বিগ্ন হয়ে এক কোণে বসে ছিল নেল্লী। আমার দিকে তাকালে অদ্ভুত দৃষ্টিতে। আমাকেও বোধ হয় বেশ অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।

ওর হাত ধরে নিজে বসলাম সোফায়, আর কোলের ওপর ওকে বসিয়ে আবেগভরে চুমু খেলাম। ও লাল হয়ে উঠল।

বললাম, 'নেল্লী, লক্ষ্মীটি আমার, আমাদের একটু উদ্ধার করবে তুমি? আমাদের সকলকে বাঁচাবে?'

ও তাকালে অবাক হয়ে।

'নেল্লী, তুমিই এখন আমাদের একমাত্র আশা! একটি বাপ আছেন, তাঁকে তুমি দেখেছ, চেনো। সে বাপ অভিশাপ দিয়েছেন তাঁর মেয়েকে। তাঁর মেয়ের জায়গা নেবার জন্যে কাল উনি এসেছিলেন তোমায় ডাকতে। এখন সেই মেয়ে, নাতাশাকে (তুমি তো তাকে ভালোবাসো বলেছিলে!) ছেড়ে গেছে সেই লোকটি যাকে সে ভালোবাসত, যার জন্যেই নাতাশা তার বাবাকে ছেড়ে এসেছিল। লোকটি সেই প্রিন্সের ছেলে, মনে আছে, সেই যে একদিন সন্ধ্যেয় আমার কাছে এসেছিল, তুমি একলা ছিলে, ওকে দেখে পালিয়ে গিয়েছিলে, তারপর অসুখ করল তোমার... সেই প্রিন্সকে তো তুমি চেনো? লোকটা ভারি পাজি!'

'চিনি,' বলে নেল্লী কেঁপে ফ্যাকাশে হয়ে উঠল।

'হ্যাঁ, লোকটা পাজি। ওর ছেলে আলিওশা নাতাশাকে বিয়ে করতে চাইছিল বলে প্রিন্সের ভারি রাগ ছিল নাতাশার ওপর। আজ আলিওশা

চলে গেছে আর তার একঘণ্টা বাদেই বাপ গিয়ে হাজির হয় নাতাশার ওখানে, তাকে অপমান করে, হুমকি দেয় ওকে জেলে আটক করবে, নানারকম বিদ্রূপ করে। আমার কথা বুঝতে পারছ নেল্লী?'

ওর কালো চোখদুটো জ্বলে উঠল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চোখ নামিয়ে নিলে ও।

প্রায় অনুচ্চারিত স্বরে ফিসফিস করে ও বললে, 'বুঝতে পারছি।'

'এখন নাতাশা একা, অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমাদের ডাক্তারের কাছে ওকে রেখে আমি ছুটে এসেছি তোমার কাছে। শোনো নেল্লী, চলো আমরা যাই নাতাশার বাবার কাছে। ওঁকে তোমার ভালো লাগে না, ওঁর কাছে যেতে চাও নি, কিন্তু এখন চলো, ওঁর কাছে আমরা দুজনেই যাই। গিয়ে আমি বলব, তুমি ওঁদের কাছে থাকতে রাজী হয়েছ, ওঁদের মেয়ে নাতাশার জায়গা নেবে। বৃদ্ধ নাতাশাকে অভিশাপ দিয়েছেন, তার ওপর আলিওশার বাপ ওঁকে সেদিন মারাত্মক অপমানিত করেছে — এইসব কারণে বৃদ্ধ এখন অসুস্থ। মেয়ের কোনো কথাই এখন উনি শুনতে রাজী নন, অথচ মেয়েকে উনি ভালোবাসেন নেল্লী, সত্যি ভালোবাসেন। তার সঙ্গে মিটমাট করে নিতে চান, আমি তা জানি, সব জানি!.. শুনছ নেল্লী?'

'শুনছি,' নেল্লী বললে সেইরকম ফিসফিস করে। কথা বলার সময় আমার চোখ ভরে উঠছিল জলে। আমার দিকে ভীরু-ভীরু দৃষ্টিতে চাইছিল নেল্লী।

'সেটা বিশ্বাস করছ তো?'

'করছি।'

'বেশ, তাহলে আমি তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাব। ওঁরা তোমায় আদর করে ঘরে তুলবেন, নানা কথা জিজ্ঞেস করবেন। আমি তখন আলাপটাকে এমনভাবে মোড় ঘোরাব যাতে ওঁরা তোমার অতীত জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করেন, তোমার মা, তোমার দাদু সম্পর্কে জানতে চান। সবকিছু ওঁদের তুমি ব'লো নেল্লী, আমায় যেমন বলেছিলে। সব, সবকিছুই ব'লো, সোজাসুজি, কিছুই চেপে রেখো না। ব'লো, কীভাবে তোমার মাকে ত্যাগ করে যায় একটা পাজি লোক, কীভাবে বুবনভার বাড়িতে একটা মাটির নিচের কুঠরিতে উনি মারা যান, কীভাবে মায়ে মেয়েতে তোমরা রাস্তায় ভিক্ষে করতে, উনি কী বলেছিলেন, মরার সময় কী উপদেশ দিয়ে গেছেন... দাদুর কথাও ওঁদের ব'লো। ব'লো, উনি তোমার মাকে ক্ষমা করতে চান নি, মৃত্যুর আগে মা

তোমায় ওঁর কাছে পাঠিয়ে ছিলেন যাতে উনি এসে তাঁকে ক্ষমা করেন, কিন্তু উনি তা চান নি... কেমন করে মা মারা গেলেন। সব, সবকিছু তুমি ব'লো! তোমার এসব কথা শুনে বৃদ্ধের নিজের মনেও সব বিঁধতে থাকবে। উনি তো জানেন যে আলিওশা নাতাশাকে আজ ত্যাগ করে গেছে, অপমান আর গালাগালি খেয়ে নাতাশা এখন একা, সহায় কেউ নেই, রক্ষক কেউ নেই, শত্রু ওকে চুনকালি মাখাবে। উনি এসবই জানেন... নেল্লী, নাতাশাকে বাঁচাও! যাবে তো?'

'যাব,' গভীর একটা শ্বাস নিয়ে, আমার দিকে বহুক্ষণ বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ও বললে। সে দৃষ্টিতে তিরস্কারের মতো কিছু যেন একটা ছিল, মনের মধ্যে গিয়ে তা বিঁধল আমার।

কিন্তু আমার কল্পনা আমি ছাড়তে পারলাম না। একান্ত ভরসা ছিল এতে। নেল্লীর হাত ধরে আমরা বেরিয়ে গেলাম। তখন দু'টো বেজে গেছে। মেঘ জমছে। কয়েকদিন ধরে আবহাওয়াটা যাচ্ছিল গরম, গুমোট। কিন্তু এখন শোনা গেল দূরে কোথায় যেন নববসন্তের প্রথম মেঘগর্জন। হাওয়া ছুটছিল ধুলোভরা রাস্তা ভাসিয়ে।

গাড়িতে উঠলাম আমরা। সারা রাস্তা নেল্লী একটি কথাও কইলে না। শুধু থেকে থেকে সেই বিচিত্র রহস্যময় দৃষ্টিতে চাইছিল আমার দিকে। বুক ওর ওঠাপড়া করছিল। গাড়িতে ওকে ধরে রেখে ছিলাম আমি, অনুভব করছিলাম আমার হাতের তালুর ওপর ওর ছোট্ট বুকখানা এমন ঢিপঢিপ করছে যেন এই বুঝি তা ভেঙে বেরিয়ে আসবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাস্তাটা যেন ফুরোতেই চাইছিল না। অবশেষে পেঁছলাম, আমার বৃদ্ধাদের ঘরে ঢুকলাম আড়ষ্ট বুকে। জানতাম না, ফেরার সময়টা কী দাঁড়াবে, কিন্তু এইটে জানা ছিল যে যাই হোক মিটমাট করিয়ে ক্ষমা নিয়ে আমায় ফিরতে হবে।

ইতিমধ্যে তিনটে বেজে গিয়েছিল। বুড়োবুড়ি যথারীতি বসেছিলেন একাকী। নিকোলাই সের্গেয়িচ খুবই বিচলিত, অসুস্থ অবস্থায় আধশোয়া হয়ে পড়েছিলেন তাঁর আরামকেদারায়, দেখতে বিবর্ণ, অবসন্ন, মাথা ঘিরে জলপটি। পাশে বসে ছিলেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা, থেকে থেকে ভিনিগার

দিয়ে তাঁর রগটা ভিজিয়ে দিচ্ছিলেন এবং অনবরত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মুখের দিকে এমনভাবে চেয়ে থাকছিলেন যে বৃদ্ধ মনে হয় তাতে খুবই অস্বস্তি, বলতে কি বিরক্তিই বোধ করছিলেন। গোঁয়ারের মতো চুপ করে ছিলেন উনি, আর কথা বলার সাহস হচ্ছিল না বৃদ্ধার। আমাদের আকস্মিক আগমনে ওঁরা দুজনেই অবাক হয়ে গেলেন। কেন জানি, নেল্লীর সঙ্গে আমায় দেখে আন্না আন্দ্রেয়েভনা ভয় পেয়ে গেলেন এবং প্রথমটা এমনভাবে আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন যেন হঠাৎ নিজেকে কেমন অপরাধী বলে মনে হয়েছে তাঁর।

ভেতরে ঢুকে বললাম, 'এই যে, আমার নেল্লীকে নিয়ে এলাম আপনাদের কাছে। মন ঠিক করে নিয়েছে ও, নিজেই আসতে চাইছিল। ঘরে তুলে নিন ওকে, ভালোবাসবেন...'

বৃদ্ধ আমার দিকে তাকালেন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এবং তাঁর ওই চাউনি দেখেই বুঝলাম উনি সবই জানেন, জানেন নাতাশা এখন নিঃসঙ্গ, একাকী, পরিত্যক্তা, এবং ইতিমধ্যে হয়ত-বা লাঞ্ছিতাও হয়েছে। আমাদের আগমনের রহস্য ভেদ করার জন্যে উনি খুব উৎসুক হয়ে ছিলেন, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন আমাদের দিকে। নেল্লী কাঁপছিল, আমার হাতখানা জোরে চেপে ধরে মাটির দিকে চেয়ে ছিল আর ফাঁদে পড়া ছোট এক প্রাণীর মতো শুধু থেকে থেকে ভীত দৃষ্টিপাত করছিল চারিদিকে। আন্না আন্দ্রেয়েভনা কিন্তু শিগ্‌গিরই সচেতন হয়ে ব্যাপারটা বুঝলেন। নেল্লীর দিকে ধেয়ে এলেন তিনি, চুমু খেলেন, আদর করলেন, এমনকি কেঁদেও ফেললেন, তারপর হাতখানি ওর নিজের হাতে নিয়ে সস্নেহে নেল্লীকে বসালেন পাশে। কৌতূহলে এবং কেমন একটা বিস্ময়ে নেল্লী তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল কটাক্ষে।

কিন্তু আদর করে পাশে বসাবার পর আর যে কী করতে হবে উনি তা ঠিক ধরতে না পেরে সরল প্রত্যাশায় চাইতে লাগলেন আমার দিকে। বৃদ্ধের মুখ কুঁচকে উঠল, নেল্লীকে কেন এনেছি তার কারণ যেন তিনি প্রায় ধরি-ধরি করছেন। আমি তাঁর অপ্রসন্ন মেজাজ ও ভ্রূকুটি লক্ষ্য করেছি, টের পেয়ে বৃদ্ধ কপালে হাত দিয়ে কাটা কাটা ভাবে জানালেন:

'ভারি মাথা ধরেছে ভানিয়া।'

নীরবে বসে রইলাম আমরা। আমি ভাবছিলাম কী করে শুরু করি। ঘরের ভেতরটা আঁধার-আঁধার। আকাশ ঘিরে ঝোড়ো কালো মেঘ জমছে। দূরের মেঘগর্জন ফের কানে এল।

'এ বসন্তে মেঘডাকাটা যেন একটু আগেই হল,' বললেন বৃদ্ধ, 'কিন্তু মনে আছে সাঁইত্রিশ সালে, দেশের বাড়িতে, মেঘডাকা শুরু হয়েছিল আরো আগে।'

আন্না আন্দ্রেয়েভনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'একটু চা চাপাব নাকি?' কিন্তু কেউ জবাব দিল না। ফের তিনি নেল্লীর দিকে ফিরলেন।

বললেন, 'কী নাম তোমার বাছা?'

ক্ষীণকণ্ঠে নাম বলে নেল্লী আরো ঘাড় নিচু করল। বৃদ্ধ তার দিকে তাকালেন স্থির দৃষ্টিতে।

'তার মানে ইয়েলেনা, তাই না?' একটু উৎসাহিত হয়ে বললেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা।

'হ্যাঁ।' নেল্লী বললে। আবার এক মুহূর্ত সকলে নীরব।

'আমার এক আত্মীয়া প্রাস্‌কভিয়া আন্দ্রেয়েভনার ভাইঝির নাম ছিল ইয়েলেনা। মনে আছে, ওকেও সকলে ডাকত নেল্লী বলে,' বললেন নিকোলাই সের্গেয়িচ।

'আত্মীয়স্বজন তোমার কেউ নেই বাছা? মা কি বাপ?' আন্না আন্দ্রেয়েভনা জিজ্ঞেস করলেন।

'না,' ঝটকা মেরে ভীরু গলায় ফিসফিসিয়ে বললে নেল্লী।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি বটে, তা শুনেছি। তোমার মা কি অনেকদিন মারা গেছেন?'

'না, বেশিদিন নয়।'

'আহা বেচারী, অনাথিনী,' মমতাভরে নেল্লীর দিকে তাকিয়ে বলে চললেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা। টেবিলের ওপর অধৈর্যে টোকা দিয়ে যাচ্ছিলেন বৃদ্ধ।

'তোমার মা তো বিদেশী ছিলেন, তাই না? তাই তো আপনি আমায় বলেছিলেন ইভান পেত্রোভিচ?' বৃদ্ধা মহিলা তাঁর ভীরু-ভীরু জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে গেলেন।

কালো চোখের চকিত দৃষ্টি হেনে নেল্লী যেন সাহায্য চাইলে আমার। ওর নিশ্বাস পড়ছিল কেমন যেন এলোমেলো, ভারি-ভারি।

'ইংরেজ বাপ আর রুশ মায়ের সন্তান ওর মা। সুতরাং উনি মোটের ওপর রুশী, আন্না আন্দ্রেয়েভনা। কিন্তু নেল্লীর জন্ম হয়েছে বিদেশে।'

'কিন্তু ওর মা কেন স্বামীর সঙ্গে বিদেশে চলে যায়?'

হঠাৎ লাল হয়ে উঠল নেল্লী। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা টের পেলেন ভুল করেছেন। চমকে উঠলেন স্বামীর সরোষ দৃষ্টিপাতে। কঠোর চোখে উনি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মুখ ফেরালেন জানলার দিকে।

হঠাৎ আন্না আন্দ্রেয়েভনাকে লক্ষ্য করে উনি বলতে শুরু করলেন, 'নীচ পাজি একটা লোক ওর মাকে প্রতারণা করেছিল। ওর মা বাপকে ছেড়ে তার সঙ্গে চলে যায়, বাপের টাকাকড়ি সব প্রেমিককে দিয়ে দেয়। লোকটা সেসব টাকা ঠকিয়ে নেয়, ওকে বিদেশে নিয়ে গিয়ে টাকা মেরে তারপর ছেড়ে চলে যায় ওকে। একটি ভালো লোক ওকে ছেড়ে যায় না, আমরণ ওকে সাহায্য করে গেছে। সে যখন মারা যায়, তখন ওর মা ফিরে আসে বাপের কাছে, দুবছর আগে। তাই তো তুমি বলেছিল ভানিয়া, তাই না?' আচমকা জিজ্ঞেস করলেন আমায়।

ভয়ানক বিচলিত হয়ে নেল্লী উঠে যেতে চাইলে দোরের দিকে।

শেষ পর্যন্ত ওর দিকে হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'এসো নেল্লী, এসো, এখানে বসো আমার পাশে, এই এখানে।' নুয়ে পড়ে উনি চুমু দিলেন ওর কপালের ওপর; আস্তে করে হাত বুলোতে লাগলেন ওর মাথায়। সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠল নেল্লীর... কিন্তু সংযত করে নিলে নিজেকে। বিগলিত হয়ে সানন্দ প্রতীক্ষায় আন্না আন্দ্রেয়েভনা লক্ষ্য করতে লাগলেন, অনাথিনীটির প্রতি শেষ পর্যন্ত তাঁর নিকোলাই সের্গেয়িচ মায়া দেখাতে শুরু করেছেন।

'আমি জানি নেল্লী, একটা পাজি লোক, পাজি দুর্নীতিপরায়ণ একটা লোক তোমার মায়ের সর্বনাশ করেছে। কিন্তু তোমার মা যে তোমার দাদুকে ভালোবাসত, সম্মান করত তাও আমি জানি,' নেল্লীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বিচলিত হয়ে বলে চললেন বৃদ্ধ; এই মুহূর্তে এই চ্যালেঞ্জটা না দিয়ে তিনি সইতে পারছিলেন না। বিবর্ণ দুই গালে একটা ফিকে রং ছড়িয়ে পড়ল তাঁর। চেষ্টা করলেন আমাদের চোখাচোখি না হবার।

'দাদু মাকে যা ভালোবাসতেন, মা দাদুকে ভালোবাসত তার চেয়ে ঢের বেশি।' ভয়ে ভয়ে কিন্তু দৃঢ় গলায় নেল্লী বললে। কারো চোখের দিকে সেও তাকালে না।

'কী করে জানলে তুমি?' ছেলেমানুষের মতো আত্মসংযম হারিয়ে বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন কড়া করে, অথচ এ অধৈর্যে লজ্জাও যেন বোধ করলেন মনে মনে।

'আমি জানি,' ঝটকা মেরে মেরে জবাব দিলে নেল্লী, 'মাকে উনি গ্রহণ করতে চান নি... তাড়িয়ে দিয়েছিলেন...'

দেখলাম, নিকোলাই সের্গেয়িচ কী যেন বলতে, আপত্তি করতে চেয়েছিলেন, যেমন গ্রহণ না করার কারণ ছিল, এমন একটা জবাব দিতে উঠেছিলেন, কিন্তু আমাদের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন।

'সেকী? দাদু তোমাদের যখন গ্রহণ করলেন না তখন কোথায় গিয়ে ছিলে তোমরা?' জিজ্ঞেস করলেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা, ঠিক এই প্রসঙ্গটাকে চালিয়ে যাবার জন্যে হঠাৎ একটা ইচ্ছে, একটা একগ‍ুঁয়েমি পেয়ে বসল ওঁকে।

নেল্লী বললে, 'ফিরে এসে আমরা বহুদিন দাদুর খোঁজ করেছিলাম, কিন্তু সন্ধান পাই নি। মা আমায় তখনই বলেছিল, দাদু একসময় খুব বড়োলোক ছিলেন, একটা কারখানা বসাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে ভারি গরিব হয়ে যান, কেননা যে লোকটার সঙ্গে মা চলে গিয়েছিল সে দাদুর সব টাকা নিয়ে নিয়েছিল মায়ের কাছ থেকে, ফেরত দেয় নি। মা নিজ মুখেই আমায় তা বলেছে।'

'হুম্...' সাড়া দিলেন বৃদ্ধ।

'মা বলেছিল,' ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে বলে চলল নেল্লী যেন নিকোলাই সের্গেয়িচকে খণ্ডণ করার জন্যে, কিন্তু আন্না আন্দ্রেয়েভনার দিকে চেয়ে, 'মা বলেছিল, দাদু মায়ের ওপর ভারি রাগ করেছেন, দাদুর প্রতি মা নিজেই খুব অন্যায় করেছে, অথচ দুনিয়ায় দাদু ছাড়া আর তখন আমাদের কেউ নেই। বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিল মা... দেশে ফেরার সময় মা বলেছিল, "উনি আমায় ক্ষমা করবেন না, কিন্তু হয়ত তোকে দেখে ভালোবাসবেন, তোর জন্যে আমাকেও ক্ষমা করবেন।" মা খুব ভালোবাসত আমায়, এসব কথা বলতে গিয়ে কেবলি চুমু খেত আমায়, কিন্তু দাদুর কাছে যেতে খুব ভয় পেত। মা আমায় শিখিয়ে দিয়েছিল দাদুর মঙ্গলের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে, নিজেও প্রার্থনা করত দাদুর জন্যে, আগে দাদুর সঙ্গে কীভাবে মা ছিল তার কত কথা আমায় বলেছে মা, দাদু কীরকম ভালোবাসতেন মাকে, সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। মা দাদুকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনাত, সন্ধ্যা বেলায় শোনাত বই পড়ে, দাদু মাকে চুমু খেয়ে নানারকম সব উপহার এনে দিতেন... সবকিছু দিতেন। সেই নিয়েই একবার মার জন্মদিনে ওদের ঝগড়া হয়ে যায়। কেননা দাদু ভেবেছিলেন, কী উপহার দিচ্ছেন তা মা জানে না। কিন্তু মা আগেই তা টের পেয়ে গিয়েছিল। মা

চেয়েছিল কানের দুল, কিন্তু দাদু মাকে ঠকাবার জন্যে বলেছিলেন দুল হবে না, হবে ব্রোচ্। তারপর দুল দেবার পর দাদু যখন দেখলেন মা আগে থেকেই জানত দুল আসবে, তখন খুব রেগে গিয়ে গোটা এক বেলা কথা কন নি। পরে নিজেই এসে চুমু খেয়ে মিটিয়ে নিয়েছেন...'

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল নেল্লী, জীর্ণ বিবর্ণ গালদুটো পর্যন্ত ওর খানিকটা রাঙা হয়ে উঠল।

বোঝা গেল, নিচ-কুঠরির কোণটিতে বসে মা তার ছোট্ট নেল্লীর কাছে বহুবার তার অতীতের সুখের দিনগুলোর কথা গল্প করে শুনিয়েছে, জীবনের একমাত্র আনন্দের ধন তার ছোট্ট মেয়েটিকে চুমোয় চুমোয় ভরে দিয়ে কেঁদেছে। কখনো ভাবে নি মেয়েটার রুগ্ন উত্তেজনাপ্রবণ, অকালে পরিণত মনের ওপর কী প্রবল প্রভাব পড়বে তার।

কিন্তু উত্তেজিত হলেও হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠল নেল্লী। সন্দিগ্ধভাবে চারিদিকে চেয়ে ফের চুপ করে গেল সে। ভ্রুকুটি করে বৃদ্ধ ফের টেবিলে টোকা দিতে লাগলেন। আন্না আন্দ্রেয়েভনার চোখে টলমল করে উঠল এক ফোঁটা অশ্রু, নীরবে সেটিকে তিনি মুছে নিলেন রুমালে।

মৃদু কণ্ঠে নেল্লী বললে, 'মা এখানে আসেন, খুব অসুখ নিয়ে। বুকের দোষ হয়েছিল মার। বহুদিন ধরে দাদুর খোঁজ করেও দেখা পাই নি। নিচ-কুঠরির একটা কোণ আমরা ভাড়া নিই।'

'একটা কোণ! আর অমন অসুখ তোমার মায়ের!' চেঁচিয়ে উঠলেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা।

'হ্যাঁ... একটা কোণ...' নেল্লী বললে, 'মা তো গরিব ছিল। আমায় বলত,' উত্তেজিত হয়ে ও যোগ করলে, 'গরিব হওয়া কিছু পাপ নয়, বড়োলোক হয়ে লোকের মনে আঘাত দেওয়াই হল পাপ... ভগবান মাকে শাস্তি দিচ্ছেন।'

'ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপে থাকতে তোমরা? বুবনভার বাড়িতে, না?' বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন আমার দিকে চেয়ে, প্রশ্নটায় একটা অবহেলার ভাব ফুটিয়ে। জিজ্ঞেস করলেন এই জন্যে যেন চুপ করে থাকতে তাঁর অস্বস্তি লাগছিল।

নেল্লী বললে, 'না, সেখানে নয়। প্রথমে ছিলাম মেশ্যান্স্কায়া স্ট্রিটে। খুব অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে,' একটু থামলে নেল্লী, 'মার অসুখ খুব বেড়ে গেল, তবু একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে নি। আমি তার কাপড়চোপড় পরিষ্কার করে দিতাম, মা কাঁদত। একটা বুড়িও থাকত সেখানে, এক ক্যাপ্টেনের বিধবা বউ। আর ছিল অবসর-নেওয়া একজন রাজকর্মচারী, রোজ ফিরত মদ খেয়ে,

সারা রাত চেঁচামেচি করত, ঝগড়া বাধাত। ওকে ভারি ভয় লাগত আমার। মা আমাকে বিছানার মধ্যে নিয়ে জড়িয়ে ধরে থাকত। ওর গালাগালি চেঁচামেচি শুনে মারও কাঁপুনি ধরে যেত। একবার লোকটা ক্যাপ্টেনের বিধবাকে মারতে যায় — একেবারে বুড়ি মেয়েমানুষ, লাঠি ভর দিয়ে হাঁটত। মা বুড়িটার পক্ষ নেয়, তাতে লোকটা মাকেও মেরে বসে, আমিও লোকটাকে মারি...'

নেল্লী থেমে গেল। ঘটনাগুলো মনে পড়ে অস্থির হয়ে উঠছিল সে। চোখদুটো জ্বলছিল।

'মা গো!' গল্পের মধ্যে একেবারে ডুবে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা। চোখ তাঁর নেল্লীর ওপর নিবদ্ধ, নেল্লীও কথা কইছিল প্রধানত তাঁর দিকেই চেয়ে।

নেল্লী বললে, 'মা তারপর আমায় নিয়ে বেরিয়ে যায়। দিনের বেলা তখন। সন্ধে পর্যন্ত আমরা রাস্তায় রাস্তায় কেবলি ঘুরে বেড়ালাম, সারাটা সময় মা শুধুই হাঁটে আর কাঁদে, আমায় নিয়ে যায় হাত ধরে। আমি আর পারছিলাম না। সারা দিন খাওয়াও হয় নি। মা শুধু নিজের মনে মনে বিড়বিড় করে আর আমায় বলে, "গরিব হয়ে থাকিস নেল্লী, আমি মরে গেলে কারও কথা শুনিস না, কিছু শুনিস না। একা থাকবি, গরিব হয়ে খেটে খাস, কাজ না পেলে ভিক্ষে করিস তবু ওদের কাছে যাবি না!" গোধূলি হয়ে এসেছে। একটা রাস্তা পেরোচ্ছি আমরা, হঠাৎ মা চেঁচিয়ে উঠল, "আজর্কা! আজর্কা!" মস্ত একটা ন্যাড়া কুকুর কেঁউ কেঁউ করে লাফাতে লাফাতে ছুটে এল মার কাছে। ভয় পেয়ে গিয়েছিল মা। ফ্যাকাশে হয়ে চিৎকার করে মা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল একটা লম্বা বুড়ো লোকের পায়ের কাছে। বুড়োটা মাথা নিচু করে লাঠি ঠুক ঠুক করে হেঁটে আসছিল। ঐ লম্বা বুড়োটাই হল গে আমার দাদু। কী রোগা, আর কী ন্যাতাকানি পোশাক। সেই প্রথম দেখলাম দাদুকে। দাদুও খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে যান। তারপর যখন দেখলেন পায়ের কাছে পড়ে মা ওঁর হাঁটুদুটো জড়িয়ে ধরেছে, তখন নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মাকে ঠেলে ফেলে লাঠি দিয়ে রাস্তার ওপর বাড়ি মেরে তাড়াতাড়ি করে চলে গেলেন। আজর্কা গেল না, কেঁউ কেঁউ করে মার গা চাটতে লাগল, তারপর দাদুর কাছে ছুটে গিয়ে তাঁর কোটের কোনা ধরে টেনে আনার চেষ্টা করলে। কিন্তু দাদু লাঠির বাড়ি মারলেন আজর্কাকে। আজর্কা ফের ছুটে আসতে চাইছিল আমাদের দিকে, কিন্তু

দাদু ডাকলেন, তাই কেঁউ কেঁউ করতে করতে ও দাদুর পিছু পিছু চলে গেল। মা পড়ে রইল মড়ার মতো। চারিদিকে ভিড় জমে গেল। পুলিস এল। আমি চেঁচাতে লাগলাম, মাকে তোলবার চেষ্টা করলাম। উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকাল মা, তারপর আমার সঙ্গে সঙ্গে এল। আমি মাকে বাড়ি নিয়ে এলাম। লোকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে আমাদের, আপসোসের ভঙ্গি করে মাথা নাড়লে...'

দম নিয়ে নিজেকে শক্ত করার জন্যে থামলে নেল্লী। ভয়ানক ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল ও, কিন্তু চোখ তার স্থির প্রতিজ্ঞায় জ্বলছিল। বোঝা গেল, সবকিছু বলবে বলে ও শেষ পর্যন্ত তার মন ঠিক করে ফেলেছে। সেই মুহূর্তে কেমন একটা আস্ফালনও ফুটে উঠেছিল ওর মধ্যে।

'কিন্তু,' স্খলিত কণ্ঠে কেমন একটা বিরক্ত রূঢ়তায় মন্তব্য করলেন নিকোলাই সের্গেয়িচ, 'কিন্তু আপন বাপের প্রতি অন্যায় করেছিলেন তোমার মা, তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার সঙ্গত কারণ ছিল তোমার দাদুর...'

'মাও তাই বলত,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল নেল্লী, 'বাড়ি ফেরবার সময় মা কেবলি বলছিল, উনি তোমার দাদু, নেল্লী, আমি ওঁর কাছে অপরাধ করেছি, সেই জন্যেই উনি অভিশাপ দিয়েছেন আমায়, এখন ঈশ্বর আমায় শাস্তি দিচ্ছেন! সেদিন সারা সন্ধ্যে, তারপরের গোটা দিন মা কেবল এই কথাই বলেছে। আর বলেছে কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো...'

বৃদ্ধ চুপ করে রইলেন।

'পরে আর একটা বাসায় তোমরা উঠে গেলে কেমন করে?' জিজ্ঞেস করলেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা। এতক্ষণ তিনি নীরবে কাঁদছিলেন।

'সেই রাত্রেই মা অসুখে পড়ে। ক্যাপ্টেনের সেই বিধবা একটা বাসা ঠিক করে দেয় বুবনভার ওখানে। দুদিন পরে আমরা উঠে যাই, ক্যাপ্টেনের বৌও আসে আমাদের সঙ্গে। আমরা উঠে যাবার পর থেকে মা একেবারে শয্যা নেয়, তিন সপ্তাহ রোগে পড়ে থাকে, আমি তার দেখাশোনা করতাম। আমাদের সব টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল, কিছু কিছু সাহায্য করত ক্যাপ্টেনের বৌ আর ইভান আলেক্সান্দ্রিচ।'

'একজন কফিনওয়ালা, ওদের কাছেই এরা ভাড়াটে হিসাবে থাকত।' আমি বললাম বুঝিয়ে।

'মা যখন ফের উঠে হেঁটে বেড়াতে পারল, তখন তার কাছ থেকে আজর্কা সম্পর্কে সব শুনি।'

নেল্লী থামল। আলাপটা কুকুরের প্রসঙ্গে গেছে দেখে বৃদ্ধ বোধ হয় একটু স্বস্তি বোধ করলেন।

'আজর্কা সম্পর্কে কী বলেছিলেন তোমার মা?' উনি জিজ্ঞেস করলেন চেয়ারে আরো বেশি ঝুঁকে বসে, মুখখানা যেন আরো বেশি আড়ালে রাখতে চান। চেয়ে রইলেন মাটির দিকে।

নেল্লী বললে, 'মা কেবলি দাদুর কথা বলত, অসুখের সময়েও মুখে শুধু ঐ এক কথা। ভুলও বকত ঐ দাদুর কথা বলে। অসুখ যখন সেরে যেতে লাগল তখন ফের আগেকার জীবনের সব কথা বলতে লাগল... সেই সময়েই মা আজর্কার কথাও বলে। শহরের বাইরে নদীতে ডুবিয়ে মারার জন্যে কতকগুলো ছেলে একদিন আজর্কার গলায় দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। মা তাদের টাকা দিয়ে আজর্কাকে কিনে নেয়। আজর্কাকে দেখে দাদু একেবারে হেসে খুন। আজর্কা কিন্তু পালিয়ে গেল, মা কাঁদতে শুরু করল। ভয় পেয়ে দাদু বললেন, আজর্কাকে যে এনে দেবে তাকে একশ রুবল দেওয়া হবে। তিনদিনের দিন নিয়ে আসা হল আজর্কাকে। দাদু একশ রুবল দিলেন, আর সেদিন থেকে উনি ভালোবাসতে লাগলেন আজর্কাকে। আজর্কাকে মা এত ভালোবাসত যে ওকে নিয়েই বিছানায় শুত। মা বলেছিল, রাস্তায় যারা খেলা দেখায় আজর্কা তাদের কারো কুকুর, পিছনের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারত আজর্কা, পিঠের ওপর বাঁদরকে সওয়ারী করে নিয়ে যেতে পারত, রাইফেল কাঁধে ড্রিল করতে পারত, নানারকম খেলা জানত... মা যখন চলে যায়, তখন দাদু আজর্কাকে রেখে দিয়েছিলেন, সব সময় আজর্কাকে নিয়েই বেড়াতেন, তাই রাস্তায় মা আজর্কাকে দেখেই বুঝতে পারে, দাদু নিশ্চয় কাছাকাছি থাকবেন...'

স্পষ্টতই আজর্কা সম্পর্কে এই কথা শোনার আশা করেন নি বৃদ্ধ, ক্রমেই মুখ হাঁড়ি করতে লাগলেন উনি। আর একটি প্রশ্নও করলেন না।

'দাদুর সঙ্গে তোমাদের তাহলে আর দেখা হয় নি?' জিজ্ঞেস করলেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা।

'দেখা হয়েছিল। মা যখন ভালো হয়ে উঠতে শুরু করেছে, দাদুর সঙ্গে সেই সময় ফের দেখা হয় আমার। রুটি কেনবার জন্যে আমি যাচ্ছিলাম দোকানে। হঠাৎ দেখি আজর্কার সঙ্গে একটা লোক। ভালো করে চেয়ে দেখে চিনতে পারলাম, দাদু। পথ ছেড়ে দিয়ে দেয়ালের সঙ্গে শিটিয়ে রইলাম আমি। দাদু আমার দিকে চাইলেন, অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইলেন, এমন

সাংঘাতিক তাঁর সে চেহারা যে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। দাদু হেঁটে চলে গেলেন, কিন্তু আজর্কা আমায় চিনতে পেরে লাফালাফি শুরু করে দিলে, হাত চাটতে লাগল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম আমি। আসবার সময় পিছনে তাকিয়ে দেখি, দাদু সেই দোকানটাতে ঢুকেছেন। ভাবলাম, বোধ হয় আমাদের কথা জিজ্ঞেস করছেন, ফলে আরো ভয় লাগল। বাড়ি ফিরে মাকে কিছুই বলি নি; ভয় হয়েছিল শুনে ফের না অসুখ শুরু হয় মায়ের। পরের দিন দোকানে গেলাম না, বললাম মাথা ধরেছে। তারপর তিনদিনের দিন যাবার সময় কাউকেও দেখি নি, কিন্তু এমন ভয় করছিল যে সারা রাস্তা দৌড়ে দৌড়ে গেছি। কিন্তু তার একদিন পর সবে মোড় ফিরেছি, এমন সময় দেখি সামনে দাদু আর আজর্কা। দৌড়ে আর একটা রাস্তা দিয়ে ঘুরে দোকানে গেলাম, কিন্তু ফের একেবারে মুখোমুখি দেখা। ভয়ে একেবারে থ' হয়ে গেলাম, নড়তে পর্যন্ত পারলাম না। আমার সামনে দাঁড়িয়ে দাদু আবার অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার দিকে, তারপর আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন, হাত ধরে নিয়ে চললেন আমায়। লেজ নাড়তে নাড়তে আজর্কা এল পেছন পেছন। সেইদিন দেখলাম, দাদু ঠিক আর খাড়া হয়ে চলতে পারেন না, লাঠি ভর দিয়ে হাঁটেন, হাত কাঁপে। উনি আমায় নিয়ে গেলেন এক ফিরিওয়ালার কাছে, মোড়ে দাঁড়িয়ে লোকটা মিষ্টি রুটি আর আপেল বিক্রি করত। মুরগি আর মাছের মতো দেখতে মিষ্টি রুটি, একটা আপেল আর একটা লজেন্স কিনলেন দাদু, চামড়ার মানিব্যাগ থেকে পয়সা বার করার সময় হাত তাঁর ভয়ানক কাঁপছিল, একটা পাঁচ কোপেকী আনি পড়ে গেল তাঁর হাত থেকে। আমি সেটা তুলে দিলাম। মিষ্টি রুটি সমেত পয়সাটা উনি আমায় দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, কিন্তু সেদিনও কিছু না বলে হেঁটে চলে যান।

'বাড়ি এসে মাকে দাদুর কথা সব বললাম। বললাম প্রথমটা আমি কীরকম ভয় পেয়ে পালিয়ে ছিলাম। মার তো বিশ্বাসই হয় না, তারপর ভারি খুশি হয়ে সারা সন্ধ্যে নানা কথা জিজ্ঞেস করলে আমাকে; চুমু খেল আমায়, কাঁদল; তারপর সব কথা যখন শেষ হয়ে গেল, তখন বললে আর কখনো যেন দাদুকে দেখে ভয় না পাই, দাদু নিশ্চয় আমায় ভালোবাসেন, আমাকে দেখবার জন্যেই তো এসেছিলেন। বললে, দাদুর সঙ্গে যেন আমি খুব ভালো ব্যবহার করি, তার সঙ্গে কথা বলি। মাকে বলেছিলাম দাদু ঠিক সন্ধ্যের আগেই সাধারণত আসেন, তবু পরদিন সকালে বার কয়েক মা আমায় পাঠালে

বাইরে। নিজেও একটু দূরে থেকে পেছু পেছু এল আমার, কোনা কানাচে লুকিয়ে লুকিয়ে রইল। পরদিনও তাই করা গেল, কিন্তু দাদু আর এলেন না। সে সময়টা বাদলা চলছিল। বিচ্ছিরি ঠাণ্ডা লাগল মার, কেননা সব সময়েই বাইরে বেরুত আমার সঙ্গে। ফের বিছানা নিতে হল মাকে।

'দাদু এলেন এক সপ্তাহ পরে। ফের আমায় একটা মিষ্টি রুটির মাছ আর আপেল কিনে দিলেন, কিন্তু সেবারও কিছুই বললেন না। উনি চলে যাবার পর আমি চুপি চুপি তাঁর পেছু নিলাম, আগে থেকেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম দাদু কোথায় থাকেন তা দেখে এসে মাকে বলব। রাস্তার অন্যপাশ দিয়ে দূরে দূরে আমি যাচ্ছিলাম যাতে দাদু দেখতে না পান। অনেক দূরে থাকতেন উনি, পরে যেখানে মারা গেছেন সেখানে নয়। তখন উনি থাকতেন গরখোভায়া স্ট্রিটের একটা বড়ো বাড়ির চার তলায়। সবকিছু দেখে শুনে বাড়ি ফিরলাম দেরি করে, ভয়ানক ভয় পেয়ে গিয়েছিল মা, কেননা মা তো জানত না আমি কোথায় গেছি। মাকে যখন সব বললাম, তখন ফের খুব আনন্দ হল মার, ঠিক করলে পরদিনই গিয়ে দাদুকে দেখে আসবে। কিন্তু পরদিন ভেবেচিন্তে কেমন ভয় করতে লাগল মার, তিন দিন ধরেও সে ভয় তার গেল না, ফলে শেষ পর্যন্ত যাওয়াই হল না আর। তারপর আমায় ডেকে বললে, শোন নেল্লী, আমার এখন অসুখ, যেতে পারব না, কিন্তু একটা চিঠি লিখেছি তোর দাদুর কাছে, গিয়ে দিয়ে আসবি। চিঠিটা পড়ে কী ওঁর ভাব হয় দেখিস তো নেল্লী, কী বলেন, কী করেন। হাঁটু গেড়ে বসে চুমু খেয়ে মিনতি করিস যেন তোর মাকে উনি ক্ষমা করেন... ভয়ানক কাঁদে মা, কেবলি চুমু খায় আমাকে, যাবার সময় ক্রুশ করে, প্রার্থনা করে। আইকনের সামনে নিজের সঙ্গে আমাকেও জানু পেতে বসায়, নিজের খুব অসুখ সত্ত্বেও আমায় ফটক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে। যেতে যেতে পেছন ফিরে দেখি, মা তখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমায় দেখছে...

'দাদুর বাসায় এসে দরজা খুললাম। দরজায় কোনো হুড়কা ছিল না। টেবিলের সামনে বসে রুটি আর আলু খাচ্ছেন দাদু, আজর্কা তাঁর সামনে বসে খাওয়া দেখছে আর লেজ নাড়ছে। সে বাসাটাতেও জানলাগুলো ছোটো ছোটো, অন্ধকার, টেবিল চেয়ার মাত্র একটা করে। উনি থাকতেনও একা। ভেতরে ঢুকতেই উনি ভয়ে একেবারে শাদা হয়ে কাঁপতে লাগলেন। আমিও ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। একটা কথাও না বলে টেবিলের কাছে গিয়ে রেখে দিলাম চিঠিটা। চিঠিটা দেখেই দাদু ভয়ানক রেগে গিয়ে লাফিয়ে উঠে লাঠি

হাঁকালেন আমার উদ্দেশে, কিন্তু না মেরে ঠেলে বার করে দিলেন বাইরের বারান্দায়। সিঁড়ির প্রথম তলাটাও নামি নি, এমন সময় ফের দরজা খুলে উনি বেরিয়ে এসে না-খোলা চিঠিটা ছুঁড়ে দিলেন আমার দিকে। বাড়ি গিয়ে মাকে সব বললাম। মা তারপর ফের অসুখে পড়ে বিছানা নেয়...'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বেশ জোরে একটা একটা বজ্রপাত হয় সেই সময়। দরোদরো ধারায় বৃষ্টির শব্দ উঠল জানলার শার্সিতে। অন্ধকার হয়ে এল ঘরটা। সভয়ে ক্রুশ করলেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা। সকলেই হঠাৎ থেমে গেলাম আমরা।

জানলার দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'শিগ্‌গিরই থেমে যাবে।' তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করলেন ঘরময়। আড়চোখে ওঁকে লক্ষ্য করল নেল্লী। ভয়ানক রকমের সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। সেটা আমি বুঝতে পারছিলাম কিন্তু আমার দৃষ্টি এড়াতে চাইছিল সে।

'তারপর কী হল?' ফের আরামকেদারায় এসে বসে জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ।

ভীরুর মতো নেল্লী চারপাশে তাকালে একবার।

'দাদুর সঙ্গে তোমার তাহলে আর দেখা হয় নি?'

'হ্যাঁ হয়েছিল...'

'বটে, বটে! বলো বাছা, বলো ব্যাপারটা,' সূত্র ধরে যোগ করলেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা।

নেল্লী বললে, 'তিন সপ্তাহ তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয় নি, শীত না পড়া পর্যন্ত। তারপর শীত এল, তুষারপাত শুরু হয়েছে। দাদুর সঙ্গে যখন ফের সেই একই জায়গায় দেখা হল, আমি ভারি খুশি হয়ে উঠেছিলাম... উনি আসেন নি বলে মা খুব দুঃখু করছিল কিনা। ওঁকে দেখে ইচ্ছে করেই আমি রাস্তার অন্য পাশে ছুটে গেলাম, উনি দেখুন যে আমি ওঁর কাছ থেকে পালাচ্ছি। পেছন ফিরে দেখি, দাদু প্রথমে তাড়াতাড়ি করে আমার পেছু পেছু আসতে লাগলেন, তারপর ছুটতে শুরু করলেন, আমায় ধরবার জন্যে। আমায় ডাকতে লাগলেন, "নেল্লী, নেল্লী!" আজর্কাও ছুটছিল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। ওঁর জন্যে কষ্ট হল আমার। দাঁড়ালাম। দাদু এসে আমার হাত ধরে নিয়ে চললেন আমায়। আমি কাঁদছি দেখে উনি থামলেন একটু, তারপর

আমার দিকে তাকিয়ে নিচু হয়ে চুমু খেলেন আমায়। ওঁর নজরে পড়ল আমার জুতো জোড়া ছেঁড়া। জিজ্ঞেস করলেন, আর জুতো আমার আছে কিনা। আমি তক্ষুনি তাড়াতাড়ি করে বললাম, মার কাছে একটা পয়সাও নেই, যেখানে থাকি সেখানকার লোকেরা নেহাৎ দয়া করে আমাদের খেতে দেয়। দাদু কিছুই বললেন না, শুধু বাজারে নিয়ে গিয়ে আমায় এক জোড়া জুতো কিনে দিলেন, বললেন তক্ষুনি সেটা পরতে। তারপর সঙ্গে করে ওঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন আমায়, গরখোভায়া স্ট্রিটে। তার আগে একটা দোকান থেকে একটা কেক আর দুটো লজেন্স কিনেছিলেন উনি। বাড়ি পেঁছে উনি আমায় কেকটা খেতে বললেন, আর তাকিয়ে তাকিয়ে খাওয়া দেখতে লাগলেন আমার। তারপর দিলেন লজেন্সদুটো। টেবিলের ওপর থাবা দিয়ে উঁচু হয়ে আজর্কাও কেক খেতে চাইছিল। আমি তাকে খানিকটা দিলাম, দাদু হেসে উঠলেন। তারপর উনি আমায় পাশে নিয়ে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন, জিজ্ঞেস করলেন, আমি পড়াশুনা করেছি কি না, কী আমি জানি? আমি সব বললাম। উনি বললেন, সম্ভব হলেই আমি যেন রোজ বিকেলে তিনটের সময় ওঁর কাছে চলে আসি, উনি নিজেই পড়াবেন। তারপর আমায় বললেন মুখ ঘুরিয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকতে, উনি না বলা পর্যন্ত যেন ঘাড় না ফেরাই। যা বললেন করলাম। তার মধ্যেই চুপি চুপি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম বালিশের একটা কোণের সেলাই খুলে উনি চারটে রুবল বার করছেন। টাকাটা বার করে আমায় দিয়ে উনি বললেন, "এটা শুধু তোমার জন্যে।" টাকাটা নিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ কী ভেবে বললাম, "শুধু যদি আমার জন্যে হয় তাহলে চাই না।" তাতে হঠাৎ চটে উঠলেন দাদু। বললেন, "বেশ, যার জন্যে খুশি নিয়ে চলে যাও!" আমি চলে এলাম, উনি চুমুও খেলেন না।

'বাড়ি এসে মাকে সব বললাম। মার কিন্তু ক্রমেই অবস্থা খারাপ হচ্ছিল। কফিনওয়ালার কাছে একটি ডাক্তার-ছাত্র আসত। মার চিকিৎসা করে সে, কতকগুলো ওষুধ খেতে বলে।

'প্রায়ই দাদুর কাছে যেতাম আমি। মা বলত যেতে। দাদু একটা বাইবেল আর ভূগোল কিনে এনে আমায় পড়াতে শুরু করেন। মাঝে মাঝে বলতেন, পৃথিবীতে কী কী দেশ আছে, কী ধরনের সব লোক সেখানে বাস করে, কী কী সমুদ্র আছে, পুরাকালে অবস্থা কেমন ছিল, খৃষ্ট কীভাবে আমাদের সকলকে ক্ষমা করলেন। আমি নিজে থেকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করলে

উনি খুব খুশি হতেন। তাই আমি প্রায়ই তাঁকে নানা প্রশ্ন করতাম, উনি সব বলতেন, অনেক কথা বলতেন ভগবান সম্পর্কে। মাঝে মাঝে পড়া না করে আমরা আজর্কার সঙ্গে খেলতাম। আজর্কা আমার খুব ন্যাওটা হয়ে উঠেছিল। লাঠির ওপর দিয়ে লাফাতে শিখিয়েছিলাম ওকে। দেখে দাদু খুব হাসতেন, কেবলি আমার মাথায় হাত বুলাতেন। দাদু অবিশ্যি হাসতেন কিন্তু খুবই কম। এক একসময় হয়ত খুবই কথা কয়ে গেলেন, তারপর হঠাৎ একসময় আবার কোনো কথা না বলে চুপ করে বসে রইলেন, মনে হবে যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন, অথচ চোখদুটো খোলা। অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকতেন অমনিভাবে, আর সন্ধ্যে হলে ওঁকে কীরকম সাংঘাতিক লাগত, কীরকম থুত্থুড়ে বুড়ো... মাঝে মাঝে এসে দেখতাম চেয়ারে বসে বসে ভাবছেন, কিছুই কানে যাচ্ছে না তাঁর, আজর্কা শুয়ে আছে পাশে। বসে বসে অপেক্ষা করে কাসির শব্দ করতাম। তবু চেয়ে দেখতেন না দাদু। তাই ফিরে চলে যেতাম। বাড়িতে মা আমার পথ চেয়ে থাকত। মা শুয়ে থাকত বিছানায় আর আমি সব, সবকিছু বলে যেতাম। বলতে বলতে রাত হয়ে যেত, তবু দাদুর কথা শোনা ফুরুত না মায়ের — সেদিন কী কী করেছেন দাদু, কী কী বলেছেন, কী সব গল্প করে শুনিয়েছেন আমায়, কী কী পড়া দিয়েছেন। লাঠির ওপর দিয়ে আজর্কাকে কীভাবে লাফাতে শিখিয়েছি আমি, তাই দেখে দাদু কীরকম হেসেছেন সেকথা যখন মাকে বলি, তখন মাও হাসতে থাকে, অনেকক্ষণ ধরে খুব আনন্দে ছিল মা। বার বার করে গল্পটা আমায় বলতে বলত, তারপর প্রার্থনা করত। আমি কেবলি ভাবতাম: মা কেন দাদুকে অত ভালোবাসে আর দাদু মাকে মোটেই ভালোবাসেন না? দাদুর কাছে যখন যেতাম, তখন ইচ্ছে করেই বলতাম মা তাকে কত ভালোবাসে। দাদু শুনতেন, কী রাগী, তবু শুনতেন, কোনো কথা বলতেন না। তখন আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মা কেন তাঁকে অত ভালোবাসে, সব সময় তাঁর কথা জিজ্ঞেস করে, অথচ উনি কখনো মার কথা জিজ্ঞেস করেন না। তাতে দাদু ক্ষেপে উঠে আমায় ঘরের বার করে দেন। দরজার বাইরে আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম, হঠাৎ দরজা খুলে উনি ডেকে নিলেন আমায়। রাগ কিন্তু তখনো তাঁর যায় নি, কথা বলছিলেন না। পরে যখন স্বর্গীয় অনুশাসন পড়া হচ্ছিল, তখন ওঁকে ফের জিজ্ঞেস করি, কিন্তু খৃষ্ট যে বলেছেন, পরস্পরকে ভালোবাসিও, যাহারা তোমার উপর অন্যায় করে তাহাদিগকে ক্ষমা করিও, তবু উনি কেন মাকে ক্ষমা করতে চাইছেন না?

তাতে উনি লাফিয়ে উঠে চে'চাতে থাকেন, মা নিশ্চয় আমায় ঐ কথা বলতে শিখিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় বার ঘরের বার করে দিয়ে আমায় বলে দেন, খবরদার কখনো যেন তাঁর কাছে না আসি। আমিও বলে দিলাম, আমি নিজেই এখন আর তাঁর কাছে আসব না। বলে চলে গেলাম... পরদিন দাদু তাঁর বাসা বদল করেন...'

'বলেছিলাম না বৃষ্টিটা শিগ্‌গিরই থেমে যাবে। দ্যাখো থেমে গেছে, সূর্য উঠেছে... দ্যাখো ভানিয়া,' জানলার দিকে চেয়ে বললেন নিকোলাই সের্গেয়িচ।

আন্না আন্দ্রেয়েভনা ভয়ানক হতভম্ব হয়ে চাইলেন ওঁর দিকে। তারপর এতদিনকার নিরীহ ভীত এই বৃদ্ধার চোখে হঠাৎ জ্বলে উঠল একটা ক্রোধের ঝলক। নীরবে নেল্লীর হাত ধরে উনি তাকে কোলে তুলে নিলেন।

বললেন, 'বল লক্ষ্মীটি, তুই বল, আমি শুনব... বুক যাদের পাষাণ তারা...'

শেষ করতে পারলেন না উনি, কে'দে ফেললেন। বিহ্বল হয়ে, ভয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নেল্লী চাইলে আমার দিকে। বৃদ্ধ আমার দিকে একবার চেয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন, তারপর সঙ্গে সঙ্গেই চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

বললাম, 'বলো নেল্লী, বলো।'

ফের বলতে শুরু করলে নেল্লী, 'তিন দিন আমি দাদুর কাছে যাই নি। তার মধ্যে মার অবস্থা আরো খারাপ হয়ে উঠল। টাকা আমাদের সব ফুরিয়ে গিয়েছিল, ওষুধ কেনারও পয়সা ছিল না, তাছাড়া উপোস দিতে হচ্ছিল আমাদের, কেননা কফিনওয়ালা আর তার বউয়ের নিজেদেরও কিছু ছিল না, ওদের ঘাড়ে খাচ্ছি বলে ওরা আমাদের খোঁটা দিতে লাগল। তিনদিনের দিন সকালে উঠে আমি বাইরে যাবার জন্যে পোশাক পরতে শুরু করলাম। মা জিজ্ঞেস করলে কোথায় যাচ্ছি? বললাম, দাদুর কাছে গিয়ে টাকা চাইব। মা খুশি হয়ে গেল, কেননা মাকে আমি বলে রেখেছিলাম দাদু আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন, মা কে'দে কে'দে আমায় বোঝাবার চেষ্টা করলেও বলে দিয়েছিলাম আর কখনো দাদুর কাছে যাব না। গিয়ে শুনলাম যে দাদু অন্য জায়গায় উঠে গেছেন, তাই নতুন ঠিকানায় খোঁজ করতে গেলাম তাঁর। তাঁর নতুন বাসায় যেই ঢুকেছি, অমনি দাদু লাফিয়ে উঠে ছুটে এলেন আমার দিকে, পা ঠুকতে লাগলেন মেঝেতে। বললাম, মার খুব অসুখ, ওষুধ কেনার জন্যে পঞ্চাশ কোপেকের মতো কিছু পয়সা দরকার, খাবারও কিছু নেই

আমাদের। দাদু চেঁচামেচি করে ধাক্কা দিয়ে আমায় বার করে দিলেন সিঁড়িতে, তারপর দরজা আটকে দিলেন হুড়কো দিয়ে। কিন্তু যখন উনি আমায় ধাক্কা দিচ্ছিলেন তখনই বলে দিয়েছিলাম সিঁড়িতে বসে থাকব আমি, পয়সা না পাওয়া পর্যন্ত যাব না। আমি বসে রইলাম সিঁড়িতে। কিছুক্ষণ পরে উনি দরজা খুললেন। কিন্তু আমায় বসে থাকতে দেখে ফের বন্ধ করে দিলেন। বহুক্ষণ পরে আবার দরজা খুললেন, আমায় দেখে বন্ধ করলেন আবার। তারপরে বহুবার দরজা খুলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। শেষ পর্যন্ত আজর্কাকে নিয়ে বেরিয়ে এসে দরজায় তালা দিলেন আর একটা কথাও না বলে আমার পাশ কাটিয়ে নেমে গেলেন। আমিও কথা কইলাম না। বসেই রইলাম সন্ধ্যে পর্যন্ত।'

'বাছারে!' চেঁচিয়ে উঠলেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা, 'সিঁড়ির ওখানটা তো ঠাণ্ডা!'

নেল্লী বললে, 'আমার একটা গরম কোট ছিল।'

'কোটে আর কী হবে! আহা রে, কী কষ্টই না গেছে! তারপর কী করলেন তোমার দাদু?'

নেল্লীর ঠোঁটদুটো থরথর করছিল। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টায় আত্মসংবরণ করলে ও।

'উনি যখন ফিরলেন তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। উঠতে গিয়ে আমার গায়ে ধাক্কা খেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন: কে রে? বললাম, আমি। উনি নিশ্চয় ভেবেছিলেন, আমি অনেক আগেই চলে গেছি, তখনো আমায় দেখে খুব অবাক হয়ে গেলেন, বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন আমার সামনে। হঠাৎ জোরে জোরে সিঁড়ির ওপর লাঠি ঠুকে ছুটে গিয়ে দরজা খুললেন। মিনিটখানেক পরে কিছু খুচরো পয়সা নিয়ে এসে ছুড়ে দিলেন আমার দিকে সিঁড়িতে। সবই তামার পাঁচ কোপেক। চেঁচিয়ে বললেন, "নাও গে! এই আমার সম্বল, নিয়ে তোমার মাকে বলো গে যাও যে আমি ওকে অভিশাপ দিচ্ছি।" বলে দরজা বন্ধ করে দিলেন উনি। খুচরোগুলো গড়িয়ে পড়ল সিঁড়ি দিয়ে। অন্ধকারে আমি কুড়োচ্ছিলাম। দাদু বোধ হয় টের পেয়েছিলেন পয়সাগুলো সিঁড়িতে ছড়িয়ে গেছে, অন্ধকারে তা খুঁজে বার করা আমার পক্ষে মুশকিল হবে। তাই দরজা খুলে একটি মোমবাতি নিয়ে এলেন, মোমবাতির আলোয় আমি শিগ্‌গিরই সব কুড়িয়ে কুড়িয়ে তুললাম। দাদু নিজেও আমার সঙ্গে খুঁজলেন, বললেন সবশুদ্ধ সত্তর কোপেক থাকার কথা। বলে চলে গেলেন। বাড়ি গিয়ে মাকে টাকা দিয়ে সব তাকে বললাম। তাতে মার অবস্থা

খারাপ হয়ে উঠল, নিজেও আমি অসুস্থ হয়ে ছিলাম সেদিন সারা রাত, তার পরের দিন পর্যন্ত বেশ জবর ছিল, কিন্তু মাথায় শুধু আমার এক ভাবনা, দাদুর ওপর ভারি রাগ হয়েছিল কিনা। তাই মা ঘুমিয়ে পড়তেই আমি রাস্তায় বেরিয়ে এসে চললাম দাদুর বাসার দিকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না গিয়ে আমি দাঁড়ালাম ব্রিজের ওপর। সেখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল ওই লোকটা...'

'মানে আর্খিপভ,' আমি বললাম, 'যে লোকটার কথা আমি আপনাকে বলেছিলাম নিকোলাই সের্গেইচ, সেই যে লোকটা গিয়েছিল ব্যবসায়ী ছোঁড়াটার সঙ্গে বুবনভার বাসায়, গিয়ে বেদম মার খায়। নেল্লী ওকে সেই প্রথম দেখল... তুমি বলো নেল্লী।'

'ওকে থামিয়ে আমি কিছু টাকা চাইলাম — চাঁদির রুবল একটা। ও বললে, "চাঁদির রুবল?" আমি বললাম, "হ্যাঁ।" ও হেসে বললে, "তাহলে এসো আমার সঙ্গে।" যাব কিনা বুঝতে পারছিলাম না, এমন সময় সোনার চশমা পরা একটি বুড়ো মানুষ এসে দাঁড়ালেন। চাঁদির রুবল আমি চাইছি তা উনি শুনেছিলেন। আমার দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন ঠিক একটা চাঁদির রুবলই আমার দরকার। বললাম, মার অসুখ, ওষুধের জন্যে ঐ টাকাটা চাই। উনি জিজ্ঞেস করলেন কোথায় আমরা থাকি, ঠিকানাটা টুকে নিয়ে এক রুবলের নোট দিলেন একটা। চশমা পরা ভদ্রলোকটিকে দেখেই অন্য লোকটা চলে যায়, আমায় আর আসতে বলে না। একটা দোকানে গিয়ে রুবলটা ভাঙালাম। তিরিশ কোপেক একটা কাগজে মুড়ে আলাদা করে রেখে দিলাম মায়ের জন্যে, বাকি সত্তর কোপেক কাগজে না মুড়ে ইচ্ছে করেই মুঠো করে নিয়ে গেলাম দাদুর কাছে। দরজা খুলে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পয়সাগুলো সজোরে ছুড়ে দিলাম ঘরের মধ্যে, মেঝের ওপর সব গড়াতে লাগল।

'বললাম, "এই নিন আপনার পয়সা! আপনি শাপ দিয়েছেন মাকে তাই মা আপনার কাছ থেকে নেবেন না!" তারপর দরজাটা বন্ধ করেই পালিয়ে গেলাম।'

চোখদুটো ওর জবলে উঠল, সরল আস্ফালনে ও চাইলে নিকোলাই সের্গেয়িচের দিকে।

'ঠিক করেছিলে! তাই দরকার!' নিকোলাই সের্গেয়িচের দিকে না তাকিয়ে বললেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা। জোরে জড়িয়ে ধরলেন নেল্লীকে। 'উচিত শিক্ষা হয়েছে। ভারি বদরাগী নিষ্ঠুর তোমার দাদু!'

'হ্ম্,' জবাব দিলেন নিকোলাই সের্গেয়িচ।

'তারপর, তারপর কী হল বলো!' অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা।

নেল্লী বললে, 'দাদুর কাছে যাওয়া আমি ছেড়ে দিলাম, উনিও আমায় দেখতে আসতেন না।'

'তাহলে তোমরা থাকত কী করে — তুমি আর তোমার মা? আহা বেচারী তোমরা!'

'মার অবস্থা আরো খারাপ হতে লাগল, বিছানা ছেড়ে উঠতেই প্রায় পারত না।' বলে চলল নেল্লী, গলার স্বর তার কাঁপা কাঁপা, ভাঙা ভাঙা, 'পয়সা ছিল না আমাদের, তাই ক্যাপ্টেন-বৌয়ের সঙ্গে আমি বেরুতে লাগলাম। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ক্যাপ্টেন-বৌ ভিক্ষে করত, রাস্তায় ভালো লোকেদের কাছেও হাত পাতত। ওই করেই তার চলত। আমায় বলত, সে তো ভিখিরি নয়, ও যে ভদ্রঘরের মানুষ, গরিব হয়ে পড়েছে, তা প্রমাণের মতো দলিলপত্র ওর আছে। সেইসব দলিল ও লোককে দেখাত, তাই পয়সা দিত লোকে। ও-ই আমায় বলেছিল, সকলের কাছে চাইলে তাতে লজ্জার কিছু নেই। ওর সঙ্গে আমি বেরুতাম, ভিক্ষে পেতাম, তাই দিয়ে আমাদের চলত। মা টের পেয়ে গিয়েছিল, কেননা অন্যান্য বাসিন্দারা সব মাকে ছি-ছি করে বলত ভিখিরি। বুবনভা নিজেও এসে মাকে বলে, রাস্তায় ভিক্ষে করতে যাওয়ার চেয়ে আমায় যেন মা পাঠিয়ে দেয় তার কাছে। আগেও সে মার কাছে আসত, টাকা দিতে চাইত। মা নিতে না চাইলে বলত, এত গরব কেন গো। খাবারদাবারও পাঠাত। আমার সম্পর্কে মাকে যখন ও এইসব কথা বলে তখন মা খুব ভয় পেয়ে কাঁদতে লাগল। বুবনভা গালাগালি দিতে লাগল, মদ খেয়ে এসেছিল তো। বললে আমি তো এমনিতেই একটা ভিখিরি, ক্যাপ্টেন-বৌয়ের সঙ্গে ভিক্ষে করে বেড়াই। সেইদিন সন্ধ্যেতেই ও ক্যাপ্টেন-বৌকে তাড়িয়ে দিলে বাড়ি থেকে। সব শুনে মা কাঁদতে লাগল। তারপর হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে পোশাক পরে হাত ধরে বাইরে নিয়ে গেল আমাকে। ইভান আলেক্সান্দ্রিচ মাকে থামাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু মা কোনো কথা শুনলে না। বেরিয়ে গেলাম আমরা। মা হাঁটতে পারছিল না, দু-এক মিনিট পরপরই বসছিল, আমি মাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলাম। মা কেবলি বলছিল, দাদুর কাছে যেতে চায়, আমায় নিয়ে যেতে হবে মাকে। ওদিকে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা বড়ো রাস্তায় আমরা এসে পড়লাম। একটা বাড়ির সামনে একের পর এক গাড়ি এসে

থামছিল, লোকজন নামছিল গাড়ি থেকে, জানলাগ্লো সব আলো হয়ে আছে, বাজনার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মা দাঁড়িয়ে আমার হাত চেপে ধরলে। বললে, "নেল্লী, গরিব হোস, সারা জীবন গরিব হয়ে থাকিস তব্ কেউ যদি ডাকে, কাছে আসে তব্ তার কাছে যাস না। ওখানে তুইও থাকতে পারতিস, ভালো পোশাক-আশাকে বড়ো লোক হয়ে থাকতিস, কিন্তু আমি তা চাই না। ওরা নিষ্ঠুর, পাজি। তোর কাছে আমার হ্কুম, গরিব হয়ে থাকবি, খেটে খাবি, বরং ভিক্ষে করবি, তব্ কেউ যদি এসে তোকে ডাকে, বলবি: তোমাদের কাছে যাব না।" অস্খের সময় আমায় এই কথা বলেছিল মা, সারা জীবন আমি সেকথা মেনে চলব,' আবেগে কেঁপে যোগ করলে নেল্লী, ছোটো ম্খখানা ওর আরক্ত হয়ে উঠেছিল, 'আমি কাজ করব, সারা জীবন চাকরানী হয়ে থাকব, আপনাদের কাছেও আমি এসেছি কাজ করতে, চাকরানী হয়ে থাকব, মেয়ের মতো থাকতে চাই না আমি...'

'ষাট, ষাট, বাছা!' আবেগে নেল্লীকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা, 'ওকথা যখন তোমার মা বলেছিলেন, তখন তো তাঁর অস্খ, জানো তো।'

'ওর মাথার ঠিক ছিল না।' ব্দ্ধ বললেন তীক্ষ্ন স্বরে।

'নাই বা থাকল মাথার ঠিক,' হঠাৎ ব্দ্ধের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে উঠল নেল্লী, 'মাথার ঠিক না থাকলেও মা আমায় এই বলেছে, সারা জীবন সে কথা আমি মানব। ঐ কথা বলার সময় ম্ছা যায় মা।'

'মা গো!' চেঁচিয়ে উঠলেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা, 'ওই অস্খ, তাতে শীতকাল, রাস্তার মাঝখানে?..'

'আমাদের থানায় নিয়ে যেত, কিন্তু একজন ভদ্রলোক আমাদের পক্ষ নিলেন, আমাদের ঠিকানা জিজ্ঞেস করে দশ র্বল আমায় দিলেন, আর তাঁর গাড়িতে করে মাকে পেঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেন। এর পর মা আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে নি, তিন সপ্তাহ বাদে মারা যায়...'

'আর তোমার দাদ্? শেষ পর্যন্তও উনি তোমার মাকে ক্ষমা করলেন না?' চেঁচিয়ে উঠলেন আন্না আন্দ্রেয়েভনা।

কষ্টে নিজেকে সংযত করে নেল্লী বললে, 'ক্ষমা করেন নি! মরার এক সপ্তাহ আগে মা আমায় ডেকে বলে, "নেল্লী, আর একবার, শেষ বারের মতো তোর দাদ্র কাছে যা, একবার এসে ক্ষমা করতে বলিস। বলিস, কয়েকদিনের মধ্যেই আমি মারা যাব, আমি তোকে একলা ফেলে রেখে যাচ্ছি দ্নিয়ায়।

বালিস, মরতে আমার ভারি কষ্ট...” আমি গেলাম। দাদুর দরজায় টোকা দিতে উনি দরজা খুললেন। আমায় দেখেই মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দিতে চাইছিলেন, কিন্তু আমি দুই হাতে দরজা চেপে ধরে চেঁচিয়ে বললাম, “মা মারা যাচ্ছে, আপনাকে দেখতে চাইছে, আসুন!” কিন্তু আমায় ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন উনি। আমি ফিরে এসে মার কাছে শুয়ে, জড়িয়ে ধরলাম মাকে, কোনো কথা বললাম না... মাও আমায় জড়িয়ে ধরলে, জিজ্ঞেস করলে না কিছুই...’

এইখানটায় নিকোলাই সের্গেয়িচ দড়াম করে টেবিলে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর কেমন একটা অদ্ভুত ঘোলাটে চোখে আমাদের সকলের দিকে চেয়ে অবসন্নের মতো ফের এলিয়ে পড়লেন আরামকেদারাটায়। আন্না আন্দ্রেয়েভনা ওঁর দিকে আর তাকাচ্ছিলেন না। নেল্লীকে জড়িয়ে ধরে উনি ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন।

‘মরবার দিন মা সন্ধ্যের দিকে আমায় ডাকল। আমার হাতটা নিয়ে বললে, “আজ আমি মরব রে নেল্লী।” আরো কী বলতে চাইছিল মা, কিন্তু কথা বলার ক্ষমতা আর ছিল না। মার দিকে তাকালাম আমি, কিন্তু আমায় যেন মা আর দেখতেই পাচ্ছিল না, শুধু শক্ত করে আমার হাতখানা ধরে রইল। আস্তে করে আমার হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে আমি ছুটলাম, সারা রাস্তা ছুটতে ছুটতে গেলাম দাদুর কাছে। আমায় দেখে দাদু চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, হাঁ করে চেয়ে রইলেন আমার দিকে, ভয়ে একেবারে শাদা হয়ে গিয়েছিলেন দাদু। কাঁপছিলেন। আমি দাদুর হাত ধরে কেবল বললাম, “মা মারা যাচ্ছে।” হঠাৎ ভয়ানক বিচলিত হয়ে ছড়ি তুলে নিয়ে উনি ছুটলেন আমার পেছু পেছু। ঠাণ্ডা ছিল, কিন্তু টুপিটা নিতেও মনে ছিল না তাঁর। আমি টুপিটা নিয়ে ওঁর মাথায় পরিয়ে দিলাম, তারপর ছুটলাম দুজনে মিলে। আমি তাড়া দিচ্ছিলাম ওঁকে, বললাম একটা গাড়ি করতে কেননা এখুনি মা মারা যাবে। কিন্তু দাদুর কাছে ছিল সব সমেত মোট সাতটি কোপেক। কয়েকটা গাড়ি থামিয়ে উনি দরাদরি করলেন, কিন্তু ওরা শুধুই হাসল তাঁর কথা শুনে, আজর্কাকে দেখেও হাসল ওরা। আজর্কাও দৌড়চ্ছিল আমাদের সঙ্গে। সকলেই আমরা দৌড়তে লাগলাম। দাদু আর পারছিলেন না, দম আটকে আসছিল তবু তাড়াতাড়ি করে ছুটছিলেন উনি। হঠাৎ পড়ে গেলেন, ছিটকে পড়ল টুপিটা। ওঁকে ধরাধরি করে তুললাম আমি, ফের টুপিটা পরালাম, হাত ধরে নিয়ে চললাম ওঁকে। বাসায় পৌছলাম রাত হবার মুখে... মা কিন্তু তার

আগেই মারা গেছে। মাকে দেখে হতাশার ভঙ্গিতে দুই হাত উলটিয়ে কাঁপতে লাগলেন দাদু, মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন, কিন্তু কোনো কথা বললেন না। আমি তখন মরা মায়ের কাছে গিয়ে দাদুর হাত ধরে চিৎকার করে বললাম, "হল তো, রাগী, নিষ্ঠুর! দেখুন!.. চেয়ে দেখুন!.." একটা চিৎকার করে তখন দাদু পড়ে গেলেন মরার মতো...'

আন্না আন্দ্রেয়েভনার আলিঙ্গন ছাড়িয়ে লাফিয়ে উঠল নেল্লী, সকলের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিবর্ণ যন্ত্রণার্ত ভীত এক মূর্তিতে। কিন্তু আন্না আন্দ্রেয়েভনা ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন কেমন একটা অনুপ্রেরণায়:

'আমি, আমি এখন তোর মায়ের মতো হব নেল্লী, তুই হবি আমার মেয়ে! হ্যাঁ নেল্লী, চল আমরা চলে যাই এইসব নিষ্ঠুর রাগী মানুষগুলোকে ছেড়ে! লোকেদের নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে চায় করুক, ভগবান ওদের দেখবেন... আয় নেল্লী; চলে যাই এখান থেকে!..'

এই ঘটনার আগে বা পরে কখনো ওঁকে আমি এই অবস্থায় দেখি নি, ভাবিও নি যে কখনো তাঁর পক্ষে এতটা আলোড়িত হওয়া সম্ভব। নিকোলাই সের্গেয়িচ চেয়ারে সিধে হয়ে বসলেন, তারপর একটু উঠে দাঁড়িয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করলেন:

'কোথায় যাচ্ছে তুমি, আন্না আন্দ্রেয়েভনা?'

'ওর কাছে চললাম, আমার মেয়ের কাছে, নাতাশার কাছে!' নেল্লীকে নিয়ে দরজার দিকে এগুতে এগুতে উনি বললেন চিৎকার করে।

'শোনো, শোনো, একটু দাঁড়াও!..'

'দাঁড়াবার কিছু নেই, রূঢ় নিষ্ঠুর তুমি! অনেকদিন সবুর করেছি আমি, নাতাশাও সবুর করেছে, আর নয়, বিদায়...'

এই কথা বলে বৃদ্ধা ফিরে তাকালেন স্বামীর দিকে। দেখে নিথর হয়ে গেলেন। টুপি আঁকড়ে ধরে নিকোলাই সের্গেয়িচ দুর্বল কম্পমান হাতে তাড়াতাড়ি করে ওভারকোট পরছেন তাঁর সামনে।

'তুমিও... তুমিও আসছ আমাদের সঙ্গে!' প্রার্থনার ভঙ্গিতে দুই হাত জড়ো করে চেঁচিয়ে উঠলেন বৃদ্ধা, অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকালেন স্বামীর দিকে, যেন এতটা সুখে বিশ্বাস করার সাহস হচ্ছে না।

'নাতাশা! কোথায় আমার নাতাশা? কোথায় তুই? কোথায় আমার মেয়ে?' অবশেষে যেন বৃদ্ধের বুক ছিঁড়ে বেরিয়ে এল কথাগুলো, 'ফিরিয়ে দাও আমার

নাতাশাকে! কোথায়, কোথায় সে!' ক্রাচটা এগিয়ে দিয়েছিলাম আমি। সেটা নিয়ে উনি ছুটলেন দরজার দিকে।

আন্না আন্দ্রেয়েভনা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ক্ষমা করেছে! ক্ষমা করেছে!'

কিন্তু চৌকাট পর্যন্ত যেতে হল না বৃদ্ধকে। হঠাৎ দরজা খুলে ঘরে ঢুকল নাতাশা, বিবর্ণ মুখ, ধকধক করছে দুই চোখ, যেন জ্বর হয়েছে। পোশাক ওর দলা-মোচড়া, বৃষ্টিতে ভেজা। মাথায় যে রুমালটা বেঁধেছিল সেটা খসে পড়েছে। ঘন এলো চুলে ঝিকমিক করছে বড়ো বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা। ছুটে এল নাতাশা, বাপকে দেখল, তারপর চিৎকার করে দুই হাত বাড়িয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল তাঁর সামনে।

নবম পরিচ্ছেদ

তার আগেই নিকোলাই সের্গেয়িচ ওকে জড়িয়ে ধরেছেন তাঁর আলিঙ্গনে!..

ছেলেমানুষের মতো নাতাশাকে উনি তুলে নিয়ে এলেন তাঁর আরামকেদারায়, ওকে তাতে বসিয়ে নিজে হাঁটু গেড়ে বসলেন তার সামনে। হাতে পায়ে চুমু খেতে লাগলেন নাতাশার, চুমু খেতে লাগলেন অধীর হয়ে, মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন অধীর হয়ে যেন ওঁর বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে তাঁরা ফের একত্রে, ফের উনি তাকে দেখছেন, কথা শুনছেন তারই, তাঁরই মেয়ে, তাঁরই নাতাশার! আন্না আন্দ্রেয়েভনাও ফুঁপিয়ে কেঁদে জড়িয়ে ধরলেন নাতাশাকে, বুকের মধ্যে মাথাটা টেনে নিলেন নাতাশার, আর এমন নিথর হয়ে রইলেন এই আলিঙ্গনে যে একটা কথাও কইতে পারলেন না।

'বাছা আমার!.. জীবনের ধন আমার!.. নয়নের মণি!..' অসংলগ্নভাবে বলে চললেন বৃদ্ধ; নাতাশার হাত ধরে তার শুকনো ফ্যাকাশে তবু সুন্দর মুখখানার দিকে, তার জল চিকচিক করা চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন প্রেমিকের মতো। 'আনন্দের ধন আমার, আমার খুকি!' ফের পুনরাবৃত্তি করে ফের থেমে গেলেন বৃদ্ধ, তাকিয়ে রইলেন মদির বিভোরতায়। 'কেন গো, কেন লোকে বলে ও রোগা হয়ে গেছে?' তখনো তিনি নতজানু হয়ে আমাদের দিকে ফিরে কেমন একটা ছেলেমানুষী হাসি নিয়ে তাড়াতাড়ি করে বলে চললেন, 'রোগা বটে, ফ্যাকাশেও, কিন্তু দ্যাখো দিকি কেমন সুন্দর ও, আগের চেয়েও সুন্দর দেখতে হয়েছে ও, আগের চেয়েও!' বলতে বলতে আপনা

থেকেই নির্বাক হয়ে গেলেন কষ্টে, আনন্দের কষ্টে... সে আনন্দে হৃদয় তাঁর বুঝি দুখানা হয়ে যাচ্ছিল।

'উঠুন, উঠুন বাবা, উঠুন না!' নাতাশা বললে, 'আমিও যে আপনাকে চুমু খেতে চাই!..'

'আরে বেটি, শুনলে আন্নুশ্‌কা, শুনলে কেমন মিষ্টি করে বলছে?' পাগলার মতো নাতাশাকে জড়িয়ে ধরলেন উনি।

'না নাতাশা, তোর পায়ের কাছে আমারই পড়ে থাকার কথা, যতক্ষণ না আমার মন বলছে তুই ক্ষমা করেছিস, ততক্ষণ আমিই পড়ে থাকব, কেননা, তোর মার্জনা যে আমি আর কখনোই, কখনোই পেতে পারি না। আমি যে তোকে পরিত্যাগ করেছিলাম, অভিশাপ দিয়েছিলাম, শুনছিস নাতাশা, অভিশাপ দিয়েছিলাম। দিতে পেরেছিলাম!.. আর তুই নাতাশা, তুই ভাবতে পারলি যে আমি অভিশাপ দিয়েছি! বিশ্বাস করেছিলি, না? সেকথা ভাবা উচিত হয় নি, স্রেফ বিশ্বাস না করলেই হত। ওরে নিষ্ঠুর মেয়ে! কেন এলি না আমার কাছে? আমি যে তোকে কেমনভাবে নেব, সে তো জানতিস!.. ও রে নাতাশা, তোকে যে আগে কত ভালোবাসতাম, সে তো তোর জানা! আর এখন, এই কয়মাস তোকে যে আমি ভালোবেসেছি তারও দ্বিগুণ, তারও হাজারগুণ বেশি! ভালোবেসেছি আমার সবটুকু রক্ত দিয়ে! আমার রক্তমাখা বুকখানা উপড়ে আমি ফালা ফালা করে ছুড়ে দিতে পারি তোর পায়ের কাছে!.. তুই যে, আমার আনন্দ রে!'

'তাহলে চুমু খান আমায়, চুমু খান নিষ্ঠুর, মা যেমন করে চুমু খায় তেমনি করে চুমু খান আমার ঠোঁটে, আমার মুখে!' ক্ষীণ, আতুর, আনন্দে সজল কণ্ঠে বললে নাতাশা।

'আর তোর আদরের চোখগুলোর ওপরেও, তোর চোখের ওপর! আগে যেমন খেতাম, মনে আছে?' দীর্ঘ মধুর এক আলিঙ্গনের পর বললেন বৃদ্ধ, 'ওরে নাতাশা, আমাদের কথা কি তোর স্বপ্নেও মনে পড়ত কখনো? আমি কিন্তু তোর স্বপ্ন দেখেছি প্রায় রোজ রাতে, রোজ রাতে স্বপ্নে আসতিস তুই, আমি কাঁদতাম। একবার তুই এলি যেন সেই ছোট্ট মেয়েটি হয়ে, সেই যেমন ছিলি তোর দশবছর বয়সে, সবে পিয়ানো বাজাতে শিখছিস, মনে আছে? এসেছিলি একটা ছোট্ট ফ্রক পরে, পায়ে সুন্দর ছোটো-ছোটো দুখানি জুতো, লালচে লালচে হাত... তখন ওর হাতগুলো কীরকম লাল হয়ে থাকত মনে আছে আন্নুশ্‌কা? তুই এসে বসলি আমার কোলের ওপর,

গলা জড়িয়ে ধরলি... আর তুই, তুই দুষ্টু মেয়ে, কী করে তুই ভাবলি যে আমি তোকে শাপ দিয়েছি, তুই এলে তোকে আমি ডেকে নেব না?.. আরে আমি যে... শোন নাতাশা, আমি যে কতবার গেছি তোকে দেখতে, তোর মা জানত না, কেউ জানত না। গিয়ে দাঁড়াতাম তোর জানলার নীচে, মাঝে মাঝে সারা বেলাই কেটে যেত তোর ফটকের কাছে ফুটপাথে কোথাও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। দৈবাৎ কি তুই বেরিয়ে আসবি না যাতে শুধু তোকে দূর থেকে দেখতে পাই। সন্ধ্যে বেলায় প্রায়ই তোর জানলায় একটা মোমবাতি জ্বলত, কতবার আমি তোর বাড়ির দিকে গেছি নাতাশা, অন্তত তোর ঐ আলোটা দেখবার জন্যে, অন্তত জানলায় তোর ছায়াটা দেখতে, রাতের জন্যে তোকে আশীর্বাদ করে আসতে। কিন্তু তুই কি আমার জন্যে প্রার্থনা করেছিস রাত্রে, আমার কথা কি ভেবেছিলি কখনো? মন তোর কখনো গেয়েছে যে আমি দাঁড়িয়ে আছি জানলার নিচে? শীতের সময় কতবার আমি উঠেছি তোদের সিঁড়ি দিয়ে, গভীর রাতে অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে থেকেছি তোর দরজায়, ভেবেছি, তোর গলা কি শুনতে পাব না? একটু কি হেসে উঠবি না তুই? আর সেই আমি কিনা অভিশাপ দেব তোকে? ওরে সেদিন আমি নিজেই যে গিয়েছিলাম তোর কাছে, ক্ষমা করতে গিয়েছিলাম, শুধু দোরগোড়া থেকে ফিরে আসি... ওরে নাতাশা!'

উঠে দাঁড়িয়ে উনি নাতাশাকে তুললেন চেয়ার থেকে এবং সজোরে চেপে ধরলেন বুকে।

চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ফের ও আমার বুকের কাছে! জয় ভগবান, জয় হোক তোমার সবকিছুর জন্যে, তোমার ক্রোধের জন্যে, তোমার করুণার জন্যে!.. বজ্রপাতের পরে তোমার যে সূর্য ফের চেয়েছে আমাদের দিকে তার জন্যেও! এই মুহূর্তটার জন্যে জয়! আমরা লাঞ্ছিত হতে পারি, অপমানিত হতে পারি, কিন্তু আবার আমরা মিলেছি। যারা উদ্ধত, অহংকৃত, যারা আমাদের লাঞ্ছিত করেছে, অপমানিত করেছে, তারা উল্লাস করুক, ঢিল ছুড়ুক আমাদের দিকে! কোনো ভয় নেই নাতাশা... হাত ধরাধরি করে আমরা যাব, ওদেরকে বলব, এ আমার নয়নের মণি, আমার আদরের খুকি, আমার নিষ্পাপ মেয়ে — এর তোমরা লাঞ্ছনা করেছ, অপমান করেছ কিন্তু আমি, একে আমি ভালোবাসি, চিরকালের জন্যে আশীর্বাদ করে যাব!..'

'ভানিয়া, ভানিয়া!' ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকলে নাতাশা, বাপের আলিঙ্গনের মধ্যে থেকে একটা হাত বাড়িয়ে দিলে আমার দিকে।

ওহ্! সেই মুহূর্তে যে সে আমার কথা ভেবে আমায় ডেকেছিল, এটা আমি কখনো ভুলব না!

'কিন্তু নেল্লী কোথায়?' চারিদিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ।

তাঁর স্ত্রীও চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সত্যি কোথায় ও? বাছারে, ওর কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম!'

কিন্তু ঘরে ছিল না নেল্লী। অলক্ষ্যে ও পালিয়ে গিয়েছিল শোবার ঘরে। সেখানে গেলাম আমরা। নেল্লী দাঁড়িয়েছিল কোণে, দরজার আড়ালে ভয়ে ভয়ে আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে।

'নেল্লী, কী হয়েছে লক্ষ্মীটি?' ডাকলেন বৃদ্ধ। ওকে জড়িয়ে ধরতে চাইলেন। কিন্তু কেমন যেন অনেকক্ষণ ধরে নেল্লী তাকিয়ে রইল তার দিকে...

তারপর ভুল বকার মতো করে বললে, 'মা কই, মা?' থরথর হাতদুটো আমাদের দিকে বাড়িয়ে আর একবার চেঁচিয়ে উঠলে, 'কই, কোথায় আমার মা?' তারপর হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর আর্তনাদ বেরিয়ে এল ওর বুক থেকে; মুখখানায় খিঁচুনি শুরু হল, প্রচণ্ড একটা মূর্ছায় লুটিয়ে পড়ল সে...

উপসংহার

অন্তিম স্মৃতি

জুনের মাঝামাঝি তখন। দিনটা গরম, গুমোট। শহরে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল, শুধু কেবল ধুলো, চুনবালি, ঘর মেরামত, তপ্ত পাথর আর বাতাসের দূষিত ভাপ... তারপর সেকী আনন্দ যখন শোনা গেল দূরে মেঘ ডাকছে; ধীরে ধীরে আকাশ গোমড়া হয়ে উঠল আর শহুরে ধুলোর কুণ্ডলী উড়িয়ে নিয়ে ছুটল ঝড়। কয়েকটা বড়ো বড়ো ফোঁটা আছড়ে পড়ল মাটিতে, তারপর সারা আকাশটা যেন হঠাৎ মুখব্যাদান করলে, শহরের ওপর ঝরে পড়ল জলের নদী। আধ ঘণ্টা পরে ফের সূর্য উঠলে আমি আমার খুপরির জানলা খুলে দিয়ে তৃষিতের মতো অবসন্ন বুক ভরে টেনে নিলাম তাজা বাতাস। আনন্দের উচ্ছ্বাসে আমার কলম, কাজকর্ম, মায় প্রকাশককে পর্যন্ত ছুড়ে ফেলে দিয়ে ইচ্ছে হল ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপে আমার বন্ধুদের কাছে ছুটে যাই। কিন্তু লোভটা প্রচণ্ড হলেও আত্মসংবরণ করে কেমন একটা আক্রোশে ঝুঁকে পড়লাম কাগজের ওপর। যে করেই হোক, ওটাকে শেষ করতে হবে। প্রকাশক কেবলি তাগিদ দিচ্ছেন, নইলে আর টাকা দেবেন না। ওখানে ওঁরা আমার আশা করে আছেন অবশ্য, তবে সন্ধ্যার মধ্যে স্বাধীন, একেবারে বাতাসের মতো স্বাধীন হয়ে যাব; গত দু'দিন দু'রাত ধরে যে সাড়ে তিন ফর্মা লিখেছি আমি — এ সন্ধ্যেয় তার ক্ষতিপূরণ।

অবশেষে শেষ হল কাজটা। কলম ফেলে উঠে দাঁড়ালাম। বুকে পিঠে একটা ব্যথা, ভোঁ ভোঁ করছে মাথাটা। জানতাম মুহূর্তে খুবই বিকল হয়ে উঠেছে আমার স্নায়ুগুলো, বৃদ্ধ ডাক্তার যা বলেছিল সেই শেষ কথাগুলো যেন শুনতে পেলাম: 'উঁহু, এতটা চাপ কোনো সুস্থ লোকও সহ্য করতে পারে না, কেননা সে অসম্ভব!' পর্যন্ত অবিশ্যি তা সম্ভব হয়েছে! মাথা ঘুরছিল আমার, খাড়া হয়ে দাঁড়াতেও যেন পারছিলাম না; কিন্তু আনন্দে, অসীম আনন্দে আমার বুক ভরা। উপন্যাসখানা আমার শেষ হয়েছে এবং প্রকাশকের

কাছে আমার প্রচুর দেনা থাকলেও হাতে জিনিসটা পেয়ে নিশ্চয় উনি আমায় কিছু দেবেন — তা সে পঞ্চাশ রুবল হলেও। হাতে অত টাকা যে কত কাল পাই নি। অবকাশ আর টাকা!.. উল্লাসে টুপিটি নিয়ে বগলের তলে পাণ্ডুলিপি সহ পূর্ণবেগে ছুটে গেলাম আমাদের অমূল্য বন্ধু আলেক্সান্দ্র পেত্রোভিচকে বাড়িতে ধরতে।

পেলাম ওঁকে, তবে প্রায় বেরিয়ে যাবার মুখে। উনিও খুব একটা লাভজনক দাঁও মেরেছেন তখুনি, যদিও সেটা সাহিত্যিক কিছু নয়। কালচে রঙের একটি ইহুদীর সঙ্গে উনি একনাগাড়ে ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়েছেন তাঁর পাঠকক্ষে। তাকে এগিয়ে দিয়ে উনি সাদরে হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে; সুন্দর নরম মোটা গলায় কুশল জিজ্ঞেস করলেন। অতি ভালো লোক উনি। এবং রহস্যের কথা নয়, ওঁর কাছে আমি অনেক ঋণী। সাহিত্যে সারা জীবন উনি যদি শুধু প্রকাশক হয়েই কাটিয়ে দেন, তাতে দোষের কী? সাহিত্যের জন্যে যে প্রকাশক দরকার সেটা তিনি ঠিক ধরতে পেরেছিলেন, এবং ধরেছিলেন বেশ সময়মতো — জয় হোক তাঁর, মানে প্রকাশনামূলক জয়!

আমার উপন্যাসটা শেষ হয়েছে শুনে উনি প্রসন্ন হাসি হাসলেন, পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যার প্রধান বিভাগটা সম্পর্কে তাঁর আর ভাবনা রইল না। আমি যে আদৌ কিছু শেষ করতে পারি এই ভেবে বেশ অবাক হলেন এবং তাই নিয়ে খুব একটা প্রীতিকর রসিকতাও করলেন। অতঃপর লোহার সিন্দুক থেকে সেই প্রতিশ্রুত পঞ্চাশটি রুবল বার করতে গেলেন এবং ইতিমধ্যে শত্রুভাবাপন্ন স্থূলকায় একটি পত্রিকা বার করে সমালোচনা বিভাগের কয়েকটি ছত্র দেখালেন — আমার শেষ উপন্যাসটি সম্পর্কে সেখানে দু-একটা মন্তব্য করা হয়েছে।

তাকিয়ে দেখলাম: "নকলনবিস" রচিত একটি প্রবন্ধ। আমার বিশেষ কোনো নিন্দা বা বিশেষ কিছু প্রশংসা নেই। তাতে খুশি হওয়া গেল। নানা কথার মধ্যে "নকলনবিস" কিন্তু মন্তব্য করেছেন যে আমার লেখায় সাধারণত "ঘামের গন্ধ থাকে" অর্থাৎ আমি লেখা নিয়ে এত ঘাম ঝরাই, এত খাটি, এত ঘষামাজা করি যে ফলটা ন্যক্কারজনক হয়ে উঠে।

প্রকাশক আর আমি দুজনেই হেসে উঠলাম। বললাম যে, আমার আগের উপন্যাসটি পুরো লিখতে লেগেছিল দুটি রাত এবং এবার সাড়ে তিন ফর্মা শেষ করলাম দুই দিন, দুই রাতে। এই যে নকলনবিসটি আমার কাজে বাড়াবাড়ি রকমের কষ্টকর মন্থরতার খুঁত ধরেছেন সেটা যদি তিনি জানতেন!

'এ কিন্তু আপনারই দোষ ইভান পেত্রোভিচ, কাজ অমন ফেলে রেখে দেন কেন? শেষকালে তাই রাত জাগতে হয়।'

আলেক্সান্দ্র পেত্রোভিচ খুবই চমৎকার লোক নিশ্চয়, শুধু একটি বিশেষ দুর্বলতা তাঁর — ওঁকে যারা আদ্যোপান্ত চেনে বলে তিনি নিজেও সন্দেহ করেন, তাদের কাছেই তাঁর সাহিত্যিক মতামত জাহির করে বড়াই করা। কিন্তু ওঁর সঙ্গে সাহিত্য আলোচনার ইচ্ছে আমার তখন ছিল না। টাকাটা পেয়েই টুপি টেনে নিলাম। আলেক্সান্দ্র পেত্রোভিচ যাচ্ছিলেন দ্বীপে তাঁর পল্লীভবনে। আমি ভাসিলিয়েভ্‌স্কি দ্বীপে যাব শুনে উনি সাদরে গাড়ি করে আমায় পোঁছে দিতে চাইলেন।

'নতুন গাড়ি কিনেছি একটা জানেন তো। দেখেন নি এখনো? চমৎকার গাড়িখানা।'

আমরা বেরুলাম। গাড়িখানা সত্যিই চমৎকার। নতুন মালিকানার এই প্রাথমিক দিনগুলোতে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে যেতে পারলে ভারি আনন্দ পেতেন আলেক্সান্দ্র পেত্রোভিচ, তার জন্যে এমনকি একটা আধ্যাত্মিক চাহিদাই যেন অনুভব করতেন উনি।

গাড়িতে ফের আধুনিক সাহিত্য নিয়ে বেশ কয়েকবার আলোচনা করলেন আলেক্সান্দ্র পেত্রোভিচ। আমার উপস্থিতিতে কোনো অস্বস্তি হচ্ছিল না ওঁর, অনায়াসে এমন সব মতামতের পুনরুক্তি করলেন, যা দু'একদিন আগে তিনি শুনেছেন তাঁর কোনো আস্থাভাজন সাহিত্যিকের কাছ থেকে, যার মতে তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। মাঝে মাঝে ভারি অদ্ভুত সব ব্যাপারে ওঁর খুব শ্রদ্ধা দেখা যায়। মাঝে মাঝে পরের কোনো মতামত তিনি গুলিয়ে ফেলেন, কিংবা তার অপপ্রয়োগ করে বসেন, ফল দাঁড়ায় ছাইভস্ম। নীরবে বসে বসে আমি শুনতে লাগলাম এবং মানবিক আকাঙ্ক্ষার বৈচিত্র্য আর খামখেয়ালের কথা ভেবে অবাক হলাম। ভাবছিলাম, "এই একটি লোক, টাকা কামিয়েই যেতে পারত, কিন্তু ইচ্ছে হয়েছে খ্যাতিও চাই, সাহিত্যিক খ্যাতি, সেরা প্রকাশক ও সমালোচকেব খ্যাতি!"

সেই মুহূর্তে উনি বিশদ করে যে সাহিত্যিক বক্তব্যটা পেশ করার চেষ্টা করছিলেন সেটা তিনি শুনেছিলেন তিন দিন আগে আমারই কাছ থেকে। তখন তার বিরুদ্ধে আমার সঙ্গেই তর্ক করেছিলেন উনি, কিন্তু এখন সেইটিকেই চালাচ্ছেন নিজের বলে। তবে এরকম বিস্মৃতিপরায়ণতা আলেক্সান্দ্র পেত্রোভিচের ঘটে মিনিটে মিনিটে, নিরীহ এই দুর্বলতার জন্যে পরিচিত মহলে ওঁর

নাম আছে। নিজের গাড়িতে বসে বক্তৃতা দিতে পেরে উনি তখন ভারি খুশি, নিজের ভাগ্যে ভারি প্রসন্ন, ভারি উদার! একটা বেশ বিদগ্ধ সাহিত্যিক আলোচনা চালাচ্ছেন উনি, কোমল প্রীতিকর তাঁর মোটা স্বর থেকেও যেন বৈদগ্ধ ঝরে পড়ছে। আস্তে আস্তে উদারনীতিবাদ শুরু করলেন উনি, এবং এই নিরীহ-সংশয়ী প্রত্যয় ঘোষণা করলেন যে, আমাদের সাহিত্যে তথা যে কোনো সাহিত্যে কারো বিনয় বা সততা থাকতেই পারে না, "পরস্পরকে ল্যাং মারা" ছাড়া আর কিছুই নেই, বিশেষ করে গ্রাহকভুক্তির সময়টা। মনে মনে ভাবছিলাম, সৎ অকপট যে কোনো লেখককেই আলেক্সান্দ্র পেত্রোভিচ তাঁর সততা ও অকপটতার জন্যে হাঁদা না ভাবলেও অন্তত ভাবেন হাবা। বলাই বাহুল্য, এরকম মতামত সরাসরি আসে তাঁর চূড়ান্ত সারল্য থেকে।

ওঁর কথা কিন্তু আমার কানে আর ঢুকছিল না। ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপে উনি আমায় নামিয়ে দিলেন, আমি ছুটলাম ওঁদের কাছে। এসে গেলাম তের নম্বর লাইনে ওঁদের ছোট্ট বাড়িটায়। আমায় দেখে আন্না আন্দ্রেয়েভনা তর্জনী তুলে হাত নেড়ে বললেন: 'শ্-শ্', অর্থাৎ গোলমাল যেন না করি। ফিসফিসিয়ে জানিয়ে দিলেন, 'নেল্লী এইমাত্র ঘুমিয়েছে, বেচারী! দোহাই আপনার, ওকে জাগাবেন না। ভারি দুর্বল হয়ে গেছে, খুব চিন্তায় আছি ওকে নিয়ে। ডাক্তার বলছেন, আপাতত ওটা কিছু না, কিন্তু আপনার ওই ডাক্তারটির কথার মাথামুণ্ডু বোঝে কার সাধ্যি! আর সত্যি আপনি কী বলুন তো ইভান পেত্রোভিচ, দুপুরের খাওয়ার সময় বসে বসে অপেক্ষা করছিলাম... দু'দিন তো আসেন নি এখানে!..'

'কিন্তু পরশু যে বলে গিয়েছিলাম, দু'দিন আসব না।' ফিসফিস করে বললাম ওঁকে, 'কাজটা শেষ করবার ছিল...'

'কিন্তু কথা দিয়েছিলেন আজ দুপুরের খাবার সময় আসবেন। এলেন না কেন? নেল্লী ইচ্ছে করেই বিছানা ছেড়ে ওঠে, সোনা আমার, আমরা ওকে আরামকেদারায় বসিয়ে খাবারের টেবিলে নিয়ে এসেছিলাম। বলল, "আপনাদের সকলের সঙ্গে আমিও ভানিয়ার জন্যে বসে থাকব।" কিন্তু ভানিয়া আর আমাদের এল না। দেখো দিকি, ছটা বাজে যে! ঘুরে বেড়াচ্ছিলে-টা কোথায়? পাপী লোক বটে। নেল্লীটা এমন আকুল হয়ে পড়েছিল যে কী করে শান্ত করি ভেবে পাই না... আহা বেচারী, যাক ঘুমতে গেছে বেঁচেছি। এদিকে নিকোলাই সের্গেয়িচও শহরে গেছেন (চা খাবার সময় ফিরবেন) আর আমি একা, একা ভয়ে মরি... ওঁর একটা চাকরি হচ্ছে ইভান পেত্রোভিচ, কিন্তু যখন

ভাবি যেতে হবে সেই পেরম্ পর্যন্ত, তখন বুক আমার হিম হয়ে আসে...'

'আর নাতাশা কোথায়?'

'বাগানে আছে, বাগানে, যান-না... ওর-ও কী যেন একটা হয়েছে... আমি ঠিক ধরতে পারছি না... মন আমার ভার হয়ে আছে ইভান পেত্রোভিচ! ও বোঝাতে চায় যে ও বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই আছে, কিন্তু আমার বাপু, বিশ্বাস হয় না... যাও ওর কাছে ভানিয়া, তারপর চুপি চুপি আমায় এসে বলো কী ব্যাপার... বুঝেছ?'

আন্না আন্দ্রেয়েভনার কথা কিন্তু আর আমার কানে ঢুকল না। ছুটলাম বাগানের দিকে। ছোট্ট বাগানটা এ বাড়িরই সম্পত্তি। লম্বায় পঁচিশ পা, চওড়াতেও প্রায় তাই, সবুজে একেবারে ছাওয়া। তিনটে বড়ো বড়ো পুরনো ঝাঁকড়া গাছ আছে, আর আছে কয়েকটা কচি বার্চ গাছ, লাইলাক আর হলুদমণি লতার কিছু ঝাড়; কোণে কোণে কয়েকটা র‍্যাস্‌প-বেরি ঝোপ, দুটো স্ট্র-বেরির ভুঁই, আর আছে বাগানের লম্বালম্বি আর আড়াআড়ি দুটি সঙ্কীর্ণ আঁকাবাঁকা পথ। বৃদ্ধ বাগানটাতে ভারি খুশি, ঘোষণা করেছেন শিগ্‌গিরই নাকি তাতে ব্যাঙের ছাতাও পাওয়া যাবে। সবচেয়ে বড়ো কথা, নেল্লী বাগানটির খুব ভক্ত হয়ে পড়েছে, প্রায়ই তাকে আরামকেদারায় করে বাগানে নিয়ে যাওয়া হয়। নেল্লী এখন গোটা বাড়িরই আদরের দুলালী। কিন্তু এই তো নাতাশা। আমায় ও স্বাগত করলে খুব আনন্দ করে, হাত বাড়িয়ে দিলে। কী রোগা হয়ে গেছে ও, কী ফ্যাকাশে! অসুখ থেকে নাতাশাও সেরে উঠেছে এই সবে।

আমায় ও জিজ্ঞেস করলে, 'একেবারে শেষ হয়েছে তো ভানিয়া?'

'শেষ, একেবারে শেষ! সারা সন্ধ্যেটা আমার আর কোনো কাজ নেই।'

'যাক বাপু, জয় ভগবান! খুব তাড়াহুড়ো করেছ বুঝি? নষ্ট হয়ে গেছে?'

'তা কী আর করা যায়! তবে ও কিছু না। আমি যখন এইরকম চাপের মধ্যে কাজ করি, তখন স্নায়ুগুলো আমার কেমন যেন হয়ে ওঠে বিশেষ রকমের উত্তেজিত, কল্পনাটা দাঁড়ায় পরিষ্কার, অনুভূতিটা আরো জীবন্ত আর গভীর, এমনকি স্টাইলও থাকে পুরোপুরি আমারই দখলে। ফলে চাপের মধ্যে যা লিখি সেটা ভালোই উতরোয়। সবই ঠিক আছে...'

'ও ভানিয়া!'

লক্ষ্য করে দেখেছি, ইদানীং আমার সাহিত্যিক সাফল্য ও খ্যাতির ব্যাপারে নাতাশা ভয়ানক উৎসাহী হয়ে উঠছে। গত বছরে আমার যাকিছু প্রকাশিত

হয়েছে, তা সবই ও পড়ে নিয়েছে, অনবরত জিজ্ঞেস করত আর কী লিখছি, আমাকে নিয়ে লেখা প্রত্যেকটি সমালোচনায় ওর আগ্রহ, কোনো কোনোটা দেখে রেগেও যায়। সাহিত্য জগতে আমি যাতে খুব একটা উঁচু জায়গায় উঠি তার জন্যে ওর ভারি আকুলতা। এমন জোর দিয়ে জেদ করে ও তার ইচ্ছার কথা জানাত যে ওর বর্তমান মনোভাবে আমার আশ্চর্য লাগত।

ও বললে, 'লিখে লিখেই তুমি শেষ হয়ে যাবে ভানিয়া, অতিরিক্ত চাপ পড়ছে তোমার, লিখতে লিখতেই ফুরিয়ে যাবে। তাছাড়া স্বাস্থ্যটি তোমার যাবে। দ্যাখো না, ওই তো 'স' একটা উপন্যাস লিখতে দু বছর নেন, আর গত দশ বছরে 'ন' লিখেছেন শুধু একটি উপন্যাস। কিন্তু কী ঘষামাজা নিখুঁত ওদের লেখা! অনবধানের ত্রুটি তাতে একটি পাবে না।'

'ঠিকই, কিন্তু ওঁদের টাকা আছে। মেয়াদ মেনে লিখতে হয় না, আর আমি হলাম ধোপার গাধা! কিন্তু ওসব বাজে কথা থাক, নতুন খবর কী বলো?'

'অনেক খবর। প্রথমত, ওর কাছ থেকে একটা চিঠি এসেছে...'

'আবার?'

'হ্যাঁ, আবার।' আলিওশার চিঠিটা ও আমায় দিলে। ওদের বিচ্ছেদের পর এই তৃতীয় চিঠি। প্রথমটা পাঠিয়েছিল মস্কো থেকে, কেমন একটা ঘোরের মধ্যে লেখা। তাতে ও জানিয়েছিল যে বিদায় নেবার সময় যা ঠিক হয়েছিল, ঘটনাচক্র যা দাঁড়াল তাতে সেভাবে মস্কো থেকে আসা ওর সম্ভব হল না। দ্বিতীয় চিঠিতে ও ঘোষণা করে যে কয়েকদিনের মধ্যেই ও আসছে, নাতাশার সঙ্গে বিয়েটা তাড়াতাড়ি সারার জন্যে — ব্যাপারটা একেবারে স্থির, কিছুতেই তার আর নড়চড় হবার নয়। অথচ চিঠির সুর থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে ও হতাশ হয়ে পড়েছে, বাইরে থেকে ওর ওপর প্রচণ্ড প্রভাব পড়ছে এবং ও যা বলছে তাতে ওর নিজেরই বিশ্বাস নেই। প্রসঙ্গত ও জানিয়েছিল, কাতিয়াই ওর নির্বন্ধ, ওর একমাত্র সহায় ও সান্ত্বনা। ওর এখনকার তৃতীয় চিঠিটি খুললাম অধৈর্যে।

দুই পাতা ভর্তি দমকা মারা অসংলগ্ন চিঠি, তাড়াতাড়িতে হিজিবিজি করে লেখা, চোখের জল আর কালির ফোঁটায় ভরা। শুরুতে আলিওশা জানিয়েছে যে নাতাশাকে সে ত্যাগ করেছে, অনুরোধ জানিয়েছে তাকে ভুলে যেতে। প্রাণপণে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে তাদের বিয়ে অসম্ভব, বাইরের বিরোধী প্রভাব অতি শক্তিশালী এবং আসলে এই-ই ঠিক: নাতাশা আর ও

দুজনেই সুখী হবে না, কেননা ওরা সমান সমান নয়। কিন্তু নিজেকে ও আর সামলে রাখতে পারে নি। সহসা এইসব যুক্তি আর প্রমাণ বিসর্জন দিয়ে চিঠির প্রথম অংশটা না কেটে বা না ছিঁড়েই স্বীকার করে বসেছে যে নাতাশার কাছে ও অপরাধী, ওর আর কোনো আশা নেই — ওর বাপও গ্রামে এসেছে, তার বিরুদ্ধে যাবার কোনো ক্ষমতা নেই ওর। লিখেছে, ওর যে কী যন্ত্রণা তা ও বর্ণনা করতে পারছে না, নানা কথার মধ্যে স্বীকার করেছে যে, নাতাশাকে ও সুখী করতে পারত বলেই ওর একান্ত বিশ্বাস এবং হঠাৎ করে প্রমাণ করতে চেয়েছে যে তারা দুজনেই একেবারে সমান সমান। বাপের যুক্তি ও খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছে সক্রোধে, গোঁয়ারের মতো; মরিয়ার মতো বর্ণনা করেছে বিয়ে করলে ওদের দুজনের, ওর আর নাতাশার সারা জীবন কী সুখেই না কাটত; নিজের কাপুরুষতার জন্যে অভিশাপ দিয়েছে নিজেকে এবং বিদায় জানিয়েছে চিরকালের জন্যে! দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে চিঠিটা লেখা, লেখবার সময় স্পষ্টতই ও আত্মহারা হয়ে উঠেছিল। চোখে জল এসে পড়েছিল আমার... নাতাশা আমায় আর একটি চিঠি এগিয়ে দিলে — কাতিয়ার চিঠি। আলিওশার চিঠির সঙ্গে একই খামের মধ্যে এ চিঠিটাও এসেছে, যদিও তা বন্ধ করা হয়েছে আলাদাভাবে। বেশ সংক্ষেপে অল্প কয়েক লাইনে কাতিয়া নাতাশাকে জানিয়েছে যে আলিওশা সত্যিই খুব দুঃখে আছে, অনেক কাঁদছে ও, মনে হচ্ছে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়েছে, এমনকি খানিকটা সে অসুস্থই, কিন্তু কাতিয়া ওর সঙ্গে আছে, আলিওশা সুখী হবে। প্রসঙ্গত কাতিয়া বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে অত সহজে আলিওশা প্রবোধ মানবে, কিংবা দুঃখটা তার খাঁটি নয়, একথা যেন নাতাশা না ভাবে। লিখেছে, 'ও কখনো আপনাকে ভুলবে না, আসলে ভুলতেও কখনো পারে না, ওর মনই সেরকম নয়। আপনাকে ও অসম্ভব ভালোবাসে, চিরকাল আপনাকে ভালোবেসে যাবে, এবং যদি কখনো আপনার প্রতি ওর সে ভালোবাসা চলে যায়, আপনার কথা ভাবতে গিয়ে যদি কখনো ওর দুঃখবোধ না হয়, তাহলে তার জন্যে সেই মুহূর্তেই আমিও ওকে আর ভালোবাসব না...'

দুটি চিঠিই নাতাশাকে ফিরিয়ে দিলাম। পরস্পর চাওয়া-চাওয়ি করলাম আমরা। কিছু বললাম না। প্রথম দুটি চিঠির বেলাতেও এই হয়েছে। মোটের ওপর অতীতের কথা আমরা এড়িয়ে যেতাম, আমাদের মধ্যে যেন সেই রকমের একটা গোপন বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল। অসহ্য কষ্ট হচ্ছিল ওর।

আমি তা দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু এমনকি আমার সামনেও ও তার মনোভাব প্রকাশ করতে চাইত না। বাপের বাড়ি আসার পর তিন সপ্তাহ ও শয্যাশায়ী ছিল ব্রেন ফিভারে এবং সুস্থ হয়ে উঠছিল এই সবে। ভবিষ্যতে আমাদের কী হবে তার আলোচনাও আমরা করতাম কম, যদিও ও জানত, ওর বাবা একটা চাকরি পাচ্ছে, শিগ্‌গিরই ছাড়াছাড়ি হবে আমাদের। তা সত্ত্বেও সব সময় ও ভারি নরম ব্যবহার করত আমার সঙ্গে, ভারি মনোযোগ দিত আমার দিকে, আমার সম্পর্কিত সবকিছুতেই ওর ভারি আগ্রহ। আমার নিজের কথা ওকে যা বলতে হত তা ও এমন একাগ্রভাবে মন দিয়ে শুনত যে প্রথমটা তাতে কষ্টই হত আমার। মনে হত, ও যেন অতীতের ক্ষতিপূরণ করছে আমার কাছে। কিন্তু সে কষ্টটা অচিরেই কেটে গেল। বুঝলাম, ওর মধ্যে আছে একেবারেই অন্য একটা বাসনা, স্রেফ আমায় ও ভালোবাসে, অসম্ভব ভালোবাসে, আমায় ছাড়া ও বাঁচতে পারে না, আমার সম্পর্কিত সবকিছুতে মাথা না ঘামিয়ে ও পারে না। মনে হয় নাতাশা আমায় যতটা ভালোবাসত, কোনো বোন তার ভাইকে এতটা ভালোবাসে নি। বেশ জানতাম, আমাদের আসন্ন বিচ্ছেদের কথা ভেবে বুক ওর ভার হয়ে আছে, কষ্ট হচ্ছে নাতাশার। সেও জানত, ওকে ছাড়া আমারও বাঁচা অসম্ভব, কিন্তু সেকথা আমরা কিছুই বলতাম না, যদিও আমাদের ভবিষ্যতের কথা আমরা আলাপ করতাম খুঁটিয়ে...

নিকোলাই সের্গেয়িচের কথা জিজ্ঞেস করলাম নাতাশাকে।

নাতাশা বললে, 'মনে হয় শিগ্‌গিরই ফিরবেন, বলে গেছেন চায়ের সময় আসবেন।'

'কেবল কি ওই চাকরির ধান্ধায় ঘুরছেন? চাকরিটার ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ, তবে চাকরি তো এখন সবই ঠিক, তাতে সন্দেহ নেই; আজই সেজন্যে যাবার বোধ হয় ওঁর সত্যিই খুব দরকার ছিল না।' নাতাশা বললে একটু ভেবে, 'কালও যেতে পারতেন।'

'তাহলে গেলেন কেন?'

'কারণ আমি একটা চিঠি পেয়েছি...'

তারপর একটু থেমে বলে চলল, 'আমাকে নিয়ে উনি এমন পাগল যে সত্যি ভারি কষ্ট লাগে ভানিয়া। উনি যেন স্বপ্নেও আমায় ছাড়া আর কিছু দেখেন না। আমি স্থির জানি, আমি কেমন আছি, কীরকম লাগছে, কী ভাবছি, এছাড়া উনি ভাবেন না আর কিছুই। আমার যেকোনো কষ্টে ওঁরও কষ্ট। দেখি তো, মাঝে মাঝে কীরকম আনাড়ীর মতো উনি নিজেকে সামলাবার

চেষ্টা করেন, ভান করে দেখাতে চান যে আমার জন্যে তাঁর কষ্ট হচ্ছে না, চেষ্টা করেন ফুর্তির ভাব করতে, হাসতে চান, আমাদেরও যোগ দেওয়াতে চান হাসিতে। এইসব সময় মাও নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না, ওঁর হাসিতেও বিশ্বাস করেন না তিনি, কেবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন... মা আমার এমন আনাড়ীর মতো করেন... ভারি সরল মন!' নাতাশা যোগ করলে একটু হেসে, 'তাই, আজ চিঠিটা পেতেই আমার সঙ্গে যাতে চোখাচোখি না হয় সেজন্যে তক্ষুনি ছুটে পালাবার দরকার পড়ল ওঁর... নিজের চেয়েও ওঁকে আমি ভালোবাসি ভানিয়া, দুনিয়ার সবকিছুর চেয়েও...' তারপর চোখ নামিয়ে আমার হাতে চাপ দিয়ে বললে, 'এমনকি তোমার চেয়েও...'

দুবার বাগানের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত হাঁটা হল আমাদের। তারপর ফের ও কথা কইলে।

বললে, 'মাসলবোয়েভ আজ এসেছিল, কালও এসেছিল।'

'হ্যাঁ, ইদানীং ও তোমাদের এখানে ঘন ঘন আসছে।'

'কেন আসে জানো? ওর ওপর মার অগাধ বিশ্বাস। মার ধারণা এসব জিনিস ও এত ভালো বোঝে (মানে, এইসব আইনকানুনের ব্যাপার) যে সব ঠিক করে দিতে পারবে। মার মাথার মধ্যে কী যে ঘুরছে বলো তো? আমি যে রাজবধূ হতে পারলাম না, সেজন্যে মনে মনে ওঁর ভারি দুঃখ, ভারি খেদ। সেই ভাবনাতে উনি আর স্বস্তি পাচ্ছেন না, আমার ধারণা মাসলবোয়েভকে উনি তাঁর মনোবাসনা খোলাখুলি জানিয়েছেন। বাবার কাছে বলতে সাহস পান নি, ভাবছেন, মাসলবোয়েভ ওঁকে কিছু সাহায্য করতে পারে না কি, আইনের দ্বারস্থ হয়ে কিছু করা যায় না? মাসলবোয়েভ মনে হয় তাঁর কথায় আপত্তি করছে না, এবং উনিও মাসলবোয়েভকে মদ দিয়ে আপ্যায়ন করছেন।' নাতাশা বললে একটু মুচকি হাসি হেসে।

'পাজিটার রকমই এই! কিন্তু তুমি জানলে কী করে?'

'মা নিজেই যে আমায় জানিয়েছেন... আভাসে ইঙ্গিতে...'

জিজ্ঞেস করলাম, 'নেল্লীর খবর কী, কেমন আছে সে?'

ভর্ৎসনার সুরে নাতাশা বললে, 'সত্যি তুমি আমায় অবাক করেছ ভানিয়া, এতক্ষণ ওর কথা জিজ্ঞেসই করো নি!'

এ বাড়ির সবার কাছেই নেল্লী আদরের দুলালী। নেল্লীকে ভয়ানক ভালোবেসেছে নাতাশা, নেল্লীও অবশেষে সর্বান্তঃকরণেই ওর অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। বেচারী! এমন ধারার লোক কখনো পাবে, এমন ভালোবাসা পাবে,

এ আশা তার ছিল না। দেখে আমারও আনন্দ হত যে ওর জ্বালা-পোড়া ছোট্ট বুকখানা নরম হয়ে আসছে, মন খুলতে শুরু করেছে আমাদের সকলের কাছেই। অতীত ওর মধ্যে জাগিয়েছিল অবিশ্বাস, বিদ্বেষ, একগুঁয়েমি। সে অতীতের তুলনায় এখন যে ভালোবাসা ওকে ঘিরেছে তাতে ও সাড়া দিত কেমন একটা রুগ্ন উত্তেজনায়। অবিশ্যি তখনো সে বহুদিন গোঁ ধরে ছিল, মিটমাটের যে অশ্রু জমে উঠেছিল ভেতরে ভেতরে, বহু দিন সে তা লুকিয়ে রেখেছে আমাদের কাছ থেকে এবং এত দিনেই কেবল সে ধরা দিয়েছে পুরোপুরি। নাতাশার ভারি অনুরক্ত হয়ে ওঠে সে, তার পরে নিকোলাই সের্গেয়িচের। আর আমার প্রয়োজন ওর কাছে এতই বেড়ে উঠেছিল যে আমি বেশি দিন না এলে ওর অসুখও কেমন বেড়ে উঠত। কাজটা শেষ করার জন্যে শেষবার দুদিনের জন্যে ওর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় ওকে বোঝাতে হয়েছিল অনেকখন... অবিশ্যি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে। তখনো খুব খোলাখুলিভাবে, খুব অবাধে তার হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে তার লজ্জা ছিল...

ওকে নিয়ে আমাদের সকলেরই খুব উৎকণ্ঠা। কোনো আলোচনা হয় নি, কিন্তু নীরবেই স্থির হয়েছিল যে ও নিকোলাই সের্গেয়িচের বাড়িতেই থাকবে বরাবর। কিন্তু এখন যতই ওদের চলে যাবার দিন ঘনিয়ে আসছিল, ততই অবস্থা ওর খারাপের দিকে যাচ্ছিল। যেদিন ওকে আমি নিকোলাই সের্গেয়িচের বাড়িতে নিয়ে যাই, নাতাশার সঙ্গে পুনর্মিলনের সেই দিনটি থেকেই ও অসুস্থ। তবে তাই বা কেন? অসুস্থ ও চিরকালই। আগে সে অসুখ বাড়ছিল ধীরে ধীরে, কিন্তু এখন তা বাড়তে শুরু করেছে হুহু করে। ওর যা রোগ সেটা সঠিক জানি না, বোঝাতে পারব না। ফিটগুলো অবিশ্যি আগের চেয়ে কিছুটা ঘন ঘন হচ্ছিল সত্যি, কিন্তু প্রধান কথাটা হল ওর অবসন্নতা, শক্তিহীনতা, অনবরত একটা অসুস্থ স্নায়বিক চাপ, ইদানীং তা এমনি দাঁড়িয়েছে যে বিছানা ছেড়েও উঠতে পারত না। আশ্চর্য এই যে, অসুখটা যতই গেড়ে বসছিল ততই সে আমাদের সঙ্গে নরম, মিষ্টি আর অকপট হয়ে উঠছিল। তিন দিন আগে ওর বিছানার পাশ দিয়ে আমি যেতেই ও আমার হাত চেপে ধরে কাছে টেনে নিলে। ঘরে কেউ ছিল না। ভারি রোগা হয়ে গিয়েছিল ও, মুখখানা জ্বরের ঘোরে টকটকে, চোখে আগুনের ঝিলিক। দমকা আবেগে ও চাইছিল আমাকে। আমি ওর দিকে ঝুঁকে আসতেই ও তার ময়লাটে রোগা হাতে সজোরে আমার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেলে প্রাণপণে তারপর তক্ষুনি কাছে

চাইলে নাতাশাকে। আমি নাতাশাকে ডেকে দিলাম। নেল্লী জিদ করতে লাগল নাতাশা যেন বসে বিছানায় তার পাশে, ওর দিকে চেয়ে থাকে...

বললে, 'আমার নিজেরই ইচ্ছে করছে আপনার দিকে চেয়ে থাকতে। কাল রাতে আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি আমি। আজ রাতেও দেখব... প্রায়ই আমি আপনাকে স্বপ্নে দেখি... রোজই...'

স্পষ্টতই নিজের মনের কী একটা কথা ওকে বলতে চাইছিল নেল্লী, ভারি ভাবাকুল হয়ে উঠেছিল ও, কিন্তু কী যে ওর আবেগ সেটা ও না পারছিল নিজে বুঝতে, না পারলে প্রকাশ করতে...

আমায় ছাড়া নিকোলাই সের্গেয়িচকে ও ভালোবাসত প্রায় সকলের চেয়ে বেশি। বলা উচিত যে নিকোলাই সের্গেয়িচও ওকে প্রায় নাতাশার মতোই ভালোবাসতেন। নেল্লীকে খুশি করে তুলে তার মুখে হাসি ফোটাবার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। উনি কাছে এলেই শোনা যেতে হাসির শব্দ, এমনকি ফাজলামিও চলত। একেবারে শিশুর মতো খুশি হয়ে উঠত রুগ্ন মেয়েটা, মসকরা করত বৃদ্ধের সঙ্গে, হাসিঠাট্টা করত, কী স্বপ্ন দেখেছে তা বলত, অনবরত নতুন নতুন দুষ্টুমির আয়োজন করত আর নিকোলাই সের্গেয়িচকে দিয়েও গল্প বলাত। নিজের "ছোট্ট নেল্লী মেয়েটিকে" পেয়ে বৃদ্ধেরও এত আনন্দ, এত আহ্লাদ যে নেল্লীর কাছ থেকে ফিরতেন দিন দিন উচ্ছ্বসিত হয়ে।

বরাবরের মতো নেল্লীকে রাত্রের জন্যে ক্রুশ করে ফিরে আসার সময় উনি একবার আমায় বলেছিলেন, 'ভগবান আমাদের দুঃখকষ্টের পুরস্কার হিশেবে দিয়েছেন ওকে।'

রোজ সন্ধ্যেয় আমরা সকলেই যখন একসঙ্গে জুটতাম (মাসলবোয়েভও থাকত প্রায় প্রতি সন্ধ্যেতেই), তখন মাঝে মাঝে আসতেন সেই বৃদ্ধ ডাক্তার। ইখমেনেভ পরিবারের সঙ্গে তিনি ভারি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছেন। আরামকেদারায় বসিয়ে নেল্লীকেও নিয়ে আসা হত গোল টেবিলটার কাছে। বারান্দার দিকে দরজাটা থাকত খোলা। সূর্যাস্তে আলোকিত সবুজ বাগানটা দেখা যেত সবখানি। সেখান থেকে আসত তাজা পাতার আমেজ আর সদ্য ফুটন্ত লাইলাক ফুলের গন্ধ। নেল্লী তার কেদারায় বসে আমাদের সকলের দিকে তাকিয়ে দেখত মমতাভরে, আমাদের আলাপ শুনত। মাঝে মাঝে নিজেও সে উৎসাহিত হয়ে আপনা থেকেই কিছু একটা বলতে শুরু করত... কিন্তু এই সব মুহূর্তে আমরা সবাই একটু অস্বস্তিভরেই তার কথা শুনতাম, কেননা

ওর স্মৃতির মধ্যে এমন সব প্রসঙ্গ ছিল যা তোলা অনুচিত। নাতাশা আর আমি আর ইখমেনেভরা সকলেই সেই দিনটার কথা ভেবে নিজেদের অপরাধী মনে করতাম যেদিন যন্ত্রণায় কাঁপতে কাঁপতে ওকে ওর পুরো কাহিনীটা বলতে হয়েছিল। ডাক্তার বিশেষ করে এই ধরনের পুরনো কথার বিরুদ্ধে ছিলেন, আমরা চেষ্টা করতাম আলাপটা ঘুরিয়ে দিতে। নেল্লী তখন দেখাবার ভাব করত যেন আমাদের চেষ্টাটা তার নজরে পড়ে নি। ডাক্তার কিংবা নিকোলাই সের্গেয়িচের সঙ্গে হাসিঠাট্টা শুরু করত ও...

এদিকে কিন্তু অবস্থা ওর খারাপই হচ্ছিল ক্রমাগত। অসম্ভব ভাবপ্রবণ হয়ে গিয়েছিল সে। হার্ট ওর ঠিকমত চলছিল না। ডাক্তার আমায় বলেই দিয়েছিলেন, শিগ্‌গিরই ও মারা যেতে পারে।

ইখমেনেভরা সশঙ্কিত হবেন ভেবে সেকথা আমি জানাই নি। নিকোলাই সের্গেয়িচ তো একেবারে নিশ্চিত ছিলেন যে যাবার আগেই ও ঠিক ভালো হয়ে যাবে।

নিকোলাই সের্গেয়িচের গলার স্বর শুনে নাতাশা বললে, 'ঐ যে বাবা আসছেন, চলো যাই ভানিয়া।'

দরজায় পা দিয়েই নিকোলাই সের্গেয়িচ যথারীতি উচ্চ কণ্ঠে কথা কইতে শুরু করেছিলেন। হাত নেড়ে আন্না আন্দ্রেয়েভনা ইশারা করতেই উনি সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলেন, তারপর নাতাশাকে আর আমাকে দেখে ফিসফিসিয়ে তাড়াতাড়ি করে বলতে লাগলেন তাঁর যাতায়াতের কী ফল হয়েছে। যার জন্যে চেষ্টা করছিলেন সে কাজটা তিনি পেয়েছেন এবং সেজন্যে ভারি খুশি।

'দু'সপ্তাহের মধ্যেই রওনা দেওয়া যেতে পারে।' বললেন হাত ঘষতে ঘষতে, উদ্বিগ্ন কটাক্ষে নাতাশার দিকে চেয়ে। নাতাশা কিন্তু হেসে ওঁকে জড়িয়ে ধরল, ফলে ওঁর শঙ্কা দূর হয়ে গেল তক্ষুনি।

সানন্দে উনি বলে উঠলেন, 'চললাম তাহলে, চললাম হে! শুধু তুমি ভানিয়া, তোমাকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে...' (এইখানে বলে রাখি যে আমিও ওঁদের সঙ্গে যাই, একথা উনি কদাচ তোলেন নি। ওঁর চরিত্রটা আমি যতটা জানি, তাতে সেকথা তিনি নিশ্চিতই বলতেন... অন্য অবস্থায়, অর্থাৎ নাতাশার প্রতি আমার ভালোবাসার কথা যদি তিনি না জানতেন।)

'কিন্তু কী আর করা যাবে হে, কী আর করা! কষ্ট হচ্ছে ভানিয়া, কিন্তু জায়গা বদলের ফলে আমরা সবাই তাজা হয়ে উঠব... জায়গার বদল মানে সবকিছুরই বদল!' বললেন ফের তাঁর মেয়ের দিকে চেয়ে।

কথাটায় তাঁর বেশ বিশ্বাস, এবং বিশ্বাস করছেন বলে বেশ খুশি।

আন্না আন্দ্রেয়েভনা বললেন, 'আর নেল্লী?'

'নেল্লী? তা কী হয়েছে... বাছা এখনো খানিকটা ভুগছে, কিন্তু নিশ্চয় ওই সময়ের মধ্যে ও সেরে উঠবে। এখনই তো ও কিছুটা ভালো, তাই না ভানিয়া?' উনি বললেন হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে। আমার দিকে তাকালেন অস্বস্তিভরে, যেন ওঁর শঙ্কার নিরসন করে দেব আমিই।

'কেমন আছে ও? ঘুম হয়েছে কেমন? কিছু হয় নি তো? এখন জেগেছে কি? এক কাজ করি আন্না আন্দ্রেয়েভনা, ছোটো টেবিলটা তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে যাই বারান্দায়, সামোভারটাও বাইরে নিয়ে যাব, বন্ধুবান্ধবেরা সব আসবে, ওখানেই বসব আমরা, নেল্লীও আসবে সেখানে... চমৎকার হবে। কিন্তু ও জেগেছে বোধ হয়? গিয়ে দেখে আসি... শুধু দেখে আসব, জাগাব না, ভাবনা নেই!' আন্না আন্দ্রেয়েভনা ফের হাত নাড়ছেন দেখে উনি এটা বললেন।

কিন্তু আগেই ঘুম ভেঙেছিল নেল্লীর। মিনিট পনেরো পরে টেবিল ঘিরে যথারীতি আমরা বসলাম সান্ধ্য চায়ের জন্যে।

নেল্লীকে নিয়ে আসা হল তার চেয়ারে বসিয়ে। ডাক্তার এলেন, মাসলবোয়েভও। নেল্লীর জন্যে লাইলাক ফুলের একটা মস্ত তোড়া নিয়ে এসেছিল মাসলবোয়েভ, কিন্তু নিজে সে যেন কেমন উদ্বিগ্ন, কিসের জন্যে একটু যেন ব্যাজার।

প্রসঙ্গত, মাসলবোয়েভ আসত প্রায় প্রতি দিন। আগেই বলেছি, সকলেই ওকে খুব পছন্দ করতেন, বিশেষ করে আন্না আন্দ্রেয়েভনা, কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো কথা কখনো হত না আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনাকে নিয়ে। মাসলবোয়েভ নিজেই তার কোনো কথা তুলত না। আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা এখনো আইনসঙ্গত স্ত্রীর পর্যায়ে ওঠে নি, একথা আমার কাছ থেকে জানার পর আন্না আন্দ্রেয়েভনা স্থির করে নিয়েছিলেন তাকে নিমন্ত্রণ করা বা বাড়িতে তার নাম নেওয়া চলতে পারে না। তাই চলেছে এবং এতে তাঁর স্বভাবটাই খুব ফুটে উঠেছিল। তবে নাতাশা না থাকলে, বিশেষ করে নাতাশার ভাগ্যে যা হয়েছে তা না ঘটলে অবিশ্যি তিনি হয়ত অতটা খুঁতখুঁতে হতেন না।

সে সন্ধ্যায় নেল্লীকে একটু বেশি রকম মনমরা দেখাল, কেমন যেন উৎকণ্ঠিত। যেন কী একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছে, তাই নিয়ে ভাবছে। মাসলবোয়েভের

উপহারে কিন্তু ও ভারি খুশি হয়ে উঠল। ওর সামনে একটা গেলাসে রাখা হল ফুলগুলো, আনন্দে ও সেগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

বৃদ্ধ বললেন, 'তুমি তাহলে দেখছি ফুল খুব ভালোবাসো নেল্লী।' তারপর উৎসুক হয়ে যোগ করলেন, 'আচ্ছা দাঁড়াও, কালকে... আচ্ছা সে তুমি নিজেই দেখবে!..'

নেল্লী বললে, 'সত্যি, খুব ভালো লাগে ফুল। মনে আছে একবার ফুল দিয়ে মাকে আমরা স্বাগত করেছিলাম। আমরা তখন ওখানে।' (ওখানে অর্থ বিদেশে) 'একবার গোটা মাস খুব অসুখ গেল মার। হেনরিখ আর আমি ঠিক করলাম মা যখন প্রথম তার শয্যা ছেড়ে বাইরে বেরুবে, সারা মাস সেখান থেকে বেরয় নি, তখন আমরা সমস্ত ঘর ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখব। করলামও তাই। সন্ধ্যেয় মা বলেছিল, পরদিন সকালে নিশ্চয়ই বেরিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে প্রাতরাশ খাবে। খুব ভোরে সেদিন আমরা উঠলাম। এক রাশ ফুল নিয়ে এল হেনরিখ। সবুজ পাতায় আর ফুলের মালায় সারা ঘর আমরা সাজালাম। আইভি ছিল, বড়ো বড়ো পাতাওয়ালা আর একটা কী যেন, নাম জানি না, আরো কীসব পাতা, সবেতেই আটকে রাখা যায়, আর ছিল বড়ো বড়ো শাদা ফুল, আর নার্সিসাস ফুল — সবচেয়ে আমি ভালোবাসি নার্সিসাস — আর ছিল গোলাপ, চমৎকার গোলাপ, আরো কত কত ফুল। মালা করে ঝুলিয়ে দিলাম আমরা, পাত্রের মধ্যে রাখলাম কতকগুলো — বড়ো বড়ো টবে পাতাবাহারী, একেবারে পুরো এক একটা গাছের মতো — সেগুলোকে রাখলাম কোণে কোণে আর মার চেয়ারের পাশে। মা এসে একেবারে অবাক, ভারি খুশি, হেনরিখের আর আনন্দ ধরে না... বেশ মনে পড়ছে আমার...'

সেদিন সন্ধ্যেয় নেল্লীকে বেশ দুর্বল আর স্নায়বিক লাগছিল। ডাক্তার তাকাচ্ছিলেন অস্বস্তির সঙ্গে। কিন্তু কথা বলতে ওর সেদিন ভারি ইচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে, গোধূলি না হওয়া পর্যন্ত ও আমাদের শোনাল "ওখানে" তার অতীত জীবনের কথা। আমরা বাধা দিলাম না। মা আর হেনরিখের সঙ্গে ও অনেক জায়গা ঘুরেছে, অতীত সেসব স্মৃতি ওর মনে জ্বলজ্বল করে গেঁথে আছে। খুব আলোড়িত হয়ে ও বললে নীল নীল আকাশের কথা, যেসব বরফ ঢাকা উঁচু উঁচু পর্বত ও দেখেছে, সেখানে গেছে, পাহাড়ের মধ্যে জলপ্রপাতের কথা। তারপর ইতালির হ্রদ আর উপত্যকা, তার ফুল, গাছপালা, গাঁয়ের লোক, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, তাদের শ্যামলা রঙের মুখ, কালো কালো চোখের কথা। কত রকম লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কত

রকম ঘটনা ওদের ঘটেছে তার বিবরণও শোনালে। তারপর বললে বড়ো বড়ো শহর আর প্রাসাদের কথা, মস্ত গম্বুজওয়ালা একটা উঁচু গির্জা — সে গির্জার গম্বুজটা হঠাৎ নানা রঙের আলোয় ঝলমল করে উঠছিল; তারপর বললে গরম এক দাক্ষিণী শহরের কথা, নীল আকাশ, নীল সমুদ্র... তার পুরনো স্মৃতি নেল্লী কখনো এত বিশদ করে আমাদের শোনায় নি। উৎকর্ণ হয়ে আমরা ওর কথা শুনছিলাম। এতদিন পর্যন্ত ওর অন্য যে স্মৃতিটা আমরা জেনে এসেছি, সেটা হল এক গোমড়ামুখো বিষণ্ন শহর, আবহাওয়া তার পীড়াদায়ক, মাথা-ঘোরানো, বাতাস তার দূষিত, দামী দামী প্রাসাদ তার অনবরতই কর্দমাক্ত, বিবর্ণ নিষ্প্রভ রোদ্দুর, বিদ্বেষপরায়ণ আধপাগলা সব লোক, তাদের হাতে কত কষ্ট সয়েছে ও আর ওর মা। মনে মনে একটা ছবি ভেসে উঠল: মা মেয়ে দুটিতে এক নোংরা তল-কুঠরিতে স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার সন্ধ্যায় তাদের গরিব বিছানায় জড়াজড়ি করে শুয়ে তাদের অতীত নিয়ে ভাবছে, ভাবছে লোকান্তরিত হেনরিখ, অপরূপ দেশ-বিদেশের কথা... নেল্লীর ছবিও ভেসে উঠল, এসব কথা সে ভাবছে যখন সে একা, মা নেই, প্রহার দিয়ে বর্বর নিষ্ঠুরতায় বুবনভা চাইছে তার প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে এক পাপের জীবনে তাকে ঠেলে দিতে...

কিন্তু শেষকালে নেল্লীর শরীর খারাপ করে উঠল। ঘরে নিয়ে যাওয়া হল তাকে। ওকে অত কথা কইতে দেওয়া হয়েছে বলে বৃদ্ধ ভারি ভয় পেয়ে গেলেন, বিরক্ত হয়ে উঠলেন। মূর্ছার মতো একটা ফিট হয়েছিল তার। এটা আগেও হয়েছে কয়েকবার। মূর্ছার দমকটা কেটে গেলে নেল্লী চাইল আমায় দেখতে। একলা আমার কাছে কী যেন বলবার আছে ওর। এমন মিনতি করছিল যে ডাক্তার এবার নিজেই বললেন ওর ইচ্ছাটা মানতে হবে। সকলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আমরা একা হতে নেল্লী বললে, 'শোনো ভানিয়া, ওরা ভাবছে আমিও ওদের সঙ্গে যাব। কিন্তু আমি যাব না, কেননা যাবার ক্ষমতা আমার নেই. আপাতত তোমার সঙ্গে আমি থাকব। এই কথাই বলতে ডেকেছি।'

আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। বললাম, ইখমেনেভরা সকলেই ওকে ভারি ভালোবাসে, ওকে দেখে মেয়ের মতো। ওদের ভারি কষ্ট হবে। তাছাড়া, অন্য দিকে আমার সঙ্গে থাকা ওর পক্ষে কঠিন হবে। আমি ওকে খুবই ভালোবাসি, কিন্তু আর কোনো উপায় নেই — ছাড়াছাড়ি হতেই হবে।

নেল্লী জোর দিয়ে বললে, 'না, না, সে অসম্ভব! কেননা আজকাল প্রায়ই আমি মায়ের স্বপ্ন দেখি, মা আমায় বলে ওদের সঙ্গে না গিয়ে এখানে থাকতে। মা বলে, দাদুকে এখানে একলা ফেলে রেখে গেলে খুব পাপ হবে আমার — আর বলতে বলতে মা কেবলি কাঁদে। আমি এখানে থাকতে চাই — দাদুর দেখাশোনা করব ভানিয়া।'

ওর কথা শুনে একটু অবাক হয়ে বললাম, 'কিন্তু তোমার দাদু যে মারা গেছেন নেল্লী।'

ও কী ভাবলে। তারপর আমার দিকে একাগ্রভাবে চেয়ে বললে, 'বলো ভানিয়া, কী করে দাদু মারা গেলেন ফের আমায় বলো। সমস্ত বলবে, একটা কথাও বাদ দেবে না।'

ওর এই পীড়াপীড়িতে অবাক লেগেছিল, কিন্তু সমস্ত খুঁটিনাটি সমেত ফের কাহিনীটা বলতে লাগলাম ওকে। সন্দেহ হল, ও ভুল বকছে, অন্তত পক্ষে এই মূর্ছাটার পর মাথাটা ওর এখনো পরিষ্কার হয় নি।

যা বললাম, ও সব শুনলে মন দিয়ে। মনে পড়ছে, আমি কথা বলছি আর জ্বরের ঘোরে জ্বলজ্বল করছে ওর কালো চোখদুটো, সেই চোখ দিয়ে একাগ্রভাবে ও তাকিয়ে তাকিয়ে শুনছে আমার কথা। ঘরটা ইতিমধ্যে অন্ধকার হয়ে এসেছিল।

সবটা শোনার পর একটু ভেবে ও নিশ্চিত সুরে বললে, 'না, ভানিয়া, দাদু মারা যান নি। মা প্রায়ই আমায় দাদুর কথা বলে। কাল যখন বললাম, দাদু যে মারা গেছেন, তখন খুব দুঃখ হয়েছিল মার। মা খুব কাঁদলে, তারপর বললে, "না, দাদু মারা যান নি, আমায় মিছিমিছি করে লোকে তাই বলেছে। দাদু এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ভিক্ষে করছেন, আমরা যেমন ভিক্ষে করতাম।" মা বললে, "সেই যে ওকে প্রথম যেখানে দেখেছিলাম, আমি পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়েছিলাম, আজর্কা আমায় চিনতে পেরেছিল, সেইখানে উনি এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছেন..."'

বললাম, 'ওটা একটা স্বপ্ন নেল্লী, অসুখের স্বপ্ন, তোমার যে এখন অসুখ।'

নেল্লী বললে, 'আমিও ভেবেছিলাম স্বপ্ন, তাই কাউকে বলি নি, ভেবেছিলাম শুধু তোমায় বলব। কিন্তু আজ তুমি যখন এলে না, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যে দাদুকে দেখলাম। উনি বসে আছেন তাঁর সেই বাসায়। আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। দেখতে ভয়ঙ্কর আর রোগা। বললেন দু-দিন থেকে

তিনি কিছু খান নি, আজর্কাও খায় নি। আমার ওপর ভয়ানক রাগারাগি করলেন, বকলেন। বললেন, নস্যি তাঁর ফুরিয়ে গেছে, নস্যি ছাড়া তিনি বাঁচবেন না। মা মারা যাবার পর ঠিক ওই কথাই তিনি আমায় আগেও একবার বলেছিলেন ভানিয়া, আমি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। তখন তাঁর বেশ অসুখ, বিশেষ কোনো বোধ নেই। আজ ওঁর এই কথা শুনে ভাবলাম গিয়ে ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করব, তারপর ওঁর জন্যে কিছু রুটি, আলু সেদ্ধ আর নস্যি কিনে দেব। তারপর আমি যেন ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে আছি, ভিক্ষে করছি, দেখি দাদু কাছাকাছি ঘুরছেন। একটু অপেক্ষা করে তারপর আমার কাছে এসে দেখলেন কত পেয়েছি। পয়সাগুলো নিয়ে বললেন, এতে রুটি হয়ে যাবে, এবার নস্যির জন্যে কিছু জোগাড় কর। আমি যেই ভিক্ষে পাই, অমনি উনি এসে তা নিয়ে নেন। বললাম, এমনিতেই তো সবই ওঁকে দেব, কিছুই লুকিয়ে রাখব না। উনি বললেন, "না, তুই আমার কাছ থেকে চুরি করিস। বুবনভাও বলেছে তুই চোর। সেই জন্যে তোকে আমি আমার কাছে রাখব না কখনো। আর পাঁচ কোপেকটা কই?" আমায় উনি বিশ্বাস করেছেন না দেখে আমি কাঁদতে লাগলাম, কিন্তু উনি কোনো কথা না শুনে কেবলি চেঁচাতে লাগলেন, "পাঁচ-কোপেকটা তুই চুরি করেছিস!" তারপর ওখানেই ব্রিজের ওপরেই উনি আমায় মারতে লাগলেন, ভয়ানক মারলেন। খুব কাঁদলাম আমি... তাই ভাবছি ভানিয়া, উনি নিশ্চয় বেঁচে আছেন, কোথাও একা একা ঘুরছেন, অপেক্ষা করছেন আমি আসব...'

ফের ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে ওটা নেহাৎই স্বপ্ন। শেষ পর্যন্ত মনে হল ও বুঝল। বললে, ঘুমতে ভয় পাচ্ছে, কেননা দাদুকে দেখবে। অবশেষে আবেগে জড়িয়ে ধরলে আমায়...

ওর ছোট্ট মুখখানা আমার মুখের ওপর চেপে বললে, 'তবু তোমায় ছেড়ে যেতে পারব না ভানিয়া। দাদুর কথা বাদ দিলেও তোমায় ছেড়ে যাব না।'

নেল্লীর এই মূর্ছায় সকলে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমি ডাক্তারকে চুপি চুপি বললাম নেল্লীর অসুস্থ স্বপ্নগুলোর কথা। জিজ্ঞেস করলাম অসুখটা সম্পর্কে উনি শেষ পর্যন্ত কী ভাবছেন।

খানিকটা ভেবে বললেন, 'এখনো সঠিক কিছু বলা যাচ্ছে না। আমি শুধু কেবল আন্দাজ করছি, ভাবছি, দেখছি... কিন্তু সঠিক করে কিছু বলা যায় না। মোটের ওপর আরোগ্যলাভ অসম্ভব। মারা ও যাবে। আমি ওঁদের

বলি নি, কেননা আপনি বারণ করেছিলেন। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে আমার, কাল একটা কনসালটেশনের কথা আমি ভাবছি। কনসালটেশনের পরে রোগটা অন্য পথে যাবে হয়ত। কিন্তু ভারি দুঃখ হচ্ছে মেয়েটার জন্যে, যেন আমারই মেয়ে... ভারি লক্ষ্মী মেয়ে! কত রঙ্গরস!'

খুবই বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন নিকোলাই সের্গেয়িচ।

বললেন, 'কী ভেবেছি, শোনো ভানিয়া। ও ভারি ফুল ভালোবাসে। কী করব জানো, কাল ও যখন ঘুম থেকে উঠবে, তখন ফুল দিয়ে ওকে স্বাগত করব, ও আজ যা বলছিল-না, ওই হেনরিখের সঙ্গে তার মায়ের জন্যে ও যেরকম করেছিল সেই রকম... ভারি আকুল হয়ে ও বলছিল আজ...'

বললাম, 'হ্যাঁ, আকুল, কিন্তু ওই আকুলতাটাই ওর পক্ষে এখন খারাপ...'

'ঠিকই, কিন্তু সুখের আকুলতা ভিন্ন ব্যাপার। আমার কথা শোনো হে, আমার অভিজ্ঞতার ওপর ভরসা রেখো। সুখের আকুলতায় কোনো ক্ষতি হয় না, তাতে বরং রোগও সারতে পারে, স্বাস্থ্যের পক্ষে তা ভালো...'

মোটের ওপর বৃদ্ধ তাঁর এই পরিকল্পনাটায় এতই মুগ্ধ যে একেবারে মেতে উঠলেন। আপত্তি করা অসম্ভব।

ডাক্তারের কাছে আমি পরামর্শ চাইলাম। কিন্তু তিনি ব্যাপারটা বুঝে দেখবার আগেই বৃদ্ধ টুপি টেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ব্যবস্থা করতে।

যেতে যেতে বললেন, 'জানো, কাছেই একটা হটহাউস আছে, চমৎকার হটহাউস। মালীরা ফুল বিক্রি করে, বেশ সস্তায় পাওয়া যায়। এত সস্তা যে কী বলব! তুমি আন্না আন্দ্রেয়েভনাকে কথাটা বুঝিয়ে বোলো, নইলে খরচা করছি দেখে উনি চটে যাবেন... তাহলে এই রইল... হ্যাঁ, আর একটা কথা হে, কোথায় যাবে তুমি এখন? বোঝা তো খালাস করেছ, কাজটা তো সেরেছ। তাহলে বাড়ি যাবার তাড়া কেন? রাত্তিরটা এখানেই থেকে যাও, ওপরে চিলেকোঠায় শোবে, আগে যেখানে শুতে, মনে আছে? ওখানে তোমার খাট আছে, তোশক আছে, আগে যেমন থাকত, কিছুই সরানো হয় নি। ঘুমবে একেবারে ফ্রান্সের রাজার মতো। কী বলো? থেকে যাও। কাল ভোরে উঠব। ওরা ফুল পৌঁছে দিয়ে যাবে, আটটার মধ্যেই আমরা সারা ঘরটা সাজিয়ে ফেলব। নাতাশাও সাহায্য করবে। তোমার আমার চেয়ে ওর রুচিজ্ঞান তো ভালো... কী তাহলে রাজী? থাকছ তো?'

ঠিক হল আমি রাত্রে থাকব। বৃদ্ধ তাঁর ব্যবস্থাদি সারলেন। ডাক্তার আর মাসলবোয়েভ বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন। ইখমেনেভরা শুতেন সকাল সকাল,

এগারোটার মধ্যে। যাবার সময় মাসলবোয়েভকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল, আমায় কী যেন বলতে গিয়েছিল কিন্তু সেটা মুলতবী রাখল পরের বারের জন্যে।

বৃদ্ধবৃদ্ধাদের শুভ রাত্রি জানিয়ে আমার চিলেকোঠায় উঠে অবাক হয়ে দেখি মাসলবোয়েভ সেখানে বসে। টেবিলে বসে একটা বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে আমার জন্যে ও অপেক্ষা করছিল।

"মাঝপথ থেকে ফিরে এলাম ভানিয়া, ভাবলাম তোকে এখুনি বলা ভালো। বস। ব্যাপারটা একটু আহাম্মুকি গোছের, বুঝেছিস, এমনকি বিরক্তিকর...'

'কেন, কী হল?'

'হবে আবার কী, তোর ঐ পাজি প্রিন্সটি আমায় দিন পনের আগে ভয়ানক চটিয়ে দিয়েছে, এমন চটিয়েছে যে এখনো রেগে আছি।'

'সেকী, সেকী? প্রিন্সের সঙ্গে তোর এখনো সম্পর্ক আছে নাকি?'

'ওই! তুই অমনি শুরু করেছিস তোর "সেকী, সেকী?" যেন ভগবানই জানেন কী ব্যাপার। তুই ঠিক একেবারে আমার আলেক্সান্দ্রা সেমিওনোভনা প্রমুখ যত অসহ্য মেয়েমানুষগুলোর মতো... মেয়েমানুষদের আমি দু' চোখে দেখতে পারি না!.. কাকটা যদি-বা কা-কা করল, অমনি ওদের "কী হল? সেকী?"'

'হয়েছে, হয়েছে, রাগ করিস না।'

'রাগ আমি একটুও করি নি, কিন্তু প্রত্যেকটা ঘটনাকেই দেখতে হয় শাদা চোখে, বাড়িয়ে তোলা ঠিক নয়... এই হল ব্যাপার।'

ও একটু চুপ করে রইল, তখনো যেন ও চটে আছে আমার ওপর। আমি ওকে বাধা দিলাম না।

'শোন ভানিয়া,' ফের শুরু করলে ও, 'একটা সূত্র আমি পেয়েছি... মানে সত্যিই পেয়েছি তা নয়, সূত্রও তাকে বলা যায় না, তবে এইরকম আমার মনে হচ্ছে... মানে কতকগুলো জিনিস থেকে আমার সিদ্ধান্ত হয়েছে যে নেল্লী... বোধ হয়... মানে এক কথায়, প্রিন্সের বৈধ কন্যা।'

'সেকী!'

'এই দ্যাখো, ফের চেঁচামেচি লাগিয়েছে "সেকী!" এসব লোকের সঙ্গে কথা বলাই বিপদ!' ও চেঁচিয়ে উঠল এক প্রবল বিরক্তির ভঙ্গি করে, 'তোকে এখনো সঠিক করে কিছু বলেছি কি, উজবুক কাঁহিকার? বলেছি কি যে ও প্রিন্সের বৈধ মেয়ে তা প্রমাণিত হয়েছে? তেমন কিছু বলেছি কি?..'

ভয়ানক উত্তোজিত হয়ে আমি বাধা দিলাম, 'শোন ভাই, ঈশ্বরের দোহাই, চেঁচামেচি না করে ঠিকঠাক স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বল। দিব্যি দিয়ে বলছি তোর কথাটা বোঝার চেষ্টা করব। বুঝে দেখ ব্যাপারটা কী গুরুতর, এবং কী তার পরিণতি...'

'পরিণতি, কিন্তু কী থেকে? প্রমাণ কোথায়? অমন করে কিছু হয় না, আর তোকে এখন কথাটা বলছি গোপনে। কেন বলছি তা পরে বোঝাব। তার মানে কারণ আছে। মুখ বন্ধ করে শোন এবং মনে রাখিস যে জিনিসটা গোপনীয়...

'ব্যাপার হল এই! প্রিন্স শীতকালে ওয়ারস থেকে ফিরে এসেই খোঁজ খবর করতে শুরু করে, স্মিথ মারা যাবার আগেই। তার মানে খোঁজ নিতে সে শুরু করেছিল অনেক আগেই, এক বছর আগে। কিন্তু সে সময় ও একটা জিনিসের খোঁজে ছিল, এখন অন্য জিনিস। প্রধান কথা, সূত্রটা হারিয়ে ফেলেছিল। প্যারিসে স্মিথকন্যার সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ি হয়, ওকে ত্যাগ করে তের বছর আগে, কিন্তু এই তের বছর ও তার ওপর অনবরত নজর রেখে এসেছে। জানত, ও আছে হেনরিখের সঙ্গে, নেল্লী যার কথা আজ বলছিল। জানত, স্মিথকন্যার মেয়ে হয়েছে, নেল্লী, নিজে ও অসুখে ভুগছে; মোটের ওপর ও সবই জানত, তারপর হঠাৎ সূত্রটা ছিঁড়ে যায়। মনে হয়, সেটা ঘটে হেনরিখ মারা যাবার কিছু পরেই, স্মিথকন্যা যখন পিটার্সবুর্গে চলে আসে। পিটার্সবুর্গে অবিশ্যি প্রিন্স তাকে অচিরেই খুঁজে বার করতে পারত, রাশিয়ায় এসে যে নামই সে নিক না কেন। কিন্তু ব্যাপার হল, বিদেশে ওর এজেন্টরা ওকে মিথ্যে খবর দিয়ে বিভ্রান্ত করে। তারা বলে যে স্মিথকন্যা দক্ষিণ জার্মানির কোনো একটা অবহেলিত ছোট্ট সহরে বাস করছে; অসাবধানতার জন্যে ওরা নিজেরাই ভুল করেছিল। ওরা অন্য একটি মেয়েকে ধরে নিয়েছিল স্মিথকন্যা বলে। এইভাবে বছরখানেক কি আরো বেশি চলে, কিন্তু এক বছর পরে প্রিন্সের সন্দেহ হতে শুরু করে। কতকগুলো তথ্যে তার আগেই মনে হচ্ছিল, বোধ হয় এটি সে মেয়ে নয়। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় আসল স্মিথকন্যা গেল কোথায়? ওর ধারণা হল (কোনো তথ্য ছাড়াই, এমনি) পিটার্সবুর্গেই আছে না তো? বিদেশে খোঁজ খবর চলছিলই, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্স এখানেও খোঁজ নিতে শুরু করে। কিন্তু বোঝা যায় বড়ো বেশি সরকারী সূত্রে খোঁজ খবর করতে তার ইচ্ছা হয় নি, পরিচয় হয় আমার সঙ্গে। ওর কাছে আমার নাম সুপারিশ করা হয়েছিল। নানা কথা ও

শুনেছিল আমার সম্পর্কে, বেসরকারী গোয়েন্দাগিরির কাজ নিই ইত্যাদি, ইত্যাদি...

'অর্থাৎ ঘটনাটা আমায় তখন ও বলে। তবে শয়তানের বাচ্চাটা বলে ধোঁয়াটে করে, ঘুরিয়ে। বলতে গিয়ে এক রাশ ভুল করে, বারবার পুনরাবৃত্তি করে, একই ঘটনাকে দেখায় ভিন্ন ভিন্ন আলোয়... তবু সকলেই জানে, যত সেয়ানাই হোক, সব সূত্র কি আর লুকানো যায়? বলাই বাহুল্য, আমিও শুরু করলাম একেবারে সরল মনে — জী হুজুর করে, মোট কথা একেবারে দাসানুদাসের মতো অনুগত। কিন্তু আমার চিরকালকার নীতি এবং প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে (কেননা এ একেবারে প্রকৃতিরই নিয়ম) আমি ভেবে দেখলাম, প্রথমত, ওর যা সত্যি দরকার সেটা আমায় বললে কি? দ্বিতীয়ত, ও যা বলেছে তার পেছনে অনুক্ত অন্য একটা লক্ষ্য আছে কিনা। কেননা শেষের ক্ষেত্রে এমনকি তুই, দুলাল আমার, তোর কাব্যিক মাথা সত্ত্বেও সম্ভবত বুঝতে পারবি — আমায় ও ঠকাচ্ছে। কেননা কোনো কাজের দাম এক রুবল, কোনোটার চার রুবল। যার দাম চার রুবল সেটা যদি ওকে আমি এক রুবলে দিয়ে দিই, তাহলে যে হাঁদামি হবে। খতিয়ে দেখতে শুরু করলাম আর একটু একটু করে এক-একটি সূত্র হস্তগত হতে লাগল। কোনোটা বার করলাম ওরই কাছ থেকে, কোনোটা অন্য লোকের কাছ থেকে, কোনোটা আবার নিজে মাথা খাটিয়ে। জিজ্ঞেস করবি কেন তা করলাম? আমার জবাব, অন্তত এই কারণে যে, প্রিন্স ব্যাপারটা নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় ছিল, কিছু একটা ব্যাপারে ওর বেশ ভয় হচ্ছিল। অথচ, মনে হবে, আসলে ভয়ের কী আছে, প্রণয়িনীকে ও হরণ করে নিয়ে গেছে বাপের কাছ থেকে, তারপর সন্তানসম্ভবা মেয়েটিকে সে পরিত্যাগ করেছে। তার মধ্যে আশ্চর্যের কী আছে? এতো নেহাৎ একটা মনোহর ফুর্তির নষ্টামি, তার বেশি কিছু নয়। তার জন্যে প্রিন্সের মতো একটি লোক ভয় পাবে সে হয় না! অথচ ভয় সে পাচ্ছিল ... সুতরাং সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলাম আমি। কতকগুলো খুব চিত্তাকর্ষক সূত্র আমি পেলাম ভায়া, প্রসঙ্গত হেনরিখের মারফত। ও অবশ্য তখন মারা গিয়েছিল। ওর এক আত্মীয়া (এখন এখানে পিটার্সবুর্গে এক রুটিওয়ালার সঙ্গে আছে), হেনরিখকে আগের কালে সে ভালোবাসত প্রচণ্ড এবং এই পনের বছর ধরে ভালোবেসে এসেছে ঐ মুটকো বাবুটি সত্ত্বেও — দৈবাৎ যার সঙ্গে ওর আটটি সন্তান হয়েছে। এই মেয়েটির কাছ থেকে নানা জটিল মহড়ার পর আমি একটা গুরুতর ঘটনার কথা জানতে পারি: হেনরিখ তার জার্মান অভ্যাসমতো ওকে

চিঠি আর ডায়েরি লিখে পাঠাত এবং মরার আগে তার কতকগুলো লেখা পাঠিয়েছিল। বোকা মেয়েটার ধারণা ছিল না সে চিঠিতে জরুরী জিনিস কোনটা, বুঝত শুধু সেইসব জায়গাগুলো যেখানে চাঁদের কথা, "প্রেয়সী অগাস্টিন" আর বোধ হয় ভাইল্যান্ডের* কথা আছে। তবে প্রয়োজনীয় তথ্য আমার হাতে আসে এবং চিঠিগুলো থেকে একটা নতুন সূত্র পাই। যেমন, স্মিথের কথা আমি জানতে পারি, ওর মেয়ে তার যে টাকাটা নেয়, এবং মেয়ের কাছ থেকে প্রিন্স যে টাকাটা মারে, তার কথাও জানা গেল। পরিশেষে, নানা প্রকার ভাবাবেগ, কথকতা আর রূপকের মধ্যে থেকে বার করলাম মূল কথাটা, মানে, খুব নিশ্চিত করে কিছু নয়, নিশ্চয় বুঝতে পারছিস। আহাম্মক হেনরিখটা এসব বিষয়ে ইচ্ছে করেই মুখ বুজে ছিল এবং যা বলেছে সে শুধু আভাসে ইঙ্গিতে। এইসব আভাস ইঙ্গিত থেকে, সব একত্র করে এক স্বর্গীয় সঙ্গতি মিলে গেল: স্মিথকন্যার সঙ্গে প্রিন্সের আইনসঙ্গত বিয়ে হয়েছিল নিশ্চয়! কোথায় বিয়ে হয়েছিল, কী করে, ঠিক কখন, বিদেশে না এখানে, তার দলিলপত্রের হদিশ — এ সবই অজানা। আসলে ভায়া ভানিয়া, হতাশ হয়ে মাথার চুল ছিঁড়েছি, এসবের তল্লাশ করে বেড়িয়েছি, দিনরাত্তির শুধু ওই খুঁজেছি।

'স্মিথকেও শেষকালে পাত্তা করেছিলাম, কিন্তু পট করে লোকটা আবার মরে গেল। জ্যান্ত থাকতে ওকে একবার চোখেও দেখা হল না। তারপর হঠাৎ আকস্মিকভাবে শুনলাম ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপে একটি মেয়ে মারা গেছে, এবং জিনিসটা আমার কাছে লাগল সন্দেহজনক। খোঁজ তল্লাশ করে পিছু ধরলাম। ছুটে গেলাম ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপে। আর সেখানেই তোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, মনে আছে? মস্ত একটা ঘাই মেরেছিলাম সে সময়। মোটের ওপর নেল্লীকে পেয়ে খুব সাহায্য হয়েছে আমার...'

বাধা দিয়ে বললাম, 'কিন্তু তুই ভাবছিস যে নেল্লী এসব জানে...'

'কী জানে?'

'যে সে প্রিন্সের মেয়ে?'

কেমন একটা রাগত ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ও বললে, 'সে তো তুই নিজেই জানিস যে ও প্রিন্সের মেয়ে। এসব বাজে কথা বলে

---

* ক্রিস্টফ্ মার্টিন ভাইল্যান্ড — অষ্টাদশ শতকের জার্মান রোমাণ্টিক কবিতার সূত্রপাত করেন। — সম্পাঃ

লাভ কী? একেবারে গবেট তুই! আসল কথাটা হল, ও প্রিন্সের মেয়ে শুধু নয়, প্রিন্সের বৈধ কন্যা, সে কথাটাও ও জানে, বুঝেছিস?'

চেঁচিয়ে উঠলাম, 'হতে পারে না!'

'আমিও প্রথমে ভেবেছিলাম "হতে পারে না"। এখনো মাঝে মাঝে তাই ভাবি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই "না হতে পারাটাই" খুব সম্ভব হয়েছে।'

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'না মাসলবোয়েভ, তা নয়। বড়ো বেশি রকম মেতে গেছিস তুই! নেল্লী এসব কিছু জানে না তাই নয়, বড়ো কথা, ও হল অবৈধ কন্যা। ওর মায়ের কাছে যদি আদৌ কোনো দলিল থাকত, তাহলে এখানে পিটার্সবুর্গে ওর যা কষ্ট গেছে সে দুর্ভাগ্য কি কখনো মেনে নিত? তার চেয়েও বড়ো কথা, নিজের মেয়েটিকে কি কখনো এমন একান্ত অনাথ অবস্থায় ফেলে যেতে পারত? বাজে কথা, এ হতে পারে না।'

'আমি নিজেও তাই ভেবেছিলাম, মানে এখনো পর্যন্ত আমার কাছে তা প্রহেলিকা। কিন্তু ফের, স্মিথকন্যাটির মতো ক্ষিপ্ত পাগলাটে মেয়ে দুনিয়ায় নেই। ও এক অসাধারণ মেয়ে। সব ঘটনাগুলো একবার ভেবে দ্যাখ: ওর সেই রোমাণ্টিকতা, গগনস্পর্শী বোকামিগুলো একেবারে পাগলামির সীমায়। একটা কথাই ধরা যাক: শুরু থেকেই ও পৃথিবীতে স্বর্গীয় কিছু একটা কল্পনা করেছিল, কল্পনা করেছিল দেবদূতের; ভালোবাসা ছিল ওর অসীম, বিশ্বাস অতল, এবং আমার দৃঢ় ধারণা যে পরে ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল — সেটা ওকে আর প্রিন্সের ভালো লাগছিল না, তাকে ছেড়ে গেল বলে নয়, পাগল হয়েছিল প্রিন্স সম্পর্কে ওর ধারণা ভুল প্রমাণিত হল বলে, প্রিন্স তাকে প্রতারিত করে ছেড়ে যেতে পারে বলে, ওরই দেবতা কাদার মধ্যে নেমে এসে ওকে লাঞ্ছিত অপমানিত করে গেল বলে। এই পরিণতি ওর রোমাণ্টিক যুক্তিহীন মন কখনো সইতে পারে না। সবচেয়ে বড়ো কথা আঘাতই; বুঝতে পারছিস সে কী আঘাত! আতঙ্কে এবং তার চেয়েও বেশি অহঙ্কারে ও সরে এসেছিল এক অসীম ঘৃণায়। সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে, সমস্ত দলিলপত্র টুকরো টুকরো করে, টাকায় থুতু দিয়ে — টাকাটা যে ওর নয়, ওর বাপের, সেকথা ভুলে গিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করলে এক মুঠো ধুলোর মতো, আবর্জনার মতো, করলে তার আত্মিক মহিমা দিয়ে তার প্রতারক পুরুষটিকে দলিত করার জন্যে, তস্কর বলে ওকে ধিক্কার দিয়ে সারা জীবন ঘেন্না করার অধিকার রাখার জন্যে, এবং খুবই সম্ভব যে এ কথাও সে বলেছে যে, ওর স্ত্রী বলে নিজের পরিচয় দেওয়া অপমানকর বলে সে মনে করে। রাশিয়ায় আমাদের

বিবাহবিচ্ছেদের কোনো আইন না থাকলেও কার্যত ওদের বিচ্ছেদই হয়ে যায় এবং এর পরে কী করে আর সে তার কাছ থেকে সাহায্য চাইতে পারে। মনে আছে; মৃত্যুশয্যায় শুয়ে নেল্লীকে কী বলেছিল পাগলের মতো: ওদের কাছে যাস নে, খেটে খাবি, মরে যাবি তবু যেই ডাকুক না কেন কখনো ওদের কাছে যাবি না। (তার মানে, ও তখনো কল্পনা করছিল যে তার ডাক পড়বে, সুতরাং আর একটা সুযোগ ও পাবে প্রতিশোধের, আহ্বায়ককে দলিত করবে ঘেন্না দিয়ে। মোটের ওপর মেয়েটা দিন কাটাচ্ছিল রুটি খাওয়ার বদলে আক্রোশের কল্পনায়।) নেল্লীর কাছ থেকেও আমি অনেক কথা বার করেছি রে, এখনো মাঝে মাঝে করি। অবিশ্যি ওর মায়ের অসুখ ছিল, ক্ষয় রোগ, — এ রোগটায় বিশেষ করে আক্রোশ আর নানা ধরনের তিক্ততা বেড়ে ওঠে। তাহলেও বুবনভার এক পাতানো দিদির কাছ থেকে আমি এ একেবারে নিশ্চয় করে জানি যে, মেয়েটা প্রিন্সের কাছে চিঠি লিখেছিল, হ্যাঁ, প্রিন্সের কাছেই, স্বয়ং প্রিন্সের কাছে...'

'লিখেছিল? চিঠিটা পেয়েছিল প্রিন্স?' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

'হ্যাঁ লিখেছিল, কিন্তু প্রিন্স পেয়েছিল কি না আমি জানি না। একবার মেয়েটা এই পাতানো দিদির কাছে যায় (বুবনভার বাড়িতে সেই রংকরা মাগীটার কথা মনে আছে? সে এখন জেলে)। যাই হোক, চিঠিটা লিখে ওই মেয়েটাকে সে দেয় দিয়ে আসার জন্যে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাঠায় না, ফিরিয়ে নেয়। এ হল ওর মৃত্যুর তিন সপ্তাহ আগের কথা... ঘটনাটার গুরুত্ব আছে। একবার যখন ও চিঠিটা পাঠাবার উপক্রম করেছিল, তখন সেবার ফিরিয়ে নিলেও অন্য কোনো বার পাঠাতেও পারে। সুতরাং আমি বলতে পারি না, ও চিঠি পাঠিয়েছিল কি না। তবে পাঠায় নি সেকথা ভাবার একটা কারণ আছে। কেননা সে যে পিটার্সবুর্গে আছে এবং ঠিক কোথায় আছে তা প্রিন্স নিশ্চিত করে জেনেছিল কেবল তার মৃত্যুর পরে। কীরকম হাঁপ ছেড়ে যে প্রিন্স বেঁচেছিল তা বেশ বোঝা যায়।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে আলিওশা একবার বলেছিল কী একটা চিঠি পেয়ে ওর বাপ ভারি খুশি হয়ে উঠেছিল — তবে সেটা বেশি দিন আগের কথা নয়, মাস দুয়েক হবে। তারপর, তারপর। প্রিন্সের সঙ্গে তোর কী হল?'

'হবে-টা কী? ব্যাপারটা বোঝ, আমার যা আছে সেটা পুরোপুরি নৈতিক প্রত্যয় মাত্র, কিন্তু খাস প্রমাণ একটিও নেই, শত চেষ্টাতেও একটিও পাই নি। অবস্থাটা সঙ্গীন! বিদেশে খোঁজ খবর নেওয়া দরকার ছিল। কিন্তু কোথায়

নেব, জানি না। আমি অবিশ্যি বুঝেছিলাম যে লড়তে হবে, প্রিন্সকে আমি ভয় দেখাতে পারি শুধু আভাসে ইঙ্গিতে, আসলে যা জানি তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু আমি জেনে ফেলেছি এই ভান করে...'

'তারপর?'

'ঠকিয়ে জব্দ করা গেল না, কিন্তু ভয় ও পেয়েছিল। এমন ভয় পেয়েছিল যে এখনো পর্যন্ত আতঙ্ক যায় নি। কয়েকবার সাক্ষাৎ হয় আমাদের। নিজেকে কী হতভাগ্য বলেই না দেখালে! একবার বন্ধুর মতো নিজেই ও পুরো গল্পটা বলতে শুরু করেছিল, মানে তখন ওর ধারণা, আমি সবই জানি। ভালোই বললে, বেশ খোলাখুলি, আবেগ দিয়ে — অবিশ্যি যা বললে সে সবই নির্লজ্জ মিথ্যা। তখন আমি টের পেলাম আমায় ও কতখানি ভয় পাচ্ছে। কিছু দিন আমি এক বেদম হাবা-গবার ভান করে গেলাম এবং ওকে বুঝিয়েও দিলাম যে আমি চালাকি করছি। ওকে ভয় দেখালাম একটু আনাড়িপনা করে, অর্থাৎ ইচ্ছে করেই আনাড়িপনা করে। ইচ্ছে করেই একটু কড়া ব্যবহার করলাম, ভয় দেখাতে লাগলাম, করলাম যাতে ও আমায় বোকা ভাবে, এবং সেই ভেবে যদি-বা কিছু ফাঁস করে। পাজিটা আমার চালাকি ধরে ফেললে! আর একবার মাতালের ভান করেছিলাম। তাতেও কাজ হল না — ভয়ানক সেয়ানা! ব্যাপারটা বুঝছিস তো ভানিয়া? ও আমায় কতখানি ভয় করে তা জানতে হবে, দ্বিতীয়ত, ওর মনে এই ধারণাটা করাতে হবে যে আমি আসলে যতটা জানি, তার চেয়েও যেন জানি বেশি...'

'তা শেষে কী দাঁড়াল?'

'কিছু হল না। দরকার ছিল প্রমাণ, তথ্য — সে সবকিছুই আমার ছিল না। ও শুধু একটা জিনিস বুঝেছিল, আমি অন্তত ওর দুর্নাম রটাতে পারি। বলাই বাহুল্য দুর্নামটাতেই ওর ভয়; আরো বেশি এইজন্যে যে এখানে ও সম্পর্কে পাতাতে শুরু করেছে। জানিস তো ও বিয়ে করতে যাচ্ছে?'

'জানি না তো...'

'সামনের বছরে! ভাবী কন্যাটিকে ও পছন্দ করে রেখেছে এক বছর আগে থেকে। তখন ওর বয়স ছিল মোটে চোদ্দ। অধুনা ও পনের, এখনো খুকির পোশাক বেচারী ছাড়ে নি। ওর মা-বাপ খুব খুশি। ওর বৌয়ের মারা যাওয়াটা ওর পক্ষে কত দরকার ছিল বুঝতে পারছিস তো? এটা এক জেনারেলের মেয়ে, টাকা আছে মেয়েটার — অঢেল টাকা! ওরকম বিয়ে তোর আমার কপালে নেই রে ভানিয়া... শুধু একটা জিনিসের জন্যে আমি সারা

জীবন নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে পারব না,' মাসলবোয়েভ চেঁচিয়ে উঠল টেবিলের ওপর ঘুষি মেরে, 'দু'সপ্তাহ আগে পাজিটা আমার মুখে থুতু দিয়েছে!'

'সেকী?'

'হ্যাঁ, তাই। বুঝেছিলাম যে আসল প্রমাণ আমার কিছু নেই তা ও টের পেয়েছে। শেষে টের পাচ্ছিলাম যে ব্যাপারটা যতই বেশি দিন ধরে আমি টানাটানি করব, ততই তাড়াতাড়ি ও বুঝবে আমার করবার বিশেষ কিছু নেই। সুতরাং, ওর কাছ থেকে দু'হাজার নিতে রাজী হয়ে গেলাম আমি।'

'দু'হাজার নিয়েছিস তুই!..'

'চাঁদির রুবলে দু'হাজার। অনিচ্ছায় নিয়েছি। এরকম কাজের দাম কি আর এই দুই হাজার! মাথা হেঁট করে নিয়েছি। মনে হচ্ছিল যেন ও একেবারে আমার মুখে থুতু দিলে। বললে, "আপনি আগে যে কাজ করেছেন, তার জন্যে কোনো টাকা আপনাকে এখনো দিই নি মাসলবোয়েভ" (কিন্তু চুক্তিমতো দেড়শ রুবল সে অনেক আগেই শোধ দিয়েছিল), "যাক, এখন আমি চলে যাচ্ছি, এই নিন দু'হাজার, আশা করি, আমাদের মধ্যে সবকিছু একেবারে চুকে গেল।" আমিও বললাম, "একেবারে চুকে গেল, প্রিন্স।" লোকটার জঘন্য মুখখানার দিকেও তাকাবার সাহস হল না আমার। মনে হল যেন তাতে পরিষ্কার লেখা আছে: "কী, অনেক পেলে? শুধু ভালোমানুষি করেই তা দিচ্ছি নিতান্ত এক আহাম্মককে!" মনে নেই কেমন করে চলে এসেছিলাম ওর কাছ থেকে!'

'কিন্তু ভারি জঘন্য কাজ করেছিস মাসলবোয়েভ!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'নেল্লীর কী করলি ভেবে দ্যাখ তো।'

'শুধু জঘন্য নয়... পাষণ্ডের কাজ, ঘেন্নার কাজ... কাজটা হল... কাজটা হল গে... যে কী তা বলবার ভাষাই নেই!'

'মা গো! অন্তত নেল্লীর একটা ব্যবস্থা করা তার উচিত ছিল!'

'উচিত তো ছিল, কিন্তু সেটা করানো যায় কেমন করে? ভয় দেখিয়ে? ভয় সে পাবে না। টাকাটা যে নিলাম। মানে নিজেই যে স্বীকার করে এলাম যে আমার কাছে ওর যা ভয় তার দাম চাঁদিতে মাত্র দু'হাজার। দামটা আমিই স্থির করে এসেছি! এখন আর তার কিসের ভয়?'

হতাশ হয়ে বলে উঠলাম, 'সত্যিই, সত্যিই কি নেল্লীর তাহলে সব আশা গেল বলছিস?'

'মোটেই না!' উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে উঠল মাসলবোয়েভ, প্রায় ধড়ফড় করে উঠল, 'সেটি ওকে করতে দিচ্ছি না! ফের নতুন করে শুরু করব ভানিয়া। মন আমি ঠিক করে ফেলেছি। দু'হাজার নিয়েছি তো কী হয়েছে? থুতু ফেলি ওর টাকায়! মনে করব টাকাটা নিয়েছি আমার অপমানের শোধ হিসেবে, নিষ্কর্মাটা আমায় বোকা বানিয়েছে, মানে আমায় নিয়ে হাসাহাসি করেছে বলে। আমায় ঠকিয়েছে এবং তার ওপর তাচ্ছিল্য করে হেসেছে! উঁহুঃ, আমায় নিয়ে হাসবে সে আমি হতে দেব না... এবার ভানিয়া, আমি শুরু করব নেল্লীর কাছ থেকে। কতকগুলো জিনিস লক্ষ্য করে দেখে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে সমস্ত ব্যাপারটার চাবিকাঠিটি আছে ওর কাছে। ও সব জানে, সমস্ত কিছু... ওর মা-ই ওকে সব বলেছে। জ্বরের ঘোরে, মন পোড়ানিতে, ওকে সব বলাই ওর পক্ষে সম্ভব। কারো কাছে নালিশ জানাবে এমন কেউ তো আর ছিল না। হাতের কাছে ছিল নেল্লী, তাই নেল্লীকেই বলেছে। হয়ত কোনো দলিলও পেয়ে যেতে পারি!' উল্লাসে হাত ঘষে ও যোগ করলে, 'তাহলে কেন যে এখানে আমি ঘুরঘুর করি তা এখন বুঝেছিস তো ভানিয়া? প্রথমত, তোর বন্ধুত্বের খাতিরে, সে তো বটেই, কিন্তু প্রধানত নেল্লীর ওপর নজর রাখছি, আর তৃতীয় কথা ভানিয়া, তোর ইচ্ছে থাক না থাক, আমায় তোকে সাহায্য করতেই হবে, কেননা নেল্লীর ওপর তোর প্রভাব আছে!..'

বলে উঠলাম, 'নিশ্চয় সাহায্য করব, কথা দিচ্ছি! আর আশা করি মাসলবোয়েভ, তোর প্রধান চেষ্টাটা হবে নেল্লীর জন্যে, শুধু কেবল তোরই নিজের লাভের জন্যে নয়, হতভাগিনী আহত এক অনাথিনীর জন্যেই...'

'কিন্তু ও রে স্বর্গবাসী, কার স্বার্থে করি তাতে তোর কী? প্রধান কথা কাজটা করা! প্রধানত অনাথ মেয়েটার জন্যে তো বটেই, সে তো মানবিকতার দাবি। কিন্তু নিজের খানিকটাও যদি গুছিয়ে নিই তাহলে একটা চূড়ান্ত ধিক্কার দিয়ে বসিস না ভানিয়া। আমি গরিব লোক, আর গরিবকে অপমান করার আস্পর্ধা যেন ও না করে। ও আমার ভাগটা মেরেছে, তার ওপর পাজিটা আমায় বোকা বানিয়েছে। এমন জোচ্চোরকে আমি অমনি ছেড়ে দেব ভেবেছিস? মাইরি আর কি!'

কিন্তু পরের দিন আমাদের কুসুমোৎসব আর হল না। নেল্লীর অবস্থা আরো খারাপের দিকে গেল, বেরুতে পারল না ঘর ছেড়ে।

আর ঘর থেকে সে বেরয় নি আর কখনো।

মারা গেল দু'সপ্তাহ পরে। শেষ যন্ত্রণার এই একপক্ষ কাল সে কখনো পুরোপুরি সজ্ঞানে থাকে নি, মুক্তি পায় নি তার বিদ্ঘুটে উৎকল্পনাগুলো থেকে। মাথাটা ওর কেমন ঘোলাটে হয়ে উঠেছিল। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ওর স্থির বিশ্বাস ছিল যে দাদু ওকে ডাকছেন, ও আসছে না বলে দাদু রাগ করছেন, ওর দিকে ছড়ি ঠুকছেন, ভালোমানুষদের কাছে গিয়ে ভিক্ষে করে আনতে বলছেন রুটি আর নস্যি কিনে। প্রায়ই ঘুমের মধ্যে ও কাঁদত, জেগে উঠে বলত, মাকে দেখেছে।

নিতান্ত মাঝে মধ্যে ওর যেন পুরো জ্ঞান ফিরত। একবার আমরা দুজনে একা ছিলাম। ও আমার দিকে ফিরে তার ছোট্ট রোগা জ্বরতপ্ত হাতে আমার হাত চেপে ধরলে।

বললে, 'ভানিয়া, আমি মারা গেলে নাতাশাকে বিয়ে ক'রো।'

মনে হয়, এই কথাটা বরাবর ওর মনে মনে ছিল অনেকদিন ধরে। কথা না বলে আমি শুধু হাসলাম। আমার হাসি দেখে ও-ও হাসল, তারপর দুষ্টুমির চোখে আমার দিকে তার রোগা তর্জনী পাকিয়ে তৎক্ষণাৎ চুমু খেতে লাগল আমায়।

মৃত্যুর তিন দিন আগে, চমৎকার এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় ও বললে পর্দা তুলে শোবার ঘরের জানলাটা খুলে দিতে। জানলাটা থেকে বাগান দেখা যায়। বহুক্ষণ ও তাকিয়ে রইল ঘন সবুজ গাছপালা আর অস্তগামী সূর্যের দিকে, তারপর হঠাৎ আমি ছাড়া সকলকে চলে যেতে বললে।

বললে, 'ভানিয়া,' গলার স্বর ওর প্রায় শোনাই যায় না, অসুখে ভারি দুর্বল হয়ে পড়েছিল ও, 'শিগ্‌গির আমি মারা যাব, খুবই শিগ্‌গির। আমার ইচ্ছে, তুমি আমায় যেন মনে রেখো। স্মৃতি হিসেবে এইটে আমি তোমায় দিয়ে যাচ্ছি।' (ওর বুকের ওপর ক্রুশের সঙ্গে ঝোলানো একটা মস্ত কবচ ও আমায় দেখালে।) 'মারা যাবার সময় মা এটা আমায় দিয়ে গেছে। আমি মারা গেলে তুমি এটা খুলে নিয়ে তাতে কী লেখা আছে পড়ে দেখো। আজ সকলকে আমি বলে যাব, কবচটা যেন কেবল তোমাকে দেয়। কী লেখা আছে পড়ে তারপর ওর কাছে গিয়ে ব'লো যে আমি মারা গেছি, কিন্তু ওকে আমি ক্ষমা করি নি। ওকে একথাও ব'লো যে আমি আজকাল বাইবেল পড়ছিলাম। তাতে বলা আছে নিজের সমস্ত শত্রুদের ক্ষমা ক'রো। আমি সে কথা পড়েছি, ওকে আমি ক্ষমা করি নি। কেননা মরার সময়, মা যতক্ষণ কথা বলতে পেরেছে, শেষ কথা বলে গেছে, "ওকে আমি অভিশাপ দিই।" তাই আমিও অভিশাপ

দিচ্ছি ওকে, আমার জন্যে নয়, মায়ের জন্যে... ওকে ব'লো, মা কী করে মারা গেছে, কীভাবে আমি একলা ছিলাম বুবনভার বাসায়। ব'লো, কীভাবে আমায় তুমি সেখানে দেখেছিলে, সব, সবকিছু তুমি ওকে জানিও আর ব'লো যে, আমি ওর কাছে না গিয়ে বরং বুবনভার কাছেই থাকতে চেয়েছি...'

কথা বলতে বলতে নেল্লী ফ্যাকাশে হয়ে গেল, চোখ জ্বলে উঠল ওর, এত জোরে বুক ধড়ফড় করতে লাগল যে ও বালিশে নেতিয়ে পড়ল, মিনিট দুয়েক কোনো কথা কইতে পারলে না।

অবশেষে ক্ষীণকণ্ঠে বললে, 'ওদের ডাকো ভানিয়া, আমি সকলের কাছে বিদায় জানাতে চাই। বিদায় ভানিয়া!..'

শেষ বারের মতো ও আমায় সজোরে জড়িয়ে ধরলে। এল সবাই। বৃদ্ধ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না যে নেল্লী মারা যাচ্ছে; কিছুতেই তিনি মানতে পারছিলেন না কথাটা। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উনি আমাদের সকলের সঙ্গে তর্ক করেছেন, বলেছেন ও নিশ্চয় ভালো হয়ে উঠবে। উদ্বেগে তিনি বেশ রোগা হয়ে গিয়েছিলেন। দিনের পর দিন, এমনকি রাতের পর রাত উনি কাটিয়েছেন নেল্লীর বিছানার পাশে বসে... গত কয়েক রাত উনি আদৌ ঘুমোন নি। নেল্লীর তুচ্ছতম খেয়াল, তুচ্ছতম ইচ্ছেটা পর্যন্ত উনি আগে থেকেই পূরণ করার চেষ্টা করতেন। নেল্লীর ঘর ছেড়ে আমাদের কাছে এসে বুকভাঙা কাঁদতেন, কিন্তু মিনিটখানেক পরেই আবার আশা হত তাঁর, আমাদের বোঝাতেন যে ও শিগ্‌গিরই ভালো হয়ে উঠবে। নেল্লীর ঘরটা উনি ভরে তুলেছিলেন ফুলে। একবার কিনে আনলেন চমৎকার লাল আর শাদা গোলাপের একটা মস্ত তোড়া। অনেক দূরে কোথাও গিয়ে তা নিয়ে এসেছিলেন তার ছোট্ট নেল্লীর জন্যে... এসবে ভারি বিচলিত হত নেল্লী। চারপাশ থেকে যে এত ভালোবাসা ওকে ঘিরেছিল তাতে সাড়া না দিয়ে ও পারত না। সেই সন্ধ্যেয়, আমাদের কাছে বিদায় নেবার সেই সন্ধ্যেয়, চিরকালের জন্যে ওকে বিদায় জানাতে কিছুতেই রাজী হলেন না বৃদ্ধ। নেল্লীর মুখে হাসি ফুটল, সারা সন্ধ্যেটা বেশ হাসিখুশি দেখাবার চেষ্টা করলে সে। বৃদ্ধের সঙ্গে রসিকতাও করলে, এমনকি হাসলে... প্রায় একটা আশা নিয়ে আমরা ওর ঘর ছেড়ে গেলাম। কিন্তু পরের দিনই ও আর কথা বলতে পারলে না। মারা গেল দুদিন পরে।

মনে আছে, বৃদ্ধ তার ছোট্ট কফিনটাকে ফুল দিয়ে সাজিয়েছিলেন, হতাশ হয়ে চেয়েছিলেন ওর মৃত ক্ষীণ মুখখানার দিকে, মরণেও সে মুখে হাসি,

হাতদুটো আড়াআড়ি করে দেওয়া আছে বুকের ওপর। নেল্লীর জন্যে বৃদ্ধ কেঁদে ভাসালেন যেন তাঁর নিজের মেয়েই মারা গেছে। নাতাশা এবং আমরা সবাই তাঁকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু প্রবোধ তিনি মানলেন না, নেল্লীর সৎকারের পর গুরুতর অসুখে পড়েছিলেন তিনি।

আন্না আন্দ্রেয়েভনা স্বয়ং নেল্লীর গলা থেকে সেই কবচটা খুলে দিলেন আমায়। তার মধ্যে ছিল প্রিন্সের কাছে লেখা নেল্লীর মায়ের চিঠিটা। চিঠিটা আমি পড়েছিলাম নেল্লীর মৃত্যুর দিন। তাতে প্রিন্সকে তিনি অভিশাপ দিয়েছেন, বলেছেন তাঁকে তিনি ক্ষমা করতে অক্ষম। জীবনের শেষ দিনগুলোর কথা তিনি জানিয়েছেন, কী বীভৎস অবস্থার মধ্যে নেল্লীকে তিনি রেখে যাচ্ছেন, অনুরোধ করেছেন মেয়েটার জন্যে প্রিন্স যেন কিছু করেন। লিখেছেন, 'মেয়েটা আপনার, আপনারই মেয়ে সে এবং আপনিও জানেন সে আপনার বৈধ কন্যা। ওকে আমি বলেছি, আমি মারা গেলে ও আপনার কাছে গিয়ে এই চিঠিটা দেবে। আপনি যদি নেল্লীকে না ফিরিয়ে দেন, তাহলে হয়ত আপনাকে আমি ক্ষমা করব সেখানে, পরলোকে, শেষ বিচারের দিন, আমি নিজে ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে বিচারককে মিনতি করব আপনার পাপ ক্ষমা করতে। নেল্লী জানে চিঠিতে কী লেখা আছে। চিঠিটা আমি তাকে পড়ে শুনিয়েছি, সবকথা ওকে বলেছি, সবকিছু ও জানে, সবকিছু...'

কিন্তু নেল্লী তার মায়ের কথা শোনে নি। সব সে জানত, কিন্তু যায় নি প্রিন্সের কাছে, মরেছে মিটমাট না করে।

নেল্লীর সৎকার থেকে ফিরে নাতাশা আর আমি গেলাম বাগানে। দিনটা বেশ গরম, ঝকঝকে। এক সপ্তাহ পরে ওরা চলে যায়। একটা দীর্ঘ বিচিত্র দৃষ্টিতে নাতাশা চাইলে আমার দিকে।

বললে, 'ভানিয়া, একটা যেন স্বপ্ন গেল ভানিয়া!'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোনটা স্বপ্ন?'

'সব, সবকিছু,' নাতাশা বললে, 'গত বছরটার সবকিছুই। তোমার সুখ আমি কেন নষ্ট করেছিলাম ভানিয়া?'

ওর দুচোখে লেখা:

'চিরকাল সুখী হতে পারতাম আমরা দুজনে।'

পরিশেষের কথা

'বঞ্চিত লাঞ্ছিত' উপন্যাসটি দস্তয়েভস্কি লিখতে শুরু করেন ১৮৬০ সালের বসন্তে... 'আছি সমূহ উত্তেজিত অবস্থায়। সবকিছুর কারণ আমার উপন্যাস। লিখতে চাই তা ভালো করে, অনুভব করছি তাতে কাব্য আছে, জানি এর সাফল্যের ওপর নির্ভর করছে আমার সাহিত্যিক ভবিষ্যৎ। মাস তিনেক এবার দিন-রাত এটা নিয়ে বসতে হবে...'

পত্রিকায় প্রকাশিত 'উপসংহার'এর শেষে যে তারিখ ছিল তদনুসারে উপন্যাস শেষ হয় ১৮৬১ সালের ৯ জুলাই। তিন মাসের বদলে 'বঞ্চিত লাঞ্ছিত' লিখতে লাগে এক বছরেরও বেশি।

এটি লেখা হয় রুশ সমাজজীবন ও সাহিত্যের, প্রথমত উপন্যাস সাহিত্যের জোয়ারের যুগে। তুর্গেনেভ, গঞ্চারোভ, পিসেমস্কির উপন্যাস তখন সোরগোল তুলছিল, সেইসঙ্গে তা নিয়ে লেখা প্রবন্ধও, বিশেষ করে দব্রলিউবভ আর চের্নিশেভ্স্কির প্রবন্ধ।

উপন্যাস লেখার সময় দস্তয়েভস্কির ছিল তাঁর কয়েদখাটুনির দিনগুলোর সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা, কিন্তু সেটা তিনি জমিয়ে রাখেন তাঁর ভবিষ্যৎ 'মরণ ঘরের কড়চা'র জন্যে। তাই 'বঞ্চিত লাঞ্ছিত'তে সে অভিজ্ঞতার সামান্যই ছায়া পড়েছে সেইসব অধ্যায়ে যেখানে বর্ণিত হয়েছে পিটার্সবুর্গের তলদেশ, বাড়িউলী আড়কাঠি বুবনভার কীর্তিকলাপ। এই আত্মসংযম সত্ত্বেও এ উপন্যাসে লেখকের নিজ জীবনের এত ঘটনা ছড়িয়ে আছে যা আগে কখনো তিনি পাঠকদের চোখে পড়তে দেন নি। 'বঞ্চিত লাঞ্ছিত' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'অসফল সাহিত্যিক' ইভান পেত্রোভিচের (ভানিয়া) মধ্যে যেন মিশে আছে স্বয়ং দস্তয়েভস্কির জীবনের দুটি অধ্যায়: ইভান পেত্রোভিচের সাহিত্যকর্মের ঘটনাদি, লেখকবৃত্তির কৃচ্ছ্র-কষ্ট এসেছে তরুণ দস্তয়েভস্কির প্রথম

সাহিত্যসাধনার স্মৃতি থেকে, আর নাতাশার সঙ্গে ইভান পেত্রোভিচের সম্পর্কে, তার আত্মনিবেদিত অনুরাগে প্রতিবিম্বিত হয়েছে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে ভবিষ্যৎ ভার্যা মারিয়া দ্‌মিত্রিয়েভনা আর দস্তয়েভস্কির যোগাযোগ।

এ উপন্যাসে দস্তয়েভস্কি সোজাসুজি, প্রায় না ঢেকে-রেখে বলেছেন তাঁর তরুণ সাহিত্যজীবনের কথা: 'অভাজন' উপন্যাস লেখা, পাঠক মহলে তার সমাদর, বেলিন্‌স্কির প্রবন্ধ ('ব'এর সমালোচনা), তাঁর সাহিত্যিক প্রতিপক্ষ, প্রকাশক আ. আ. ক্রায়েভস্কির শোষণ, বহু খণ্ডের বই (বিশ্বকোষিক অভিধান)-এর জন্য প্রবন্ধ ইত্যাদি। এইসব প্রত্যক্ষ উক্তি এবং সাহিত্যিক মহলে তরুণ দস্তয়েভস্কির জীবনের যেসব ঘটনা সুবিদিত তা থেকে উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাবলির সময় ধরা যায় উনিশ শতাব্দীর চল্লিশ দশকের শেষার্ধ, ১৮৪৫ থেকে ১৮৪৯ সাল।

উপন্যাস লেখা উত্তম পুরুষে। কথনের এই ভঙ্গীটি দস্তয়েভস্কি গ্রহণ করেন ১৮৪০-এর দশকেই। 'শ্বেত নিশা' আর 'নেতচ্‌কা নেজভানোভা' উত্তম পুরুষে বর্ণিত, 'অভাজন' গ্রন্থে দেখা যাবে উত্তম পুরুষ রয়েছে ঈষৎ প্রচ্ছন্ন রূপে। তবে 'অসফল সাহিত্যিকের নোট' লেখা হয়েছে দস্তয়েভস্কি অবলম্বিত পূর্বেকার ধরন থেকে পৃথক এবং জটিলতর প্রকরণে। ইভান পেত্রোভিচ তার 'নোটে' যেন 'দ্বৈত' রূপ নিয়েছে: একই সঙ্গে সে ঘটনাবলিতে অংশ নিচ্ছে আবার অতীতের কথাও স্মরণ করছে। যেসব ঘটনা ইভান পেত্রোভিচ স্মরণ করছে এবং সদ্যসংঘটিত বলে যা পাঠকদের দেখাচ্ছে, তাকে থামিয়ে দিয়ে আসছে ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রসূত ব্যাখ্যা আর মন্তব্য। ঘটনার এইরূপ আনুপূর্বিকতা লঙ্ঘনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়ে তোলা হয়েছে তার বিনোদন গুণ, ঘটনার সংখ্যা আর তার তাৎপর্য। দস্তয়েভস্কির পূর্বে এই ধরনের রীতি ল. ন. তলস্তোয় অবলম্বন করেছিলেন তাঁর 'শৈশব' (১৮৫২) আর 'যৌবন' (১৮৫৪) গ্রন্থে। ইর্তেনিয়েভও এখানে স্মরণ করছে তার সুদূর বাল্যকাল যা আর ফেরার নয় এবং নিজে বিচলিত বোধ করছে। বর্ণিত ঘটনা আর স্মৃতিচারণের কষ্টের মধ্যে যে কাল ব্যবধান তলস্তোয়ের ক্ষেত্রে সেটা শিশু ও বয়স্ক নিয়ে। আর দস্তয়েভস্কির ক্ষেত্রে ব্যবধানটা মাত্র এক বছর। তবে ব্যবধানের এই হ্রস্বতার পরিপূরণ করেছে ক্রিয়ার তীব্রতা, ঘটনার কেন্দ্রীভূতি, স্থানে ও কালে তাদের নিবিড়তা। সক্রিয় চরিত্র আর একজন আখ্যায়ক রূপে ইভান পেত্রোভিচের দ্বিত্ব সম্ভব হয়েছে এইজন্য যে নায়ক নিজেই একজন পেশাদার সাহিত্যিক।

বাস্তব জীবনের ঘটনাবলিতে নিজে আলোড়িত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইভান পেত্রোভিচ অচেতনভাবে তাদের দেখছে সাহিত্যের উপকরণ হিশেবেও। মাঝে মাঝে আবার উল্টো — বাস্তব লোকজন তার কাছে যেন সাহিত্যের পাত্রপাত্রী, উঠে এসেছে তার প্রিয় লেখকের বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে। রুশ সাহিত্যের ক্ষেত্রে উত্তম পুরুষে কথনের একটা নতুন ধরন প্রবর্তন দস্তয়েভস্কির পক্ষে সহজ হয়েছে ইভান পেত্রোভিচের 'সাহিত্যিকতায়', সম্ভব হয়েছে উপন্যাসের দুটি মূল ধারা নেল্লী আর নাতাশাকে মেলানো।

ইভান পেত্রোভিচের মানবিক ও সাহিত্যিক আগ্রহ পরস্পর বিজড়িত হয়ে যায়, অপরের জীবনে ও ভাগ্যে তার হস্তক্ষেপ যেন সেই সক্রিয় লোকহিতৈষণা ও সামাজিক মানবতারই প্রলম্বন যাতে ইভান পেত্রোভিচের প্রথম উপন্যাস এবং তার বাস্তব প্রতিরূপ দস্তয়েভস্কির 'অভাজন' অনুপ্রাণিত। উপন্যাসের দুটি ধারাতেই ইভান পেত্রোভিচের সমস্ত আচরণ প্রণোদিত হয়েছে একটা সঙ্গতিশীল নিখাদ পরার্থপরতায়, সমস্ত আহত ও অভাগ্যের প্রতি ভ্রাতৃকল্প ভালোবাসায়, কু নয় সু, জুলুম আর স্বার্থপরতা নয়, ভালোবাসার পক্ষ নেবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতায়। 'ভ্রেমিয়া' পত্রিকায় দস্তয়েভস্কি নিজের মানবতাবাদী যে কর্মসূচি পেশ করেন, তাকেই তিনি রূপ দিয়েছেন ইভান পেত্রোভিচের চরিত্রে।

আখ্যানের দুই ধারার মধ্যে অন্বয় ঘটেছে তাদের আনুরূপ্যের জন্যেও। রাজাবাহাদুর ভালকোভস্কি প্রতারণা করে ও স্মিথকন্যা নেল্লীর মাতাকে ছেড়ে যায়। তার পুত্রবর আলিওশার আচরণও একই প্রকার, কাতিয়ার জন্যে সে ত্যাগ করে নাতাশাকে। বৃদ্ধ স্মিথ অভিশাপ দেয় কন্যাকে, ক্ষমা করতে চায় না তাকে; পিতৃগৃহ ত্যাগ করে আলিওশার কাছে চলে যাওয়ায় ইখমেনেভও অভিশাপ দেয় তার মেয়ে নাতাশাকে, তাকে মার্জনা করতে রাজী হয় কেবল নেল্লীর কাছে তার মা হতভাগিনী স্মিথকন্যার বিবরণ শুনে। প্রটেস্ট্যাণ্ট ধারার নিষ্করুণ অপ্রশম্য ঈশ্বর আর বাইবেলের দণ্ডদাতা বিধাতার বিপরীতে দস্তয়েভস্কি পেশ করেছেন তাঁর খৃষ্টধর্মের নৈতিক ভাষ্য — ন্যায়াচরণের দৃঢ়তা, অশুভের প্রতি আপোসহীনতা, সেইসঙ্গে সৌভ্রাত্র, প্রেম, তিতিক্ষা।

নৈতিক-সামাজিক যে মূল প্রশ্নের সমাধানে ইভান পেত্রোভিচ আলোড়িত সেটা স্বার্থপরতার সমস্যা। পশ্চিমের সামাজিক ও দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে সমস্যাটার একটা নীতিগত নতুন দিক উদ্ঘাটিত হয় ১৮৪০-এর দশকে ফয়েরবাখের দর্শনে, রুশ সাহিত্য ও প্রচার-প্রবন্ধে সেই দশকেই তা লক্ষণীয়

গের্ৎসেন আর বেলিনস্কি, এবং ১৮৫০-এর দশকের শেষার্ধে চের্নিশেভ্স্কি আর দব্রলিউবভের রচনায়।

১৮৪০-এর দশকের শেষেই স্বার্থপরতার সমস্যা নিয়ে দস্তয়েভস্কি ভাবিত ছিলেন। 'বঞ্চিত লাঞ্ছিত' উপন্যাসে রাজাবাহাদুর ভালকোভস্কির মুখ দিয়ে জীবনের পুরো একটা নির্লজ্জ নীতিবিগর্হিত মতবাদ বলিয়ে দস্তয়েভস্কি ফিরে আসেন ব্যক্তির অহংসর্বস্ববাদী আত্মসমর্থন ও তার স্বার্থগৃধ্নু প্রয়াসের সমালোচনায়।

উপন্যাসে তার বিপরীতে রাখা হয়েছে 'বঞ্চিত লাঞ্ছিত'দের ভালোবাসা আর ভ্রাতৃত্ব, যারা নিজেদের উৎপীড়কদের প্রতি আক্রোশ বোধ করলেও তাদেরই মতো যারা লাঞ্ছিত তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, সমবেদনায় কোমল।

উপন্যাসে অবিমৃষ্য অনাবৃত স্বার্থপরতার প্রতিচ্ছবি আলিওশা।

রাজাবাহাদুর ভালকোভস্কির মধ্যে দস্তয়েভস্কি তাঁর রচনায় এই প্রথম আঁকলেন 'মতাদর্শী'-নায়কের মূর্তি, বহু দিক থেকে তা অসম্পূর্ণ হলেও উপন্যাসের পাতায় ফুটিয়ে তুলেছে বাহ্যত সুগঠিত, সুসমাপ্ত একটা 'জীবনদর্শন'। দস্তয়েভস্কির ১৮৬০-৭০ দশকের বিবরজীবী মানুষ, রাসকলনিকভ স্ভিদ্রিগাইলভ এবং অন্যান্য মতবাদাশ্রিত নায়কের যে চরিত্র মানসিকতার দিক থেকে আরো জটিল ও সুসম্পূর্ণ তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল ভালকোভস্কি সৃষ্টিতে। ঔপন্যাসিকের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিণতিলাভে নেল্লী, আলিওশা, বৃদ্ধ ইখমেনেভের চরিত্রাঙ্কন গুরুত্ব ধরে। এদের মানসিকতার বৈপরীত্যে প্রকাশ পেয়েছে তাদের আভ্যন্তরীণ টানা-পোড়েন। যেমন, নেল্লী যুগপৎ সদয়া আর হিংস্রা, মানবিক মায়ার জন্যে কাতর অথচ লোকের প্রতি নিষ্ঠুর। আলিওশা খোলামেলা সরল মনের এক খোকাবাবু, অথচ মেরুদণ্ডহীন, স্বার্থপর। স্ত্রী আর কন্যাকে মাথায় করে রাখতে চাইলেও ইখমেনেভ তাদের প্রতি নির্মম।

শিল্পী হিশেবে দস্তয়েভস্কির একটা নতুন পর্যায় সূচিত হয়েছে এই উপন্যাসে। তখনকার সমাজজীবনের যেসব বিরোধ ও সংঘাত বাস্তবে সমাধানের অতীত, প্রধানত তার প্রতি মন দিয়েছেন তিনি। ইভান পেত্রোভিচের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ আর ভালোমানুষি সত্ত্বেও, অভিজাত ও ধনীদের যে স্বার্থপরতা ও ঔদাসীন্য লোকেদের মধ্যে গরমিল ঘটায়, পরস্পরকে পরকীয় করে তোলে তার বিপরীতে 'বঞ্চিত লাঞ্ছিতদের' সম্মিলিত করা মানবিকতা এবং কষ্টসহিষ্ণুতা তুলে ধরার জন্যে ইখমেনেভের প্রয়াস সত্ত্বেও উপন্যাস শেষ হয়েছে

প্রধান চরিত্রদের ব্যক্তিগত সুখের অবসানে, নেল্লীর মৃত্যুতে। দেখা গেল, সামাজিক অকল্যাণ আর বিযুক্তির শক্তি 'বঞ্চিত লাঞ্ছিতদের' চেয়ে প্রবল, তারা নৈতিক বিজয়গর্ব বোধ করতে পারে, কিন্তু বাস্তব জীবনে সে অকল্যাণের ক্ষমতা টলাতে অক্ষম।

১৮৬০-এর দশকে দস্তয়েভস্কির উপন্যাসটির সবচেয়ে মূলগত ও প্রগাঢ় মূল্যায়ন পাওয়া যায় দব্রলিউবভের 'আতুর জন' প্রবন্ধে। দস্তয়েভস্কি তাঁর যশের তুঙ্গবিন্দুতে তখন পৌঁছবেন যখন বহু প্রতিভা বিস্মৃত হবে, 'তাদের তুলনা করা হবে তাঁর সঙ্গে' — এই মর্মে ১৮৪৬ সালে বেলিনস্কি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা কতটা সফল হল, তদবধি দস্তয়েভস্কির সৃষ্টিপথ কী তা নির্ণয় করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

রুশ সমালোচনা সাহিত্যে দব্রলিউবভের প্রবন্ধেই প্রথম দস্তয়েভস্কির ভাবাদর্শীয় ও শিল্পীয় বিকাশের একটা গভীর ও সুসিদ্ধ বিবরণ মেলে।

বেলিন্‌স্কির পর দব্রলিউবভই ১৮৪০-এর দশকের 'মানবতাবাদী' সাহিত্যে সবচেয়ে সম্মানের স্থান দিয়েছেন দস্তয়েভস্কিকে, লক্ষ্য করেছেন তরুণ দস্তয়েভস্কির সমাজচেতন ভাবধারা: 'আর্ত, নষ্ট, স্বাতন্ত্র্যহীন মানুষের মধ্যে তিনি খোঁজেন এবং আমাদের দেখান মানবিক প্রকৃতির জীবন্ত প্রয়াস ও চাহিদা যা কখনো চাপা পড়ার নয়, বাইরের জবরদস্ত চাপের বিরুদ্ধে প্রাণের গহনে লুকানো ব্যক্তিত্বের প্রতিবাদ অবারিত করে আমাদের বিচার ও সহানুভূতির জন্যে তা তুলে ধরেন।

'শ্রী দস্তয়েভস্কি যাকিছু লিখেছেন সবের মধ্যেই একটা সাধারণ দিক কমবেশি লক্ষণীয়: সেটা হল মানুষের জন্যে এই ব্যথাবোধ, যে সত্যকার, পূর্ণায়তন, স্বাধীন মানুষ হতে, নিজের মতো হয়ে উঠতে নিজেকে অক্ষম বলে মানছে অথবা শেষত, সে অধিকার থেকে বঞ্চিত। "প্রত্যেকটি লোককে হতে হবে মানুষ এবং অপরের প্রতি তার আচরণ হওয়া চাই মানুষের মতো" — লেখকের যতকিছু আপেক্ষিক ও আংশিক দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও, এমনকি, যা বোঝা যায়, তাঁর নিজস্ব ইচ্ছা ও চেতনা ব্যতিরেকেই এই আদর্শ দানা বেঁধেছে তাঁর প্রাণে, যেন তা স্বতঃসিদ্ধ, তাঁর নিজ স্বভাবের অঙ্গ। অথচ জীবনক্ষেত্রে নেমে এবং চারপাশে দৃষ্টিপাত করে তিনি দেখেন যে নিজের ব্যক্তিত্ব রক্ষা করা, নিজের মতো হয়ে থাকার জন্যে মানুষের অন্বেষণ কখনো সফল হয় না আর অন্বেষীদের মধ্যে যারা যক্ষ্মা বা অন্যান্য ক্ষয়রোগে আগেই মারা যাবার ফুরসত না পায় তারা পরিণামে পৌঁছয় কেবল হয় কার্কশ্যে,

অসামাজিকতায়, মস্তিষ্কবিকৃতিতে, নয় স্রেফ মন্থর নীরসতায়, নিজের মানবপ্রকৃতি দমনে, মানুষের চেয়ে সে অনেক নিচু এমন একটা আত্মস্বীকৃতিতে। তেমন লোক অনেকেই আছে যারা এই শেষোক্ত চেতনা নিয়েই যেন জন্মায়, নিজের মানবিক তাৎপর্য বিষয়ে ভাবনা যাদের আজন্ম অনুপস্থিত। সে যেন অন্য জগতের জীব, বাকি মানুষদের সঙ্গে তার যেন মিল কিছু নেই... এই অধঃপতন, মানবিক সম্পর্কের এই ব্যত্যয়ের কারণ কী? কী করে তা ঘটে? এরূপ ব্যাপারের মূল বৈশিষ্ট্য কী? কী তার পরিণাম? এইসব প্রশ্নেই স্বাভাবিক ও অমোঘ রূপে পাঠকদের টেনে নিয়ে যায় শ্রী দস্তয়েভস্কির রচনা।'

সমকালীনদের পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ১৮৮১ সালে ন. ন. স্ত্রাখভের নিকট পত্রে ল. ন. তলস্তোয়ের মন্তব্য: 'ওঁর মৃত্যুর দিন কয়েক আগে "বঞ্চিত লাঞ্ছিত" পড়লাম, অভিভূত হয়েছি।'

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়। আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union